নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প

মীর হুমায়ূন কবীর

পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর ২০২০

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের পিএইচ ডি গবেষক মীর হুমায়ূন কবীর কর্তৃক পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প' (The Short Stories of Narayan Gangopadhyay : Society, Politics and Aesthetics) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে প্রণীত। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রিপ্রাপ্তির জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভ আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি বাংলা বিষয়ে পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

আরও প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এ-অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism (কুম্ভিলকবৃত্তি) নেই।

(ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন)
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জনের প্রয়োজনে উপস্থাপিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প' (The Short Stories of Narayan Gangopadhyay : Society, Politics and Aesthetics) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের (গিয়াস শামীম) তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি আমার মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এই অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষও উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি এই মর্মে আরও অঙ্গীকার করছি যে, এই অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism (কুম্ভিলকবৃত্তি) নেই।

(মীর হুমায়ূন কবীর)
পিএইচ. ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২৪
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রসঙ্গকথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের (গিয়াস শামীম) তত্ত্বাবধায়নে *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প* শীর্ষক পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন হয়েছে। অভিসন্দর্ভের বিষয়-নির্বাচন থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত, প্রতিটি পর্যায়ে তিনি প্রাজ্ঞ পরামর্শ, গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রদান করে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন; এবং উপর্যুপরি তাগিদ দিয়ে আমার গবেষণার গতি ত্বরান্বিত করেছেন। মূলত তাঁর উৎসাহ ও সস্নেহ তাগিদেই শেষাবধি এই গবেষণা-প্রকল্প উপস্থাপন সম্ভব হয়েছে। স্যারের প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

পিএইচ ডি গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আমাকে নিরন্তর উৎসাহিত করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক তানিম জসিম, রাফাত মিশু; পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আলীম, সহকারী অধ্যাপক তানভীর হায়দার; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শরীফ সিরাজ, জান্নাত আরা সোহেলী; বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহসিনা হোসাইন, মোহাম্মদ সাকিবুল হাসান; রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রভাষক জাবেদ ইকবাল, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফজলুর রহমান প্রমুখ। এঁদের আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কিত কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা সরবরাহ করে আমাকে সহযোগিতা করেছেন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক গাজী মো. মাহবুব মুর্শিদ। তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এছাড়া কলকাতা থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ এনে আমাকে উপকৃত করেছে স্নেহভাজন ইমরুল কায়েস প্রান্ত। তাকেও আমার শুভেচ্ছা।

গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমি ব্যবহার করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সেমিনার, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং পাবনা অন্নদাগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি। এসব গ্রন্থাগারে কর্মরত ব্যক্তিবর্গকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বাবা মীর হান্নানুর রহমান ও মা হাসিনা বানু পারিবারিক সকল প্রকার দায়দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়ে আমার গবেষণাকালকে নির্বিঘ্ন করেছেন। সহধর্মিণী কবিতা সুলতানা এবং আমাদের শিশুসন্তান মৃত্তিকা ও মননের সুখসঙ্গ গবেষণা-মুহূর্তকে করে তুলেছে আনন্দময়। এঁদের প্রতি আমার অফুরান ভালোবাসা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০) অবস্থান স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। সাহিত্যের বিচিত্র শাখায় তাঁর বিচরণ ছিল স্বচ্ছন্দ। তিনি ছিলেন একাধারে জনপ্রিয় ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, সাহিত্য-সমালোচক, ছোটগল্পশিল্পের গবেষক ও তাত্ত্বিক, চিত্রনাট্যকার, খ্যাতিমান অধ্যাপক এবং অসাধারণ বাগ্মী। ছাত্রাবস্থায় কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু হলেও কথাসাহিত্যিক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* গ্রন্থে তাঁকে 'তিরিশের কনিষ্ঠতম কথাশিল্পী' হিসেবে আখ্যায়িত করলেও তাঁর যথার্থ আত্মপ্রকাশের কাল চল্লিশের দশক। এই দশকেই তিন খণ্ডে রচিত *উপনিবেশ* (১৯৪৪) উপন্যাসে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর দুর্ধর্ষ পোর্তুগিজ জলদস্যু এবং তাদের উত্তরপুরুষের মহাকাব্যোচিত জীবনচিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে বাংলা কথাসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। অবশ্য উপন্যাস রচনায় নারায়ণের কৃতিত্ব স্মরণযোগ্য হলেও তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় হলো ছোটগল্প। প্রথম গল্পগ্রন্থ *বীতংস* (১৯৪৫) প্রকাশের পরই তিনি বাঙালি পাঠকসমাজে ব্যাপক সমাদৃত হন। ইতিহাসচেতনা ও স্বাদেশিকতাবোধ তাঁর ছোটগল্প রচনার অন্যতম প্রধান উপকরণ। তাঁর ছোটগল্প একটি বিশেষ মানবিকবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বাংলার এক উত্তাল রাজনৈতিক পটভূমিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম। বাল্যজীবনে তিনি যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন সত্যাগ্রহ কিংবা বিপ্লববাদী আন্দোলনের মতো ঐতিহাসিক কর্মসূচি, তেমনি কর্মজীবনে পর্যবেক্ষণ করেছেন মহাযুদ্ধ-মন্বন্তর, দাঙ্গা-দেশভাগ এবং তেভাগা-তেলেঙ্গা চাষীদের বিদ্রোহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ের উন্মূল জীবনযাত্রা যখন ছন্নছাড়া মূল্যহীনতায় আক্রান্ত, যখন পুরোনো মূল্যবোধে ভাঙন শুরু হয়েছে, বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি হয়ে গেছে চূর্ণ-বিচূর্ণ, তখনকার বাস্তব রেখাচিত্রাঙ্কনে তাঁর ছোটগল্পগুলো অর্জন করেছে তুমুল বিশ্বস্ততা। এসময় ভারতবর্ষে আধিপত্য সুরক্ষায় সাম্রাজ্যবাদীদের মরণকামড়, দেশীয় চোরাকারবারি-কালোবাজারিদের নীতিহীন দৌরাত্ম্য ও অর্থলিপ্সা, আর্থ-সামাজিক নৈরাজ্য, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরে জনজীবন যেমন সংকটাপন্ন ছিল, ঠিক তেমনি এসবের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল তীব্র প্রতিরোধ; স্বাধিকার চেতনায় জেগে উঠেছিল দেশপ্রেমিক সংঘশক্তি।

সমকালের যন্ত্রণা-বিক্ষুব্ধ পরিপ্রেক্ষিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বভাবতই জনজীবনবিচ্ছিন্ন কোনো বায়বীয় জগতে বিচরণ করেননি; বরং সংবেদনশীল হৃদয়ে তিনি তাঁর শিল্পকর্মে উপস্থাপন করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিধ্বস্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার করুণ চিত্র এবং উন্মোচন করেছেন মানবিক উত্তরণের

পন্থা। একারণে তাঁর ছোটগল্প অতিমাত্রায় সমাজ ও রাজনীতিঘনিষ্ঠ। ভাষিক প্রকরণেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ শিল্পসফল। ছোটগল্প নিয়ে তিনি নানা সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদন করেছেন। বর্ণনরীতির অভিনবত্ব, দৃষ্টিকোণ ব্যবহার, প্রসাধন ও পরিচর্যার বিন্যাসকলায় তিনি তাঁর গল্পগুলোতে নিয়ে এসেছেন ভিন্নমাত্রিক স্বাদ।

বিষয়বৈচিত্র্যে শুধু নয়, সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসংখ্যানেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমৃদ্ধ। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় *বীতংস* (১৯৪৫), *ভাঙাবন্দর* (১৯৪৫), *দুঃশাসন* (১৯৪৫), *ভোগবতী* (১৯৪৭), *কালাবদর* (১৯৪৮), *শ্বেতকমল* (১৯৫৪), *গন্ধরাজ* (১৯৫৫), *উর্বশী* (১৯৫৭), *শুভক্ষণ* (১৯৬০), *একজিবিশন* (১৯৬১), *ছায়াতরী* (১৯৬৬) এবং *বনজ্যোৎস্না* (১৯৬৯); মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় *ঘূর্ণি* (১৯৭১) ও *আলেয়ার রাত* (১৯৮২) গল্পগ্রন্থ। এসব গল্পগ্রন্থে রূপায়িত সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা আলোচিত হয়েছে আমাদের সদ্যসম্পন্ন পিএইচ ডি গবেষণা-অভিসন্দর্ভে। তৎসঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে গল্পগুলোর শিল্পরীতি ও সৌন্দর্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প শীর্ষক এই পিএইচ ডি গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় 'বাংলা ছোটগল্পধারায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়'। এখানে বাংলা ছোটগল্পের উৎস-বিকাশের ধারাসমূহ পরিচিহ্নিত হয়েছে এবং বিভিন্ন গল্পকারের উল্লেখযোগ্য প্রবণতাসমূহ প্রদর্শিত হয়েছে। সেইসঙ্গে বাংলা ছোটগল্পের দীর্ঘ পথযাত্রায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশিত হয়েছে এবং তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানাবিধ পর্যায় আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'সমকালীন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত'। এ অধ্যায়ে সমকালীন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে, এবং এসব ঘটনাপ্রবাহের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তা কীভাবে জাগ্রত হয়েছে, তা তথ্যাকারে উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প'; এ অধ্যায়টি বিন্যস্ত হয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদে –

প্রথম পরিচ্ছেদ : সমাজ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাজনীতি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিল্পশৈলী

প্রথম পরিচ্ছেদে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রতিফলিত সমাজজীবনের বৃত্তান্ত রয়েছে। এ পরিচ্ছেদের শুরুতে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনযাপনের পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে। সমাজপটে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর অবস্থান, তাদের প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্ক এ পরিচ্ছেদের আরেকটি আলোচ্য বিষয়। কেবল নাগরিক কিংবা গ্রামীণ সমাজ নয়, এখানে প্রদর্শিত হয়েছে আঞ্চলিক সমাজের চিত্র। পাহাড়ি জনগোষ্ঠী এবং নদী-তীরবর্তী মানুষের জীবনযাপন-পদ্ধতি এ-প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে। এ পরিচ্ছেদের শেষাংশে উপস্থাপিত হয়েছে সমাজ-পরিসরে নিগৃহীত-বঞ্চিত-শোষিত জনতার প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে উপস্থাপিত রাজনৈতিক বাস্তবতা। এ-অংশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তুজীবন, তেভাগা আন্দোলন, ৫২-র ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত গল্পসমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে। এছাড়া সমকালীন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, বামপন্থী রাজনীতি, বিশেষত নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির নানা তৎপরতা, ভারতীয় সমাজে জাতিবিদ্বেষ, রাজনীতিবিদদের স্খলন প্রভৃতি প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের শিল্পনিরীক্ষা।

‘উপসংহার’ অংশে এ-অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপিত হয়েছে।

সর্বশেষে প্রদর্শিত হয়েছে ‘গ্রন্থপঞ্জি’।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পধারায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৬-৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমকালীন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ৩৪-৬৪

তৃতীয় অধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাজ ৬৫-২৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজনীতি ২৩৩-৩২৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিল্পশৈলী ৩২৬-৩৭০

উপসংহার ৩৭১-৩৭৪

গ্রন্থপঞ্জি ৩৭৫-৩৮০

সাহিত্যের বিবিধ রূপকল্পের মধ্যে ছোটগল্প অন্যতম। এটি আধুনিক জীবনের জনপ্রিয় সাহিত্য-মাধ্যম। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে মানব-সমাজে গল্পের প্রচলন থাকলেও[১] ছোটগল্প একেবারেই আধুনিক যুগের সৃষ্টি। ইতালি সাহিত্যে Gesta Romanorum (১৩৫০); Giovanni Boccaccio'র The Decameron (১৩৪৮-১৩৫৩); Aesop's Fables; বিষ্ণুশর্মার 'হিতোপদেশ' ও 'পঞ্চতন্ত্র'; বৌদ্ধসাহিত্যে 'জাতকের গল্প' প্রভৃতি গল্পসাহিত্যের নিদর্শন হলেও এগুলো ছোটগল্প অভিধায় চিহ্নিত নয়। এগুলোর কোনো-কোনোটির আকার-প্রকার ও পরিসরও বেশ বড়ো। কিন্তু ছোটগল্প তা নয়। আধুনিক কালের স্মারকচিহ্ন বিধৃত রয়েছে ছোটগল্পের অঙ্গভঙ্গিতে ও মর্মমূলে। প্রাচীনকালের গল্পের মতো আধুনিক ছোটগল্প যথেষ্ট-বিহারী, প্রগল্‌ভ কিংবা নিরুদ্দেশপন্থি নয়। আধুনিক ছোটগল্প-লেখক বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ, সংলাপ কিংবা ভাষাবয়নে যথেষ্ট সচেতন।

বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্প আত্মপ্রকাশ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এসময় গল্প কেবল কাহিনি বর্ণনা নয়, আত্মপ্রকাশ করে বিশিষ্ট শিল্পকৌশলে। এ শতকে ফ্রান্সের আলফঁস দোদে (১৮৪০-১৮৯৭), গী-দ্য-মোপাসাঁ (১৮৫০-১৮৯৩); রাশিয়ার আলেকজান্ডার পুশ্‌কিন (১৭৯৯-১৮৩৭), নিকোলাই গোগোল (১৮০৯-১৮৫২), লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০), আন্তন চেকভ (১৮৬০-১৯০৪), ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) প্রমুখ ছোটগল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইংল্যান্ডে তখন কাব্য ও নাট্যশিল্প বিকশিত হলেও ছোটগল্প-চর্চা বেগবান হয়নি। বস্তুত ছোটগল্পের উর্বর ভূমি হচ্ছে আমেরিকা। মার্কিন কথাসাহিত্যিক ন্যাথানিয়েল হথর্ন (১৮০৪-১৮৬৪), এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯), হেনরি জেমস (১৮৪৩-১৯১৬), ও হেনরি (১৮৬২-১৯১০) এক্ষেত্রে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। এঁরা কেবল গল্পরচনা করেননি, এ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনাও করেছেন এবং ছোটগল্পের নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরিতে সচেষ্ট ছিলেন। অ্যালান পো আধা-ঘণ্টা থেকে দু-এক ঘণ্টায় পঠিত

[১] মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ, গল্পের জন্মও সেদিন থেকেই।... কিসের গল্প ? প্রকৃতির নানা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম এবং জয়লাভ; নিষ্ঠুর ও জান্তব প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে আত্মরক্ষার উপায় এবং উপকরণ; সাহস ও বুদ্ধির সহযোগিতায় অন্যান্য বিরোধীগোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব বিস্তারের কাহিনী। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত তরুণদের শিক্ষাদান – জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তোলবার মূল্যবান উপদেশ, দ্বিতীয়ত আনন্দের পরিবেষণ। জ্ঞানাঞ্জন-প্রলেপন এবং চিত্ত-বিনোদন, এই দ্বৈত প্রেরণা থেকেই গল্পের আবির্ভাব।" [দ্রষ্টব্য : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প – প্রথম খণ্ড : উৎসকথা*, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (একাদশ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪০৫, পৃ. ২৪৯]

গদ্যশিল্পকে ছোটগল্প হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ন্যাথানিয়েল হথর্নের *Twice-Told Tales* (১৮৩৭) গ্রন্থের আলোচনায় তিনি বলেছেন :

> The short prose narrative, requiring from a half-hour to one and two hours in its perusal. The ordinary novel is objectionable, from its length, for reasons already stated in substance, As it cannot be read at one sitting, it deprives itself, of course, of its immense force derivable from totality...
>
> A skilful literary artist has constructed a tale. If wise, he has fashioned his thoughts to accomodate his incidents; but having concevied, with deliberate care, a certain unique or simple effect to be wrought out, he then invents such events as may best aid him in establishing this preconceivd effect.[১]

আমেরিকান লেখক ব্র্যান্ডার ম্যাথুজ (১৮৫২-১৯২৯) *The Philosophy of the Short-Story* (১৮৮৫) গ্রন্থে ছোটগল্পকে চিহ্নিত করেছেন 'Unity of Impression' হিসেবে। তিনি বলেন – 'The short story by its efect, a creation unity of Impression which set it apart from other kinds of fiction.'[২] ছোটগল্পে কাহিনির গতি একমুখী। এখানে একটি বাক্যও মূল্যবান। অনেক সময় একটিমাত্র বাক্য একটি গল্পকে চূড়ান্ত রসনিষ্পত্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ছোটগল্পের দায়িত্ব অনেক বেশি, বিস্তৃতির অবকাশ কম। ছোটগল্প জীবনের খণ্ডাংশ হলেও অখণ্ড জীবনেরই ব্যঞ্জনা। এ যেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর প্রকাশ, শিশিরের স্বচ্ছ দর্পণে আকাশ-আলোর প্রতিফলন।

ছোটগল্পের আরম্ভ ও সমাপ্তি হবে নাটকীয়। সুনির্বাচিত ঘটনার সাহায্যে ইঙ্গিতপূর্ণ পরিণতি প্রদানই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য। বিশেষত পূর্ণাঙ্গ গল্পে লেখকের যে মানস-স্পর্শ থাকে তা তাকে গীতিকাব্যোচিত মাধুর্য দান করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) ভাষায় :

ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।

---

[১] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা*, দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ) : জুন ২০১৫, পৃ. ৯

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প* – দ্বিতীয় খণ্ড : রূপতত্ত্ব, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (দ্বাদশ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৮, পৃ. ৪৮২

নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,

নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।

অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি' মনে হবে

শেষ হয়ে হইল না শেষ।[১]

রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যিক সংজ্ঞার্থকে সাহিত্যতাত্ত্বিক ও ছোটগল্প-গবেষকগণ ব্যাপক স্বীকৃতি দিয়েছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে বলেছেন –

> খাঁটি ছোট গল্পের এই হল সহজসুন্দর কাব্যিক ব্যাখ্যা। 'ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা'ই তার উপজীব্য... তত্ত্ব থাকবে, কিন্তু তাত্ত্বিকতা বড় হয়ে উঠবে না – ফুলের গায়ে গন্ধের মতোই তা অবিচ্ছিন্ন হয়ে বিরাজ করবে; কাহিনীর ধূপ নিবে যাবে, কিন্তু তার ভাবের সৌরভটি মোহ বিস্তার করতে থাকবে ধীরে ধীরে। অতএব লেখকের কলম যেখানে থেমে দাঁড়াবে, সেইখান থেকেই পাঠকের মনে গল্পটি সঞ্চারিত হয়ে চলবে।[২]

এ-প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ রায়ও একমত পোষণ করেছেন –

> 'বর্ষাযাপন' কবিতায় কবি প্রসঙ্গক্রমে ছোটগল্প সম্পর্কে যে বিদগ্ধ মন্তব্যটি করেছেন, স্বল্পাক্ষরে ছোটগল্পের এর চেয়ে সর্বার্থসাধক সংজ্ঞা আর কেউ দিতে পারেননি। সংক্ষেপে এই অংশটুকুর মধ্যে ছোটগল্পের স্বরূপধর্ম সম্পর্কে সব কথাই বলা হয়েছে।[৩]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের আলোচনার সূত্র ধরে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়াস করেছেন। তাঁর মতে :

> ছোট গল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression)-জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।[৪]

ছোটগল্পের রূপবিচারে তিনি নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এগুলো হলো :

(১) ছোট গল্পে 'প্রতীতির সমগ্রতা' (Unity of Impression) অবশ্য রক্ষণীয়।

(২) ছোট গল্পে একটিমাত্র বস্তুকেই একমুখী ভাবে পাওয়া যাবে, পার্শ্ব উপকরণগুলি সে একমুখিতার আনুকূল্য করবে – অন্তরায় ঘটাবে না।

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সোনার তরী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ৩৫

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প* – দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩

[৩] রথীন্দ্রনাথ রায়, *ছোটগল্পের কথা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৯৮

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প* – দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩

(৩) একটিমাত্র 'মহামুহূর্ত' বা 'চরমক্ষণ' (Climax) থাকবে – গল্পের সমগ্র উৎকণ্ঠা (suspense) তার উপরেই নিবদ্ধ হবে।

(৪) জীবনের চলস্রোত থেকে গল্পকার যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড 'প্রতীতি' আহরণ করবেন – তারাই হবে ছোট গল্পের প্রাণবীজ।

(৫) এই প্রাণবীজটি গল্পরূপে পল্লবিত হবে ব্যক্তিত্বের মৃত্তিকায়, প্রত্যেকটি ছোট গল্পেই লেখকের ব্যক্তিসত্তা নিজেকে সম্প্রসারিত করবে – তাঁর দেশ, কাল, চরিত্র ও মানসিকতা অনুযায়ী তিনি 'প্রতীতি'র উপযোগী প্রতীক (Expressive symbol) এবং তার রসভাষ্য রচনা করবেন। তাঁর নিজস্ব স্টাইলটিও সেই ব্যক্তিত্বেরই রূপ।

(৬) স্বল্পতম ব্যাপ্তির মধ্যে ছোট গল্প বৃহৎ সত্যকে প্রতিফলিত করবে।[১]

আধুনিক ছোটগল্পের সমাপ্তির ক্ষেত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দু-ধরনের প্রবণতা লক্ষ করেছেন –

ক) গল্পের শেষে একটা অপ্রত্যাশিত চমক দিয়ে পাঠককে স্তম্ভিত করে দেওয়া একটি প্রিয় ও প্রাচীন পদ্ধতি। চল্‌তি পরিভাষায় এর নাম "Whipcrack ending" – 'চাবুক-হাঁকড়ানো সমাপ্তি'। ... পো, মোপাসাঁ এবং ও. হেনরি এই জাতীয় সমাপ্তির পক্ষপাতী।[২]

খ) আর একদল আছেন, যাঁরা এই চমককে পছন্দ করেন না। এঁদের মধ্যে আছেন চেকভ, আছেন হেন্‌রি জেম্‌স। দিনের শেষে যেমন ধীরে ধীরে বিকেলের ছায়া বিকীর্ণ হয়ে পড়ে, এঁরা গল্পের ভিতর সেই ধীর স্বাভাবিক পরিণামকেই আনবার পক্ষপাতী।[৩]

ছোটগল্পের সংজ্ঞা এবং রূপবিচারের পাশাপাশি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণে ছোটগল্প নানা ধরনের হতে পারে। যেমন : দার্শনিক, সমাজ সমস্যামূলক, নারী-পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রশ্নাত্মক, মনস্তাত্ত্বিক, রোম্যান্টিক, চরিত্রাত্মক, রূপক, ব্যঙ্গমূলক, কাব্যধর্মী, আদর্শাত্মক-রাজনৈতিক, অতিলৌকিক ইত্যাদি। বিভিন্নভাবে ছোটগল্পকে বিন্যস্ত করা হলেও, একই গল্পের মধ্যে একাধিক প্রবণতা মিশ্রভাবে থাকতে পারে; এক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পাবে, গল্পটি সেই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প* – দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০০

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১

[৪] দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮

দুই

বাংলা গল্পসম্ভার সমৃদ্ধ হয়েছে সংস্কৃত কথা-কাহিনির মাধ্যমে। উনিশ শতকের শুরুতে এগুলো অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে। ১৮০১ সালে গোলকনাথ দাস *হিতোপদেশের* বাংলা অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থের আরেকটি অনুবাদ করেন (১৮০৮) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)। উইলিয়াম কেরির (১৭৬১-১৮৩৪) *ইতিহাসমালায়* (১৮১২) সন্নিবেশিত হয়েছে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের গল্প। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) অনূদিত *বেতাল পঞ্চবিংশতি* (১৮৪৭) গ্রন্থেও গল্পের আস্বাদ পাওয়া যায়। আরব্য এবং পারস্য সাহিত্য থেকে এসময় কিছু অনুবাদকর্ম সম্পন্ন হয়। যেমন : হরিমোহন সেন অনূদিত *আরব্য রজনী* (১৮৩৯), চণ্ডীচরণ মুন্সী অনূদিত *তোতা ইতিহাস* (১৮৫৩), দ্বারকানাথ রায় অনূদিত *লয়লা-মজনু* (১৮৫৪) প্রভৃতি।

বাঙালি পাঠকদের গল্পতৃষ্ণাকে গুরুত্ব দিয়ে উনিশ শতকে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন আখ্যানধর্মী রচনা। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২২) 'মধুমতী' (১৮৭৩) এবং 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভিখারিণী' (১৮৭৪) গল্প। বাংলা গল্পের শিল্প-সম্ভাবনাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নেন স্বর্ণকুমারী দেবী[১] (১৮৫৫-১৯৩২)। 'প্রাক্-রবীন্দ্র গল্পধারায় তিনিই ছোটগল্পের প্রথম সচেতন শিল্পী।'[২] তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম *নবকাহিনী বা ছোট ছোট গল্প* (১৮৯২)। তবে স্বর্ণকুমারীর গল্পের স্বতন্ত্র ভঙ্গি থাকলেও, তিনি যথার্থ প্লট-নির্মাণে ব্যর্থ হন। এসময় আরো দুজন গল্পকারের নাম স্মরণীয়, এঁরা হলেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিই প্রথম 'ছোটগল্প' অভিধাটি ব্যবহার করেন। বিষয় ও প্রকরণের বিচারে সার্থক ছোটগল্প তিনিই প্রথম রচনা করেছেন। 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর গল্পলেখা শুরু হলেও তা অব্যাহত থাকে 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে। *গল্পগুচ্ছ* রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী সৃষ্টিকর্ম। উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রধানত নগরকেন্দ্রিক হলেও, তাঁর অধিকাংশ গল্পের পটভূমি বাংলার পল্লিজীবন। মূলত জমিদারি তদারকির উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে পদার্পণ করলে (১৮৯০) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটে। এ-প্রসঙ্গে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন – 'এই জমিদারি দেখা উপলক্ষে নানা রকমের লোকের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয় এবং এই থেকেই

---

[১] স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নদিদি এবং 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক।

[২] শিশিরকুমার দাশ, *বাংলা ছোটগল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ : আগস্ট ২০১২, পৃ. ৬৭

আমার গল্প লেখারও শুরু হয়।’[১] সাজাদপুর-শিলাইদহের পদ্মা-তীরবর্তী জনজীবন ও প্রকৃতি হয়ে ওঠে তাঁর এ-পর্যায়ের গল্পের শিল্প-উপকরণ। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> ক) সাজাদপুরে যখন আসতুম চোখে পড়ত গ্রাম্য জীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্মোদ্যম। তারই প্রকাশ ‘পোস্টমাস্টার’, ‘সমাপ্তি’, ‘ছুটি’ প্রভৃতি গল্পে। তাতে লোকালয়ের খণ্ড খণ্ড চলতি দৃশ্যগুলি কল্পনার দ্বারা ভরাট করা হয়েছে।[২]
>
> খ) ‘সাধনা’র যুগে প্রধানত শিলাইদহেই কাটিয়েছি। কলকাতা থেকে বলুর (সাধনা পত্রিকার সম্পাদনা-সহযোগী) ফরমাস আসত, গল্প চাই। গ্রাম্যজীবনের পথ-চলতি কুড়িয়ে-পাওয়া অভিজ্ঞতার সঞ্চয় সাজিয়ে লিখেছি গল্প। তখন ভাবতাম কলম বাগিয়ে বসলেই গল্প লেখা যায়।[৩]

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২) সম্পাদিত ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’, ‘পোস্টমাস্টার’, ‘গিন্নি’, ‘রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা’ প্রভৃতি ছোটগল্প। এরপর ‘সাধনা’ পত্রিকায় তিনি লেখেন ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’, ‘একরাত্রি’, ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘ছুটি’, ‘সুভা’, ‘মধ্যবর্তিনী’, ‘শাস্তি’, ‘সমাপ্তি’, ‘মেঘ ও রৌদ্র’, ‘অতিথি’ প্রভৃতি গল্প। ‘একদিকে সরল জীবনের সহজকথা, অন্যদিকে প্রকৃতির উদার সুন্দর রহস্যময়তা’[৪] – এ-পর্বের গল্পের বৈশিষ্ট্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নে প্রকাশিত ‘সবুজপত্র’ (১৯১৪) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-গল্পের বাঁকবদল ঘটে। এখানে প্রকাশিত হয় তাঁর দশটি গল্প : ‘হালদারগোষ্ঠী’, ‘হৈমন্তী’, ‘বোষ্টমী’, ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘ভাইফোঁটা’, ‘শেষের রাত্রি’, ‘অপরিচিতা’, ‘তপস্বিনী’, ‘পয়লা নম্বর’ এবং ‘পাত্র ও পাত্রী’। এ পর্যায়ের গল্পে রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। ব্যক্তিত্বধর্মে জাগরিত ও উদ্বোধিত নারীরা এসময়ের গল্পসমূহে শিল্পমূল্য পেয়েছে। এরা সনাতনী চিন্তা-চেতনা, দ্বিধা-শঙ্কা বিসর্জন দিয়েছে এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌক্তিক এবং বৌদ্ধিক ভঙ্গিতে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

রবীন্দ্র-যুগে যেসব ছোটগল্পকার ছোটগল্পশিল্পে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) প্রমুখ। আবহমান বাঙালি সমাজের নিপুণ রূপকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ‘মার্জিত শিক্ষাদীক্ষা ও

---

[১] উদ্ধৃত : [তথ্যপঞ্জি : শ্রীপুলিনবিহারী সেন (সংকলিত)], প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪, পৃ. ৩৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প* – প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬

সমাজানুগত্য প্রভাতকুমারের গল্পে একটি বিনম্র শোভনতা এনে দিয়েছে।'[১] তাঁর গল্প আখ্যানপ্রধান; কৌতুক ও রঙ্গচিত্রে তিনি উপস্থাপন করেছেন বাঙালির গার্হস্থ্য জীবন। এমনকি পাশ্চাত্যের পটভূমিতে তিনি যেসব গল্প লিখেছেন, সেগুলোও যেন হয়ে উঠেছে বাঙালির অন্দরমহলের কাহিনি। তাঁর গল্প নির্ভার ও গতিময়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে জানিয়েছেন – 'তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায়, কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।'[২] *নবকথা* (১৮৯৯), *ষোড়শী* (১৯০৬), *দেশী ও বিলাতী* (১৯০৯), *গল্পাঞ্জলি* (১৯১৩), *গল্পবীথি* (১৯১৬), *পত্রপুষ্প* (১৯১৭), *গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প* (১৯২১), *হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প* (১৯২৪), *বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প* (১৯২৬), *যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প* (১৯২৮), *নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প* (১৯২৯) এবং *জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প* (১৯৩১) প্রভৃতি প্রভাতকুমারের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগ্রন্থ।

সমকালীন গল্পকারদের মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী প্রমথ চৌধুরী। 'সবুজপত্রে'র সম্পাদক এবং প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি চূড়ান্ত হলেও ছোটগল্প রচনায়ও তাঁর সাফল্য ঈর্ষণীয়। 'রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে বাস করেও রবীন্দ্র-যুগের এই গল্পকার রবীন্দ্র-প্রভাবিত হলেন না। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ কথাশিল্পী প্রমথ চৌধুরীর কৃতিত্বের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ।'[৩] গল্পের বিষয়-চরিত্র-আঙ্গিক সর্বক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তা স্পষ্ট। প্রমথ চৌধুরীর গল্পে কাহিনির অন্তরালে 'বৈঠকী রসালাপের মন্থর ভঙ্গি ফুটে উঠেছে।'[৪] সামাজিক সংকট কিংবা সীমাবদ্ধতা নয়, তিনি 'বাংলার সজীব প্রাণের ধারা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।'[৫] এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি অনেকটা অতীতমুখী। তাঁর গল্পগ্রন্থসমূহ হচ্ছে : *চার-ইয়ারী কথা* (১৯১৬), *আহুতি* (১৯১৯), *নীল লোহিত* (১৯৩২), *নীল লোহিতের আদিপ্রেম* (১৯৩৪), *ঘোষালের ত্রিকথা* (১৯৩৭), *অনুকথা সপ্তক* (১৯৩৯) এবং *গল্প-সংগ্রহ* (১৯৪১)।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্প-বিচিত্রা*, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (নবম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ২৭৮

[২] উদ্ধৃত : শিশিরকুমার দাশ, *বাংলা ছোটগল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[৩] গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৪১৭, পৃ. ৬২

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

[৫] জীবেন্দ্র সিংহ রায়, *প্রমথ চৌধুরী*, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ১৭৭

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কথাশিল্পী। গ্রামীণ সমাজের প্রেম-ভালোবাসা, আদর্শ-সংস্কার, ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁর গল্পে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তবে তিনি সমাজের আমূল পরিবর্তন চাননি। তিনি 'সমন্বয় চেয়েছেন; সমন্বয়ের কারণেই সমাজ ভেঙে পড়ার কোনো সুযোগ তিনি দেননি কোনো গল্পে। ভারতীয় সমাজকাঠামোর পরিবর্তন তিনি ওইটুকুই চেয়েছেন, যেটুকু হলে সমাজ আরও মানবিক হয়ে উঠবে।'[১] রক্ষণশীল পল্লিসমাজে নারীর দুঃখগাঁথা বর্ণনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর গল্পে 'নারী চিরন্তন ধাত্রী, সে প্রিয়া হয়েও পরিপূর্ণ প্রেমিকা নয়, অনেকাংশে জননী। উদ্ভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ নারীর প্রেমের মধ্যেই শান্তির আস্বাদ পেতে চেয়েছে।'[২] শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্প 'মন্দির' (বেনামে প্রকাশিত)। সমকালে এ-গল্পটি কুন্তলীন-পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে। তাঁর গল্পের সংখ্যা বেশি নয়, মাত্র পঁচিশটি। এগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে *বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প* (১৯১৪), *মেজদিদি* (১৯১৫), *নিষ্কৃতি* (১৯১৭), *কাশীনাথ* (১৯১৭), *স্বামী* (১৯১৮), *ছবি* (১৯২০), *হরিলক্ষ্মী* (১৯২৬) এবং *অনুরাধা সতী ও পরেশ* (১৯৩৪) গল্পগ্রন্থে।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা ছোটগল্প যাঁদের বিচিত্রধর্মী নিরীক্ষায় ঋদ্ধিলাভ করেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০) প্রমুখ।

বাংলা ছোটগল্পে জগদীশ গুপ্ত হলেন 'ন্যাচারালিজম-এর শিল্পী'[৩]। তাঁর 'রূপায়িত অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীর মধ্যেই মানবতাবোধ সুপ্ত; কামনা-বাসনা, লালসা-লিপ্সাই তাদের আরাধ্য; ঘৃণ্য-কদর্য-অবৈধ আত্মগুহাবাসে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্ব-কৃত-কার্যের দায়ভার অদৃষ্টের উপর চাপিয়ে তারা নিশ্চিন্ত।'[৪] গল্পে পূর্বাপর স্বার্থ-চালিত হলেও তাঁর গল্পের চরিত্রপাত্র জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও নিঃসঙ্গ। এসব হতাশাদীর্ণ ও বিকারগ্রস্ত মানুষের প্রবণতা নির্ণয়ে জগদীশ গুপ্ত ছিলেন সম্পূর্ণ নির্মোহ। তাঁর গল্পে 'প্রেমের-জগৎও অসঙ্গতি-যুক্ত; তাঁর চরিত্রসমূহের প্রেমবোধ

---

[১] শরীফ সিরাজ, ভূমিকা : *শ্রেষ্ঠ গল্প শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* (শ্রেষ্ঠ গল্পমালা সম্পাদক : ডক্টর গিয়াস শামীম), ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২২

[২] গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

[৩] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[৪] ভীষ্মদেব চৌধুরী, *জগদীশ গুপ্তের গল্প : পঙ্ক ও পঙ্কজ*, ফুলদল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৫, পৃ. ৪৯

সর্বদা দেহজ-কামনার পঙ্কে বিকৃত।'[১] জগদীশ গুপ্তের প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে *বিনোদিনী* (১৯২৭), *রূপের বাহিরে* (১৯২৯), *শ্রীমতী* (১৯৩০), *উদয়লেখা* (১৯৩২), *তৃষিত সৃক্কনী* (?), *রতি ও বিরতি* (১৯৩৪), *উপায়ন* (১৯৩৪), *পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক* (?), *শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী* (১৯৩৫) এবং *মেঘাবৃত অশনি* (১৯৪৭)।

বাংলা ছোটগল্পধারায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। 'সমকালীন সাহিত্যধারায় তিনি ছিলেন দলছুট ও ব্যতিক্রমধর্মী। কল্লোলীয় লেখকদের নগর-তৃষিত, বিকৃত ও পঙ্কমথিত জীবনদৃষ্টিকে তিনি গ্রাহ্য করেননি। জীবনের অব্যবহিত প্রয়োজন, প্রতিক্রিয়া, নৈরাশ্য-নৈরাজ্য ও জটিলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি মানবজীবনকে সমগ্র ও অখণ্ডভাবে বিবেচনা করেছেন।'[২] তাঁর গল্পের বিষয় ও বয়ন-বিন্যাস সরল ও ব্যঞ্জনাময়। মানবচরিত্রের রূপায়ণে তিনি মূলত প্রকৃতি-আশ্রয়ী। 'একান্ত পরিচিত বাস্তব বিষয় ও চরিত্র প্রকৃতি-সংস্পর্শে বিভূতিভূষণের গল্পে এক অসামান্যতা পেয়েছে। এখানেই তিনি আধুনিক। সাধারণের অন্তরালে তিনি দেখেছেন সৌম্য, শাশ্বত পরিপূর্ণ জীবন।'[৩] তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থসমূহ হচ্ছে – *মেঘমল্লার* (১৯৩১), *মৌরীফুল* (১৯৩২), *যাত্রাবদল* (১৯৩৪), *জন্ম ও মৃত্যু* (১৯৩৭), *কিন্নরদল* (১৯৩৮), *বেনীগীর ফুলবাড়ি* (১৯৪১), *নবাগত* (১৯৪৪), *তালনবমী* (১৯৪৪), *উপলখণ্ড* (১৯৪৫), *বিধু মাষ্টার* (১৯৪৫), *ক্ষণভঙ্গুর* (১৯৪৫), *অসাধারণ* (১৯৪৬), *মুখোশ ও মুখশ্রী* (১৯৪৭), *আচার্য্য কৃপালনী কলোনী* (১৯৪৮)[৪], *জ্যোতিরিঙ্গণ* (১৯৪৯), *কুশল পাহাড়ী* (১৯৫০), *রূপহলুদ* (১৯৫৭), *অনুসন্ধান* (১৯৬০) এবং *ছায়াছবি* (১৯৬০)।

বাংলা ছোটগল্পে রাঢ়বঙ্গের বিশ্বস্ত রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গল্পের 'অধিকাংশ চরিত্রই বাস্তবানুগ, অভিজ্ঞতাপ্রসূত। জন্মভূমি বীরভূমের জনজীবন থেকেই অধিকাংশ চরিত্র গ্রহণ করেছেন তিনি। একারণেই চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে এত জীবন্ত, এত সজীব।'[৫] রাঢ় অঞ্চলের ধীবর সম্প্রদায়, বিশেষ করে ডোম-হাড়ি, বেদে-বাগদি, সাধু-সন্ন্যাসী, সাঁওতাল-চণ্ডাল, কাহার-মাঝি, ভৈরব-ভৈরবী, বাউল-বৈষ্ণব তাঁর গল্পে শিল্পরূপ পেয়েছে। 'রাঢ়ের কঙ্করাকীর্ণ জলহীন প্রান্তরে মধ্যাহ্ন সূর্যের যে অসহ্য দাহ – যে বুকফাটা পিপাসা, তাঁর গল্পের

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[২] গিয়াস শামীম, *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০১৯, পৃ. ৫৬

[৩] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

[৪] *আচার্য্য কৃপালনী কলোনী* গল্পগ্রন্থটি ১৯৫৯সালে *নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব* নামে প্রকাশিত হয়।

[৫] জান্নাত আরা সোহেলী, ভূমিকা : *শ্রেষ্ঠ গল্প তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়* (শ্রেষ্ঠ গল্পমালা সম্পাদক : ডক্টর গিয়াস শামীম), ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২৪

মধ্যে তারই জ্বালাভরা এক শুষ্ক লেলিহ-রসনার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। লোভ, লালসা, কামনা ও স্নেহ – সব কিছুই যেন এই খররৌদ্রের রৌদ্ররসে অভিষিক্ত।'[১] এছাড়া সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তা তাঁর গল্পে বিশেষ তাৎপর্যে প্রকাশিত হয়েছে। এ দ্বন্দ্ব কেবল 'প্রাচীন জমিদার ও নতুনকালের জেগে ওঠা ব্যবসায়ী বা প্রজাদের হাত ধরেই আসেনি। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব এসেছে পুরোনো সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব হিসেবেও।'[২] তারাশঙ্করের গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *পাষাণপুরী* (১৯৩৩), *নীলকণ্ঠ* (১৯৩৩), *ছলনাময়ী* (১৯৩৬), *জলসাঘর* (১৯৩৭), *রসকলি* (১৯৩৮), *তিনশূন্য* (১৯৪১), *বেদেনী* (১৯৪৩), *দিল্লীকা লাড্ডু* (১৯৪৩), *যাদুকরী* (১৯৪৪), *স্থলপদ্ম* (১৯৪৪), *ইমারৎ* (১৯৪৬), *রামধনু* (১৯৪৭), *মাটি* (১৯৫০), *কামধেনু* (১৯৫৩) ইত্যাদি।

বাংলা ছোটগল্পে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় 'বনফুল' ছদ্মনামে সুপরিচিত। অতি সাধারণ নরনারীর অনাড়ম্বর জীবনাচার বনফুলের গল্পের প্রধান শিল্প উপকরণ। 'সাধারণ নরনারীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তিনি যেমন একাত্ম হয়েছেন; তেমনি তাদের চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি, শঠতা, হীনতা, দুর্বলতা কিংবা কৃত্রিমতাকে প্রকাশ করেছেন তির্যক ব্যঙ্গাশ্রয়ে। তবে এসকল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অন্তরালে মূর্ত হয়ে উঠেছে অসহায় ও অক্ষম মানুষের প্রতি তাঁর গভীর আন্তরিকতা ও মমত্ববোধ। একারণে তাঁকে অভিহিত করা হয় মানবচেতনায় পরিপুষ্ট জীবনবাদী এক কথাশিল্পী হিসেবে।'[৩] বনফুলের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব তাঁর ক্ষুদ্রাকৃতির গল্পগুলো, যেগুলো অণুগল্প নামে স্বীকৃত। অনুগল্পের মতোই তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টিকর্ম রেখাচিত্রধর্মী গল্প। এ ধারার গল্পগুলো অনুগল্পের মতোই ক্ষুদ্রাকৃতির, তবে এর মধ্যে লেখকের কবিত্বশক্তি ও দার্শনিকতার যুগল পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলো হলো : *বনফুলের গল্প* (১৯৩৬), *বনফুলের আরও গল্প* (১৯৩৮), *বাহুল্য* (১৯৪৩), *বিন্দু-বিসর্গ* (১৯৪৪), *অদৃশ্যলোকে* (১৯৪৬), *আরও কয়েকটি* (১৯৪৭), *তন্বী* (১৯৪৯), *নবমঞ্জরী* (১৯৫৪), *ঊর্মিমালা* (১৯৫৬), *রঙ্গনা* (১৯৫৬), *অনুগামিনী* (১৯৫৮), *করবী* (১৯৫৮), *সপ্তমী* (১৯৬০), *দূরবীণ* (১৯৬১), *মনিহারী* (১৯৬৩), *ছিটমহল* (১৯৬৫), *বহুবর্ণ* (১৯৭৬), *বনফুলের নূতন গল্প* (১৯৭৬) এবং *বনফুলের শেষ লেখা* (১৯৭৯)।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্প-বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

[২] অরিন্দম গোস্বামী, 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নব্য-প্রাচীনতার দ্বন্দ্ব', শীতল চৌধুরী (সম্পাদিত), *তারাশঙ্করের ছোটগল্প : রূপ ও বৈচিত্র্য*, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৩, পৃ. ৪৭

[৩] মীর হুমায়ূন কবীর, ভূমিকা : *শ্রেষ্ঠ গল্প বনফুল* (শ্রেষ্ঠ গল্পমালা সম্পাদক : ডক্টর গিয়াস শামীম), ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৭

মনোজ বসু 'প্রকৃত অর্থেই, স্বভাব-রোম্যান্টিক কথাকোবিদ।'[১] "অতিপ্রাকৃতের খুব সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় জগতের শিহরণ জাগাইবার অসাধারণ ক্ষমতা – ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব।... 'বন-মর্মর'ই তাঁহার সর্বপ্রধান গল্প।"[২] বিভূতিভূষণের মতো মনোজ বসুর গল্পের বিষয় নিসর্গপ্রেম। 'বাংলা কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি অনাবিল স্বভাব-শিশু হন, – মনোজ বসুর শিল্পী-আত্মা তাহলে একটি অম্লান কিশোর ধর্মে লাবণ্যময়।'[৩] দক্ষিণবাংলার সুন্দরবন-সংলগ্ন অঞ্চলে বেড়ে ওঠা এ শিল্পী কেবল প্রকৃতিমুগ্ধ নন, এর রুক্ষতার পরিচয়ও তাঁর জানা। একারণে তাঁর 'গল্পের পরিবেশ ভূগোলের মতো বাস্তব, যথাযথ।'[৪] গ্রামীণ জনজীবনের রূপচিত্রাঙ্কনে মনোজ বসুর দক্ষতা অতুলনীয়। পল্লি-প্রকৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর গল্পে। তাঁর গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *বনমর্মর* (১৯৩২), *নরবাঁধ* (১৯৩৩), *দেবী কিশোরী* (১৯৩৪), *পৃথিবী কাদের* (১৯৪০), *একদা নিশীথকালে* (১৯৪২), *কাঁচের আকাশ* (১৯৫১), *দিল্লী অনেকদূর* (১৯৫১), *কিংশুক* (১৯৫৭), *মায়া কন্যা* (১৯৬১), *গল্পপঞ্চাশৎ* (১৯৬২), *কনকলতা* (১৯৬৬) ইত্যাদি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের হতাশাদীর্ণ পট-পরিসরে সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকার। শুধু রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদ নয়, এ পত্রিকার সত্যভাষণ ছিল অচলপ্রতিষ্ঠ স্থবির সমাজের বিপক্ষে। কল্লোল চেতনায় পরিপুষ্ট লেখকদের মধ্যে অন্যতম হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। এ-পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন – 'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।'[৫] অচিন্ত্যকুমারের গল্পেও এর অন্যথা ঘটেনি; শহরাঞ্চলের নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবনাচার–জৈবিকতা তিনি অনুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে সরকারি চাকরিসূত্রে বাংলাদেশের

---

[১] বিশ্বজিৎ গোষ, *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০২, পৃ. ১৬১

[২] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ : ১৩৮০, পৃ. ৬৩৪

[৩] ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম প্রকাশ (পুনর্মুদ্রণ) : ২০১৩-২০১৪, পৃ. ৫৫৬

[৪] ভূদেব চৌধুরী (সম্পাদিত), *মনোজ বসুর গল্পসমগ্র* (আদিপর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশঃ কার্তিক ১৩৮২, পৃ. ৬

[৫] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দশম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪১৬, পৃ. ৪৭

বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসের কারণে নানা শ্রেণির মানুষ হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের বিষয়। অচিন্ত্যকুমারের গল্পগ্রন্থগুলো হলো – *টুটাফুটা* (১৯২৮), *ইতি* (১৯৩১), *অধিবাস* (১৯৩২), *অকাল বসন্ত* (১৯৩২), *কালের রক্ত* (১৯৪৫), *যতনবিবি* (১৯৪৬), *হাড়ি মুচি ডোম* (১৯৪৮), *ডবল ডেকার* (১৯৫৩), *এক সঙ্গে এত রূপ* (১৯৫৯), *স্বাদু স্বাদু পদে পদে* (১৯৫৯), *প্রেমের গল্প* (১৯৫৯) প্রভৃতি।

কল্লোল যুগের অন্যতম গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র। ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ ঘটলেও (‘শুধু কেরাণী’ : চৈত্র ১৩৩০) তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার মূলক্ষেত্র ‘কল্লোল’। কল্লোলগোষ্ঠীর মতো তিনি অখ্যাত-অনভিজাত নরনারীর নানাবিধ সংকট চিত্রায়ণে প্রয়াসী হন। বিশেষত ‘নারীর যন্ত্রণা, তা গৃহবধূ অথবা পতিতা নারীর – সবই তাঁর সৃষ্টির দর্পণে ধরা পড়েছে সার্থকভাবে।’[১] কল্লোলপন্থী হয়েও প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোলের অতিরেক, উচ্ছ্বাস, আত্মরতি থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিলেন। তাঁর মধ্যে কোনো কল্পনাবিলাস বা রোম্যান্টিকতা ছিল না। জীবনের যেখানে ত্রুটি ও অসঙ্গতি, সেখানে তিনি বিদ্রূপের সূক্ষ্ম শর নিক্ষেপ করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের শিল্পী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের নগর-মানসের যাপিত জীবনের ছবি তিনি অত্যন্ত নির্মোহ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। নাগরিক মধ্যবিত্তের বিচিত্র সমস্যা-সংকট, হতাশা-ব্যর্থতা, পারিবারিক টানাপড়েন কিংবা স্বপ্নকাতরতা প্রভৃতি রূপায়িত হয়েছে তাঁর গল্পে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগ্রন্থের মধ্যে *বেনামী বন্দর* (১৯৩০), *পুতুল ও প্রতিমা* (১৯৩১), *অফুরন্ত* (১৯৩২), *পঞ্চশর* (১৯৩৪), *মৃত্তিকা* (১৯৩৫), *প্রজাপতির পক্ষপাত* (১৯৩৬), *মহানগর* (১৯৩৭), *নিশীথ নগরী* (১৯৩৮), *ধূলিধূসর* (১৯৩৮), *কুড়িয়ে ছড়িয়ে* (১৯৪৬), *সপ্তপদী* (১৯৫৫), *জলপায়রা* (১৯৫৮), *হাতে হাত রাখো* (১৯৬৭), *অষ্টপ্রহর* (১৯৭৩), *সংসার সীমান্তে* (১৯৭৭) প্রভৃতি স্মরণীয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলা হয় ‘কল্লোলেরই কুলবর্ধন’। ‘দীর্ঘ আটাশ বছরের সাহিত্যসাধনায় তিনি অবলম্বন করেছেন স্বতঃশ্চল মানবজীবন, সমাজ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কল্পলোকের মনোদৈহিক বিচিত্র বিভঙ্গের সমৃদ্ধ চালচিত্র। যেমন ছোটগল্পে, তেমনি উপন্যাসে জীবনের বিচিত্রমাত্রিক উপস্থাপনায় তিনি প্রদর্শন করেছেন আলোকসম্ভব কৃতিত্ব।’[২] তাঁর প্রাথমিক-কালের গল্পে (১৯২৮-১৯৪৪) ‘মানব-মনের জটিল গভীর রহস্য ফুটে

[১] অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : মননে ও সৃজনে*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৫৬

[২] গিয়াস শামীম, *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৫, পৃ. ১৩

উঠেছে।'[১] এ পর্যায়ে তিনি ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোকে মানব-মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। '১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে মানিক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-পদ লাভ করেছিলেন'[২]; ফলে উত্তরকালের গল্পে (১৯৪৪-১৯৫৬) প্রতিফলিত হয়েছে মার্কসীয় চিন্তাচেতনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ হচ্ছে *অতসীমামি* (১৯৩৫), *প্রাগৈতিহাসিক* (১৯৩৭), *মিহি ও মোটা কাহিনী* (১৯৩৮), *সরীসৃপ* (১৯৩৯), *বৌ* (১৯৪৩), *সমুদ্রের স্বাদ* (১৯৪৩), *ভেজাল* (১৯৪৪), *হলুদপোড়া* (১৯৪৫), *আজ কাল পরশুর গল্প* (১৯৪৬), *পরিস্থিতি* (১৯৪৬), *খতিয়ান* (১৯৪৭) *মাটির মাশুল* (১৯৪৮), *ছোট বড়* (১৯৪৮), *ছোট বকুলপুরের যাত্রী* (১৯৪৯), *ফেরিওয়ালা* (১৯৫৩), *লাজুকলতা* (১৯৫৪) প্রভৃতি।

বুদ্ধদেব বসু 'কল্লোলগোষ্ঠীর রোম্যান্টিক স্বপ্নাতুর গীতিকাব্যসুরভিত কথাশিল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা।'[৩] 'কল্লোলে'ই তাঁর প্রথম গল্প ('রজনী হল উতলা' : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) প্রকাশিত হয়; অবশ্য তিনি নিজেও ছিলেন 'প্রগতি' এবং 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক। গল্প-উপন্যাস-নাটক রচনায় সাফল্য পেলেও বুদ্ধদেব বসু একান্তভাবে একজন কবি। ফলে তাঁর গল্প 'নিটোল-পূর্ণাঙ্গ কবিতাধর্মী'[৪]; গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রেও এই কাব্যধর্মিতার পরিচয় মেলে। বুদ্ধদেব বসুর গল্পের প্রেক্ষাপট বিশ-তিরিশ দশকের ঢাকা-কলকাতা মহানগর এবং চরিত্রগুলো এতদঞ্চলের অভিজাত-শিক্ষিত সম্প্রদায়। তবে এদের জীবনের দ্বন্দ্ব-সংকট তাঁর কাছে প্রাধান্য পায়নি; সমকালীন সমাজ-রাজনীতির পরিবর্তে তিনি বরং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন নরনারীর প্রেমের গল্প রচনায়। এক্ষেত্রে 'প্রেমের চিত্র রচনায় নগ্নতার অঙ্কনে তিনি যেমন নির্ভয়, তেমনি ঝাঁঝহীনও বটে।'[৫] বুদ্ধদেব বসুর গল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে *অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প* (১৯৩০), *রেখাচিত্র ও অন্যান্য গল্প* (১৯৩১), *এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে* (১৯৩২), *অদৃশ্য শত্রু* (১৯৩৩), *মিসেস গুপ্ত* (১৯৩৪), *প্রেমের বিচিত্রগতি* (১৯৩৪), *শ্বেতপত্র* (১৯৩৪), *অসামান্য মেয়ে* (১৯৩৫), *ঘরেতে ভ্রমর এল* (১৯৩৫), *নতুন নেশা* (১৯৩৬), *ফেরিওলা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৪১), *খাতার শেষ পাতা* (১৯৪৩) প্রভৃতি।

---

[১] তানিম জসিম, ভূমিকা : *শ্রেষ্ঠ গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (শ্রেষ্ঠ গল্পমালা সম্পাদক : ডক্টর গিয়াস শামীম), ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৭

[২] কৃষ্ণা বসু, *ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শিল্পরূপ ও জীবনবোধ*, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১০

[৩] গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

[৪] শ্রীভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

বাঙালি জনজীবনের অসামান্য রূপকার সুবোধ ঘোষ। 'তাঁর অধিকাংশ গল্পের ঘটনাংশ চল্লিশের দশকের কলকাতার পরিশীলিত মধ্যবিত্তের যাপিত জীবন থেকে লব্ধ।'[১] সুবোধ ঘোষের গল্পের দুটি বিশেষ ধারা পরিলক্ষিত হয়। প্রারম্ভিক পর্যায়ে ('অযান্ত্রিক', 'ফসিল' প্রভৃতি গল্প) তিনি শ্রেণিসংগ্রামের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এরপর তিনি 'প্রগতি লেখক সংঘ' ছেড়ে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘে' (১৯৪৪) যোগ দেন এবং সাম্যবাদের পরিবর্তে 'ভারতীয়ত্ব-এর ভাবধারাকে অধিক বরণীয় বলে গ্রহণ করেছেন। এমনকি গান্ধীজী ও তাঁর অহিংস আন্দোলনের কথাও পরবর্তী বেশ কিছু গল্পে কাঠামো ও প্রধান ভাবধারা হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছেন।'[২] এ-প্রসঙ্গে 'বৈরনির্যাতন', 'কালাগুরু' প্রভৃতি গল্প স্মর্তব্য। সুবোধ ঘোষের উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হলো – *ফসিল* (১৯৪০), *পরশুরামের কুঠার* (১৯৪০), *শুক্লাভিসার* (১৯৪৪), *গ্রাম-যমুনা* (১৯৪৪), *মণিকর্ণিকা* (১৯৪৭), *জতুগৃহ* (১৯৫০), *মনভ্রমরা* (১৯৫৪), *থিরবিজুরী* (১৯৫৫), *কুসুমেষু* (১৯৫৬), *পলাশের নেশা* (১৯৫৭), *মনোবাসিতা* (১৯৫৭), *নিত সিঁদুর* (১৯৫৮), *চিত্তচকোর* (১৯৬০), *অর্কিড* (১৯৬২), *পুতুলের চিঠি* (১৯৬৪), *সায়ন্তনী* (১৯৬৯), *প্রথমা* (১৯৮৪) প্রভৃতি।

তিন

বাংলা ছোটগল্পের অনবদ্য রূপকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের যোগ্য উত্তরসূরি। তাঁর গল্পরচনার প্রেরণা ও প্রাণশক্তি ছিলেন এঁরাই। 'কি করে লেখক হলাম' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন – "বাংলা সাহিত্য জগতে যে সব লেখা আমার প্রাণ মন কেড়ে নিয়েছিল সেগুলি অচিন্ত্যকুমারের গল্প, তারাশঙ্করের বিচিত্র একটা ফ্যান্টাস্টিক রচনা – নাম বোধ হয় 'খড়গ', মনোজ বসুর 'বন-মর্মর' এবং নবাগত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'।"[৩] ১৯৩৫ সাল থেকে আমৃত্যু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অজস্র গল্প লিখেছেন। কেবল বিষয়বৈচিত্র্যে নয়, সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসংখ্যানেও তাঁর ছোটগল্প সমৃদ্ধ। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় – *বীতংস* (১৯৪৫)[৪],

---

[১] মোহসিনা হোসাইন, ভূমিকা : *শ্রেষ্ঠ গল্প সুবোধ ঘোষ* (শ্রেষ্ঠ গল্পমালা সম্পাদক : ডক্টর গিয়াস শামীম), ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২৯

[২] উত্তম রায়, *সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে কথনশৈলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : দীপাবলি : ২০১০, পৃ. ৩৫

[৩] তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বর্মণ (সম্পাদিত), *কোরক* (তৃতীয় পর্ব), কলকাতা, বইমেলা : ১৩৯৮, পৃ. ৭

[৪] *বীতংস*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ ১৩৫২। এ গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'বীতংস', 'হাড়',

ভাঙাবন্দর (১৯৪৫)[১], *দুঃশাসন* (১৯৪৫)[২], *ভোগবতী* (১৯৪৭)[৩], *কালাবদর* (১৯৪৮)[৪], *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৪৯)[৫], *শ্বেতকমল* (১৯৫৪)[৬], *গন্ধরাজ* (১৯৫৫)[৭], *উর্বশী* (১৯৫৭)[৮], *শুভক্ষণ* (১৯৬০)[৯], *একজিবিশন* (১৯৬১)[১০],

---

'নীলা', 'প্রদীপ ও প্রজাপতি', 'তৃণ', 'নিশাচর' এবং 'সৈনিক'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন কথাসাহিত্যিক মনোজ বসুকে।

[১] *ভাঙাবন্দর*, কমলা পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৫২। এ গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'ভাঙাবন্দর', 'কবর', 'তীর্থযাত্রা', 'ছলনাময়ী', 'লুচির উপাখ্যান', 'পাণ্ডুলিপি', 'নক্র-চরিত' এবং 'আত্মহত্যা'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে।

[২] *দুঃশাসন*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫২। এ গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'দুঃশাসন', 'কালো জল', 'পুষ্করা', 'ভাঙা চশমা', 'বন-বিড়াল', 'খড়ুগ', 'মমি', 'ডিম' এবং 'পাইপ'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন তাঁর বন্ধু সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়কে।

[৩] *ভোগবতী*, ভারতী ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৪। এ গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'ভোগবতী', 'বনতুলসী', 'জীবাণু', 'চারতলা', 'ডিনার', 'প্র্যাকটিস্', 'ধন্বন্তরি', 'পিতরি', 'তরফদার', 'একটি শত্রুর কাহিনী' এবং 'ইতিহাস'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন সজনীদাকে (*শনিবারের চিঠি*র সম্পাদক সজনীকান্ত দাশ)।

[৪] *কালাবদর*, দি-গ্লোব পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৫৫। এ গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'টোপ', 'শৈব্যা', 'ইজ্জৎ', 'অপঘাত', 'বন্দুক', 'শিল্পী', 'শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু', 'উস্তাদ মেহের খাঁ' এবং 'কালাবদর'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন শিশুসাহিত্যিক নীহাররঞ্জন গুপ্তকে।

[৫] *শ্রেষ্ঠ গল্প*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ ১৩৫৬। এ গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'বীতংস', 'হাড়', 'নক্র-চরিত', 'দুঃশাসন', 'টোপ', 'ফলশ্রুতি', 'একটি শত্রুর কাহিনী', 'জান্তব', 'উস্তাদ মেহের খাঁ', 'বন-জ্যোৎস্না', 'পুষ্করা', 'দুর্ঘটনা', 'ভাঙা চশমা', 'বনতুলসী', 'ইতিহাস', 'কনে-দেখা আলো' এবং 'সৈনিক'।

[৬] *শ্বেতকমল*, কামারিকা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬১। এ গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'বাইশে শ্রাবণ', 'মর্গ', 'তিমিরাভিসার', 'কালনেমি', 'অধিকার', 'জন্মভূমিশ্চ', 'শ্বেতকমল', 'হাত' এবং 'ঘাসবন'।

[৭] *গন্ধরাজ*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬২। এ গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'ধস্', 'কল্প-পুরুষ', 'তাস', 'লজ্জা', 'ইদু মিঞার মোরগ', 'হরিণের রঙ', 'গন্ধরাজ', 'উন্মেষ', 'দরজা' এবং 'নতুন গান'।

[৮] *উর্বশী*, সাহিত্য, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৬৩। এ গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'কলঙ্ক', 'হাঁস', 'পুরোনো', 'দক্ষিণান্ত', 'একটি অমর রাত্রি', 'প্রতিনায়ক', 'দায়মোচন', 'মর্যাদা', 'নেতার জন্ম', 'কালো মোটর' এবং 'উর্বশী'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন সাহিত্যিক সমরেশ বসুকে।

[৯] *শুভক্ষণ*, সুরভী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৬০। এ গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'রিবনবাঁধা ভালুক', 'কেয়া', 'সঞ্চার', 'উদ্বোধন', 'উত্তম পুরুষ', 'খুনী', 'তিলঙ্গমা', 'মহলা', 'একটি চিঠি', 'রেকর্ড' এবং 'তিতির'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে।

[১০] *একজিবিশন*, অভিজিত প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৮। এ গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'প্রতিপক্ষ', 'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু', 'কাণ্ডারী', 'একজিবিশন', 'অমনোনীতা', 'গিলটি', 'আতিথ্য', 'মধুবন্তী', 'দাম', 'রাণীর গল্প', 'গলি' এবং 'রাঙা মাসিমা'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তীকে।

ছায়াতরী (১৯৬৬)[১] এবং *বনজ্যোৎস্না* (১৯৬৯)[২]; মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় *ঘূর্ণি* (১৯৭১)[৩] ও *আলেয়ার রাত* (১৯৮২)[৪] গল্পগ্রন্থ। এছাড়া পরবর্তীকালে পাওয়া যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *অগ্রন্থিত রচনা* (২০১০)[৫]।

প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশের পরই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পাঠকসমাজে ব্যাপক স্বীকৃতি ও সমাদর অর্জন করেন। *বীতংসের* নামকরণ এবং উপস্থাপন-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বলেন – 'তোমার লেখা – আরে কপালে যে রাজতিলক জ্বলজ্বল করছে ! তোমার পথ আটকায় কে ?'[৬] গল্পের সমান্তরালে তাঁর উপন্যাসগুলো[৭] সমকালীন সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। *উপনিবেশ* উপন্যাস 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে অভিনন্দন জানান – 'আপনার *উপনিবেশের* প্রথম কিস্তি ভারতবর্ষে পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আপনার এই লেখায় আগামী দিনের শ্রেষ্ঠ একটি প্রতিভার পদধ্বনি

---

[১] *ছায়াতরী*, অরুণিমা পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৩। এ গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'লাল ঘোড়া', 'শেষ চূড়া', 'তমস্বিনী', 'সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে', 'কুয়াশা', 'হলদে চিঠি', 'সেই পাখিটা', 'একটি কৌতুকনাট্য', 'সুখ' এবং 'ট্যাক্সিওয়ালা'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন কথাসাহিত্যিক মন্মথনাথ সান্যালকে।

[২] *বন-জ্যোৎস্না*, পুস্তকালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৭৬। এ গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'বন-জ্যোৎস্না', 'বন-তুলসী', 'হয়তো', 'সেই মৃত্যুটা', 'দোসর', 'বিসর্জন' এবং 'কালপুরুষ'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ গ্রন্থটিও উৎসর্গ করেন কথাসাহিত্যিক মনোজ বসুকে।

[৩] *ঘূর্ণি*, গ্রন্থালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৮। এ গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'ঘূর্ণি', 'ধানশ্রী', 'সীমান্ত', 'মশা' এবং 'দিনান্ত'।

[৪] *আলেয়ার রাত*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮২। এ গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'আলেয়ার রাত', 'টুটুল' এবং 'আসানসোলের লোকটা'।

[৫] *অগ্রন্থিত রচনা*, কথাসত্য, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১০। এ গ্রন্থে সংকলিত গল্পসমূহ হচ্ছে 'রসিকতা', 'তৃতীয় লোকটি' এবং 'একটি ইতরলোকের কাহিনী'।

[৬] উদ্ধৃত : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৯, পৃ. ৫৮৪

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের তালিকা বেশ দীর্ঘ। ১৯৪৪ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছর তাঁর এক বা একাধিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে *উপনিবেশ* – প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড (যথাক্রমে ১৯৪৪, ১৯৪৫, ১৯৪৭), *তিমির-তীর্থ* (১৯৪৪), *মন্দ্রমুখর* (১৯৪৫), *সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী* (১৯৪৫), *স্বর্ণসীতা* (১৯৪৬), *সূর্য-সারথি* (১৯৪৭), *রোমান্স* (১৯৪৭), *শিলালিপি* (১৯৪৯), *মহানন্দা* (১৯৫১), *লালমাটি* (১৯৫১), *সাগরিকা* (১৯৫২), *একতলা* (১৯৫৩), *পদসঞ্চার* (১৯৫৪), *বৈতালিক* (১৯৫৫), *সঞ্চারিণী* (১৯৫৫), *নীল দিগন্ত* (১৯৫৮), *বিদূষক* (১৯৫৯), *মেঘরাগ* (১৯৫৯), *রঞ্জনা* (১৯৬০), *ট্রফি* (১৯৬২), *চোখের বাহিরে* (১৯৬২), *তিন প্রহর* (১৯৬২), *মাটির দেবতা* (১৯৬৩), *মেঘের উপর প্রাসাদ* (১৯৬৩), *দূর মেদূর* (১৯৬৩), *চিত্ররেখা* (১৯৬৪), *জয়তী* (১৯৬৪), *নিশিযাপন* (১৯৬৪), *কলধ্বনি* (১৯৬৫), *অমাবস্যার গান* (১৯৬৫), *কৃষ্ণচূড়া* (১৯৬৫), *বিদিশা* (১৯৬৫), *পাতালকন্যা* (১৯৬৬), *সন্ধ্যার সুর* (১৯৬৬), *পদ্মপাতার দিন* (১৯৬৭), *নির্জন শিখর* (১৯৬৮), *নতুন তোরণ* (১৯৬৮), *চাঁপার গন্ধ* (১৯৬৯), *তৃতীয় নয়ন* (১৯৬৯), *আলোকপর্ণা* (১৯৭০), *কাচের দরজা* (১৯৭০), *তারা ফোটবার সময়* (১৯৭১), *স্রোতের সঙ্গে* (১৯৭৯) প্রভৃতি অন্যতম।

শুনিতেছি – আপনার লেখনী অক্ষয় হোক।'[১] জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে শীর্ষস্থানীয় লেখক ছিলেন, তা প্রতীয়মান হয় ক্ষেত্র গুপ্তের (১৯৩০-২০১০) বক্তব্যে :

> আমাদের অল্প বয়সে যখন তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যয়ের মতো পয়লা সারির কথাসাহিত্যিক বাংলা গল্প-উপন্যাসের আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন, এবং মাঝারি কিন্তু বেশ শক্তিশালী লেখকও ছিলেন অনেকে এবং এঁরা সবাই নারায়ণবাবুর চেয়ে ছিলেন বয়সে বড়, তখন নারায়ণবাবু জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন।[২]

কলকাতা কেমিক্যাল কোম্পানি আয়োজিত গল্পলেখা-প্রতিযোগিতায় (১৯৪৩) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস' গল্পটি প্রথম স্থান অর্জন করে।[৩] এ আয়োজনে উপস্থাপিত গল্পগুলো নিয়ে পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় *কথাশিল্প* গল্পসংকলন[৪] (১৫ আশ্বিন ১৩৫৩)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কেবল গল্প-উপন্যাস নয়, রচনা করেছেন সাহিত্যবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ। এগুলো হলো – *সাহিত্য ও সাহিত্যিক* (১৯৫৬), *বাংলা গল্প বিচিত্রা* (১৯৫৮), *সাহিত্যে ছোটগল্প* (১৯৬২), *কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৬) এবং *ছোটগল্পের সীমারেখা* (১৯৬৯)।

চার

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন বেশ বর্ণিল; নানা ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-যন্ত্রণা এবং সাফল্য-প্রাপ্তিতে নির্মিত হয়েছে তাঁর শিল্পী-মানস। তাঁর জন্ম ১৯১৮ সালে[৫] দিনাজপুর জেলার বালিয়াডিঙ্গিতে; পৈতৃক নিবাস বরিশাল

---

[১] উদ্ধৃত : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮১

[২] উদ্ধৃত : (ভূমিকা : ক্ষেত্র গুপ্ত), শিপ্রা দে, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প*, শৈলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৬

[৩] এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী লেখক হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পুরস্কার পান এক হাজার টাকা। (দ্রষ্টব্য : সরোজ দত্ত, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ২৩)

[৪] *কথাশিল্প* গল্পসংকলন সম্পাদনা করেন নরেন্দ্রদেব এবং রাধারানী দেবী। এ-গ্রন্থে যাঁদের গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁরা হলেন – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (ইতিহাস), আশাপূর্ণা দেবী (বাজে খরচ), সুবোধ বসু (আজাদী), বনফুল (অর্জুন মণ্ডল), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বুড়ো হাজরা কথা কয়), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (দ্বিখণ্ড), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (ফুলেশ্বর), সরোজকুমার রায়চৌধুরী (অকালবসন্ত), গজেন্দ্রকুমার মিত্র (প্রেরণা), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (চক্রান্ত), অন্নদাশঙ্কর রায় (রূপদর্শন), প্রবোধকুমার সান্যাল (প্রশ্ন), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (কামধেনু) এবং বাণী রায় (ডঃ দীপাণ্বিতা চৌধুরী)।

[৫] লেখকের স্বীকৃত জন্মসাল হলো ১৯১৮ (১৩২৫ বঙ্গাব্দ) – '১৩২৫ সালে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরের বালিয়াডিঙিতে আমার জন্ম।... সরস্বতী পুজোর পরদিন আমার জন্ম।' [নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ছোটবেলার স্মৃতি', *সমগ্র কিশোর সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৯৮৯] এ সূত্রে বাংলা একাডেমির *চরিতাভিধান* (ঢাকা) এবং *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধানে* (কলকাতা) তাঁর জন্মসাল উল্লেখ করা হয়েছে ১৯১৮। পরবর্তীকালে গবেষক সরোজ দত্ত লেখকের নির্দেশিত

জেলার বাসুদেবপুরে। তাঁর প্রকৃত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর পিতা ছিলেন দারোগা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মাতা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী। এ দম্পতির অষ্টম সন্তান নারায়ণ।[১] পুলিশের চাকরিসূত্রে প্রমথনাথ দিনাজপুর আসেন এবং এ অঞ্চলে বাড়ি নির্মাণ করেন। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি করলেও প্রমথনাথ ছিলেন আপসহীন ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। 'এস পি-র পরামর্শ মতো একজন নিরীহ মানুষকে মিথ্যা অভিযোগে জড়াতে রাজি না হওয়ায়... তাঁর চাকরিতে ছেদ পড়ে।'[২] নারায়ণের লেখক হয়ে ওঠার প্রেরণা ছিলেন তাঁর বাবা। এ-প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন :

> কি ভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে এলাম –, কে আমাকে অনুপ্রাণিত করলো, তার উত্তরে বলতে পারি সাহিত্য-প্রীতিটা আমার পৈতৃক উত্তরাধিকার। বাবা অত্যন্ত পড়তে ভালোবাসতেন। পুলিশের দারোগা হলেও তাঁর লোভনীয় লাইব্রেরি ছিল। পড়া ছাড়া আর কোনো নেশাই ছিল না তাঁর।[৩]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয় পণ্ডিত ত্বিষাম্পতি অধিকারীর পাঠশালায়। এরপর তিনি ভর্তি হন দিনাজপুর মিউনিসিপ্যাল এম.ই. স্কুলে। সপ্তম শ্রেণি থেকে (১৯২৯) তিনি দিনাজপুর জেলা স্কুলের ছাত্র। এ বছর *মাসপয়লা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতা 'ডাক'; কবিতাটির জন্য তিনি পুরস্কার পান 'বারো আনা মূল্যের তিনখানা বই – হুলুস্থুল, মশহাট যুদ্ধ এবং বীরবাজা।'[৪] অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে মঞ্চস্থ হয় তাঁর 'গুরুদক্ষিণা' নাটক (১৯৩০)। অগ্রজ-সহোদর শেখর গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন নারায়ণের সহপাঠী। জেলা স্কুলে থাকাকালেই শেখর রাজনীতিতে সক্রিয় হন। নারায়ণও ভাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন – 'ছোটবেলাতেই আমি রাজনীতিতে যোগ দিই। প্রথম প্রথম দাদাদের কাছে নানা সাহসের পরীক্ষা দেওয়া; বাজেয়াপ্ত বই লুকিয়ে সরবরাহ করা এবং নিজে পড়া।'[৫] সত্যাগ্রহ আন্দোলনে (১৯৩০) অংশগ্রহণের জন্য শেখর বন্দি হন। তাঁর

জন্মতারিখে সংশয় প্রকাশ করেন। নারায়ণের কয়েকজন বন্ধু এবং আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তিনি প্রতিপাদন করেন – '২৭ জানুয়ারি ২০১৭ – কেই নারায়ণের জন্মদিন হিসেবে মেনে নিতে হয়।' (দ্রষ্টব্য : সরোজ দত্ত, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫)

[১] নারায়ণের দুই অগ্রজ শিশুকালে মৃত্যুবরণ করে। তাই ভাইবোনের তালিকা দাঁড়ায় এরকম – সতীরানী, নিখিলনাথ, ননীবালা, পুঁটুরানী, শেখরনাথ, তারকনাথ (নারায়ণ), বাণী এবং কমলা।

[২] উদ্ধৃত : (স্মৃতিচারণ : নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়), সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আমার কথা', *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ঘ

[৪] উদ্ধৃত : সরোজ দত্ত, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ছোটবেলার স্মৃতি', *সমগ্র কিশোর সাহিত্য* (চতুর্থ খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ১৯৯১, পৃ. ১৩৪

কারামুক্তির পর দুই ভাই যুগান্তর পার্টির[১] সদস্য হন। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে নারায়ণ তাঁর কৈশোরের রাজনীতি-মুগ্ধতার কথা প্রকাশ করেছেন এভাবে :

> আমি তখন স্কুলের ছাত্র। ত্রিশ সালের সত্যাগ্রহ দেখেছি, দেখেছি চট্টগ্রামের বিস্ফোরণ। পড়ছি রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য', নজরুলের কবিতা, বাজেয়াপ্ত 'দেশের ডাক', 'ফাঁসির সত্যেন', আমাদের হাতে ঘুরছে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'সব হারাদের গান', বিমল সেনের 'ফুলঝুরি', প্রেরণা দিচ্ছে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের 'বেণু' পত্রিকা, কানে বাজছে প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই আশ্চর্য পংক্তিগুলো : "দারুণ দেবতার ডাক যে পেলো তার / আগুন লাগিয়াছে সুখের ঘরে।" সে দিনের বালক মনে তখন একটি মাত্র সংকল্পই আগুনের অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছিল। যদি কলম ধরতে হয়, তবে তা দেশের জন্য; যদি লিখতে হয় তবে তা স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে দেবার জন্য।[২]

দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন (১৯৩৩)। এরপর তিনি ভর্তি হন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে; অন্যদিকে শেখর গঙ্গোপাধ্যায় চলে যান কলকাতা শহরে। ফরিদপুরে নারায়ণের বন্ধু ছিলেন সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫) এবং অচ্যুত গোস্বামী (১৯১৮-১৯৮০)। কলেজ-জীবনে *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নারায়ণের 'নমস্কার' কবিতা (৩ মার্চ ১৯৩৪); ছয় মাসের ব্যবধানে স্থান পায় আরেকটি কবিতা 'চারণ' (১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪)। এরপর প্রায় প্রতি মাসে *দেশ* পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হয়। নারায়ণের প্রথম ছোটগল্প 'নিশীথের মায়া' (১০ আগস্ট ১৯৩৫) এই পত্রিকায় প্রকাশ পায়।

---

১ "যুগান্তর পার্টি উপনিবেশিক আমলে বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী দলগুলির পুরোধা। কলকাতা অনুশীলন সমিতির ভেতরেই একটি আন্তব্যূহ হিসেবে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (নেপথ্যে পরামর্শদাতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ) ১৯০৬ সালের এপ্রিলে সাপ্তাহিক যুগান্তর প্রকাশ শুরু করেন। সশস্ত্র জাতীয়তাবাদীদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত যুগান্তর-এর নামানুসারে দলটির নামকরণ হয়। বারীন্দ্রকুমার ব্রিটিশ উপনিবেশিক অধীনতাপাশ থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য ছিলেন বদ্ধপরিকর। ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত বারীন্দ্রকুমার বিশ্বাস করতেন, মানুষের বৃহত্তর কল্যাণে প্রয়োজন হলে সন্ত্রাস ও হত্যা বিধেয়। তিনি বিপ্লবের ঢঙে ব্যাপক আকারে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন।... ১৯৩০ সালের মে মাসে কলকাতা যুগান্তর দলের নেতৃবৃন্দ ত্রাস সৃষ্টির এক ব্যাপক পরিকল্পনা করে এবং বোমা তৈরির যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।... এর ফলে বাংলায় পুনরায় বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়, বিশেষ করে চট্টগ্রামে। সমগ্র বাংলার বিপ্লববাদী সন্ত্রাসীদের ওপর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এর (১৯৩০) ঘটনার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ১৯৩৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি যুগান্তর দলের নেতা ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র লুটে নেয়ার পরিকল্পনার মূল সংগঠক মাস্টারদা সূর্যসেন পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।" [উদ্ধৃত : সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া* খণ্ড ১১, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০১১, পৃ. ৪৪৯]

২ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শিল্পীর স্বাধীনতা', *অগ্রন্থিত রচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩

ফরিদপুরে নারায়ণ চাচাতো ভাই মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওঠেন। মন্মথ ছিলেন সরকারি কর্মচারী, পক্ষান্তরে নারায়ণ ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনীতির একজন সক্রিয় কর্মী। তাঁর চলাফেরার ওপর প্রশাসনের নজর থাকায় তিনি অতঃপর হোস্টেলে চলে আসেন। এরপরও তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৫ সালের আইএ পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ব্যর্থ হন।[১] অগ্রজ শেখর গঙ্গোপাধ্যায়ও এসময় কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৪-১৯৪৬ সাল পর্যন্ত শেখর কখনো কারাগারে, কখনো অন্তরিত থাকেন; পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। শেখরের বিপ্লবী ভাবাদর্শের প্রতি নারায়ণের শ্রদ্ধাবোধ ছিল অপরিসীম। *মহানন্দা* উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে তিনি স্মরণ করেন – 'নির্যাতন ও কারাবাস যাঁর বিদ্রোহী প্রাণকে অবদমিত করতে পারেনি, সেই অক্লান্ত দেশকর্মী – মেজদা শ্রীশেখরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে।'[২]

কলেজের লেখাপড়া অসম্পূর্ণ রেখে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এরপর চলে আসেন দিনাজপুরে (পহেলা মে ১৯৩৫)। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে তিনি চলে যান বরিশালের আশুতোষ ভবনে; তাঁর বড়দি সতীরানীর শ্বশুরালয়ে। আট বছর বয়সে মাকে হারানোর পর দিদিই হয়ে ওঠেন তাঁর নির্ভরস্থল। এছাড়া জামাইবাবু শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। দিদির উৎসাহ এবং সহযোগিতায় নারায়ণ ভর্তি হন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে। এখানকার ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। বাংলা সাহিত্যের এই বিশিষ্ট কবির সঙ্গে নারায়ণ তখন ঘনিষ্ঠ হন। 'জীবনানন্দ যেমন ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু তেমনি অন্যতম সাহিত্যগুরুও।'[৩] এজন্য "জীবনানন্দের কবিতা যখন নির্মমভাবে 'শনিবারের চিঠি' দ্বারা আক্রান্ত হতো তখন তিনি ভীষণ দুঃখ পেতেন।"[৪]

১৯৩৬ সালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নন-কলিজিয়েট ছাত্র হিসেবে প্রথম বিভাগে আইএ পাশ করেন। বিএ-তে তিনি ব্রজমোহন কলেজের নিয়মিত ছাত্র। এসময় *দেশ* পত্রিকার পাশাপাশি *বিচিত্রা*য় তাঁর লেখা প্রকাশ পায়।

[১] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদের জন্য প্রেরিত আবেদনপত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেন – 'I could not appear in 1935 as I was arrested, by the then British Government as a suspected revolutionary and was kept as an internee.' (দ্রষ্টব্য : সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০)

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *মহানন্দা*, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ : কার্তিক ১৪২০, পৃ. ১৩৪

[৩] অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ড., *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : ছোটগল্পের রূপকার*, আর্ট পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৫১

[৪] প্রাগুক্ত

রাজনৈতিকভাবে তিনি বরিশালে নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। এজন্য তিনি প্রায়ই পুলিশি হয়রানির শিকার হয়েছেন। তাঁর বন্ধু নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় (সতীরানীর দেবর) বলেছেন :

> নারায়ণ তাদের নিজস্ব এজমালি বাড়ি বরিশালের কাঠপট্টিতে ২ দিন বেড়াতে যাবার সময় ভোররাতে পুলিশ ঘেরাও হয়। সেটা শীতকাল। বেষ্টনী ভাঙ্গার উপায় নেই। স্বয়ং পুলিশ সুপার অগ্রণী হয়ে সার্চ করেন – 'পথের দাবী' (তখন নিষিদ্ধ) তার গরম চাদরের নিচে হাতের মধ্যে লুকানো। পুলিশ সুপারের 'বিগ ক্যাচ' ব্যর্থ হল সেদিন। রাজনীতির ঘনঘটার মধ্যে তরুণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ভিড় প্রায়ই হত আমাদের বাড়িতে। সুযোগ সন্ধানীরাই পুলিশ বিভ্রাটের কারণ।... নারায়ণ কাঠপট্টি ত্যাগ করে আশুতোষ ভবনেই ফিরে আসে কিছুটা বাধ্যতামূলকভাবে।[১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পী-জীবনে বরিশাল-পর্ব নানা কারণে তাৎপর্যবহ। এখানে রেণু দেবীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। রেণু ছিলেন সতীরানীর ননদের মেয়ে। তার মা কুমুদিনী স্বামী-কর্তৃক নিগৃহীত হয়ে দুই কন্যাসহ (রেণু এবং কণা) পিতৃগৃহে আশ্রয় নেন। নারায়ণের পিতা এ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তাই জীবৎকালে তিনি সন্তানকে আশীর্বাদ করেন – 'বাবা তুই নাকি রাণুকে বিয়ে করবি শুনলাম ? যদি তাই সত্যি হয়, তবে ভালো কথা। আর মেয়েটাও ভালো, জীবনে পিত্রালয়ে যায়নি। ওদের এই দিকটা খুব দুঃখের। তোর দিদি সমস্ত জীবন প্রতিপালন করলো। তুই যদি ওকে সুখী করতে পারিস আমিও শান্তি পাব।'[২] নারায়ণকে রেণু সম্বোধন করতেন 'রঞ্জন' নামে। সম্ভবত এ কারণে নারায়ণের অধিকাংশ গল্পকথকের নাম হয়েছে রঞ্জন।

১৯৩৮ সালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ডিস্টিংশনসহ বিএ পাশ করেন। এরপর তিনি ভর্তি হন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। শোভাবাজার স্ট্রিটের একটি মেসে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে তাঁর পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। পিতার মৃত্যুর পর নারায়ণের অর্থকষ্ট বেড়ে যায়। তাই তিনি গৃহশিক্ষকতার পাশাপাশি থ্রিলার লিখতে শুরু করেন।[৩] এছাড়া দুর্দিনে তাঁর সহায় হন ভগিনীপতি শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ-পর্বে তিনি *শনিবারের চিঠি* গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের যৌথ কবিতা সংকলন *জোনাকী*। এ গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২)। শোভাবাজারের মেসের নানা স্মৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে নারায়ণের *একতলা* উপন্যাসে।

---

[১] উদ্ধৃত : (প্রশ্নোত্তর : নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়), সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

[২] উদ্ধৃত : (স্মৃতিচারণ : রেণু গঙ্গোপাধ্যায়), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

[৩] এসময় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে তিনটি থ্রিলার পাওয়া যায় – *বিভীষিকার মুখে* (১৯৩৮), *মরণের মুখোমুখি* (১৯৩৯) এবং *ঘূর্ণিপাকে লাল নিশান* (১৯৪০); এগুলোর সহ-লেখক ছিলেন নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থস্বত্ব হিসেবে তাঁরা বই-প্রতি 'তখনকার দিনে একশ টাকা' সম্মানি পেয়েছেন। (দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪)

১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত এমএ পরীক্ষায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অংশ নেননি। এ বছর তিনি রেণু দেবীকে বিয়ে করেন (৯ মে ১৯৪০) এবং পরবর্তী বছরের এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। শুধু তাই নয়, সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি অর্জন করেন ব্রহ্মময়ী স্বর্ণপদক। এ পর্যায়ে নারায়ণ কন্যাসন্তানের পিতা হন (১১ নভেম্বর ১৯৪১)। তিনি মেয়ের নাম রাখেন বাসবী।

জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে যোগদানের মাধ্যমে (১৯৪২) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি ছিলেন 'ওই কলেজের প্রথম অধ্যাপক।'[১] এখানেই আশা সান্যালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়; এক বন্ধুর অনুরোধে তিনি তাকে লেখাপড়ায় সহযোগিতা করেন। ক্রমে ছাত্রী-শিক্ষকের সম্পর্ক প্রেমে রূপান্তরিত হয়। একদিকে স্ত্রী রেণু দেবী, অন্যদিকে আশা সান্যালের সঙ্গে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে তাঁর শিল্পী-মানস। জলপাইগুড়ি থেকে স্ত্রীর কাছে প্রেরিত পত্রে (১২ এপ্রিল ১৯৪৫) তাঁর এই অস্থিরচিত্ততার পরিচয় মেলে :

> তোমার জন্য অত্যন্ত মানসিক অশান্তি বোধ করি। আমার এমনই দুভার্গ্য যে তোমাকে কিছুতেই সুখী করিতে পারিতেছি না। মনের দিক হইতে কেমন যেন একটা অসহায়তার মধ্যে বাস করিতেছি। এক মুহূর্ত শান্তি পাই না – জীবনের কোনোদিকে যেন এতটুকু আনন্দ নাই। সব কিছুই বিস্বাদ আর তিক্ত হইয়া গিয়াছে। সুখী হইবার সমস্ত আশা ভরসা আমার শেষ হইয়াছে – কেবল যেন দিনগত পাপক্ষয় করিয়া চলিয়াছি।[২]

সাহিত্যচর্চার দিক থেকে জলপাইগুড়ি-পর্ব তাঁর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত হয় নারায়ণের কালজয়ী গল্প – 'বীতংস', 'নক্র-চরিত', 'হাড়', 'পুষ্করা', 'দুঃশাসন' প্রভৃতি। 'দৈনিক কৃষক' পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস *তিমিরতীর্থ*; 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় *উপনিবেশের* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

১৯৪৫ সালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা সিটি কলেজে যোগ দেন। এরমধ্যে তিনি আশা সান্যালকে বিয়ে করেন এবং পটলডাঙায় টেনিদার[৩] (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) বাড়ি ভাড়া নেন। এখানে তাঁরা দীর্ঘদিন বসবাস করেন। ১৯৫৯ সালে তাঁরা চলে যান বৈঠকখানা রোডের নিজস্ব বাড়িতে (৯০/১)। বিয়ের পর আশা

---

[১] উদ্ধৃত : সরোজ দত্ত, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[২] উদ্ধৃত : সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় টেনিদার নামে একটি জনপ্রিয় চরিত্র সৃষ্টি করেন।

দেবী নিজেকে বিকশিত করবার পর্যাপ্ত সুযোগ পান।[১] পটলডাঙার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে (১৩ জানুয়ারি ১৯৪৯) এ-দম্পতির একমাত্র সন্তান অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (বাবলু)। এসময় নারায়ণ শিশুতোষ গ্রন্থ রচনা শুরু করেন; 'মৌচাকে' ছাপা হয় তাঁর প্রথম কিশোর গল্প 'সভাপতি'[২]। এ-ধরনের লেখা প্রকাশের পর তাঁর পাঠকপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৩]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পটলডাঙ্গার বাসায় সাহিত্যের আসর বসতো। 'বাংলার নবীন সারস্বত সাধক ও সংস্কৃতিমান মানুষের এমন কেউ ছিলেন না যিনি পটলডাঙার আড্ডায় যোগ দেননি। এই তালিকায় রয়েছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত নামী অনামী প্রায় সবাই। এসেছিলেন সংগীত শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রাভিনেতা ও প্রিয় ছাত্র সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।'[৪] পটলডাঙ্গায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি স্মৃতি রোমন্থন করেছেন অরিজিৎ :

> ছোটবেলায় প্রায়ই দেখতাম এক মলিন ধুতি পরা ভদ্রলোক আমাদের পটলডাঙার গলি-ঘুপচির বাড়ি আসতেন। সেই সহজ-সরল-সাদাসিধে মানুষটিকে দেখলে বাবা ভীষণ খুশী হতেন। মনে পড়ে, একদিন ১১-১২ টা নাগাদ তিনি আমাদের বাড়ি এসেছেন। বাবা ওঁকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে ঘরে এনে বসালেন।... এরমধ্যে বাবা বাজারে গিয়ে ইলিশ মাছ কিনে এনেছেন। দুপুরে মা-র হাতের রান্না পরিতৃপ্তি করে খেয়ে ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে মজলিশী আড্ডা আরম্ভ করলেন। উনি সম্মোহিতের মত ঘন বন-জঙ্গল, জ্যোৎস্না রাতের পাহাড়, নির্জন টিলা, বিহারের প্রাকৃতিক শোভার গল্প অদ্ভুত সুন্দর করে বর্ণনা করে চলেছেন। গল্পে গল্পে কখন যে বিকেল চারটে বেজে গেছে ভদ্রলোক খেয়াল করেননি।...

---

[১] আশা দেবী ১৯৪৬ সালে এমএ পাশ করেন এবং বিদ্যার্থীমণ্ডলের প্রধান শিক্ষিকা পদে নিযুক্ত হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ' শিরোনামে গবেষণার জন্য ডি. ফিল. ডিগ্রি লাভ করেন (১৯৬১)। উচ্চশিক্ষা শেষে তিনি যোগদান করেন কলকাতা রামমোহন কলেজে।

[২] 'সভাপতি' *মৌচাক* পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় (১৩৫৩) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] কিশোর সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সার্থক শিল্পী। তিনি শিশু-কিশোরদের উপযোগী প্রচুর গল্প-উপন্যাস রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে *অন্ধকারের আগন্তুক* (১৯৫৩), *চারমূর্তি* (১৯৫৬), *ছুটির আকাশ* (১৯৫৬), *খুশির হাওয়া* (১৯৫৮), *চারমূর্তির অভিযান* (১৯৬০), *ঝাউ বাংলোর রহস্য* (১৯৬৩), *ছোটোদের ভালো গল্প* (১৯৬৪), *কম্বল নিরুদ্দেশ* (১৯৬৭), *বন বাংলো* (১৯৬৮), *টেনিদার গল্প* (১৯৬৮), *পঞ্চাননের হাতি* (১৯৬৮), *পটলডাঙ্গার টেনিদা* (১৯৭০), *গল্পবলি গল্প শোনো* (১৯৭১), *টেনিদা দি গ্রেট* (১৯৭১), *তপন চরিত* (১৯৭৩), *অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ* এবং (১৯৭৪), *টেনিদার অভিযান* (১৯৭৮), *টেনিদা ও ভুতুড়ে কামরা* (১৯৮১), *ক্রিকেটার টেনিদা* (১৯৮৬), *টেনিদার কাণ্ডকারখানা* (১৯৯০) প্রভৃতি অন্যতম।

[৪] অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ড., *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : ছোটগল্পের রূপকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

পরে শুনেছিলাম ইনিই বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবা বিভূতিভূষণকে নিজের বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন।[১]

নারায়ণের সঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি এত স্নেহ করতেন যে তাঁর যাবতীয় বইয়ের প্রকাশকদের প্রতি তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল তাঁর প্রত্যেকটি বইয়ের কপি তাঁকে দেবার জন্য।... নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রয়াণের সংবাদ শুনে উনি ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তকে টেলিফোনে 'নারায়ণের কী হয়েছিল' প্রশ্ন করেই উচ্চঃস্বরে কাঁদতে থাকেন।"[২] সাহিত্যিক-পরিবেষ্টিত নারায়ণের একটি আড্ডাস্থলের বর্ণনা নিম্নরূপ :

উনিশ শো বাহান্ন। কিংবা তিপ্পান্ন।... হঠাৎ এসে উপস্থিত হতেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কখনও বা হারিয়ে যাওয়া চশমার খোঁজে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্সের দপ্তর ছিল সেই বাড়িতেই, যেখানে এখন 'পরিচয়ে'র অফিস। মনোজ বসু নিজের কাজ ফেলে আড্ডা দিতে বসে যেতেন প্রায়ই। ঝাঁপ ফেলে দেওয়ার পর একমুখ হাসি নিয়ে দেখা দিতেন শচীনবাবুও। এবং আরো আরো আরো অনেকে, যাঁদের অনেকেই এখন আর নেই, যাঁদের কেউ কেউ এখনও বেশ কিছুকাল বহাল তবিয়তেই থাকবেন। প্রবোধ সান্যাল, সজনীকান্তের মতো প্রবীণ, সন্তোষ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসুর মতো নবাঙ্কুর টাটকা সবুজ।...

হ্যারিসন রোডে জল কাদা ট্র্যাফিক। টেবিলে চা আর তেলেভাজা। আমরা সবাই জানতাম নারায়ণ বাবু সুন্দর আবৃত্তি করতেন। সেদিন ওঁকে ধরে পড়লাম।

উনি শোনালেন রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি'। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।[৩]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন।[৪] বন্ধু-নির্বাচনে তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ ছিল না। অরিজিৎ উল্লেখ করেছেন – 'প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সরস্বতী

---

[১] অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আমার বাবা', তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত), *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : মাস্টারমশাই*, কোরক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১১৬-১১৭। বিভূতিভূষণের সঙ্গে নারায়ণের ঘনিষ্ঠতার নানা বিবরণ পাওয়া যায়। তবে অরিজিতের এ-মন্তব্যে সংশয়ের উদ্রেক হয়। কেননা অরিজিতের জন্ম ১৩ জানুয়ারি ১৯৪৯; অন্যদিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন ২৯ অক্টোবর ১৯৫০ সালে। এত অল্পবয়সের স্মৃতি মনে রাখা অসম্ভব; হয়তো পারিবারিক পরিমণ্ডলে এরূপ আলোচনা শুনে অরিজিৎ এসব স্মৃতি রোমন্থন করেছেন।

[২] নিতাই বসু ড., *তারাশঙ্করের শিল্পীমানস*, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ : মার্চ ২০১২, পৃ. ১০৩

[৩] বারীন্দ্রনাথ দাশ, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় – সেই কবেকার কথা', সঞ্জীবকুমার বসু (সম্পাদিত), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, বর্ষ ২৭ ॥ সংখ্যা ৪, মাঘ-চৈত্র : ১৩৭৮, পৃ. ৪০৬-৪০৭

[৪] *সুনন্দর জার্নালে* নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন : 'ধর্ম মানি আর নাই মানি, নিষ্ঠাবান ধার্মিককে আমি শ্রদ্ধা করি। প্রতিবেশী বৈষ্ণব পরিবারের যে তরুণী মেয়েটির শান্ত কীর্তনের সুরে আমার ঘুম ভাঙে – সে

পুজোয় পটলডাঙার বাড়িতে পাড়ার মুসলমানদেরও প্রসাদ খেতে দেখেছি, ঈদ সম্মেলন হয়েছে আমাদের বাড়িতে। সেখানে আবু সয়ীদ আইয়ুব থেকে শুরু করে বহু মুসলমান বুদ্ধিজীবী এসেছিলেন।'[১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন সফল শিক্ষক। তিনি দীর্ঘ দশ বছর কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। একলেজে তিনি ছিলেন জনপ্রিয় শিক্ষক। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) স্মৃতিচারণে জানা যায় –

> সিটি কলেজে আমি কিছুদিন ওঁর ছাত্র ছিলাম। আই.এস.সি. পড়ছিলাম অন্য কলেজে, তাতে সুবিধা করতে পারিনি – তাই বি.এস.সি. পড়ার বদলে যখন বি.এ. পড়া ঠিক হলো, তখন অন্য অনেকের আপত্তি না শুনে, আমি জোর করে ভর্তি হয়েছিলাম সিটি কলেজে। একমাত্র কারণ, ওখানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পড়ান, তাঁকে দেখতে পাবো, তাঁর কথা শুনতে পাবো। সেই বয়সে প্রিয় লেখকের সান্নিধ্যের চেয়ে বড় আকর্ষণ আর কিছু হতে পারে না। কত নিদ্রাহীন রাত্তিরে যে-লেখকের বই আমার সঙ্গী, সেই লেখক নিজে আমার সঙ্গে কথা বলবেন, এ কি বিরাট সৌভাগ্য।[২]

বিশিষ্ট অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও (১৯৩৫-২০২০) তাঁর ছাত্র। সিটি কলেজের এক অনুষ্ঠানে তিনি নারায়ণের *রামমোহন*[৩] নাটকে অভিনয় করেন। অভিনয়জীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষাগুরুর অফুরন্ত উৎসাহ এবং আশীর্বাদ লাভ করেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আমার ছাত্রজীবনকে নানাভাবে গৌরবময় করে দিয়ে গেছেন। ইন্টারমেডিয়েট থেকে একেবারে এম.এ. (১৯৫১-১৯৫৭) – এই দীর্ঘ ছ'বছর আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে বাংলা শিখেছি।... আমার অন্যান্য বন্ধুদের

সুকণ্ঠী নয়, তবু তার গান ভোরের অন্ধকারকে আমার কাছে পবিত্র করে তোলে। বাড়ির অদূরের মসজিদ থেকে সকাল-সন্ধ্যায় সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ মোল্লার উদার আজানের ধ্বনি আমার মতো অবিশ্বাসীরও মাথা নত করে আনে।' (উদ্ধৃত : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কপাল পোড়ানো আগুন', *সুনন্দর জার্নাল*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ : মাঘ ১৪২২, পৃ. ১৭)

[১] অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আমার বাবা', তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত), *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : মাস্টারমশাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'আমার মাস্টারমশাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়', তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত), *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : মাস্টারমশাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

[৩] *রামমোহন* 'পরিচয়' পত্রিকায় (ফাল্গুন ১৩৫৭-মাঘ ১৩৫৮) প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে নাটকটি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়। এছাড়া নারায়ণের দর্শকনন্দিত নাটকের মধ্যে *ভাড়াটে চাই* (১৯৫৭), *চারমূর্তি* (১৯৫৮), *বারোভূতে* (১৯৬০), *আগন্তুক* (১৯৬২) প্রভৃতি স্মরণীয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটকের আলোচনায় নাট্য-সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন –
"আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহার 'ভাড়াটে চাই', 'বারোভূতে' অত্যন্ত জনপ্রিয় কৌতুকরসাশ্রিত একাঙ্ক নাটক। কলিকাতার গৃহ-সঙ্কটকে ভিত্তি করিয়া বিচিত্র প্রকৃতির বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশে তাঁহার 'ভাড়াটে চাই' রচিত হইয়াছে। ইহার বাস্তব জীবন-দৃষ্টি নাটকীয় গৌরভ লাভ করিয়াছে। 'বারোভূতে' সম্পর্কে নাট্যকার লিখিয়াছিলেন, "সব পেয়েছির আসরে' বার্ষিক উৎসবে সাহিত্যিকদের অভিনয়ের প্রয়োজনে 'বারোভূতে' লেখা হইয়াছিল। নাটকের বক্তব্য নামের মধ্যে চিহ্নিত। তাঁহার 'রামমোহন' জীবনী নাটক এবং 'এক সন্ধ্যায়' জীবনীমূলক একাঙ্ক নাটক।" (শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* – দ্বিতীয় খণ্ড, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৭১, পৃ. ৫৩১)

মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, নির্মাল্য আচার্য প্রমুখেরাও নারায়ণবাবুর খুব ঘনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। আমরা ওর বাড়িতে হঠাৎ-ই চলে যেতাম। উনি সবসময় হাসিমুখে উদারভাবে কাছে ডেকে নিতেন। নানা গল্পে আমাদের মাতিয়ে তুলতেন। সাহিত্য নিয়ে যেমন আলোচনা হতো; তেমনি সমসাময়িক বিষয়, বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে এমন সুন্দর করে কথা বলতেন যে আমরা মোহিত হয়ে শুনতাম। সাহিত্যের প্রতি একটা আলাদা ভালোবাসা আমাদের মনে জন্মে দিয়েছিলেন। মাস্টারমশাইয়ের হাতের লেখা ছিল একেবারে মুক্তোর মতো ঝকঝকে। কবির মতো উজ্জ্বল চেহারা – অত্যন্ত সুপুরুষ, মধুর স্বভাবের ছিলেন। সব মিলিয়ে ঐ সময়ে বাংলার কোনো অধ্যাপকই আমাদের কাছে এতটা প্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি।[১]

এছাড়া নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পৃক্ত ছিলেন আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি ভবনের সঙ্গে। এ প্রতিষ্ঠানে তিনি এমএ ক্লাসের ছাত্রদের পাঠদান করতেন। কলকাতার সেরা পণ্ডিতদের সমন্বয় ঘটেছিল এ বিদ্যাপীঠে। এঁদের মধ্যে নারায়ণ ছিলেন অনেকটা স্বতন্ত্র। এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জগদীশ ভট্টাচার্য (১৯১২-২০০৭) বলেছেন – 'আমাদের কালের অধ্যাপকদের মধ্যে নারাণের মতো স্মৃতি শক্তি আর কারো দেখিনি। বক্তৃতার সময় বিভিন্ন সাহিত্য থেকে অনর্গল তুলনামূলক আবৃত্তিতে সে তাঁর অধ্যাপনাকে সরস ও আকর্ষণীয় করে তুলত।'[২]

১৯৫৬ সালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনাকালে তিনি 'সাহিত্যে ছোটগল্প' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ডি. ফিল. ডিগ্রি লাভ করেন (১৯৬০)। নারায়ণের পাঠদানের বিষয় মূলত কথাসাহিত্য। ১৯৬৯ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনদিনব্যাপী যে স্মারক বক্তৃতা দেন – তারই গ্রন্থরূপ *ছোটগল্পের সীমারেখা*। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রতি নারায়ণের দায়িত্ববোধ এবং সর্বমহলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার প্রসঙ্গ রয়েছে কবি শঙ্খ ঘোষের (১৯৩২-) বক্তব্যে :

ক) নারায়ণবাবু ভেঙে দিতে পেরেছিলেন সম্পর্কের এই বানানো খোলস। তাঁর ছাত্রদের তিনি স্পর্শ করতে জেনেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে, সুখ-দুঃখময় মানুষ হিসেবে, তাদের বয়সের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। ক্লাসের বাইরে ছেলেমেয়েদের রাজনৈতিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক সংকটের অন্তরঙ্গ হতে জানতেন বলেই খুব সহজ ছিল তাঁর ওপর নির্ভর করা, তাঁর সাহায্য নেওয়া, তাঁকে আত্মীয় বলে বোধ করা।[৩]

---

[১] সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, 'বলেছিলেন, বড় অভিনেতা হবে', তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত), *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : মাস্টারমশাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯৩

[২] উদ্ধৃত : প্রভাস রায়চৌধুরী, *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৪, পৃ. ২৪

[৩] শঙ্খ ঘোষ, 'শিক্ষক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়', তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত), *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : মাস্টারমশাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

খ) তিনশো ছেলেমেয়ের দাবিতে একদিন এক স্পেশাল ক্লাস, অনেকেই বসবার জায়গা পর্যন্ত পায়নি, নোট নেবার চেষ্টা চলছে দেয়ালে বা এ-ওর পিঠে খাতা রেখে, এই দৃশ্যে স্পষ্টতই অভিভূত মাস্টারমশাই – কিন্তু সে-ভাবটা কাটিয়ে নেবার জন্য ঈষৎ পরিহাস্যে বলে উঠলেন, 'আগে জানলে তো রিপোর্টারদের একটা খবর দিতাম, ছবি নিয়ে যেত'।

রিপোর্টারদের অবশ্য দরকার ছিল না কোনো। সেই ছেলেমেয়েরা – এবং পরম্পরায় আরো অনেকে – তাদের স্মৃতিতে রেখে দিয়েছে ওই ছবি।[১]

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ না করলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বামপন্থী রাজনীতির প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল[২] এবং 'প্রগতি লেখক সংঘে'র অন্যতম সদস্য। লেখক সংঘের 'আসরে নিয়মিত অংশ নিতেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও কবি।'[৩] নারায়ণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ প্রদর্শিত হয়েছে গোপাল হালদারের (১৯০২-১৯৯৩) একটি লেখায় :

কেমন করে নারায়ণ আমাদের সহযাত্রী হয়ে উঠলেন মনে নেই, ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক শপথ নিয়ে অনেকেই এসেছিলেন, নিজ নিজ বিচার বিবেচনা মতো অনেকেই পিছিয়েও গিয়েছেন। নারায়ণ সে সময়েই এসে থাকবেন। কিন্তু পিছিয়ে যাননি, দেখলাম। সেই – তীর্থেই রয়ে গেলেন। নারায়ণ নিজের জীবন জিজ্ঞাসার দায়েই নিজের রসচেতনাকে বুদ্ধিতে, যুক্তিতে, মানবিক কল্যাণবোধে মার্জিত ও পরিপুষ্ট করতে কার্পণ্য করেননি। নারায়ণ পড়তেন, বুঝতেন, বিচার করতেন ... যে কোনো কারণেই হোক – বুঝেছিলেন সভ্যতার সংকটে কারও নিরপেক্ষ থাকার উপায় নেই।[৪]

মার্কসবাদে আস্থাবান হওয়ায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পীজীবনে বঞ্চনার শিকার হন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেও, শেষপর্যন্ত তাঁর নাম প্রত্যাহার করা হয়। অরিজিৎ জানিয়েছেন – 'সে বছর পুরস্কার কমিটিতে একজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকও ছিলেন। শুনেছি তিনিই নাকি বাবার নাম সুপারিশে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তবে এসবে কিছু যায় আসে না। বাবা সারাজীবন ধরে যা ভালোবাসা, সম্মান, মর্যাদা

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[২] ড. অলোক রায়কে লেখা এক পত্রে শেখরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেন : "আমি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছি জেনে নারায়ণ খুব খুশি হয় এবং আমাকে জানায় যে ওর মতে মার্কসবাদ-লেলিনবাদ এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক মতবাদ এবং কম্যুনিস্ট পার্টি এই বিচার ধারার উদ্ভব – অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক পার্টি।... ও কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক এবং সেই হিসেবে যতদূর সম্ভব পার্টির কাজে সাহায্য করেছে – করছে এবং করবে।" (উদ্ধৃত : সুস্মিতা ঠাকুর, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৪১৮, পৃ. ৯০)

[৩] অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব*, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ২০০৬, পৃ. ৩৫

[৪] গোপাল হালদার, 'সংস্কৃতির সতীর্থ', তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বর্মণ (সম্পাদিত), *কোরক* (প্রথম পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২]

পেয়ে এসেছেন, তা যে কোনো পুরস্কারের থেকে অনেক বড়।'[১] ১৯৬৪ সালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হন, ১৯৬৮ সালে তাঁকে সংবর্ধনা জানায় 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকা।

১৯৬৩ সাল থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় *দেশ* পত্রিকায় লিখেছেন *সুনন্দর জার্নাল*। এগুলো মূলত রম্যরচনা; সমাজ-রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ নানা বিষয় তিনি সূক্ষ্ম কৌতুক ও অসাধারণ বাগবৈদগ্ধ্যে পরিবেশন করেছেন। মৃত্যুর পূর্বদিন তিনি লেখেন 'অসুস্থ শরীরের ভাবনা'। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অনুধাবন করেছেন মৃত্যুর আগমন-বার্তা। তাই শেষ লেখায় তিনি ভক্ত-পাঠকের কাছে সহজ বিদায় গ্রহণ করেন – "অসুস্থ শরীরে জার্নাল লিখতে লিখতে ভাবছি পরের সংখ্যায় 'সুনন্দের পাতাটি' যদি না থাকে, তাহলে জানবেন, আর একটি কমনম্যান বাঙালির অবলুপ্তি বা আত্ম-বিসর্জন ঘটল।"[২]

১৯৭০ সালের ৮ নভেম্বর কলকাতার শেঠ শুকলাল কারনানি হাসপাতালে (পি. জি. হাসপাতাল) মৃত্যুবরণ করেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পরদিন তাঁর প্রতি শেষ-শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কলকাতার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিকসহ সর্বস্তরের মানুষ।[৩] রেডিওতে তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে ছুটে আসেন প্রথম স্ত্রী রেণু দেবী। স্বামীসুখ-বঞ্চিত এ নারী সেদিন প্রার্থনা করেন – 'যদি পরজন্মে মানুষ হই, তবে যেন তোমাকেই স্বামী পাই। তুমি যতই দুঃখ দাও সব সহ্য করে যাব।... আর কোন অভিমান নেই আমার। আজ আমার সব শেষ হয়ে গেল।'[৪]

---

[১] অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আমার বাবা', তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত), *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : মাস্টারমশাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'অসুস্থ শরীরের ভাবনা', *সুনন্দর জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় 'যেসব সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, প্রতিষ্ঠান-প্রতিনিধি হাসপাতালে, গৃহে, শ্মশানে গিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন এবং মাল্যদান করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন – জগদীশ ভট্টাচার্য, মনোজ বসু, সুভাস মুখোপাধ্যায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সেন, মৃণাল সেন, বিনয় মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত ঘোষ, নারায়ণ চৌধুরী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, সুমথনাথ ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, মন্মথ রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহার গুপ্ত, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, সবিতাব্রত দত্ত, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ গুপ্ত, রমাপদ চৌধুরী, গৌরকিশোর ঘোষ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও মাল্যার্পণ করা হয় – আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যানডারড, দেশ, কথাসরিৎসাগর, বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, শরৎসাহিত্য সম্মেলন, উত্তরবঙ্গ লেখক সমিতি। (দ্রষ্টব্য : প্রভাস রায়চৌধুরী, *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪)

[৪] উদ্ধৃত : সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলের পূর্বে বাংলার সমাজব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। পলাশি যুদ্ধে (১৭৫৭) নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর এদেশের সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে ব্যাপক রূপান্তর সাধিত হয়। এসময় স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে একটি শ্রেণি ইংরেজদের সহযোগী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ শ্রেণিকে বলা হয় কম্প্রেডর বা মুৎসুদ্দি। কলকাতা এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তারা বসবাস স্থাপন করে এবং সম্পত্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যেগী হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে জমিদারিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে তারা স্থায়ী অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণে প্রয়াসী হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে সমাজব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে ছিল ইংরেজরা এবং সর্বনিম্নে ছিল কৃষক-শ্রমিক শ্রেণি। বাঙালি জমিদার, চাকুরিজীবী এবং ব্যবসায়ী-মহাজনরা ছিল এ-দুয়ের মধ্যবর্তী স্তরে। এরূপ বিবেচনায় এরা মধ্যশ্রেণিভুক্ত। মূলত এ শ্রেণির ওপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষে দৃঢ়মূল ভিত্তি পেয়েছে ইংরেজ রাজত্ব। নিজেদের সুবিধাবৃদ্ধির লক্ষ্যে এরা সর্বদাই অর্জন করতে চেয়েছে ব্রিটিশ অনুগ্রহ। ইংরেজ শাসকদের আনুকূল্য প্রত্যাশায় তারা স্বজাতির ওপর শোষণ-পীড়নেও লিপ্ত থেকেছে। এভাবে প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে এতদঞ্চলের মধ্যশ্রেণি ছিল রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত এবং নৈতিক দিক থেকে অধঃপতিত।

ইংরেজদের সান্নিধ্য-অর্জনের এক পর্যায়ে হিন্দু মধ্যশ্রেণি পরিচিত হয় ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে। ইংরেজদের অধীনে জমিদারি, চাকরি কিংবা ব্যবসায়িক সুবিধা অক্ষুণ্ন রেখে তারা শ্রেণিস্বার্থ চরিতার্থ করতে তৎপর হয়। বাঙালির এই নব-জাগরণ বা রেনেসাঁস শাসকগোষ্ঠী আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তৎসত্ত্বেও তারা বাধ্য হয়ে এদেশীয়দের জন্য উন্মোচন করে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার। এরপর থেকে কলকাতায় স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজ (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে বাংলায় ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে আধুনিক ভাবধারা ও জীবনচেতনাসমৃদ্ধ একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) প্রমুখ।

অন্যদিকে পলাশি যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পতন এবং তৎপরবর্তীকালে ওয়াহাবি ও ফরায়জি আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের চেতনালোকে সঞ্চারিত হয় ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব। প্রগতিবিরোধী চিন্তাচেতনার অনুবর্তী হয়ে তারা যেমন ইংরেজদের সাহচর্য ত্যাগ করে, তেমনি বর্জন করে পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি। বিজ্ঞানধর্মী জীবনচেতনার পরিবর্তে তারা সমর্পিত হয় ধর্মান্ধতায়; অতীত গৌরবের প্রতি তারা অকারণে হয়ে পড়ে মোহাচ্ছন্ন। সিপাহি বিপ্লবের (১৮৫৭) পর হতাশাগ্রস্ত মুসলিম সম্প্রদায় কিছুটা আলোড়িত হয়। এ বিদ্রোহে মুসলমানদের ভূমিকা মুখ্য হলেও, হিন্দু সৈনিকরা তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। সিপাহি বিদ্রোহে মুসলমানদের পরাজয় ঘটলেও একথা সত্য যে, 'এই বিদ্রোহ জাতির অন্তর্জগতে ইতিবাচক সম্ভাবনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল।'[১]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট থেকে রানি ভিক্টোরিয়া উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করলে (১৮৫৮) এতদঞ্চলের আর্থ-সামাজিক স্তরবিন্যাসে পরিবর্তন সূচিত হয়। এসময় বাঙালি চিন্তানায়ক আবদুল লতিফ খান বাহাদুর (১৮২৮-১৮৯৩) এবং সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯-১৯২৮) মুসলিম সমাজে শিক্ষাবিস্তার এবং তাদের ভাগ্য-পরিবর্তনে সচেষ্ট হন। এতদুদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় আবদুল লতিফের 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' (১৮৬৬) এবং সৈয়দ আমির আলীর 'মোহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৭৭)।

১৮৮৫ সালে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে হিন্দু মধ্যবিত্তের অগ্রগতি আরেক ধাপ বৃদ্ধি পায়। এ সংগঠনের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে এবং সাংগঠনিকভাবে তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বোম্বে শহরে। ডাব্লিও সি. ব্যানার্জি, ফিরোজ শাহ মেহতা, দাদাভাই নওরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ দলটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু নব্য প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসকে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এর মধ্যে তারা আবিষ্কার করে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ফাঁক ও ফাঁকি।

১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন (১৮৫৯-১৯২৫) ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হন। শাসনকার্যের সুবিধার্থে তিনি বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করবার পরিকল্পনা করেন। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে হিন্দু ও মুসলিম নেতৃত্বের অদূরদর্শিতার কারণে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দূরত্ব ও বিভেদ তৈরি হয়েছিল, তা হিংসাত্মক উপায়ে আত্মপ্রকাশ করে বঙ্গভঙ্গকে (১৯০৫) কেন্দ্র করে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থে এসময় তারা জড়িয়ে পড়ে পারস্পরিক বাদানুবাদ,

[১] আবুল কাসেম ফজলুল হক, 'আধুনিক যুগে বাঙালির চিন্তাধারা : আমূল পরিবর্তনবাদী প্রবণতা', *আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৩, পৃ. ১৬১

বিতর্ক ও সংঘাতে। এ-পর্যায়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে মুসলিম মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ (১৯০৬)। স্বল্পকাল ব্যবধানে দলটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ খান (১৮৬৬-১৯১৫) এবং টাঙ্গাইলের নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯২৯) নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হয়। পুরস্কারস্বরূপ নবাব সলিমুল্লাহ 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হন (১৯০৮) এবং ভাইসরয়ের আইন পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হন। অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (১৮৪৮-১৯২৫) হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করেন। পাশাপাশি প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০) এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) নেতৃত্বে মধ্যবিত্তের একটি অংশ জড়িয়ে পড়ে বিপ্লবী আন্দোলনে।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দিন (৭ আগস্ট ১৯০৫) বাংলায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়, আয়োজন করা হয় নগ্নপদ শোভাযাত্রা এবং রাখিবন্ধনের। এ শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাখি উৎসবের জন্য তিনি রচনা করেন কালজয়ী গান – 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। এছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের অংশ হিসেবে তিনি অজস্র গান রচনা করেন। যেমন : 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', 'ও আমার দেশের মাটি', 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে', 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক', 'সার্থক জনম আমার', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'আমি ভয় করব না' প্রভৃতি। স্বদেশী আন্দোলনে বিলাতি পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; দেশীয় মূলধনে প্রতিষ্ঠিত হয় কাপড়ের কল, চামড়া-সাবান-ঔষধের কারখানা, ব্যাংক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানি ইত্যাদি। এসময় "রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে সরলা দেবী চৌধুরানী 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী দ্রব্যের এক আড়ত খুললেন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'অনুশীলন সমিতি'র তরুণেরা 'বেঙ্গল স্টোর' ও যোগেশ চৌধুরী 'ইন্ডিয়ান স্টোর' নামে স্বদেশী দ্রব্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করলেন।"[১]

দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন (১২ ডিসেম্বর ১৯১১)। এর ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় আশাহত হয়। ব্রিটিশ রাজশক্তির ওপর তারা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। বিশেষত বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে স্যার সলিমুল্লাহ মানসিকভাবে তীব্র আঘাত পান এবং কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন। বিচলিত মুসলমানদের নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখান শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)।

[১] নরহরি কবিরাজ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা*, মনীষা, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮, পৃ. ১৭০

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৭) ভয়াবহতা বৈশ্বিকভাবে মানুষকে বিপন্ন করে তোলে। ভারতবর্ষ সংঘাতের বাইরে থাকলেও, ব্রিটিশ উপনিবেশ-শাসিত এ অঞ্চলে যুদ্ধের নানা পরোক্ষ প্রভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। কেননা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুই প্রতিপক্ষ দেশসমূহের মধ্যে ইংল্যান্ড ছিল অন্যতম। যুদ্ধকালে এবং তৎপরবর্তী সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দুর্মূল্য এদেশীয়দের জীবনযাপন বিপর্যস্ত করে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে চাকরি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্র্য হয়ে ওঠে। সাধারণত সরকারি উচ্চপদ ছিল ইংরেজদের দখলে; যুদ্ধ-সংক্রান্ত কাজ ব্যতীত বাঙালির কর্মসংস্থানের অন্য পন্থা ছিল না। এছাড়া শিক্ষার ক্রমপ্রসারে বাংলার পাশাপাশি বিহার, উড়িষ্যাসহ অন্য প্রদেশে তাদের চাকরির সুযোগ রহিত হয়। ফলে দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। 'কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায় যে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ।'[১] নিম্নশ্রেণির জীবনযুদ্ধ যে কতটা অমানবিক হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)। এর পূর্বে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বঞ্চিত ভারতীয়দের পক্ষে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছেন। এ অহিংস বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় তিনি বিহারে নীলচাষীদের এবং গুজরাটে কৃষকদের অধিকার আদায়ে সমর্থ হন। যুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দুরবস্থায় ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত হয় দমন-নীতিমূলক রাউলাট আইন (৩ মার্চ ১৯১৯)। কতিপয় ভারতীয় যুবক জার্মানির সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে – এ ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগে আইনটি পাশ হয়। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে গান্ধীজি দেশব্যাপী অহিংস আন্দোলনের ডাক দেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র জাতি তাঁর আহবানে ঐক্যবদ্ধ হয়। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এসময় পাঞ্জাবের অমৃতসরে শুরু হয় গণ-অভ্যুত্থান (১০ এপ্রিল ১৯১৯)। বিক্ষুব্ধ জনতা সরকারি অফিস-ব্যাংক ভাঙচুর করে এবং কয়েকজন ইংরেজকে হত্যা করে। এরই প্রেক্ষাপটে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ বাহিনী নিরস্ত্র মানুষের ওপর অকস্মাৎ গুলিবর্ষণ করে (১৩ এপ্রিল ১৯১৯)। সরকারিসূত্রে 'এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ৪০০ লোক নিহত এবং এক হাজারের অনেক বেশী লোক আহত হয়েছিল।'[২] নারকীয় হামলার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজ সরকার প্রদত্ত সম্মানসূচক 'নাইট' উপাধি

[১] গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

[২] নরহরি কবিরাজ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

পরিত্যাগ করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাযজ্ঞের পর ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটে।

মুসলমান সম্প্রদায় এসময় খিলাফত আন্দোলন শুরু করে। তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনে ইংরেজদের নেতিবাচক ভূমিকায় তারা বিক্ষুব্ধ হয়। এজন্য প্রতিটি সরকারি কাজে তারা অসহযোগিতা প্রদর্শন করে। খিলাফতের দাবিতে সারা ভারতে পালিত হয় ধর্মঘট (১৯ মার্চ ১৯২০)। পাশাপশি এ বছরের পহেলা আগস্ট থেকে শুরু হয় গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন। ক্রমে অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলন অভিন্ন রূপ ধারণ করে। রাষ্ট্রীয় পদ-পদবী ত্যাগ, আদালত ও বিলাতি পণ্য পরিহার, ছাত্রদের সরকারি স্কুল-কলেজ বর্জন প্রভৃতি কর্মপন্থার মধ্য দিয়ে ভারতীয়রা সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে। এই আন্দোলন উত্তাল হয়ে ওঠে প্রিন্স অব ওয়েলেসের ভারত-সফরের দিন (১৭ নভেম্বর ১৯২১)। দেশের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হন (১৯২২)।

১৯২৯ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় ভারতের জনজীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে। শহরের শ্রমিকরা বেকারত্বের যন্ত্রণায় ভোগে; গ্রামাঞ্চলে কৃষিপণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে কমতে থাকে। তদুপরি সাধারণ মানুষের ওপর সরকার এবং জমিদাররা নানামুখী খাজনা ধার্য করে। এসময় লবণের ওপর কর আরোপের প্রতিবাদে গান্ধীজি লবণ সত্যাগ্রহের সূচনা করেন (১২ মার্চ ১৯৩০)। এতদুদ্দেশ্যে তিনি সবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডির সমুদ্র উপকূল বরাবর প্রায় ২৪১ মাইল পদযাত্রা করেন, যা ঐতিহাসিক 'ডান্ডি মার্চ' নামে পরিচিত। পঁচিশ দিনের এ কর্মসূচি আরম্ভ হয় আটাত্তর জন সঙ্গী নিয়ে, পরবর্তীকালে মুক্তির মিছিলে যুক্ত হয় হাজারো জনতা। ডান্ডি সমুদ্রতীরে এক মুঠো লবণ তুলে গান্ধীজি প্রতীকীভাবে আইন লঙ্ঘন করেন। লবণ-আইনের ব্যত্যয় ঘটায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গান্ধীজির কারাবরণের বিরুদ্ধে কলকাতা, বোম্বে এবং পুনায় হরতাল চলে, কোথাও কোথাও পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ বাধে।

গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহের খণ্ডচিত্র রয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *সূর্য-সারথি* উপন্যাসে – 'তারপর উনিশশো তিরিশ সাল এল। গান্ধী মহারাজ ডাক দিলেন স্বরাজের লড়াইয়ের জন্যে। ডাণ্ডিতে সত্যাগ্রহ। আইন ভাঙতে হবে – লড়াই হবে সরকারের বিরুদ্ধে – সত্যাগ্রহীর বুকের শেষ রক্তকণা দিয়ে স্বরাজ আনত হবে।'[১] নারায়ণের

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সূর্য-সারথি*, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪১৯, পৃ. ১৯৬

'ইতিহাস' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র লোকেশও ছাত্রজীবনে জড়িয়ে পড়ে লবণ-আইন অমান্য আন্দোলনে। এ আন্দোলনের সূত্রে বাংলার রাজনীতিতে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। '১৯১৯-২৯-এর মধ্যে বাংলায় মোট ৪৭টি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে, আর শুধু ১৯৩০-এই ঘটেছিল ৫৬টি। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, জালালাবাদের যুদ্ধ, লোম্যান হত্যা ও বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স অভিযান।'[১] শিক্ষিত নারীরাও অংশ নেন এসব দুঃসাহসিক অভিযানে। মাস্টারদা সূর্যসেনের (১৮৯৪-১৯৩৪) নেতৃত্বে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২), কল্পনা দত্ত (১৯১৩-১৯৯৫), সুহাসিনী গাঙ্গুলী (১৯০৯-১৯৬৫) প্রমুখ দীক্ষিত হন অগ্নিমন্ত্রে।

১৯১৭ সালের অক্টোবরে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদী-চেতনার প্রসার ঘটে। 'মার্কসীয় চিন্তাচেতনা ও রুশবিপ্লবের প্রেরণা তৎকালীন বাঙালি তরুণদের একাংশের মনেও সঞ্চারিত হয়।... দেশের কৃষক জনতার মধ্যেও তখন জমিদার-বিরোধী মনোভাব ব্যাপকতর ও তীব্রতর হয় এবং মধ্যশ্রেণীর কোন কোন দল কৃষকদের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে এগিয়ে যায়।'[২] বৃহৎ-বঙ্গের কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) এবং কমরেড মুজফ্ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩) ছিলেন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁদের সাম্যবাদী চেতনায় প্রভাবিত হয়ে এ অঞ্চলে গড়ে ওঠে একটি মার্কসবাদী শ্রেণি। কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে পার্টির মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকা (১৯২৫)।

কমিউনিস্ট পার্টির পাশাপাশি আত্মপ্রকাশ করে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি (১৯২৯)। এ. কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে (১৯৩৬) সংগঠনটির নামকরণ হয় – নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা পার্টি। পরবর্তীকালে জমিদাররা ক্রমাগত সংগঠন ত্যাগ করলেও, ফজলুল হকের কাছে কৃষকদের স্বার্থ অগ্রাধিকার পায়। ভারত শাসন আইনের (১৯৩৫) ফলে ১৯৩৭ সালে ঘোষিত হয় সাধারণ নির্বাচন। এ-নির্বাচনে মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত হবার প্রয়াস পায়। কিন্তু মুসলিম লীগ নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহর (১৮৭৬-১৯৪৮) সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করে। এ

---

[১] অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস* (১৮৮৫-১৯৪৭), আনন্দ, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪২৩, পৃ. ১৬৩

[২] আবুল কাসেম ফজলুর হক, *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য*, খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭৯, পৃ. ৭৩

নির্বাচনে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না, গঠিত হয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সমবায়ে সরকার-গঠন প্রক্রিয়াকে কংগ্রেস অগ্রাহ্য করে। তাই ফজলুল হক বাধ্য হয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৩৭ সালের পহেলা এপ্রিল তিনি বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এসময় ঋণসালিশী বোর্ড স্থাপন, মহাজনি আইন ও বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয় এবং বিশেষকরে শিক্ষিত মুসলমানদের চাকরিপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অভাবনীয় অগ্রযাত্রা সাধিত হয়। মন্ত্রিসভা গঠনের কিছুদিনের মধ্যে ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং সংগঠনটির সভাপতি নির্বাচিত হন। সাম্প্রদায়িক-সংগঠনের আশ্রয়ভুক্ত হয়ে কৃষক-প্রজা পার্টি নিজস্বতা হারায় এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে দুর্বল হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৩৯ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর জার্মানি সেনাবাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করলে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। দুদিন পর ইংল্যান্ডও জার্মানির বিরুদ্ধে পাল্টা যুদ্ধ ঘোষণা করে। ‘বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ইংল্যান্ড ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে সর্বভারতীয় কংগ্রেস, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি রাজনৈতিক সংগঠন তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এ-অন্যায় যুদ্ধে ভারতের জনবল ও অর্থসম্পদ ব্যবহার না করার জন্য এ-রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ ব্রিটিশ সরকারকে সতর্ক করে দেয় এবং জনমতগঠনে প্রয়াস পায়।’[১] অথচ তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মার্কুইস লিনলিথগো (১৮৮৭-১৯৫২) এসব দাবি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন এবং ভারতকে যুদ্ধরত বলে প্রচার করেন। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি ভারতের রাজনৈতিক দল, আইনসভা কিংবা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সঙ্গে ন্যূনতম পরামর্শ করেননি; উপরন্তু ভারতীয়দের দমন-নিপীড়নের লক্ষ্যে প্রবর্তন করেন ‘ভারতরক্ষা আইন’। এ আইনে বিনা কারণে গ্রেপ্তার থেকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানসহ নানারকম ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় ইংরেজ প্রশাসন।

ইংরেজদের এ-স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে এসময় সাধারণ মানুষ গর্জে ওঠে। কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার অব্যাহত বিক্ষোভে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। যুদ্ধের প্রতিবাদে বোম্বে শহরে হরতাল পালিত হয় (২ অক্টোবর ১৯৩৯), জমসেদপুরে টাটা কোম্পানির শ্রমিকরা পৃথক ধর্মঘটের ডাক দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের প্রশ্নে ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে কংগ্রেসের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। ফলে এগারোটি প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার

[১] গিয়াস শামীম, ‘সরদার জয়েনউদ্দীনের উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা’, *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

মধ্যে কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণাধীন আটটি মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ করে (২২ ডিসেম্বর ১৯৩৯)। মুসলীম লীগ এটিকে তাদের রাজনৈতিক সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করে। কংগ্রেসের পদত্যাগের দিনটি তারা পালন করে 'আজাদ দিবস' বা 'নিষ্কৃতি দিবস' হিসেবে। মুসলীম লীগ বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ সরকারের ভূমিকাকে সমর্থন করে প্রশাসনের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। এছাড়া ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তারা পূর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এসময় দলটির লাহোর অধিবেশনে (২৩ মার্চ ১৯৪০) 'পাকিস্তান প্রস্তাব' উত্থাপিত হয়। এখানে তারা ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠনের দাবি জানায়।

১৯৪০ সালের শেষদিকে মিত্রশক্তি যুদ্ধে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। জার্মানি বাহিনী পোল্যান্ড, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে, ফ্রান্স এবং পূর্ব ইউরোপের বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে। অন্যদিকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোচীন, এবং ইন্দোনেশিয়া চলে যায় জাপানের অধিকারে। পার্ল হারবার বন্দরে মার্কিন নৌবহরে হামলা করে জাপানি বিমান বাহিনী। তবে রুশ-জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে হিটলার সোভিয়েত রাশিয়ায় আঘাত হানলে (২২ জুন ১৯৪১) অকস্মাৎ যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়।

বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে (১৯৩৯-১৯৪০) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধ-বিরোধী অবস্থানে ছিল। কিন্তু রাশিয়া আক্রান্ত হলে দলটি কৌশল পরিবর্তন করে। এ যুদ্ধকে তারা 'জনযুদ্ধ' হিসেবে আখ্যায়িত করে। একইসঙ্গে যুদ্ধের সমর্থনে তারা কল-কারখানার ধর্মঘট প্রত্যাহার করে এবং দেশের সামগ্রিক উৎপাদনব্যবস্থা গতিশীল রাখতে চেষ্টা করে। এজন্য কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক, সিএসপি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। ফ্যাসিবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি-শিল্পী-নাট্যকারদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'[১]। কলকাতার ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটে সমিতির দপ্তর স্থাপিত হয়। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, গ্রিসসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তের কমিউনিস্ট শিল্পী-সাহিত্যিক এখানে সম্মিলিত হন। সুহৃদ সমিতির এক বৈঠকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় "তাঁর 'হারাণের নাতজামাই' গল্পটি পড়ে শোনান। আর একদিন কিশোর সুকান্ত পড়ে শোনাল তাঁর সদ্যরচিত 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি।"[২] ঢাকা শহরে ফ্যাসিস্ট বিরোধী গণজমায়েতকে কেন্দ্র করে প্রাণ হারান তরুণ লেখক সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২)।

---

[১] ১৯৪৫ সালের পর এ সংগঠনের নামকরণ হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'। (দ্রষ্টব্য : অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪)

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১৯৪১ সালের আগস্টে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল (১৮৭৪-১৯৬৫) এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট (১৮৮২-১৯৪৫) আটলান্টিক মহাসাগরের এক রণতরীতে 'আটলান্টিক সনদ' প্রকাশ করেন। এ শান্তিসনদের মূলবক্তব্য হচ্ছে অঙ্গ-রাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসন এবং তাদের পছন্দমতো সরকারগঠন। তবে পরবর্তীকালে কমন্সসভার বৈঠকে চার্চিল এর নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করান। তিনি বলেন – নাৎসী অধিকৃত ইউরোপীয় রাজ্যে আটলান্টিক সনদ কার্যকর হলেও ভারত এবং বার্মার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। চার্চিলের বিকৃত বক্তব্যের জবাবে রুজভেল্ট স্পষ্টভাবে বলেন, আটলান্টিক সনদের ব্যাপ্তি কোনো নির্দিষ্ট ভূগোলে সীমাবদ্ধ নয়। কেবল বিবৃতি-প্রদান নয়, ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবিকে মেনে নিতে তিনি চার্চিলকে অনুরোধ করেন। রাশিয়া ও চীন এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৪২ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রণাঙ্গন জাপানের নিয়ন্ত্রণে আসে; থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং বার্মায় মিত্রবাহিনী পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হয়। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ভায়েট (১৮৮৪-১৯৪৮) এসময় বলেন – "ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপ সরকার সহযোগিতা দেবে। ভারতীয়দের সহযোগিতার ক্ষেত্রে জাপানের নীতি হবে 'মুশচাকুনো এনজো' অর্থাৎ অনাসক্ত কর্মযোগের নীতি।"[১] ফলে ব্রিটিশ সরকার অনেকটা নিরুপায় হয়ে ক্রিপস মিশনের ঘোষণা দেয় (১১ মার্চ ১৯৪২)। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস (১৮৮৯-১৯৫২) ছিলেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য। তিনি বামপন্থী এবং প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ; একারণে তাঁর আগমনে (২২ মার্চ ১৯৪২) ভারতীয়রা আশান্বিত হয়। কিন্তু ক্রিপসের প্রস্তাবে স্বাধীনতা নয়, দেশকে বিভক্ত করবার হীন পরিকল্পনা উত্থাপিত হয়। শুধু কংগ্রেস নয়, ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক দল এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সীমানায় অনুপ্রবেশ করে জাপানি বিমানবাহিনী। বিশেষত, কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ বোমা হামলার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। ১৯৪২ সালের ২২ ডিসেম্বর কলকাতার খিদিরপুরে জাপানি বোমায় অনেকে প্রাণ হারায়। এর ফলে লক্ষ-লক্ষ মানুষ কলকাতা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। অনেক সরকারি-বেসরকারি অফিস কলকাতার বাইরে স্থানান্তরিত হয়, বন্ধ করা হয় নগরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তখন জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজের শিক্ষক। বড়দিনের ছুটিতে কলকাতা হয়ে বরিশালে ফিরবার পথে তিনি বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। লেখক-পত্নী রেণু দেবীর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় :

---

[১] শঙ্কর কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : রাসপূর্ণিমা ২০১৬, পৃ. ৫২

রঞ্জন লিখল তার আসতে একটু দেরি হবে। একখানা বই বের হবে সেজন্য তাকে কলকাতা যেতে হবে। কলকাতা গিয়ে উঠল বুলবুল চৌধুরীর মেসে। হাতিবাগানে। দু'দিন বেশ ভালই কাটল। এমন সময় হাতিবাগান মার্কেটে বোমা পড়ল। আর খিদিরপুর ডকে কলকাতার অবস্থা ভয়ানক হয়ে উঠল।... বোমাপড়ার সংবাদ পেপারে দেখে বাড়ির অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়ে। ওর জামাইবাবু, যিনি ছোটবেলা থেকে পিতৃস্নেহে মানুষ করেছেন, তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েন।... এইভাবে ২/৩টি দিন কেটে যায়। বাড়ির সবাই চুপচাপ, কারো মুখে হাসি নেই।... এমন সময় [রঞ্জন] বাড়ির ভিতর ঢুকে বলে 'তোমাদের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ি, বিশেষ করে জামাইবাবুর জন্য। তাই অতিকষ্টে কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও ট্রেনে, আবার কিছু পথ গরুর গাড়ি চড়ে আসতে হল।'...

কথা বলতে বলতে গায়ের জামা, পোষাক, জুতো মোজা খুলতে থাকে আর মুখ বিকৃত করে। জামা খুলতেই দেখা গেল সমস্ত গায়ে পাঁচড়ায় ভর্তি হয়ে গেছে।... ৭/৮ দিন প্রাণপণ যত্ন নেওয়ার পর একটু উন্নতির দিকে গেল।... এমন সময় ছুটিও শেষ হয়ে এল।[১]

ব্রিটিশরা ভারত ছাড়লে জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে; এ ধরনের প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন – 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' (দেশ স্বাধীন করবো, অথবা মৃত্যুবরণ করবো)। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় গান্ধীজির প্রস্তাব জোরালো সমর্থন পায়। এ দাবিতে উদ্ভ্রান্ত-প্রশাসন মহাত্মা গান্ধীসহ দলের শীর্ষ নেতাদের বন্দি করে (৯ আগস্ট ১৯৪২) এবং কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করে। এতে সারাদেশ বিস্ফারিত হয়; শুরু হয় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন বা 'আগস্ট বিপ্লব'। বিহারের পাটনায় আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও মুহূর্তে সারা ভারতে ছড়িয়ে যায়। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ থাকলেও আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত হয়। কেবল শহর নয়, গ্রামগঞ্জের কৃষকশ্রেণি এবং পাহাড়ি আদিবাসী জনগোষ্ঠী গণ-আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। থানা, রেলস্টেশন, রেললাইন, ডাকঘর, টেলিগ্রাম অফিসসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা চলতে থাকে। তৎকালীন বড়লাট এক গোপন তারবার্তায় (৩১ আগস্ট ১৯৪২) চার্চিলকে জানান – '১৮৫৭ সালের পর এতবড় বিদ্রোহ ভারতের বুকে ঘটেনি। এর ব্যাপ্তি ও মারাত্মক চেহারার কথা আমরা সামরিক নিরাপত্তার খাতিরে কারও কাছে প্রকাশ করিনি।'[২] বিক্ষোভকারীদের দমন করতে প্রশাসন আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, পুলিশের সঙ্গে যুক্ত হয় সেনাবাহিনী। লাঠি-গুলি-টিয়ার শেলের সমান্তরালে বিমান থেকে গুলি বর্ষিত হয়। 'সরকারী হিসাবেই প্রকাশ

[১] উদ্ধৃত : (স্মৃতিচারণ : রেণু দেবী), সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৮

[২] অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

যে, আগস্ট বিপ্লব দমন করিতে গিয়া পুলিশ ও মিলিটারি ১০২৮ লোককে নিহত এবং ৩২০০ লোককে আহত করিয়াছে। কিন্তু বেসরকারি মতে ২৫ হাজার লোক নিহত হইয়াছিল।’[১]

এসময় কংগ্রেসের নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ সাংগঠনিকভাবে দৃঢ়তা অর্জন করে। ‘জিন্নার ওয়ার্কিং কমিটি ওই আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত থাকেনি, ভারতীয় মুসলমানদের এ আন্দোলন থেকে দূরে থাকার আহবানও জানানো হয়। এ সুযোগে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারস্বরূপ পাকিস্তান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভাইসরয়ের প্রতি আহবান জানায় ওয়ার্কিং কমিটি।’[২] ভারত-ছাড়ো আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনীতি দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। ফরওয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিস্ট পার্টি এবং রেভোলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, কৃষক-প্রজা পার্টি, হিন্দু মহাসভা, র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি এ আন্দোলনের বিরোধিতা করে। জিন্নাহ আগস্ট বিপ্লবকে অভিহিত করেন গৃহযুদ্ধ হিসেবে। আর কমিউনিস্টদের বিচারে, ‘শুধু কংগ্রেস নয়, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সমর্থক ও আন্দোলনকারী রাজনৈতিক দলগুলি ফ্যাসি-জাপানী দালাল; তারা কুইসলিং এবং পঞ্চম বাহিনী। এক-কথায় তারা হল নিকৃষ্টতম অন্তর্ঘাতক।’[৩]

আগস্ট বিপ্লবের উত্তাপ এবং ব্যর্থতার নানা প্রসঙ্গ চিত্রিত হয়েছে সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬০) *জাগরী* (১৯৪৫) এবং *ঢোঁড়াই চরিতমানস* (দ্বিতীয় চরণ, ১৯৫১) উপন্যাসে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি গল্পে এ আন্দোলনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। ১৯৪৪ সালের জুন পর্যন্ত ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন সক্রিয় ছিল। সরকারের পৈশাচিক নির্যাতন এবং যুদ্ধের বিজয়স্রোত ব্রিটেনের অনুকূলে থাকায় গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। জাতীয় সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর গৌরবোজ্জ্বল অবদানকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করেছেন। *স্বর্ণ-সীতা* উপন্যাসে তিনি লেখেন – ‘মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ত্যাগব্রত ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ।’[৪]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৭) ভারতবর্ষ ছিল রণভূমি থেকে দূরবর্তী স্থানে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এ অঞ্চল দক্ষিণ-এশিয়ার বৃহৎ যুদ্ধ-ঘাঁটিতে পরিণত হয়। অগণিত ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্য ছাড়াও আফ্রিকান, আমেরিকান

---

[১] বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, *দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় শোভন সংস্করণ : ২০১২, পৃ. ১৩৩

[২] আহমদ রফিক, *দেশভাগ : ফিরে দেখা*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১৪, পৃ. ১৪৫

[৩] শঙ্কর কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *স্বর্ণ-সীতা*, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

এবং চিনা সৈনিকদের ব্যাপক সমাবেশ ঘটে এ অঞ্চলে। এসব ভিনদেশি সেনাবাহিনীর উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ডে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। এজন্য ফ্যাসিস্ট ও মিত্রশক্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য খুঁজে পায়নি সাধারণ মানুষ। যুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর দৌরাত্ম্যের বিবরণ উঠে এসেছে এভাবে :

> চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা সর্বত্র – যেখানে ব্রিটিশ আর্মি – সেখানেই ত্রাস। লোকের চোখে তারা মূর্তিমান বিভীষিকা। যে অত্যাচার তারা লোকের উপর করেছে ! সে সময় ব্রিটিশ সরকার আফ্রিকা থেকে এমন এক জাতের সৈন্য আমদানি করেছিল – যারা একেবারে বর্বর। ধরুন কুমিল্লায় – গোটা শহরে পাঁচ সাত ঘরের বেশি মেয়ে নেই। সবাই শহর ছেড়ে চলে গেছে। মেয়ের খোঁজে ওই আফ্রিকান সৈন্যরা গোটা শহর চষে বেড়াচ্ছে। তারা শুধু একটা কথা জানে – বিবি ! বিবি আর বিবি ! লোকে হৈ চৈ করে তাদের তাড়া করে ফিরছে। পার্টি অফিসের নীচে একটা ঘড়ির দোকান। একদিন তারা জনাকয় মিলে সেখানে এসে হানা দিল। একটা কাপড় পেতে যত হাত-ঘড়ি পেল, সব পোঁটলা বেঁধে – দে দৌড় – লোকেরা চারধার থেকে ছুটে এল। কাছে যেতে সাহস করছে না কেউ – শুধু দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ছে। কলকাতায় তো কেউ চৌরঙ্গী অঞ্চলে সন্ধ্যের পর যেতে ভরসা পেত না। এহেন অবস্থায় লোকে কী করে বুঝবে – এটা হচ্ছে অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট আর্মি (ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাহিনী) ?[১]

ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী, চল্লিশের দশকের শুরুতে বাংলায় অন্নাভাব প্রকট আকার ধারণ করে। বিশেষত বার্মাপতনের পর সেখানে বসবাসকারী বাঙালি জনগোষ্ঠী স্বদেশে ফিরে আসে এবং বাংলার জনসংখ্যা লক্ষণীয় হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসময় বাংলায় দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয়। *শনিবারের চিঠি* (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯) বিষয়টি উপস্থাপন করে এভাবে –

> যুদ্ধের দরুণ আমাদের বাংলাদেশে নিদারুণ অন্নসমস্যা দেখা দিতেছে।... ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ভারতবাসী অন্তত কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। এই সকল দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ পথই বাংলাদেশ। যুদ্ধের জন্য সহস্র সহস্র নতুন লোকেরও আমদানি এখানে হইয়াছে, ফলে অন্ন সমস্যা মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে।[২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর নৌ-অভিযানের অন্তর্ভুক্ত হয়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ জাপানের নিয়ন্ত্রণে আসায় সিংহল দ্বীপ এবং ভারতীয় উপকূলাঞ্চল অরক্ষিত হয়ে পড়ে। জাপানি আধিপত্যে স্তম্ভিত হয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার। ভারতের পূর্বাঞ্চলে জাপানি বাহিনীর অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় অধিকাংশ

---

[১] উদ্ধৃত : অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[২] সজনীকান্ত দাস, 'সংবাদ সাহিত্য', *শনিবারের চিঠি* (উদ্ধৃত : সুস্মিতা ঠাকুর, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২)

নৌযান ধ্বংস করা হয়, যদিও নদীমাতৃক পূর্ববাংলায় মানুষের যোগাযোগের প্রধান বাহন ছিল নৌকা। দরিদ্র মাঝি এবং নৌকা মালিকরা জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। সহজ এবং সুলভ পরিবহনব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ায় নিত্য ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জাপানি সৈন্য ভারতে প্রবেশ করলে তারা যেন রসদ-সংকটে ভোগে, সেজন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে গৃহীত হয় পলায়নপর 'পোড়ামাটি নীতি' (Scorched Earth Policy)। এরফলে উপকূলবর্তী কৃষকদের ধান, চাল ও রবিশস্য ধ্বংস করা হয়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক অবশ্য সতর্ক করেছিলেন – 'গভর্নরের নীতির জন্য এই মুহূর্তে আমরা বাংলায় চালের মন্বন্তরের সম্মুখীন।'[১] এছাড়া ১৯৪২ সালের অক্টোবরে মেদিনীপুরের সমুদ্র-সংলগ্ন অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাসের কারণে ব্যাপক শস্যহানি হয়। 'শুধু তমলুক মহাকুমাতেই ফসল নষ্ট হয়েছিল শতকরা ৫০ ভাগ। মৃত গরু মোষের সংখ্যা ৭০ হাজারেরও বেশি। আর মৃত মানুষের সংখ্যা চার হাজার অতিক্রম করেছিল।'[২] দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় গ্রামের মজুররা শহরে পাড়ি জমালে যথাসময়ে ধান কাটাও সম্ভব হয় না। ফলে কৃষিভিত্তিক বাংলার প্রচুর ফসল মাঠেই বিনষ্ট হয়।

বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর খাদ্যরসদ সরবরাহের দায়িত্ব পায় কিছু দেশীয় ব্যবসায়ী। এরা অধিক লাভের আশায় খোলাবাজারে পণ্য বিক্রয় বন্ধ রাখে এবং হাজার-হাজার মণ ধান, চাল, ডাল, আটা, ময়দা মজুত করে। জনগণকে দুর্ভোগে ফেলে তারা আকস্মিকভাবে অগাধ অর্থসম্পদের মালিক হয়। প্রশাসন তাদের নিবৃত্ত করেনি, বরং ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। তদুপরি সারাদেশে বিপুল খাদ্যঘাটতি সত্ত্বেও সরকার বিদেশে চাল রপ্তানির সিদ্ধান্ত নেয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, 'যুদ্ধের পূর্বে ভারত যেখানে বছরে কম করে দশ লক্ষ টন চাল ও গম আমদানি করত, সেখানে ১৯৪২-এ ১ এপ্রিল থেকে ১৯৪৩-এর মার্চ পর্যন্ত আর্থিক বছরে রপ্তানি করেছিল বস্তুত ২,৬০,০০০ টন চাল। রপ্তানি জারি ছিল ঘূর্ণিঝড়ে গুরুত্বপূর্ণ শীতকালীন ধান বিনষ্ট হওয়ার পরেও।'[৩] আর এসব চক্রান্তের নেপথ্যে ছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল। দেশের উদ্বৃত্ত ফসল-সংগ্রহের জন্য প্রায় পাঁচ হাজার ব্যবসায়ীকে লাইসেন্স দেয় প্রশাসন। শুধু তাই নয়, এ কাজের জন্য ব্যবসায়ী মির্জা আহমেদ ইসপাহানিকে (১৮৯৮-১৯৮৬) অগ্রিম কুড়ি লক্ষ টাকা প্রদান করেন বাংলার তৎকালীন গভর্নর স্যার জন হারবার্ট। মুসলিম লীগের অন্যতম অর্থ-

---

[১] মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়, *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র* (নিখিল সুর ও অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত), সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৮৬

[২] বিজিত ঘোষ ড., *বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা*, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০০, পৃ. ৪১

[৩] মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়, *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

যোগানদাতা ছিলেন আহমেদ ইসপাহানি। 'এই কোম্পানিকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে, কোনো মজুতদার চাল বিক্রয় করতে অস্বীকার করলে তাকে বাধ্য করতে পারবে।'[১]

কেবল খাদ্যশস্য নয় – বস্ত্র, ঔষধ, কেরোসিন, লবণ সবই মজুত করতে থাকে নীতিহীন মজুতদারেরা। এদের মধ্যে অনেকে নারীপাচারের সঙ্গেও যুক্ত হয়। অসহায় নারীদের প্রতি এরা বাড়িয়ে দেয় লোভী-হাত। ফলে নরককুণ্ডে পরিণত হয় সমগ্র বাংলা। অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ-মহামারি গ্রাস করে নেয় সমগ্র লোকালয়। অথচ 'এই মন্বন্তরকে সেকালের কোনো দেশীয় গণবিক্ষোভ ও সাম্যবাদী রাজনীতির নেতাদের পক্ষেও ঠেকানো সম্ভব হয়নি। সম্ভব ছিলও না, কারণ মন্বন্তর ডেকে এনেছিল সে সময়ের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণীই ! সেই প্রভুত্ব-বিলাসী বৃটিশদের সহায়তা করে দেশীয় একদল নবোদ্ভূত শ্রেণী।'[২] সরকার ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের যৌথ ষড়যন্ত্রে 'উনিশ শো বিয়াল্লিশের এগারোই ডিসেম্বর যে চাল ছিল তেরো-চৌদ্দ টাকা মণ, উনিশ শো তেতাল্লিশের বারো মার্চে তা হলো একুশ টাকা,... অক্টোবরে চট্টগ্রামে প্রতি মণ চালের দাম হল আশি টাকা, ঢাকায় একশো পাঁচ টাকা।'[৩] অনেক কষ্টে সাধারণ মানুষ যেটুকু চাল সংগ্রহ করতে পেরেছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল নিতান্তই স্বল্প। খাদ্যাভাবে গ্রামে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে দুর্ভিক্ষ। ১৯৪৩ সালের (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) এ দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। প্রথমে বেসরকারি উদ্যোগে এবং পরে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় চালু হয় লঙ্গরখানা। একমুঠো অন্নের জন্য লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু মানুষ জড়ো হয় মহানগরের মাঠে-ময়দানে। সামান্য খিঁচুড়ির জন্য তারা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শহরবাসীর ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট খাবারের অধিকার নিয়ে এরা লড়াই করে রাস্তার কুকুরের সঙ্গে।

যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ বাঙালির বাহ্যিক জীবনকে একদিকে যেমন বিপর্যস্ত ও জটিল করেছে, অন্যদিকে তাদের মনোজগতে সৃষ্টি করেছে তীব্র অস্তিত্ব-সংকট। পঞ্চাশের মন্বন্তরের একটি অনুপুঙ্খ চিত্র প্রতিভাত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯১৭-১৯৭৫) স্মৃতিচারণে। এসময় তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র; পড়ালেখার পাশাপাশি তিনি সম্পৃক্ত হন ত্রাণ-কার্যক্রমে। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে তিনি লিখেছেন :

> দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। গ্রাম থেকে লাখ লাখ লোক শহরের দিকে ছুটেছে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে। খাবার নাই, কাপড় নাই। ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। ধান, চাল সৈন্যদের খাওয়াবার জন্য গুদাম জব্দ করেছে। যা

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

[২] বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২৯৪

[৩] শ্রাবণী রায়, 'সুনন্দর জার্নাল', সঞ্জীবকুমার বসু (সম্পাদিত), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩

কিছু ছিল ব্যবসায়ীরা গুদামজাত করেছে। ফলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা দশ টাকা মণের চাউল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করছে। এমন দিন নাই রাস্তায় লোকে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় না।...

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখল করে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল যে, একজন মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারত। সেই বাংলাদেশের এই দুরবস্থা চোখে দেখেছি যে, মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মার দুধ চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েকে বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। কেউ কিনতেও রাজি হয় নাই। বাড়ির দুয়ারে এসে চিৎকার করছে, 'মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও, মরে তো গেলাম, আর পারি না, একটু ফেন দাও।' এই কথা বলতে বলতে ঐ বাড়ির দুয়ারের কাছেই পড়ে মরে গেছে। আমরা কি করব ? হোস্টেলে যা বাঁচে দুপুরে ও রাতে বুভুক্ষুদের বসিয়ে ভাগ করে দেই, কিন্তু কি হবে এতে ?

এই সময় শহীদ সাহেব লঙ্গরখানা খোলার হুকুম দিলেন। আমিও লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অনেকগুলি লঙ্গরখানা খুললাম। দিনে একবার করে খাবার দিতাম। মুসলিম লীগ অফিসে, কলকাতা মাদ্রাসায় এবং আরও অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খুললাম। দিনভর কাজ করতাম, আর রাতে কোনোদিন বেকার হোস্টেলে ফিরে আসতাম, কোনোদিন লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে থাকতাম।[১]

পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলার গ্রামীণ জনপদ মৃতস্তূপে পরিণত হয়। '১৯৪৩ সালে বাংলায় সমূহ মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১৯,০৮,৬৬২। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলের মৃত্যুসংখ্যাই – ১৭,৮০,৩১৫। সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয় মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, ঢাকা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও মৈমনসিংহে।'[২] শহরাঞ্চলেও 'সর্বত্র রাস্তায় রাস্তায় অবহেলায় মানুষের শব ছড়িয়ে থাকতো। ত্রাণ সংগঠনগুলি শুধু অক্টোবরেই সৎকার করে ৩,৩৬৩ টি শবদেহ।'[৩] লক্ষণীয় যে, 'পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে কিন্তু একজনও সাদা চামড়ার মানুষের মৃত্যু হয়নি। মোদ্দা কথাটা হল ভারতের সাধারণ মানুষের প্রাণের দাম কানাকড়িও ছিল না।'[৪] মন্বন্তরের পর বাংলার প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হয় ম্যালেরিয়ায়। অথচ মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের জন্য পর্যাপ্ত কুইনিন সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না। কালোবাজারিরা

---

[১] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৭-১৮

[২] অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস* (১৮৮৫-১৯৪৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯

[৩] অধ্যাপক অমর্ত্য সেন, '*দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ*' (কবীর চৌধুরী অনূদিত), মাতৃভূমি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৫৫

[৪] মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়, *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

কুইনিনও মজুত করে রাখে। ত্রিশ টাকার কুইনিন চোরাবাজারে বিক্রয় হয় তিনশো টাকায়। ম্যালেরিয়ার পাশাপাশি সংক্রমিত হয় কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা ও অন্যান্য মরণব্যাধি।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পঞ্চাশের মন্বন্তরে যে ভূমিকা রেখেছে, তা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। 'কমিউনিস্ট কর্মীরা নিজেরা দিনের পর দিন অভুক্ত অর্ধভুক্ত থেকে নিরন্ন মানুষদের লঙ্গরখানায় রান্না করে খাইয়ে গেছেন মাসের পর মাস।'[১] কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখক-শিল্পী-নাট্যকাররা দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ চিত্র জনসম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। এরকম প্রেরণাতেই রচিত হয়েছে বিজন ভট্টাচার্যের (১৯১৭-১৯৭৮) *নবান্ন* (১৯৪৪) নাটক। দেশ-জাতির ক্রান্তিলগ্নে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বভাবতই দুর্গত মানুষের প্রতি সহমর্মিতাসূত্রে তাদের জীবনযন্ত্রণাকে শিল্পরূপে বাঙ্ময় করে তুলেছেন তাঁর ছোটগল্পে। এ পর্বে রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলো হলো : 'কবর', 'ডিম', 'তীর্থযাত্রা', 'লুচির উপাখ্যান', 'নক্র-চরিত', 'দুঃশাসন', 'ডিনার', '৺শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু', 'হাড়', 'কালো জল', 'পুষ্করা', 'ভাঙা চশমা', 'বিসর্জন' এবং 'সেই মৃত্যুটা'। এছাড়া দুর্ভিক্ষের নানা বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পার্থক্য', 'চাউল', 'ভীড়'; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তিনশূন্য', 'ইস্কাবন', 'পৌষ লক্ষ্মী', 'বোবা কান্না'; বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বীরুর প্রশ্ন'; পরিমল গোস্বামীর 'পরিচয়', 'ভাঙন', 'কৃষ্ণহরির চাল', 'তারিণী মাস্টার', 'শেষের হিসাব'; মনোজ বসুর 'মন্বন্তর', 'দ্বীপের মানুষ', 'বন্যা'; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কালনাগ', 'হাড়', 'কেরোসিন', 'কাক', 'চিতা', 'বস্ত্র; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়', 'আজ কাল পরশুর গল্প', 'প্রাণের গুদাম', 'সাড়ে সাত সের চাল', 'কালোবাজারে প্রেমের দর'; নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আবরণ', 'রসাভাস', 'রূপান্তর', 'পুনশ্চ', 'মদনভস্ম' প্রভৃতি গল্পে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ করেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫[২])। ১৯৩৮-১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের নমনীয়তার প্রশ্নে তিনি দলত্যাগ করেন এবং 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে নতুন রাজনৈতিক দল (৩ মে ১৯৩৯) প্রতিষ্ঠা করেন। নেতাজি এসময় ব্রিটেনের যুদ্ধ-সংকটকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির উপলক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাবিত হয়ে ভারতীয়দের একটি বড় অংশ জার্মান-জাপান জোটকে সমর্থন করে। যুদ্ধলগ্নে তিনি ছদ্মবেশে দেশ ছেড়ে (২৬ জানুয়ারি ১৯৪১) প্রথমে জার্মানি এবং পরে জাপান যান। এই দুই ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের

---

[১] অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[২] অনেকের ধারণা, নেতাজি ১৯৪৫ সালের ১৭ আগস্ট তাইওয়ানে এক বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। তবে তাঁর মৃত্যুর স্থান এবং সময় নিয়ে এখনও নানা বিতর্ক রয়েছে।

সহযোগিতায় তিনি আজাদ-হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব নেন। এ বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ছিল ভারতীয় যুদ্ধবন্দি এবং প্রবাসী দিনমজুর। বিশ্বযুদ্ধে এরা নেতাজির নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অবশ্য জাপানের পরাজয়ের (১০ আগস্ট ১৯৪৫) পর তারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। বিদেশের মাটিতে অবস্থান সত্ত্বেও নেতাজি ভারতের মুক্তিকামী জনতার উদ্দেশে নিয়মিত বেতার-ভাষণ দেন। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এবং অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা প্রাণিত করে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেও :

> হিটলারের ফ্যাসিস্ট নীতি আমরা সমর্থন করতাম না, তথাপি যেন ইংরেজদের পরাজিত হওয়ার খবর পেলেই একটু আনন্দ লাগত। এই সময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যদের দলে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।... মাঝে মাঝে সিঙ্গাপুর থেকে সুভাষ বাবুর বক্তৃতা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠতাম। মনে হত, সুভাষ বাবু একবার বাংলাদেশে আসতে পারলে ইংরেজকে তাড়ান সহজ হবে।[১]

রাজনৈতিক চেতনায় মতভেদ থাকলেও[২] সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী চিন্তাধারা গান্ধীজিকে স্পন্দিত করে। এমনকি তাঁর 'ভারত ছাড়ো' কর্মসূচির মধ্যে নেতাজির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৩] অন্যদিকে কমিউনিস্টরা সুভাষের সমালোচনা করলেও পরবর্তীকালে অনুতপ্ত হয়। পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ (১৯০৯-১৯৬২) কলকাতার এক জনসভায় (২৫ জানুয়ারি ১৯৫৭) স্বীকার করেন :

> কমিউনিস্টরা নেতাজীকে দেশদ্রোহী বলিয়াছিল। আমরা তাঁহার সম্পর্কে এইরূপ কথা বলিবার জন্য দুঃখিত। ১৯৪২ সালে অন্যান্য দেশপ্রেমিক দলের সহিত আমাদের অনুসৃত নীতির বিভেদ ছিল। এইসব মতভেদ সম্পর্কে বাদানুবাদ

---

[১] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[২] ১৯৩৯-১৯৪০ সালে মহাত্মা গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক মতবিরোধ স্পষ্ট হয়। 'গান্ধী ছিলেন প্রকৃত সত্যাগ্রহী, সারা জীবন ইংরেজদের সঙ্গে লড়েও তিনি তাদের বিপদের সুযোগ নিতে চাননি। তাঁর রাজনীতি কৌটিল্য বা মাকিয়াভেল্লিকে সযত্নে পরিহার করেছিল।' [উদ্ধৃত : অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস* (১৮৮৫-১৯৪৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩] অন্যদিকে নেতাজি 'স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে যে-কোন পথ নিতে প্রস্তুত ছিলেন। গান্ধীর মত লক্ষ্য ও উপায়ের সমতায় কোন বিশ্বাস ছিল না তাঁর। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (G.O.C) রূপে তিনি যে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সঙ্গে নেপোলিয়ন (ডেভিডের বিখ্যাত প্রতিচ্ছবি স্মরণ করুন)-এর মিল। [উদ্ধৃত : অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস* (১৮৮৫-১৯৪৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২] নেতাজি সম্পর্কে গান্ধীজি একবার বলেছিলেন – "সুভাষচন্দ্র একজন ভ্রান্তপথে পরিচালিত দেশপ্রেমিক (a misguided patriot)।" (উদ্ধৃত : নরহরি কবিরাজ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭)

[৩] রাজনৈতিক বিশ্লেষক অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেন : "ভারতবর্ষে শেষ ব্যাপক গণ বিদ্রোহ আওয়াজ তুলেছিল – 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।' সুভাষ কি বহুদূর থেকে গান্ধীর মনে যাদু বিস্তার করছিলেন ?
সুভাষ যখন কাছে ছিলেন গান্ধী তাঁকে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। তিনি যখন নিরুদ্দেশে পাড়ি জমালেন, তাঁর মনে একটা ধাক্কা লাগল। একে ঠিক অপরাধ বলা চলে না, যদিও তার সামান্য ছোঁওয়া থাকতে পারে।" [উদ্ধৃত : অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস* (১৮৮৫-১৯৪৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩]

> অত্যন্ত তিক্তভাবে করা হইত। আমাদিগকে বলা হইত বৃটিশের অনুচর, আমরাও বিপক্ষকে বলিতাম ফ্যাসিস্তদের অনুচর ইত্যাদি। ইহা নিঃসন্দেহে শোচনীয়।... জাপানের সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতার যে নীতি নেতাজী গ্রহণ করিয়াছিলেন আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম যে সেই নীতি সঠিক নয়। ব্রহ্মদেশের দৃষ্টান্ত ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ। কিন্তু তাঁহাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছিল। আমরা তাহার জন্য দুঃখিত। সুভাষ বসু দেশপ্রেমিক এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন।[১]

ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধশেষে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দি সৈনিকদের বিচারকার্য শুরু করে। এদের মুক্তির দাবিতে সারা ভারতে তখন দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্র ধর্মঘট ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় (২১ নভেম্বর ১৯৪৫)। এদিন ছাত্রদের শোভাযাত্রাকে পুলিশ ডালহৌসি স্কোয়ারে যেতে বাধা দেয়। তবে পুলিশের লাঠিচার্জ এবং গুলি উপেক্ষা করে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। সরকার জনতার দাবি উপেক্ষা করে ক্যাপ্টেন রশিদ আলিকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেয়। এ বিচারের প্রতিবাদে অগণিত মানুষ রাস্তায় নেমে আসে (১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)। কলকাতার বস্তিবাসীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যুক্ত হয়। ইংরেজদের তারা অকথ্য গালাগালি করে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করে এবং পুলিশের গাড়িতে আগুন দেয়। পুলিশও পাল্টা গুলি চালায় এবং নির্মম নির্যাতন করে। তিন দিনের এ আন্দোলনে প্রচুর হতাহতের ঘটনা ঘটে। এসময় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অভূতপূর্ব মিলন সাধিত হয়। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টি একত্রে রশিদ আলি দিবস সফল করে। রশিদ আলি দিবসের পটভূমিতে রচিত হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ঝড় ও ঝরাপাতা* (১৯৪৬) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চিহ্ন* (১৯৪৭) উপন্যাস।

একইসময় বোম্বে বন্দরে ধর্মঘট করে প্রায় বিশ হাজার ভারতীয় নৌ-সেনা (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)। এদের অনেকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দুঃসাহসিক সমুদ্রজয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এরপরও ইংরেজ অফিসাররা তাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করে। তদুপরি স্বল্পবেতন, অখাদ্য ভক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে নিরাপত্তার অভাব তাদের সংক্ষুব্ধ করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরসেনাদের বিচারে এরা অধৈর্য হয়ে ওঠে। ১৮ ফেব্রুয়ারি 'তলোয়ার' জাহাজে প্রথম ধর্মঘট হয়; পরদিন আরো কুড়িটি জাহাজের সৈনিক একজোট হয়। এ আন্দোলন দমন করতে ব্রিটিশ সৈন্যরা বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে গুলি চালায়। দুই পক্ষের গোলাগুলিতে ধর্মঘট বিদ্রোহে রূপ নেয়। দিল্লি, করাচি, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তম এবং কলকাতার নৌসদস্যরা এ আন্দোলনে একাত্মতা জানায়।

---

[১] অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সদস্যরাও নৌবিদ্রোহ সমর্থন করে। নৌসেনাদের প্রতি অবিচারের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষ বোম্বেতে হরতাল আহবান করে (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)। ধর্মঘটরত নাবিকদের সাহায্যার্থে শহরবাসী খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সরবারহ করে। 'এমনকি কয়েকজন ভিক্ষুককেও নাবিকদের জন্য খাবারের প্যাকেট হাতে বন্দরের দিকে যেতে দেখা গেল। কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে পাহারারত ভারতীয় সৈনিকদের দেখা গেল লোকজনদের কাছ থেকে খাবার নিয়ে লঞ্চে তুলে দিচ্ছে। ব্রিটিশ অফিসাররা অসহায়ের মতো তাকিয়ে।'[১]

ভারতবর্ষের এই রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনে ইংল্যান্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি (১৮৮৩-১৯৬৭) 'কেবিনেট মিশন' গঠন করেন। এ দলে অন্তর্ভুক্ত হন ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং অ্যাডমিরালিটির প্রথম লর্ড এ ভি আলেকজান্ডার। ভারতের জন্য নতুন সংবিধান প্রণয়ন এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের লক্ষ্যে দলটি দিল্লি আসে (২৪ মার্চ ১৯৪৬)। এ বছরের জুন মাস পর্যন্ত তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মতবিনিময় করে। কংগ্রেস ভারতের অখণ্ডতা দাবি করলেও মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাবে অনড় থাকে।

এই পরিস্থিতিতে কেবিনেট মিশন ভারতবর্ষকে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করে। তাদের নির্দেশিত বিভাজনে সেকশন 'এ' তে ছিল মাদ্রাজ, বোম্বে, ইউ. পি, বিহার, সি. পি ও উড়িষ্যা; সেকশন 'বি' তে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশ; এবং সেকশন 'সি' তে ছিল বাংলা ও আসাম। 'বি এন রাউ ও ভি পি মেনন ক্রিপস্‌কে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বাংলা ও আসামকে নিয়ে একটা তৃতীয় জোট তৈরি হলে কেউ বলতে পারবে না ভারতকে শুধু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করা হচ্ছে। বাংলা শুধু পশ্চিমের মুসলিম প্রদেশগুলি থেকে বহুদূর নয়, ভাষার দিক থেকেও আলাদা। (বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এই সত্যটা পাকিস্তানকে ১৯৭১ সালে বুঝিয়ে দেয়)।'[২] নিখিল ভারত কংগ্রেসের বোম্বে অধিবেশনে কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়।

অন্যদিকে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিতে সোচ্চার থাকে মুসলীম লীগ। এ দাবি বাস্তবায়নে তারা কলকাতায় পালন করে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' কর্মসূচি (১৬ আগস্ট ১৯৪৬)। এরফলে সামগ্রিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) এদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

[২] অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস* (১৮৮৫-১৯৪৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪

করেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এ কর্মসূচি ঘোষিত হলেও, এটি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে রূপ নেয়। রশিদ আলি দিবস এবং নৌবিদ্রোহের সূত্রে ভারতবর্ষে যে সম্প্রীতির সূচনা হয়, তা সহসা ভেস্তে যায়। 'ফেব্রুয়ারিতেও শত্রু ছিল ইংরেজ; অগস্টে শত্রু মনে করা হচ্ছে অপর সম্প্রদায়কে। লুঠ হচ্ছে সাহেবদের নয়, অপর সম্প্রদায়ের দোকান; আক্রমণ করা হচ্ছে ইংরেজদের ওপর নয়, প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের ওপর। লক্ষ্য আর উপলক্ষ বদলে গেছে; কিন্তু আচরণের প্রকাশভঙ্গি প্রায় একইরকম।'[১] প্রকাশ্য রাজপথে আগ্নেয়াস্ত্রসহ মহড়া দেয় হিন্দু-মুসলমানরা। 'চার দিনের এই নরমেধ যজ্ঞে কমপক্ষে ৫ হাজার (মতান্তরে ১০ হাজার) নর-নারী-বৃদ্ধ-শিশু নিষ্ঠুরভাবে নিহত, ১৫ হাজারের মত আহত, কোটি কোটি টাকার সম্পদ ভস্মসাৎ অথবা লুণ্ঠিত ও নারীর অমর্যাদার বহু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য হিন্দুদের স্বধর্মীয়দের এবং মুসলমানদেরও মুসলিম অধ্যুষিত পাড়ায় বিপুল সংখ্যায় স্থানান্তরণ করে দেশ বিভাগের ভিত্তি রচনা করা হয়।'[২] ভ্রাতৃঘাতী এ দাঙ্গা 'দি গ্রেট কলকাতা কিলিং' নামে আখ্যায়িত হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় – 'বীভৎসতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ! কোথায় গলি-ঘুঁজিতে খুন করে এনে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে রাস্তার ওপর – রৌদ্রে শুকিয়ে কাঠ হচ্ছে – দূর থেকে দেখছি মধ্যে মধ্যে কাক এসে বসছে তার ওপর।'[৩]

ছেচল্লিশের দাঙ্গায় আগ্নেয়াস্ত্র এবং বোমার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে এসব বেআইনি মারণাস্ত্র দুর্লভ ছিল না। আবার অনেকের ছিল যুদ্ধকালীন সামরিক প্রশিক্ষণ। তাই এ দাঙ্গা অতীতের তুলনায় বীভৎস রূপ নেয়। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করে। ১৬ আগস্টের দাঙ্গা প্রসঙ্গে পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত প্রচলিত রয়েছে। কলকাতার *স্টেটসম্যান* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এ 'নরমেধ যজ্ঞে'র জন্য মুসলিম লীগকে এককভাবে দায়ী করা হয় :

> এক মহৎ প্রদেশের রাজধানীতে যে আতঙ্কজনক নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, ভারতের ইতিহাসে তা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং আমাদের বিশ্বাস এর মূলে ছিল মুসলিম লীগ দ্বারা আয়োজিত এক রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন। লীগ মন্ত্রী-মণ্ডলীর অত্যন্ত সততা সহকারে এই ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেওয়া উচিত ছিল যে এ জাতীয় রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন কোন রকম অশান্তি সৃষ্টির কারণ হবে না। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যে-কোন মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রধান কর্তব্য। আর বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত দায়িত্বের পরিমাণ এই কারণে আরও অধিক ছিল যে মুসলিম লীগের ঘোষিত নীতি ছিল 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' – কে শান্তিপূর্ণ রাখা। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই কর্তব্য

[১] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিক্ষুব্ধ বাংলা*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ২৪

[২] শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *দাঙ্গার ইতিহাস*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ : পৌষ ১৪২১, পৃ. ৫৯

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'লোকটা মরছে', *সুনন্দর জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮

পালন করার বদলে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর বিভ্রান্তিকর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও প্ররোচনামূলক কার্যকলাপের দ্বারা যেসব ঘটনা ঘটেছে তা পরিহার করার পরিবর্তে মন্ত্রীমণ্ডলী বরং তার কারণ স্বরূপ হয়েছে।[১]

মুসলিম-লীগ নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দীর উদাসীনতাকে কেউ-কেউ দাঙ্গার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২] অন্যদিকে সেদিনের জনসমাগমে অংশগ্রহণকারী শেখ মুজিবুর রহমান এবং চিত্রশিল্পী কামরুল হাসানের (১৯২১-১৯৮৮) পর্যবেক্ষণ ছিল ভিন্নরকম। বঙ্গবন্ধু আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন :

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা কাকে বলে এ ধারণাও আমার ভালো ছিল না। দেখি শত শত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক মসজিদ আক্রমণ করছে। মৌলভী সাহেব পালিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। তাঁর পিছে ছুটে আসছে একদল লোক লাঠি ও তলোয়ার হাতে। পাশেই মুসলমানদের কয়েকটা দোকান ছিল। কয়েকজন লোক কিছু লাঠি নিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়াল। আমাদের মধ্য থেকে কয়েকজন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' দিতে শুরু করল। দেখতে দেখতে অনেক লোক জমা হয়ে গেল। হিন্দুরা আমাদের সামনা সামনি এসে পড়েছে। বাধা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। ইঁট পাটকেল যে যা পেল তাই নিয়ে আক্রমণের মোকাবেলা করে গেল। আমরা সব মিলে দেড় শত লোকের বেশি হব না। কে যেন পিছন থেকে এসে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের কয়েকখানা লাঠি দিল। এর পূর্বে শুধু ইঁট দিয়ে মারামারি চলছিল। এর মধ্যে একটা বিরাট শোভাযাত্রা এসে পৌঁছাল। এদের কয়েক জায়গায় বাধা দিয়েছে, রুখতে পারে নাই। তাদের সকলের হাতেই লাঠি। এরা এসে আমাদের সঙ্গে যোগদান করল। কয়েক মিনিটের জন্য হিন্দুরা ফিরে গেল, আমরাও ফিরে এলাম। পুলিশ কয়েকবার এসে এর মধ্যে কাঁদানে গ্যাস ছেড়ে চলে গেছে। পুলিশ টহল দিচ্ছে। এখন সমস্ত কলকাতায় হাতাহাতি মারামারি চলছে। মুসলমানরা মোটেই দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত ছিল না, একথা আমি বলতে পারি।[৩]

এছাড়া কামরুল হাসানের স্মৃতিকথায় উল্লেখ রয়েছে :

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টকে ঘোষণা করা হয়েছিল কেবল পাকিস্তান বিরোধীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার জন্য, দাঙ্গা বাধানোর জন্য নয়। কলকাতার মুসলমানদের সামনে গড়ের মাঠে জনসভায় সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন, সবাই দলে দলে যোগদান করবে – এই ছিল প্রত্যাশা। দলে দলে যোগদান করেছিলাম। দলে দলে সবাই গিয়েছিল সভায়। লাঠিসোটা নিয়ে যায়নি কেউ, বরং কলকাতার চিরাচরিত মিছিলের রীতি অনুযায়ী ঢাক, ঢোল, ব্যান্ড-বাদ্য ইত্যাদি নিয়ে গিয়েছিল। এটা আমার নিজের চোখে দেখা। আজও চোখ বুজলে পরিষ্কার দেখতে পাই সে দৃশ্য।

---

[১] উদ্ধৃত : শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *দাঙ্গার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

[২] গবেষক জয়া চ্যাটার্জীর মতে – 'এই রক্তক্ষরণের দায়িত্বের অনেকটাই বহন করেন সোহ্‌রাওয়ার্দী নিজে; কারণ তিনি হিন্দুদের প্রতি খোলা চ্যালেঞ্জ দেন এবং দাঙ্গা শুরু হওয়া মাত্রই তা দমনে সন্দেহজনক অবহেলার (ইচ্ছাকৃত বা অন্য কারণে) কারণে ব্যর্থ হন।' [জয়া চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হল* (আবু জাফর অনূদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮, পৃ. ২৭১]

[৩] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫

হিন্দু মহাসভার দীর্ঘদিনের মিলিত প্রচেষ্টা এবং প্রচারের মাহাত্ম্যকে এ ব্যাপারে প্রশংসা না করে পারছি না। কেননা, দাঙ্গা লেগে যেতে দেরি হলো না।... তিন দিন হিন্দু-অধ্যুষিত পাড়ার মুসলমান বাসিন্দাদের ওপর যে পাইকারি ও অরগানাইজড আক্রমণ চালানো হয়েছিল, এরও আমি প্রত্যক্ষদর্শী। অবশ্য ওই কয় দিন মুসলমান পাড়ার হিন্দুরাও যে আক্রান্ত হয়নি, তা অস্বীকার করব না।[১]

দাঙ্গা মোকাবেলায় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় পরবর্তীকালে নতুন প্রশ্নের উদ্রেক হয়। জনৈক গবেষক ছেচল্লিশের এই দাঙ্গার অন্তরালে খুঁজে পান ভারত-বিদ্বেষী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিলের পরোক্ষ হস্তক্ষেপ ও ষড়যন্ত্র :

নির্বাচনে হেরে গেলেও চার্চিল জিন্নার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। তাদের কি কথাবার্তা হত সেই বিষয়ে অনুমানের অন্ত নেই। ১৯৪৬-এর ৩ আগস্টে নাকি চার্চিল পরামর্শ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের উচিত ভবিষ্যতে অরক্ষিত ভারতকে আক্রমণ করা। সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাত্র দুই সপ্তাহ আগের ঘটনা। কিন্তু এই সমস্ত চিঠির কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। জিন্নাও নিজের ভাবনাচিন্তা বিষয়ে সুদীর্ঘ কোনো দলিল রেখে যাননি। তবে এটুকু জোর দিয়ে বলাই যায় যে, যুদ্ধের সময় যদি ভারতের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল কেউ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হতেন তাহলে হয়ত ভারতের স্বাধীনতা আরও বেশ কিছুটা শান্তিপূর্ণ হতে পারত। হয়ত এতগুলো প্রাণ বেঘোরে মারা পড়ত না। হয়ত এত মানুষ ঘরছাড়া হতে বাধ্য হত না।[২]

কলকাতার দাঙ্গা পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত হয় বোম্বে, বিহার, দিল্লি, গড় মুক্তেশ্বর, পাঞ্জাবসহ ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, সন্দ্বীপ, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং পাবনা জেলায় ব্যাপক হিন্দুনিধন চলে। এসব স্থানে প্রচুর মন্দির অপবিত্র করা হয়, অনেককে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত এবং গোমাংস ভক্ষণে বাধ্য করা হয়। 'নোয়াখালিতে নারায়ণপুরের জমিদার সুরেন্দ্রবাবুর ছিন্নমুণ্ড দাঙ্গাকারীদের নেতা গোলাম সারোয়ারকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। নামজাদা উকিল রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীর পরিবারের সমস্ত পুরুষকেই হত্যা করা হয়।'[৩] নোয়াখালির দাঙ্গা মহাত্মা গান্ধীকে সাংঘাতিক ব্যথিত করে। কারণ –

শহরে যে দাঙ্গা ঘটে সেখানে দাঙ্গাকারী ও দাঙ্গাপীড়িত কেউ কাউকে চেনে না, হিংসার উন্মত্ততা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষকে অন্ধ করে দেয় এবং তারা প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু গ্রামসমাজে মানুষ দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস

---

[১] উদ্ধৃত : সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পাদিত), *কামরুল হাসান : বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৯০

[২] মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়, *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০-২৭১

[৩] অশ্রুকুমার সিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ৫১

> করে আসছে, সামাজিক ও ধর্মগত ভিন্নতা ও বিরোধের অনেক ক্ষেত্র থাকলেও পারস্পরিক মিলন ও সহাবস্থানের ক্ষেত্র তো সমাজ ও জীবনযাত্রাই প্রস্তুত করে দেয়।[১]

জাতির দুঃসময়ে গান্ধীজি স্বয়ং চৌমুহনী আসেন (৭ নভেম্বর ১৯৪৬) এবং দাঙ্গা-কবলিত দত্তপাড়ায় একটি ক্যাম্প স্থাপন করেন। এ অঞ্চলে তিনি প্রায় চার মাস অবস্থান করেন এবং সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তাঁর গ্রামসভায় হিন্দু-মুসলমানরা তর্ক-বিতর্ক শেষে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নোয়াখালির দাঙ্গার পর বিহারে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর হামলা হলে গান্ধীজি সেখানে প্রত্যাবর্তন করেন। বিশ্বযুদ্ধোত্তর দাঙ্গার এ-ভয়াবহতা চিত্রিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অপঘাত', 'উস্তাদ মেহের খাঁ', 'তিতির', 'সঞ্চার'; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতার দাঙ্গা ও আমি'; বনফুলের 'দাঙ্গার সময়'; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'স্বাক্ষর'; মানিক বন্দ্যোপাধ্যয়ের 'খতিয়ান', 'ভালবাসা', 'ছেলেমানুষি'; বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বিশ্বাস', 'সত্যাগ্রহী'; পরিমল গোস্বামীর 'হত্যা'; সমরেশ বসুর 'আদাব'; মনোজ বসুর 'হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা', 'একটি দাঙ্গার কাহিনী', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'জৈব'; সোমেন চন্দের 'দাঙ্গা'; অতীন বন্দ্যোপাধ্যয়ের 'কাফের' প্রভৃতি গল্পে।

ছেচল্লিশের দাঙ্গার পটভূমিতে লর্ড ওয়াভেলের (১৮৮৩-১৯৫০) পরিবর্তে লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯০০-১৯৭৯) ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হন (২৪ মার্চ ১৯৪৭)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের বিজয়ী সেনানায়ক ছিলেন তিনি। ভারতবর্ষ কখনো আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হোক – ব্রিটিশ প্রশাসন তা চায়নি। মাউন্টব্যাটেনের কর্মপ্রণালির মূলবিষয় ছিল দেশভাগ। ফলে পাঞ্জাব এবং বাংলা প্রদেশ দুটিকে হিন্দু-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে বিভাজন রেখা অঙ্কনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফকে (১৮৯৯-১৯৭৭), যিনি ইতঃপূর্বে কখনো এতদঞ্চলে আসেননি। ফলত ২৮ হাজার বর্গমাইল আয়তন এবং ২ কোটি ১০ লক্ষ জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ; অন্যপ্রান্তে ৪৯ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড এবং ৩ কোটি ৯০ লক্ষ জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ। লক্ষণীয় যে, 'র‍্যাডক্লিফের সীমারেখার সাথে ১৯০৫ সালে কার্জন যে সীমারেখা টানেন তার বেশ কিছু মিল ছিল।'[২] পরিশেষে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পূর্ববঙ্গ নিয়ে গড়ে ওঠে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র।

দেশভাগকে কেন্দ্র করে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ব্যাপক অনিশ্চয়তায় নিক্ষিপ্ত হয়। মহাত্মা গান্ধী দেশভাগ প্রক্রিয়ায় প্রচণ্ড আপত্তি তোলেন। কিন্তু জিন্নাহ্‌র উপর্যুপরি অসহযোগিতায় তাঁর সদিচ্ছা ব্যর্থ

---

১ মফিদুল হক, *দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৭

২ জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন* (আবু জাফর অনূদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে ২০১৭, পৃ. ৫৪

হয়। এজন্য ভারতের স্বাধীনতার দিন (১৫ আগস্ট ১৯৪৭) গান্ধী কলকাতার বেলেঘাটায় অনশন পালন করেন। মূলত 'মহাত্মা গান্ধী যে-সময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছিলেন, ঠিক সে-সময় জিন্নাহ নিয়ে এলেন সম্প্রদায়-বিভাজনের হীন বক্তব্য। যার ফলে একই ভূখণ্ডে বসবাসরত দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রোপিত হয় হিংসার বীজ, এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্প পুরো ভারতবর্ষের জনজীবন অশান্ত করে তোলে। কুটবুদ্ধি রাজনীতিকদের প্ররোচনায় জনগণ লিপ্ত হয় আত্মদানের পরিবর্তে আত্মহননের অশুভ প্রতিযোগিতায়। শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি, বিশেষ করে ছাত্রসমাজের মন ও মস্তিষ্ক থেকেও আধুনিক সমন্বিত জাতিক চেতনা প্রায় বিলুপ্ত হয়, এবং তার স্থান অধিকার করে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্ব।'[১] আরেকটি আলোচনায় জানা যায়, 'বাঙলা ভাগের দাবি অবশ্য হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির লোকেরাই করেছিল, কারণ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে তারা কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পায়নি। নিজেদের রাজ্য দাবি করে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সাথে অংশীদারিত্বে কাজ করার রাজনৈতিক কৌশল প্রত্যাখ্যান করে ঐতিহাসিক বিকল্প গ্রহণ করে।'[২]

৪৭-এর বাংলা বিভাজন তৎকালীন প্রখ্যাত মুসলিম সাহিত্যিকদের নিরাশ করে। আবু সয়ীদ আইয়ুব, শওকত ওসমান, আবুল হোসেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আহসান হাবীব, বুলবুল চৌধুরী প্রমুখের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এসময় অখণ্ড বাংলার দাবি জানানো হয়। এছাড়া বঙ্গবিভাজন রোধ করতে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন নেতাজি সুভাসচন্দ্র বসুর ভ্রাতা শরৎ বসু, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম প্রমুখ। তবে 'আকরম খাঁ-নাজিমউদ্দীনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগের দলীয় সদস্যেরা সোহ্‌রাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাননি, বরঞ্চ জিন্নাহ্‌র কাছে তার বিরোধিতা করেছিলেন।'[৩] সে-সময়ের তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবের মর্মস্পর্শী বিশ্লেষণ এতৎপ্রসঙ্গে লক্ষণীয় :

> নাজিমুদ্দীন সাহেব নেতা নির্বাচিত হয়েই ঘোষণা করলেন, ঢাকা রাজধানী হবে এবং তিনি দলবলসহ ঢাকায় চলে গেলেন। একবার চিন্তাও করলেন না, পশ্চিম বাংলার হতভাগা মুসলমানদের কথা।... নেতারা যদি নেতৃত্ব দিতে ভুল করে, জনগণকে তার খেসারত দিতে হয়। যে কলকাতা পূর্ব বাংলার টাকায় গড়ে উঠেছিল সেই কলকাতা আমরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলাম। কেন্দ্রীয় লীগের কিছু কিছু লোক কলকাতা ভারতে চলে যাক এটা চেয়েছিল বলে আমার মনে

[১] গিয়াস শামীম, 'সরদার জয়েনউদ্‌দীনের উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা', *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

[২] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন* (আবু জাফর অনূদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[৩] আনিসুজ্জামান, 'ফিরে দেখা : উনিশশো সাতচল্লিশ', সেমন্তী ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশভাগ : স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, গাঙচিল, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৩৩

হয়। অথবা পূর্বেই গোপনে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী নেতা হলে তাদের অসুবিধা হত তাই তারা পিছনের দরজা দিয়ে কাজ হাসিল করতে চাইল। কলকাতা পাকিস্তানে থাকলে পাকিস্তানের রাজধানী কলকাতায় করতে বাধ্য হত, কারণ পূর্ব বাংলার লোকেরা দাবি করত পাকিস্তানের জনসংখ্যায়ও তারা বেশি আর শহর হিসাবে তদানীন্তন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শহর কলকাতা। ইংরেজের শাসনের প্রথমদিকে কলকাতা একবার সারা ভারতবর্ষের রাজধানীও ছিল।[১]

ভারতের পূর্ব সীমান্তে বাংলা প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হলে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করে এক বিশাল জনসম্প্রদায়, যারা উদ্বাস্তু বা শরণার্থী নামে পরিচিত হয়। এরা নিজ জন্মভূমিকে অনিরাপদ মনে করে এবং অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগ জীবনযাপনের প্রত্যাশায় বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে। পায়ে হেঁটে, ট্রেনে, বাসে কিংবা নৌকা-স্টিমারযোগে তারা পূর্ববাংলা থেকে ভিড় করে পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু অচিরেই তাদের প্রত্যাশা মার খায় এবং তারা হতশ্রী জীবনযাপনে বাধ্য হয়। কলকাতাবাসীও তাদের স্বাগত জানায়নি, 'বাঙাল' বলে তাচ্ছিল্য করেছে। যে সকল উদ্বাস্তু নগদ অর্থ-গয়নাসহ দেশ ছাড়ে, তারা আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সাময়িক আশ্রয় পায়। তাছাড়া অধিকাংশই বাস্তুচ্যুত হয়ে ঠাঁই নেয় শিয়ালদহ, বনগাঁ, দর্শনা, বার্নপুর, দমদম প্রভৃতি রেলস্টেশনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বাঁশ ও টিনের তৈরি সেনাছাউনি নিয়ে গড়ে ওঠে ধুবুলিয়া, রাণাঘাট, বকুলতলা প্রভৃতি শরণার্থী শিবির। কলকাতার বাইরে উত্তর চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় চালু হয় রিফিউজি ক্যাম্প। ক্যাম্পের প্রতি ঘরে স্থান পায় কুড়িটি পরিবার। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘদিন অবস্থানের কারণে তারা নানামাত্রিক রোগে আক্রান্ত হয়। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও হতভাগ্য এসব মানুষের সঙ্গে অনেকে প্রতারণা করে। উদ্বাস্তু নারীরা সামান্য প্রলোভনে পাচারকারীদের শিকারে পরিণত হয় এবং নিষিদ্ধ পল্লিতে দিনযাপনে বাধ্য হয়।

শরণার্থীদের প্রতি এসময় প্রশাসন সহানুভূতি প্রদর্শন করেনি, উপরন্তু বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতিহতের চেষ্টা করে। উদ্বাস্তু জনস্রোত নিয়ন্ত্রণে লিয়াকত-নেহরু চুক্তি (১৯৫০) স্বাক্ষরিত হলেও, এ প্রবাহ বন্ধ হয়নি। বরং সহিংসতা আরও সংক্রামিত হয় এবং পরিণামে উদ্বাস্তু-সংকট চূড়ান্তরূপ নেয়। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি থেকে ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালি এবং ফেনী অঞ্চলে সংঘটিত দাঙ্গার কারণে নবগঠিত পাকিস্তানের প্রতি হিন্দুদের আস্থা পূর্ণমাত্রায় লোপ পায়। অন্যদিকে পঞ্চাশের দাঙ্গায় পশ্চিমবাংলা, আসাম ও বিহারের মুসলমানরা পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে। এদের একটি বড় অংশ ছিল বিহারি মুসলমান। ঢাকা,

---

[১] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯

চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা, ঈশ্বরদী, রংপুর ও সৈয়দপুরে তারা বসতি স্থাপন করে। শরণার্থীদের প্রতিরোধকল্পে ১৯৫২ সালে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চলাচলের জন্য পাসপোর্ট ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এতৎসত্ত্বেও ১৯৭১ সাল পর্যন্ত লক্ষ-লক্ষ ছিন্নমূল মানুষ পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নেয়।[১]

পূর্ববাংলায় 'মুহাজির'দের[২] দীর্ঘদিন ক্যাম্পে অবস্থান করতে হয়নি। সংখ্যায় কম থাকায় তারা সত্বর দেশান্তরী হিন্দুদের বাড়ি, জমি ও পেশায় পুনর্বাসিত হয়। অন্যদিকে নেহেরু-সরকার তালিকাভুক্ত উদ্বাস্তুদের সামান্য ত্রাণ বিতরণ করলেও পুনর্বাসনে আপত্তি জানায়।[৩] সরকারের যুক্তি ছিল – 'পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা উন্নতি হলেই এরা দেশে ফিরে যাবে। আর ভারতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হলে তাদের পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগে উৎসাহ দেওয়া হবে।'[৪] ফলে পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তুরা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে চরম নৈরাশ্যে নিপতিত হয়। প্রায়ই তারা পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়। ১৯৪৯ সালে শিয়ালদহ স্টেশনে পুলিশের টিয়ারশেল ও লাঠির আঘাতে নয় জন উদ্বাস্তু নিহত হয়।[৫] প্রশাসনের পক্ষ থেকে শরণার্থীদের প্রেরণ করা হয় ম্যালেরিয়াপ্রবণ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, দণ্ডকারণ্য, নৈনিতাল ও মরিচঝাঁপিতে।[৬]

---

[১] ১৯৫১-১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু-সংখ্যা বৃদ্ধির একটি সারণি উপস্থাপিত হলো –

বছর	পশ্চিমবঙ্গের মোট শহুরে জনসংখ্যা	শহরের উদ্বাস্তু জনসংখ্যা	পশ্চিমবঙ্গের মোট শহুরে জনসংখ্যার তুলনায় শহরের উদ্বাস্তু জনসংখ্যার শতাংশ হার
১৯৫১	৬২৮১৬৪২	১০৫২১২১	১৬.৭৪%
১৯৬১	৮৫৪০৮৪২	১৫৬১৫৩০	১৮.২৮%
১৯৭১	১০৯৬৭০৩৩	২৭২৪৯৩৬	২৪.৪৮%

[উদ্ধৃত : শিবাজীপ্রতিম বসু, 'ছিন্নমূল রাজনীতির উৎস সন্ধানে', সেমন্তী ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশভাগ : স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১]

[২] দেশভাগের দরুন ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আগত শরণার্থীরা 'মুহাজির' নামে আখ্যায়িত হয়।

[৩] ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে ডা. বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্বগ্রহণ করেন। কিছুদিন পর নেহেরু এক পত্রে (২৫ আগস্ট ১৯৪৮) তাঁকে সতর্ক করেন – "প্রথম থেকেই আমি অত্যন্ত নিশ্চিত যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা প্রতিহত করার জন্য সবকিছু করা উচিত। যদি তা ব্যাপক আকারে সংঘটিত হয় তাহলে তা হবে প্রথম বড় ধরনের দুর্যোগ।... যুদ্ধ হলেও আমি শেষপর্যন্ত দেশান্তর গমন প্রতিরোধ করব।" (উদ্ধৃত : জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪)

[৪] অশ্রুকুমার সিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

[৫] দ্রষ্টব্য : জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

[৬] (ক) আন্দামান দ্বীপে শরণার্থীদের প্রেরণ প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার সিকদার জানিয়েছেন – 'মার্চ ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে এগারো শো বাঙালি উদ্বাস্তু পরিবারকে জাহাজযোগে আন্দামান পাঠানো হয়। এই পরিবারগুলির সবই ছিল তপশিলভুক্ত শ্রেণীর হিন্দু। সেই সময় জ্যোতি বসু, সোমনাথ লাহিড়ীরা বিক্ষোভ, সভা, মিছিল ও প্ররোচনামূলক প্রচার করতে থাকেন, উদ্বাস্তুদের

এমতাবস্থায় সরকারের সঙ্গে শরণার্থীদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠে উদ্বাস্তুরা অস্তিত্বরক্ষায় একত্র হয়। ১৯৫০ সালের ৪ জুন 'সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ' গঠিত হয়। পরিত্যক্ত ভূমিতে কলোনি স্থাপন এবং এর স্বীকৃতি আদায়ই ছিল সংগঠনটির লক্ষ্য। কমিউনিস্টরা নানাভাবে তাদের সহযোগিতা করে। ফলে উদ্বাস্তু যুবসম্প্রদায় কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিতে পরিণত হয়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনা থাকলেও, শরণার্থী সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে শক্তি অর্জনে সক্ষম হয়। '১৯৬৭ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের পাঁচজন লোকের মধ্যে একজন লোক ছিল উদ্বাস্তু অথবা সে উদ্বাস্তু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল। প্রায় এমন কোনো উদ্বাস্তু ক্যাম্প বা কলোনি কমিটি ছিল না যেখানে বাম দলগুলোর কেউ ছিল না।'[১] জমিমালিকদের লাঠিয়াল বাহিনীর আক্রমণ, পুলিশি হয়রানি এবং মামলার ঝুঁকি সত্ত্বেও গড়ে ওঠে হয় দেশবন্ধুনগর, যতীন দাস, শক্তিনগর, বিজয়নগর, বিবেকানন্দনগর, গান্ধিনগর, মিলনগর, কল্যাণগড় প্রভৃতি কলোনি। উদ্বাস্তুরা সামবায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করে এসব ক্যাম্প-কলোনি। নিজেদের প্রচেষ্টায় তারা স্থাপন করে স্কুল-বাজার; নিশ্চিত করে টিউবওয়েল, সেনিটেশন ও অন্যান্য সুবিধা। দেশত্যাগের যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিকে বিস্মৃত হতে-না-হতে অনেকে দিনমজুরি পেশায় নিযুক্ত হয়। ঘরের মেয়েরাও পরিবারের দুঃসময়ে উপার্জনমুখী হয়। কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন (১৯১১-১৯৮৭) ছিন্নমূল মানুষের জীবনযুদ্ধ এবং উদ্বাস্তু নারীদের বিস্ময়কর জাগরণ প্রত্যক্ষ করেছেন এভাবে :

> ক্যাম্পের সামনেই একটুখানি খালি জায়গা পেলেই তাতে তাঁরা লাউ-শিম লাগিয়েছেন, লঙ্কা-বেগুন ফলিয়েছেন এবং ওইটুকু ফসলই বাজারে নিয়ে বিক্রি করে রুজি বাড়িয়েছেন। খেটে-খাওয়া মানুষের বসে থাকার মতো বিড়ম্বনা আর কিছু নেই। দণ্ডকারণ্য এবং অন্যান্য অনেক জায়গায় এইসব কৃষিজীবী পরিবারদের পাঠানো হয়েছে। সেখানে তাঁরা অনেক দুর্ভোগের পর চাষিজীবন ফিরে পেয়েছেন। অনুর্বর জমিকে তাঁরা নিজেদের জীবনরস ঢেলে উর্বর করে ফসল ফলিয়েছেন।...

আন্দামানে পাঠানো চলবে না। সব শরণার্থীকে পশ্চিমবঙ্গেই পুনর্বাসিত করতে হবে।' (উদ্ধৃত : অশ্রুকুমার সিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭)

(খ) উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তৎকালীন সরকারের অত্যন্ত বিতর্কিত পরিকল্পনা ছিল দণ্ডকারণ্য প্রকল্প। 'উড়িষ্যা ও বিহার রাজ্যের কোরাপুট ও কালাহান্দি জেলা এবং মধ্য প্রদেশের বাস্তার জেলায় বিস্তৃত দণ্ডকারণ্যের অবস্থান ছিল নিচু মালভূমিতে। এর মাটি ছিল শুষ্ক ও অনুর্বর। এখানে আগে স্থায়ী কোনো জনবসতি ছিল না। এর অধিবাসীরা প্রধানত গোন্ড বনভূমির যাযাবর শ্রেণির লোক ছিল।... অনেকে পঞ্চাশের দশক থেকে 'ট্রানজিট ক্যাম্পে' অবস্থান করে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এখন তাদেরকেই প্রলোভিত করে, ধমক দিয়ে বা জোর করে দূরবর্তী এলাকা দণ্ডকারণ্যে যেতে বাধ্য করা হয়।' (উদ্ধৃত : জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৩)

[১] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮

ছোটো ছোটো মেয়েরা পর্যন্ত স্টেশন থেকে একলা ওঠানামা করছে, নিজের কাজে একলা যাচ্ছে – একটুও ভয়ডর নেই। দেশে থাকলে বোধ হয় এত দ্রুত ও সহজে এরা জীবনের হাল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো না। শুধু নিজের জীবনের কেন – ওইসব মেয়েরা শক্ত হাতে পরিবারের হাল পর্যন্ত ধরেছে এবং নিজের জীবনের কথাটা আলাদা করে ভাবতেও ভুলে গেছে। আজ আর এরা ভেসে আসা মানুষ নেই। পশ্চিমবঙ্গের অল্পপরিসর জায়গায় বিশাল জনসমুদ্রে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গের এইসব মেয়েরা শিক্ষিকা, নার্স, কেরানি – কোন কাজে নেই ? বরং পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের তুলনায় এরাই সম্ভবত রুজির ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ।[১]

সাতচল্লিশের পর পশ্চিমবঙ্গে আরম্ভ হয় তীব্র খাদ্যসংকট। যেসব জমিতে ধান উৎপন্ন হতো, তার অধিকাংশ তখন পূর্ববাংলার অধীনে। এর প্রভাবে কলকাতায় চালের দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। দেশভাগের ফলে পাটকলগুলো পশ্চিমবাংলার অধিকারে থাকলেও, পাটের জমির মালিকানা পায় পূর্ববাংলা। কাঁচামালের চাহিদা পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে উচ্চমূল্যে পাট আমদানি করতে হয় পূর্ববাংলা থেকে। তাই এ শিল্প মারাত্মক লোকসানের মুখে পড়ে; চামড়া এবং কাগজ শিল্পেরও একই দশা। পণ্যের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে অভাবনীয় হারে বাড়তে থাকে বাড়িভাড়া; বাসযোগ্য জমি থেকে যায় মধ্যবিত্তের ক্রয়সীমার বাইরে। জনশক্তির আধিক্যে চাকরিপ্রাপ্তির স্থানগুলো সংকুচিত হয়ে আসে; বেকারত্বের অভিশাপে দিশেহারা হয়ে পড়ে শিক্ষিত যুবশ্রেণি। এছাড়া ঘুষ, দুর্নীতি এবং চোরাকারবারে দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হতে থাকে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে রাজনৈতিক অঙ্গনও ঘোলাটে হয়ে যায়। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি নাথুরামের নিক্ষিপ্ত বুলেটের আঘাতে প্রাণ হারান ভারতের অবিসংবাদিত নেতা মহাত্মা গান্ধী। একই বছর কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়; পরবর্তীকালে হাইকোর্টের রায়ে দলটি রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পায় (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০)। ১৯৫২ সালে তারা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রভাবশালী বিরোধী দলে পরিণত হয়। দেশে খাদ্যের হাহাকারের পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থী দলগুলোর সমন্বয়ে পরিচালিত হয় 'খাদ্য-আন্দোলন' (১৯৫৯)। গণমুখী সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করায় কমিউনিস্ট পার্টির জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হয় এবং ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সাতচল্লিশ-পরবর্তী কলকাতায় নানা অসঙ্গতি এবং সীমাহীন দুর্ভোগের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *সুনন্দর জার্নালে*। 'দুর্দিনের ছায়া' শিরোনামে তিনি লেখেন :

রেশনের চালে দুর্গন্ধ, ক্বচিৎ ময়দা পাওয়া গেলে তা অখাদ্য, গমও যে খুব উঁচু দরের জোর করে তা বলার জো নেই। বাজারের পচা মাছের সমারোহ, এমন কদর্য অপরিচিত বিকট সব মাছ কলকাতার বাজারে যে কোথা থেকে আসে, তা নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। সরষের তেল পুনরপি নিরুদ্দিষ্ট, ডাল আবার উধাও হতে শুরু, প্রত্যেকটি জিনিস –

[১] উদ্ধৃত : দেবব্রত ঘোষ, *দেশভাগ ও স্বাধীনতা*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ২৫৪

> ... আমাদের প্রত্যেকটি দিনের চাইতে পরের দিনটি কঠোরতম হয়ে উঠেছে। সীমান্তে আপাতত আমাদের যুদ্ধ নেই বটে কিন্তু চারিদিক ঘিরে দুর্মূল্যতা, অনিশ্চয়তা আর তিক্ততার নিঃশব্দ যুদ্ধ ছিন্ন-বিদীর্ণ করে দিচ্ছে আমাদের স্নায়ুকে।[১]

বিভাগোত্তর পর্যায়ে পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। কলকাতার সঙ্গে বরাবরই বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সহজ সম্পর্ক বজায় ছিল। দেশভাগের পর উত্তরবঙ্গ দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয় এবং পরিণত হয় অবহেলিত, অনগ্রসর ভূখণ্ডে। এ জনপদের ব্যস্ত রেলস্টেশনগুলো হারাতে থাকে চিরচেনা জৌলুশ :

> পাবনার মেয়ে হামিদা খানম, খ্যাতনামা অধ্যাপিকা, বিলেত থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছেন দেশে – নবগঠিত পাকিস্তানে, ঢাকা যাওয়ার পথে ঈশ্বরদী স্টেশনে তাঁর অপেক্ষার এক অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : 'স্টেশন একেবারে ফাঁকা। দু'চারজন যাত্রী এদিক-ওদিক অপেক্ষা করছে। আসাম মেইল, দার্জিলিং মেইল এ লাইন দিয়ে এখন আর যায় না। যাত্রীদের ছোটাছুটি, মিষ্টিওয়ালার মাথায় কাচের বাক্সভরা মিষ্টি, সোরাবজির তকমাপরা চায়ের ট্রে হাতে বেয়ারাদের দ্রুত চলাফেরা, লাল কোর্তা কুলিদের দৌড়াদৌড়ি – এসব দৃশ্য আর দেখা যায় না। আমার আশৈশব পরিচিত নানা মানুষের ভিড়ে-ভরা ঈশ্বরদী যেন নিরাভরণ বিষণ্ণ। আমি কুলিকে মালপত্রগুলো প্লাটফর্মে রাখতে বলে আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমের দরজা একটু ঠেললাম। নির্জন ঘরে বড় বড় ভারী চেয়ার-টেবিলগুলো আলো-আঁধারে কেমন ভূতুড়ে দেখাচ্ছিল। ফিরে এসে আমার মালের ওপর একটু ঠেস দিয়ে বসলাম। যতোদূর চোখ যায় ফাঁকা রেললাইন দিগন্তে মিশে গেছে। এ-দিগন্ত আর আমাদের জন্য খোলা নেই। পথ কেটে ছোট করে দেয়া হয়েছে এ-ধারের মানুষের সীমানা।[২]

পূর্ববাংলায় উদ্বাস্তুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হলেও, কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার কারণে শুরু হয় খাদ্যসংকট। কিন্তু ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ না করে, উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলোতে 'কর্ডন প্রথা' প্রবর্তন করা হয়; পরিণামে ১৯৫১ সালে দুর্ভিক্ষ চরমে ওঠে। লক্ষণীয় যে, বাঙালিরা সম্পদবঞ্চিত হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পপুঁজি দ্রুত বিকশিত হয়। তদুপরি করাচি, ইসলামাবাদ প্রভৃতি শহরে 'বিদেশী দূতাবাসগুলি নিজেদের কর্মচারীদের বাসস্থান এবং দপ্তরের জন্য বাড়ী ভাড়া নিল এবং ঐসব দফতরে চাকুরী দিল তাদেরই ভাই-বেরাদারদের অনেককে। ... যে সব সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য মধ্যবিত্ত সমাজ হিন্দু আর শিখদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল পাকিস্তান অর্জনের পর তারা তাই পেয়েছে। তাই স্বাধীনতর স্বাদ তারা উপভোগ করেছে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে।'[৩] অপরদিকে দারিদ্র্য, বন্যা, মহামারি এবং খাজনার নিপীড়ন – বাঙালির জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তোলে।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সুনন্দর জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

[২] মফিদুল হক, *দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

[৩] কামরুদ্দীন আহ্মদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ইনসাইড লাইব্রেরি, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৩৮৩, পৃ. ১৭০

ক্রমেই তারা মুসলিম লীগ সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার মানুষ পাকিস্তানি সরকারের প্রতি সে-অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগ এবং কৃষক-প্রজা পার্টির সমন্বয়ে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। সোহ্‌রওয়ার্দী হন এ সংগঠনের সভাপতি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে এবং মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু দু-মাসের মধ্যেই গভর্নরের শাসন জারি করে পতন ঘটানো হয় নব্য মন্ত্রিসভার। শুধু তাই নয়, গৃহবন্দি করা হয় এ. কে. ফজলুল হককে এবং অসুস্থ অবস্থায় সোহ্‌রাওয়ার্দীকে চলে যেতে হয় সুইজারল্যান্ডে। ১৯৬৪ সালে মুসলিম লীগের 'কাশ্মীর দিবস' ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।[১] *দেশ* পত্রিকায় (২৫ জানুয়ারি ১৯৬৪) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ অবিবেচক কর্মকাণ্ডের প্রতি ধিক্কার জানান – 'কাশ্মীরে পবিত্র কেশ চুরি গেল, সেখানকার হিন্দু, মুসলিম, শিখ একসঙ্গে হাহাকার করে উঠল, অথচ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হল খুলনার সংখ্যালঘুদের।... হবুচন্দ্রের আইনকানুন এখনো একেবারে বাতিল হয়ে যায়নি।'[২] পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণি এসময় 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করে এবং শাসকগোষ্ঠীর অপতৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরের All Pakistan National conference-এ শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয়-দফা দাবি উত্থাপন করেন। স্বায়ত্তশাসন, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ছিল ছয়-দফার মূল বক্তব্য। শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' নামক মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে। একইসঙ্গে সরকার ভারতীয় গ্রন্থ আমদানি নিষিদ্ধ করে এবং বেতার-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন 'নতুন অচলায়তন' (৮ জুলাই ১৯৬৭)। এ নিবন্ধে তিনি নিপীড়িত-বাঙালির অন্তরে আশা সঞ্চারের প্রয়াস করেন –

[১] ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার কারণ প্রসঙ্গে জানা যায় – 'কাশ্মীরে হজরতবাল মসজিদে নবীর পবিত্র কেশ চুরি যাওয়ার গুজব ওঠে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে। এই সংবাদে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতন হয়। তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতেও গোলমাল বাধে।' (উদ্ধৃত : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কপাল পোড়ানো আগুন', *সুনন্দর জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮)

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

পূর্ব পাকিস্তান বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ। কারণ, তাতে হিন্দু সংস্কৃতির গন্ধ আছে।... রবীন্দ্রনাথ জাতি-ধর্ম-ন্যাশনালিজম্ – সব কিছুর সংকীর্ণ হিংস্রতার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন – এইটেই কি তাঁকে নিষিদ্ধ করবার মূল কারণ ?...

কিন্তু দরজা বন্ধ করলেও কি সূর্য উঠবে না ? পদ্মার স্রোত কি উল্‌টো মুখে বইতে থাকবে ?

লিখতে লিখতে আজকের কাগজ এল। 'বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ করায় ঢাকায় প্রতিবাদ-মিছিল – পুলিসের লাঠি চালনা – পূর্ববঙ্গ উতরোল –'

না – ইতিহাসের গতি বন্ধ হয় না। পদ্মার স্রোতও কখনো উজানে বইবে না।'[১]

১৯৬৯ সালে দুর্বার গণসংগ্রামে সন্ত্রস্ত-সরকার অতঃপর প্রত্যাহার করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং মুক্তি প্রদান করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দিকে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। এরপরও সামরিক সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে দীর্ঘসূত্রিতার আশ্রয় নেয়। এসব ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন বাঙালির মুক্তির বাণী – 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে পূর্ব পাকিস্তানে আরম্ভ হয় অসহযোগ আন্দোলন। এর প্রতিক্রিয়ায় কুচক্রী পাকিস্তান সরকার ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে এক ভয়াবহ গণহত্যা শুরু করে; ঐ রাতেই গ্রেপ্তার হন ৭০-এর নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানি বাহিনীর অতর্কিত হামলায় অসহায় নগরবাসী নিরাপত্তার সন্ধানে গ্রামে পাড়ি জমায়, পাশাপাশি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেয় লক্ষ লক্ষ শরণার্থী। এরই সমান্তরালে পাকিস্তানের বর্বরোচিত হামলা প্রতিহত করতে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিকসহ সকলের অংশগ্রহণের ফলে বাঙালি সফল প্রতিরোধে সক্ষম হয়। অবশেষে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি অর্জন করে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র – বাংলাদেশ।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নতুন অচলায়তন', *সুনন্দর জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫-২৫৬

তৃতীয় অধ্যায় : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ : সমাজ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন একজন সমাজ-সচেতন শিল্পী। শিল্পসাহিত্যচর্চার মাধ্যমে তিনি পালন করেছেন সামাজিক দায়িত্ব। সমকালীন জীবন, সমাজ ও রাজনীতি ছিল তাঁর গল্পরচনার প্রেরণাস্থল। সামাজিক মানুষ, তার মনস্তত্ত্ব, ভালো-মন্দ, জীবনধারণ ও জীবনধারণা বরাবরই ছিল তাঁর কৌতূহলের বিষয়। জীবনের প্রতি অপার কৌতূহল ও দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি শিল্পরচনায় প্রণোদিত হয়েছেন। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> বাংলাদেশের মফস্বলে আমি ছিলাম, সত্যিকারের বাঙালীকে দু চোখ ভরে দেখবার সুযোগ আমার ঘটেছে। বাবা গ্রামাঞ্চলে খাজনা আদায় করতে গেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে গেছি। দেখেছি, অনেক সময় খাজনা আদায় দূরে থাক, বুভুক্ষু কৃষককে কাছারীতে ডেকে শেষে চাল দিয়ে বিদায় করতে হয়েছে; দেখেছি, এমন মানুষকে বছরের তিন মাস পর্যন্ত যার খোরাক থাকে – বাকী ন' মাস সে কেমন করে বাঁচে তা স্বয়ং ভগবানও জানেন না; দেখেছি সাঁওতালদের – বুনো শুয়োরেরও অখাদ্য বাঘা ওল সেদ্ধ করে বিনা লবণে খেয়ে যাদের বেঁচে থাকতে হয়। নিজের চোখে না দেখলে জানতেও পারতাম না – সোনার বাংলার আসল চেহারাটা কী ?[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মহামারি-মন্বন্তর, দাঙ্গা-দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে যে রূপ-রূপান্তর সাধিত হয়, তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক-প্রতিভা বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়। এই কালপর্বে চিরায়ত মানব-সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠে, ভেঙে পড়ে পরিবার-সমাজের চিরায়ত বন্ধন। জমিদার, মহাজন এবং ক্ষমতাবানদের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে জনজীবন। প্রতিকূল এবং বৈরী সমাজব্যবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে নরনারীর প্রেম ও দাম্পত্যজীবন। শুধু শহর-গ্রাম নয়, অরণ্য পরিবেষ্টিত পাহাড়ি জনপদ এবং দুর্গম নদী-সন্নিহিত মানুষগুলো সমাজপতিদের হিংস্রতার শিকার হয়। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, কালোবাজারি ও নারীনির্যাতন পরিণত হয় সামাজিক ব্যাধিতে। অভাব-অনটনের কাছে মূল্যবোধ হারিয়ে মধ্যবিত্তের একটি অংশ যুক্ত হয় অপরাধকর্মে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সমাজজীবনে বিচরণশীল বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে নারায়ণের ছোটগল্পে। বিশেষত উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্ত-অন্তর্গত মানুষের জীবনযাপনের বিভিন্নমাত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর ছোটগল্পে অসাধারণ তাৎপর্যসহ উপস্থাপিত হয়েছে।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শিল্পীর স্বাধীনতা', *অগ্রন্থিত রচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

মধ্যবিত্ত সমাজ

মধ্যবিত্ত জনমানসের স্বরূপ উন্মোচনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। এ শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-ব্যর্থতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, বেদনা-বিলাপের পাশাপাশি তিনি এদের নৈতিক অবক্ষয়, ভঙ্গুর মূল্যবোধ এবং স্বার্থান্ধতার চিত্রাঙ্কন করেছেন। তাঁর 'চারতলা', 'টোপ', 'ফলশ্রুতি', 'হাঁস', 'প্রতিনায়ক', 'রেকর্ড', 'দাম', 'রসিকতা', 'রাণীর গল্প', 'তমস্বিনী', 'হলদে চিঠি', 'মশা', 'আরো একজন', 'মোহীনের কাকা' প্রভৃতি গল্পে মধ্যবিত্ত-জীবনাচার পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় এসব গল্পের অধিকাংশ চরিত্র সংগ্রামলিপ্ত। এ যুদ্ধে কেউ বিজয়ী হয়েছে, কেউ মেনে নিয়েছে সহজ-পরাজয়। ব্যক্তিজীবনে নানা উত্থান-পতন থাকলেও, দেশের অধিকাংশ প্রগতিশীল আন্দোলনে মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ ছিল আশাসঞ্চারী। 'প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য' প্রবন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জাতির সংকটকালে মধ্যবিত্তের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেছেন :

> এ সত্যকে ভুললে চলবে না যে, এখনো আমাদের দেশে মধ্যবিত্তই বিপ্লবের মশালচি। ঐতিহাসিকভাবে যেদিন তার প্রয়োজন থাকবে না ভারতবর্ষ সেদিনটি থেকে এখনো অনেক দূরে আছে। এই মধ্যবিত্ত শক্তির সীমা এখনো ভবিষ্যতে অনেকখানি পর্যন্ত প্রসারিত, গণবিপ্লবের সম্পূর্ণ ভূমিকা এখনো রচিত হয়নি এই শক্তির পূর্ণ-বিক্ষোভে। কিছুদিন আগেও বাংলাদেশের যে কৃষক অভ্যুত্থান তার পূর্ণতা পেল না, তারও অন্যতম, হয়তো প্রধানতম কারণ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকখানি বিরোধিতা। আজ কেন মধ্যে মধ্যে এমন এক-একটা সিদ্ধান্তের আভাস পাই যে মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে লিখলেই তা গণবিমুখ হয়ে যাবে ?[১]

বাংলা গল্প-বিচিত্রা গ্রন্থেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মধ্যবিত্তকে চিহ্নিত করেছেন সমাজ-বিনির্মাণের অংশীদার হিসেবে :

> বিনাশের পরেই নবজন্ম আছে। মার্কসবাদ বলে, ত্রিশঙ্কু মধ্যবিত্তের দৃষ্টি যতই ঊর্ধ্বলোকের দিকে অসম্ভবের দুরাশায় নিবদ্ধ থাক, শেষ পর্যন্ত ক্রান্তি-লগ্নে এই মূল্যহীন অপসঞ্জাত শ্রেণীকে নিচের মাটিতেই আশ্রয় নিতে হবে – সামিল হতে হবে সংগ্রামী জনগণের সঙ্গে।[২]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মধ্যবিত্তের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য থাকলেও '১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার নেতৃত্বকে বৃত্তকেন্দ্র থেকে চ্যুত হতে দেখে।... অন্যদিকে ঘনায়মান গণবিক্ষোভ,

---

[১] ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত), *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৫৪৭

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্প-বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

প্রতিরোধের তরঙ্গমালা – এই উভয় সংঘটনায় ভঙ্গুর হয়ে ওঠে মধ্যবিত্তের চিন্তাজগৎ, তার মূল্যবোধের ললিত-কর্ষিত রূপটিতে দেখা দেয় ভ্রষ্টতা, বিশৃঙ্খলা।'[১] নারায়ণের গল্পেও মধ্যবিত্ত সর্বদা সুপথে পরিচালিত হয়নি, স্বার্থরক্ষায় অনেকে স্বশ্রেণির ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। শিক্ষিত এই শ্রেণি সম্পদ-অর্জন এবং রক্ষায় প্রায়শ আপসকামী। অবশ্য এটিই তাদের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য :

> মধ্যবিত্তের প্রধান অবলম্বন বুদ্ধি ও বিদ্যা অর্জনে বা সংরক্ষণে তাদেরকে শ্রেণীগতভাবে বিপ্লবী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় না। এদেশে এ শ্রেণীর ভূমিকা প্রধানত সুবিধাবাদী। শক্তির পক্ষে অবস্থান গ্রহণই সাধারণভাবে এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পরিস্থিতি অনুযায়ী এদেরকে প্রগতি অথবা প্রতিক্রিয়ার পক্ষে অবস্থান নিতে দেখা যায়। এরা সুযোগসন্ধানীও। বিত্তবানের জীবনমান ও জৌলুস এদেরকে নিরন্তর প্রলুব্ধ করে। অনেকেই উচ্চভিলাষের শিকার হয়ে বিত্তবান-শ্রেণীতে উত্তরণ-প্রয়াসে লিপ্ত, কেউ কেউ এ প্রয়াসে বিবেক-মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অনেকে আবার আশানুরূপ বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জন করতে না পেরে ব্যর্থতা ও হতাশাবোধে আক্রান্ত। সাধারণভাবে এদেরকে মূলশূন্য পরনির্ভর বা পরামুখাপেক্ষী শ্রেণী আখ্যায়িত করা অসঙ্গত নয়।[২]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চারতলা'[৩] গল্পে প্রগতিপন্থী এবং প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব প্রকটিত হয়েছে। এ গল্পে 'দৈনিক অগ্নিহোত্রী' পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর নিরঞ্জন চ্যাটার্জি। 'অগ্নিহোত্রী' কেবল বাংলা নয়, ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র; এর সম্পাদকীয় নিবন্ধের ওপর গড়ে ওঠে দেশের জনমত। যে কোনো নেতার ক্ষমতা-অর্জন কিংবা ক্ষমতাচ্যুতি – অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে এ পত্রিকা। একদিন নিরঞ্জন যখন অফিসে সিগারেট খাচ্ছিল, সেসময় তার চোখে পড়ে একটি পরিত্যক্ত বিড়ি। এজন্য অধীন সাব-এডিটরদের প্রতি সে ক্ষিপ্ত হয়। অবশ্য এ দৃশ্য পরক্ষণে তাকে অতীতচারী করে তোলে।

সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের পুরাতন মেসে নিরঞ্জনের যৌবনের কিছু সময় অতিবাহিত হয়। দ্বিপ্রহরেও তার মেসটি থাকতো অন্ধকারাচ্ছন্ন, দরজা ব্যতীত প্রতিটি দেয়াল ছিল নোনাধরা। এ ঘরেই নিরঞ্জনের সঙ্গে বসবাস করে আরও চার-পাঁচজন যুবক। এদের সকলের নেশা ও পেশা সাংবাদিকতা। প্রত্যেকের চাঁদায় আড্ডার বন্দোবস্ত হয় – চা, সস্তা বিস্কুট এবং চার পয়সার বিড়ি। তাদের পত্রিকার প্রতি অক্ষরে সঞ্চারিত হয় 'বিদ্রোহী যৌবনের বিপ্লবী আগ্নেয় মন্ত্র'। নিরঞ্জন ছিল পত্রিকার পাবলিসিটি ম্যানেজার। প্রবল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পত্রিকার আশানুরূপ

---

[১] বেগম আকতার কামাল, *বিশ্বযুদ্ধ, জীবন ও কথাশিল্প*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪০৭, পৃ. ২৩

[২] মুহম্মদ ইদরিস আলী, *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ৩৩-৩৪

[৩] এ পরিচ্ছেদের আলোচনায় গল্পগ্রন্থ-অন্তর্গত গল্পসমূহের প্রকাশকালের ক্রম অনুসৃত হয়েছে।

কাটতি না দেখে সে নিরাশ হয়। তবে সম্পাদক শশধর তাকে আশ্বস্ত করে বলে – 'আজকের সাতাশখানা বিক্রি একদিন সাতাশ হাজারে নিশ্চয় গিয়ে দাঁড়াবে। এত বড় সত্যটাকে দেশের লোক গ্রহণ করতে পারবে না, একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।'[১]

দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ ছিল শশধরের। তার দেশপ্রেমের মধ্যে ছিল আবেগ, নিষ্ঠা ও সাধনার সমন্বয়। একদিন পুলিশের সঙ্গে বন্দুক-যুদ্ধে শশধরের মৃত্যু হয়। এরপর বন্ধ হয়ে যায় বিপ্লবী পত্রিকা, বন্দি হয় শ্যামানন্দ, শ্রীপতি এবং অজয়। অথচ সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকায় নিরঞ্জন মুক্তি পায়। এ পর্বে দালালির চেষ্টায় সে ফটকা বাজারে ঘুরতে থাকে। হ্যারিসন রোডের একটি চায়ের দোকানে দু-তিনজন যুবক তাকে পুনরায় 'অগ্নিহোত্রী' প্রকাশের তাগিদ দেয়। নিরঞ্জন আর্থিক-সংকট উত্থাপন করলে, তারা নিজেরাই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। এদের মধ্যে প্রবীর তাকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে :

> এটা তো বুঝতে পারছেন, গরম গরম রাজনীতির যুগ চলে গেছে ? বোমা পিস্তলের পথে অত সহজে স্বাধীনতা আসবে না। এখন পিপ্‌লের ভেতরে কাজ করতে হবে। রাজনীতির আদর্শ বদলে যাচ্ছে, দেশ এগোচ্ছে সত্যিকারের বিপ্লবের পথে। 'অগ্নিহোত্রী'ই বা পিছিয়ে পড়বে কেন ?[২]

পুনরায় মহাবিপ্লবের বাণী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'অগ্নিহোত্রী'। নব্য সদস্যরা ধনীপুত্র না হলেও, সাধ্যানুযায়ী অর্থসংগ্রহ করে। তাদের আহবানে এগিয়ে আসে কুলি, মজুর, কেরানি এবং দেশের লাঞ্ছিত গণমানুষ। সর্বহারাদের রক্তরাঙা মর্মকাহিনি প্রচার করে 'অগ্নিহোত্রী' অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে। এরমধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহের কারণে পাঁচশো টাকা জরিমানা হলে পত্রিকার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিছুদিন পর একই অভিযোগে দশ হাজার টাকা জামানত এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়। পত্রিকার দুর্দিনে প্রবীর পুনরায় শ্রমিক শ্রেণির শরণাপন্ন হয়। কেউ দান করে এক দিনের মজুরি, কেউ উৎসর্গ করে অত্যন্ত শখের আংটি। এতৎসত্ত্বেও পত্রিকাটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়। এসময় পত্রিকা অফিসে আগমন ঘটে এক প্রসিদ্ধ ধনপতির, যার অপকর্মের বিরুদ্ধে এতদিন সোচ্চার থেকেছে 'অগ্নিহোত্রী'। সম্পাদকের উদ্দেশে লোকটি পরিবেশন করে উদ্দীপ্ত শব্দাবলি :

> অত সত্যের গোঁড়ামি নিয়ে কাগজ চালাতে পারবেন না, পলিটিক্স তো নয়ই। আরে মশাই, দেনার দায়ে যদি কাগজই আপনার উঠে যায়, তা হলে সত্যের সেবা করবার সুযোগ পাবেন কোথায় ?... আর কিন্তু কিন্তু করবেন না। আপনারা

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'চারতলা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৪২০, পৃ. ৩৭০

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১

ছেলেমানুষ, বয়স কম। আপনাদের মতো রাজনীতি এককালে আমরাও ঢের করেছি, জানলেন ? তার চেয়ে পথে আসুন। আমার কথা শুনুন – সব দিক দিয়ে ভালোই হবে –[১]

এ ধনকুবেরের অর্থের মোহে নিরঞ্জন বিসর্জন দেয় তার বিপ্লবীসত্তা। প্রবীর তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে তিরস্কার করে – 'এ কাগজের যোগ্য নন আপনি। সুবিধাবাদীদের জায়গা নেই এখানে। এ সর্বহারার কাগজ, এ দেশের লাঞ্ছিত মানুষের কাগজ।'[২] কিন্তু নিরঞ্জনের অর্থ ও দাপটের কাছে হার মানে প্রবীর এবং স্ব-উদ্যোগে সে আরেকটি পত্রিকা বের করে। কিন্তু দিনে দিনে প্রবীরের পত্রিকা গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে 'অগ্নিহোত্রী'র প্রচার ও প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। মধ্যবিত্তসুলভ আপসকামিতার কারণে দুবার বিএ ফেল এবং দশ টাকার টিউশনি খুঁজে বেড়ানো নিরঞ্জন অগাধ প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। স্বল্পকাল ব্যবধানে সে বালিগঞ্জে জমি ক্রয় করে, অন্যদিকে বস্তির ভগ্নগৃহে দিনযাপন করে প্রবীর। ব্যাংকে নিরঞ্জনের সঞ্চয় ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও, প্রবীরের মুমূর্ষুদশায় চিকিৎসা ও ঔষধের সংস্থান হয় না। জীবনভর নীতি-আদর্শের মন্ত্র উচ্চারণ করে অবক্ষয়দীর্ণ সমাজের কাছে এভাবেই প্রবীর পরাজয় বরণ করে।

এরপর 'দৈনিক অগ্নিহোত্রী' রাজনৈতিক অঙ্গনে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। পত্রিকার ধনী পৃষ্ঠপোষককে নির্বাচনে বিজয়ী করতে নিরঞ্জন উদ্যোগী হয়। এ-পর্যায়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আরেক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। নিরঞ্জনের পছন্দের প্রার্থীকে সে রাজনীতিতে 'dead man' আখ্যায়িত করে। জনতার 'স্রেফ ডাল-ভাতের সমস্যার সমাধানে' প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এ নেতা সংবাদপত্রের সমর্থন প্রত্যাশা করে। বিনিময়ে নিরঞ্জনের জন্য প্রেরিত হয় নতুন গাড়ি।

নিরঞ্জনের চারতলা অফিসের নিচে কর্দমাক্ত বস্তি। একসময় জরাজীর্ণ মেসে দিন কাটালেও, এখন বস্তিতে যাওয়ার সাহস তার হয় না। কারণ – 'ওখানে ছড়িয়ে আছে শশধর আর প্রবীরের রক্ত – ওখানে চিৎকার করে কাঁদছে প্রবীরের বিধবা মা আর শশধরের বিধবা স্ত্রী; কিন্তু এখানে বক্তৃতা – এখানে অ্যাসেম্বলি।'[৩] 'দৈনিক অগ্নিহোত্রী'র সংবাদ-কর্মীদের মধ্যে নিরঞ্জনই একমাত্র দলছুট। সাংবাদিক হিসেবে সে আদর্শচালিত হয়নি, হয়েছে স্বার্থতাড়িত। এ গল্পে তার সমস্ত চিন্তা-চেতনা অসুস্থ এবং অপরিচ্ছন্ন। মূলত শশধর কিংবা প্রবীরের আত্মত্যাগের বিপরীতে নিরঞ্জনের সুবিধাভোগী মানসিকতার নগ্ন-বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'চারতলা' গল্পে।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫

উচ্চবিত্তের স্বেচ্ছাচারিতা এবং মধ্যবিত্তের চাটুকারবৃত্তি একই সমান্তরালে চিত্রিত হয়েছে 'টোপ'[১] গল্পে। পার্সেল-যোগে বাঘের চামড়ার এক জোড়া জুতা পেয়ে গল্পকথক অত্যন্ত আবেগায়িত হন। এ জুতা তাঁকে পাঠিয়েছেন রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাবাহাদুর এন. আর. চৌধুরী। এ-এস্টেটে চাকরি করতেন গল্পকথকের এক সহপাঠী। সে-সূত্রে রাজাবাহাদুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উচ্চবিত্তের পর্যায়ে নিজেকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা মধ্যবিত্তের স্বভাবজাত। গল্পকথকের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা ছিল অদম্য। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম সাক্ষাতের পরই তিনি রাজাবাহাদুরের সঙ্গে সম্পর্ক-উন্নয়নের চেষ্টা চালান। এমনকি রাজাবাহাদুরের জন্মদিনে তিনি কবি ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা নকল করে তাঁর গুণকীর্তন করেন অবলীলায়। রাজাবাহাদুর খুশি হয়ে তাঁকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেন, এবং সামান্য উপলক্ষ্যে উপহার দেন স্বর্ণের হাতঘড়ি। সুবিধাপ্রিয় গল্পকথকও জমিদারকে অকুণ্ঠিতচিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বন্ধুরা বিষয়টিকে মোসাহেবি বললেও তাঁর ধারণা, এ-মন্তব্য ওদের ঈর্ষাজাত। তিনি বিশ্বাস করেন – 'নৌকা বাঁধতে হলে বড় গাছ দেখে বাঁধাই ভালো, অন্তত ছোটখাটো ঝড়-ঝাপটার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।'[২] নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে হলেও তিনি তাই অর্জন করতে চান সামাজিক মর্যাদা ও যশোগৌরব।

রাজাবাহাদুর শিকারের আমন্ত্রণ জানালে গল্পকথক নির্দ্বিধায় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। নির্ধারিত দিন একটি ছোটো স্টেশনে জমিদারের কর্মচারী তাঁকে স্বাগত জানায়। এরপর একটি রোলস্ রয়েস গাড়িতে তাঁরা এগিয়ে চলেন আরণ্যক পরিবেশে। কাঠের দোতলা বাড়ির সম্মুখে গাড়িটি থামলে, দু-তিনজন চাপরাশি ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। স্বয়ং রাজাবাহাদুর তাঁর সম্মানে বারান্দায় অপেক্ষা করেন। বিনীত শ্রদ্ধায় ও মৃদুহাস্যে গল্পকথক জমিদারের অভিবাদনের জবাব দেন।

পরিশ্রান্ত অতিথিকে স্নানঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজাবাহাদুর কর্মচারীকে নির্দেশ দেন। অরণ্যের নির্জনতায় স্নানের নিখুঁত আয়োজনে গল্পকথক বিস্মিত হন। তাঁর সৌজন্যে নাস্তার টেবিলে পরিবেশিত হয় হরেক পদের খাবার। রাজাবাহাদুর এক টুকরো রুটি, একটি ফল আর চা ব্যতীত কিছুই গ্রহণ না করলেও গল্পকথক গোগ্রাসে খাবার গলাধঃকরণ করতে থাকেন। এ-পর্যায়ে তাঁদের কথোপকথনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে দুজনের শ্রেণিগত অবস্থান :

– আচ্ছা বলতে পারেন, আপনি রাজা নন কেন ?

[১] টোপ' *স্বাধীনতা* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫৩) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, টোপ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭১

এরকম একটা প্রশ্ন করলে বোকার মতো দাঁত বের করে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। আমিও তাই করলাম।

– বলতে পারলেন না ?

– না।

– আপনি মানুষ মারতে পারেন ?

এ আবার কী রকম কথা ! আমার আতঙ্ক জাগল।

– না।

– তা হলে বলতে পারবেন না। ইউ আর অ্যাব্সোলিউট্লি হোপলেস।[১]

রাজাবাহাদুর এন. আর. চৌধুরীর ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সারি-সারি আগ্নেয়াস্ত্র, তাঁর বীরকীর্তির প্রভূত নিদর্শন : বিভিন্ন বন্য প্রাণির চামড়া এবং মাথা। প্রাতরাশের পর তিনি বারান্দায় বসে মদ্যপান করেন এবং অল্পসময়ের মধ্যে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। গল্পকথক ভাবেন – 'রাজা-রাজড়ার ব্যাপার – সবই অলৌকিক। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউটের বাচ্চা।'[২]

রাতে গল্পকথক প্রথম শিকারের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। মোটরের তীব্র হেডলাইট জ্বলে ওঠে নিস্তব্ধ কালো অরণ্যে। ইঞ্জিনের ওপর রাইফেল রেখে সজাগ দৃষ্টি রাখেন রাজাবাহাদুর। মাঝরাতের পর কেবল একটি হায়েনা শিকার করতে তিনি সক্ষম হন। কিন্তু শিকারলব্ধ এই প্রাণীর প্রতি রাজাবাহাদুরের কোনো আগ্রহই দেখা যায় না। অন্যদিকে দিবালোকে শতচেষ্টায় বনমুরগি ব্যতীত কিছুই মেলে না।

অবশ্য পশুনিধনের ব্যাপারে গল্পকথক তেমন উৎসাহী নন। শিকারের নেপথ্যে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে তিনি বরং উপভোগ করেন বিলাসবহুল-জীবন। এ ধরনের অভিজাত পরিবেশ, ভোজন কিংবা শয়নক্ষেত্র তার কল্পনাতীত। অন্যদিকে তিন দিন বাঘের সন্ধান না পেয়ে রাজাবাহাদুর আক্রোশে ফেটে পড়েন। জমিদারের অনুগ্রহ অমূল্য হলেও, চতুর্থ দিন গল্পকথক কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছাপোষণ করেন। কিন্তু রাজাবাহাদুর বাঘ শিকারের আগে তাঁকে বিদায় জানাতে চান না।

জমিদারের বাংলোর তিন-চারশো ফুট নিচে বিস্তীর্ণ অরণ্য। গল্পকথককে জানানো হয় – 'ওটি বড় সুবিধের জায়গা নয়। টেরাইয়ের ওয়ান্ অব্ দি ফিয়ার্সেস্ট্ ফরেস্ট্স্। একেবারে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্ব।'[৩]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৬

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৪

কোনো শিকারির বন্দুক সেখানে পৌঁছায়নি, তবে রাজাবাহাদুর মাঝেমধ্যে টোপ দিয়ে মাছ ধরেন। বিষয়টি গল্পকথকের কাছে রহস্যজনক মনে হয়।

গভীর রাতে কথককে ডাকা হয় শিকার-দর্শনের জন্য। বাংলোর পেছনে শূন্যের ওপর রয়েছে একটি প্রশস্ত সাঁকো। এখানে দুজন বেয়ারা কপিকলের সাহায্যে একটি পুঁটলি নামাচ্ছে – এটি হচ্ছে রাজাবাহাদুরের টোপ। মৃদু জ্যোৎস্নায় গল্পকথক পুঁটলির মধ্যে জীবন্ত প্রাণির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রাজাবাহাদুরের হুইস্কি আর ম্যানিলা চুরুটের গন্ধে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তিনি। অকস্মাৎ শোনা যায় রাইফেলের বিকট শব্দ এবং বাঘের গর্জন। টর্চের আলোয় গল্পকথক দেখতে পান – টোপের সঙ্গে ঝুলে আছে একটি প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গল। হঠাৎ একটি মানবশিশুর আর্তনাদে তাঁর ঘোর কাটে। উদ্ভ্রান্তের মতো তিনি চিৎকার করে ওঠেন – 'রাজাবাহাদুর, কিসের টোপ আপনার ! কী দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন ?'[১] বুকে রাইফেল ঠেকিয়ে রাজাবাহাদুর তাঁর কণ্ঠরোধ করেন। এন. আর. চৌধুরীর জমিদারি রক্তে কোনো মায়া-মমতা নেই। বনের শিকারে ব্যর্থ হয়ে তিনি কর্মচারীর সন্তানকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেন। এভাবে 'বিলাসের নামে, শিকারের আনন্দের নামে ছোট শিশুকে বাঘ ধরার টোপ করা এবং উল্লাসের জীবন-যাপন – এও এক সর্বহারা শ্রেণীর ওপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকার চাপানোর দিক, জমিদারি আভিজাত্যের এ এক বিকৃত আদিম বৃত্তির প্রকাশ।'[২]

আটমাস পর রাজাবাহাদুর কর্তৃক প্রেরিত উপহৃত জুতোজোড়া মধ্যবিত্ত কথকের কাছে 'অতি মনোরম' প্রতিপন্ন হয়। তিনি অনুভব করেন পাদুকা জোড়া যেমন নরম, তেমনি আরামদায়ক। সামন্তশ্রেণি এভাবে তাদের শোষণ-প্রক্রিয়াকে বৈধ করতে নিত্যনতুন টোপে দোদুল্যমান মধ্যবিত্তকে বশে এনেছে। সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর' গল্পের সুবিধাপ্রিয় এবং বিশ্বাসভঙ্গকারী সঞ্জয়ের সঙ্গে এ গল্পের কথক-চরিত্রটি তুলনীয়। কেননা 'নিজের শ্রেণি চরিত্র অব্যর্থভাবে প্রকাশ করেছে গল্পকথক। সে ভয়ানক অপরাধ সংঘটিত হতে দেখেছে কিন্তু না দেখার ভান করেছে পরে। ... শুধু রাজাবাহাদুরের দানবিক চরিত্র নয় গল্পকথকের মেরুদণ্ডহীন ক্লীবতাকেও তীরবিদ্ধ করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।'[৩]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮২

[২] বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

[৩] গোপাদত্ত ভৌমিক, 'ক্ষোভ-ঘৃণা-ভৎর্সনা-জুগুপ্সার শতসঞ্চারী : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পভুবন', উত্তম পুরকাইত (সম্পাদিত), *উজাগর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনস্তত্ত্ব-নিরূপণে একটি সার্থক ছোটগল্প 'ফলশ্রুতি'[১]। রাজগীর ভ্রমণকালে ভুল ট্রেনে উঠে পড়েন গল্পকথক এবং তাঁর স্ত্রী অনু। আকস্মিক বিপত্তিতে টিকিট-পরিদর্শক তাঁদের বিহার থেকে ট্রেন পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়। অনুর কাছে বিষয়টি লঘু হলেও, কথকের মনে বিরাজ করে চাপা উৎকণ্ঠা। শান্তিপ্রিয় এ ভদ্রলোক সর্বদা নিরাপদ গণ্ডিতে থাকতে পছন্দ করেন। বিশ্ব-পরিভ্রমণের বাসনা থাকলেও তাঁর সাহস হয় না। চলন্ত ট্রেনে স্ত্রীর নানামাত্রিক উচ্ছ্বাসেও তিনি নিস্পৃহ থাকেন। অনুর অ্যাডভেঞ্চার-ভাবনা তাঁকে রোমাঞ্চিত করে না, বরং সংক্ষুব্ধ করে। যদিও সাংসারিক অশান্তিরোধে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক নিজেকে সংযত রাখেন – 'মুখে যা এসেছিল ভাষায় তা প্রকাশ করা গেল না। দাম্পত্যকলহের কাব্য-মাধুরী যাই থাক, বাস্তব জীবনে ওটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। সুতরাং নীরবে হোল্ড্ অল জড়াতে লেগে গেলাম।'[২]

রাতে রাজগীর স্টেশনে পৌঁছে তাঁরা তাঁদের বোঝা বহনের জন্য কোনো কুলির সন্ধান পান না। এমতাবস্থায় এক তরুণী এবং প্রৌঢ়া নারী তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। স্টেশনে এরা বিশেষ কারো জন্য প্রতীক্ষা করছিল। গল্পকথক রাত্রিযাপনের জন্য নিকটবর্তী কোনো ধর্মশালার সন্ধান চাইলে, মেয়েটি তাঁদের নিজগৃহে আমন্ত্রণ জানায়। অচেনা মেয়েটির আতিথ্যে নাগরিক-দম্পতি উৎসাহিত বোধ করেন না। তবু উপায়ান্তর না দেখে তাঁরা মেয়েটির প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। চলার পথে ভীতসন্ত্রস্ত অনু স্বামীর হাত আঁকড়ে ধরে, সন্দেহগ্রস্ততায় আচ্ছন্ন হয় তার দেহমন। রেললাইন এবং বুনো আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে তাঁরা প্রবেশ করেন একটি জীর্ণ গৃহে। আবাসস্থলটি তাঁদের সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে অনেকটাই বেমানান। ইতোমধ্যে জানা যায়, মেয়েটির নাম নিরু। অন্যদিকে নিরুও কথকের সাহিত্যিক-পরিচয় জানতে পারে। চা-পাপর পরিবেশনের পর নিরু তাদের কুণ্ডস্নানের প্রস্তাব দেয়। ততক্ষণে নিরুকে দেখে মধ্যবিত্ত কথকের সৌন্দর্যভাবনায় চিড় ধরে। কারণ –

> মেয়েটি সুন্দরী নয় – বরং কুৎসিতের সীমানা ঘেঁষেই চলেছে ! রং ময়লা, মুখখানা অসম্ভব লম্বা, হাসলে খানিকটা বিবর্ণ মাড়ি বেরিয়ে পড়ে অসঙ্গতভাবে। যৌবনের লাবণ্য স্বাভাবিকভাবে যতটুকু আলো ছড়িয়েছে, কোনোখানে তার বেশি এতটুকুও চোখে পড়ল না। শুধু প্রসন্ন উজ্জ্বলতায় বুদ্ধিমার্জিত দৃষ্টিটা তার জ্বলজ্বল করছিল।[৩]

---

[১] 'ফলশ্রুতি' *পূর্বাশা* পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় (১৩৫৩) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ফলশ্রুতি', *শ্রেষ্ঠ গল্প* (অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত), প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, দশম মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪০৮, পৃ. ৭৫

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

কুণ্ডের উত্তপ্ত নীল জলে অতিথিদের সমস্ত অবসাদ দূর হয়। ভালোলাগার চমৎকার অনুভূতিতে পুলকিত হয় অনু। স্নানশেষে নিরুর মা তাঁদের জন্য আয়োজন করে মুগ ডালের খিঁচুড়ি এবং দু-তিন পদের ভাজা। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে ভোজন করেন শাহরিক দম্পতি। ভোরে নিরুর ডাকে তাঁদের ঘুম ভাঙে। কলকাতাগামী ট্রেনের সময় আসন্ন, তাই স্বল্প সময়ের মধ্যে নিরু নাস্তা প্রস্তুত করে এবং অতিথিদের আরেকটি দিন রাজগীর অবস্থানের অনুরোধ করে। পূর্বপরিচয় না থাকলেও নিরু এবং তার মা এই দম্পতিকে তাদের সামর্থ্যানুযায়ী পরিচর্যার চেষ্টা করে। অবশেষে বিদায়বেলায় নিরু তাঁদের কল্যাণচিন্তায় এই বলে সতর্ক করে যে, 'এদিকে আজকাল কলেরা শুরু হচ্ছে, বাজারে পুরি-টুরী কিছু খাবেন না কিন্তু।'[১] বিদায়ের পর গল্পকথকের স্মরণ হয় নিরুকে ধন্যবাদ পর্যন্ত জানানো হয়নি। অপরদিকে তাঁর স্ত্রী অনুর সন্দেহপ্রবণ দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে অসূয়া-বিদ্বেষ। স্বামীর কাছে সে বর্ণনা করে তার সন্দেহের ফিরিস্তি :

> বিয়ে হয়েছে বললে, অথচ কপালে সিঁদুর নেই, হাতে শাঁখা নেই কেন ? ওর মা – সেই বিচ্ছিরি বুড়িটা রাত্তিরে কপকপ করে কতগুলো খিঁচুড়ি গিললে, কোনো বিধবা রাত্তিরে অমন করে খায় কখনো ? তা ছাড়া অজানা অচেনা লোককে স্টেশন থেকে ডেকে আনে, বাড়িতে আশ্রয় দেয়, অথচ কোনো পুরুষ অভিভাবক নেই – বুঝতে পারছ না ?[২]

গল্পকথক তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর বক্তব্য সমর্থন করেন এবং বিস্মৃত হন আশ্রয়দাত্রী এই পরিবারের অবদান। অনুর সমর্থনে তিনি উচ্চারণ করেন অশালীন মন্তব্য। তাঁদের মনে হয় – 'আর একটা দিন রাখতে পারলে বেশ ফাঁদে ফেলতে পারত।'[৩] প্রকৃতপক্ষে এ গল্পে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের 'সংকীর্ণ নীতিজ্ঞানশাসিত ভদ্রয়ানার ওপর স্রষ্টার চাবুকটা মর্মবিদারী হয়ে উঠেছে।'[৪] বিপদে বিনয়ী হলেও এরা মূলত স্বভাবে অকৃতজ্ঞ। উদার অভ্যর্থনার 'ফলশ্রুতি'তে নিরুর প্রকৃত প্রাপ্তিই গল্পকার এখানে নির্ণয় করেছেন।

সততা এবং আদর্শনিষ্ঠাকে দূরে ঠেলে বিত্তবৈভবের উত্তাল স্রোতে গা ভাসানোর নাম জীবন নয়। কিন্তু মধ্যবিত্তের একটি অংশ এমন হীনপন্থায় অর্জন করতে চায় বৈষয়িক সমৃদ্ধি। শেকড়কে অস্বীকার করে নাগরিক ভোগবিলাসে মত্ত থাকবার আকাঙ্ক্ষা তাদের জীবনকে কীরূপ বিপর্যস্ত ও সংকটময় করে তোলে, তারই বিশ্বস্ত ভাষ্য 'হাঁস'[৫]। এ গল্পে বীরেশ্বর এবং রজত প্রাক্তন সহপাঠী, কলেজের হোস্টেলে তারা একত্রে দিনযাপন

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] উদ্ধৃত : (ভূমিকা : জগদীশ ভট্টাচার্য), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[৫] 'হাঁস' *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৫৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

করেছে। দুজনই 'সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে।'[১] একসঙ্গে বিএ ফেল করে রজত সাধারণ চাকুরিজীবী এবং বীরেশ্বর অগাধ সম্পদের অধিকারী। তবে বীরেশ্বরের সমৃদ্ধি স্বাভাবিক পন্থায় হয়নি। নীতি-আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে সে অর্থ উপার্জন করেছে। কালো এবং রুগ্‌ণ চেহারার মনীষা মিত্র ছিল তার বৈষয়িক উত্তরণের প্রথম সিঁড়ি। অসুন্দরী হলেও মনীষা ধনী পরিবারের মেয়ে, এজন্য বীরেশ্বর তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে। বোনকে সুখী করতে অশোক মিত্র তাকে চল্লিশ হাজার টাকা দেয়, এবং সম্মত হয় যৌথ ব্যবসায়ে। এভাবে ভাগ্য ফেরে বীরেশ্বরের। হঠাৎ ব্যবসায় গুটিয়ে সে পাড়ি জমায় বোম্বাই শহরে। বীরেশ্বরের বিরহে মনীষার উন্মাদদশা হলেও বিশ্বাসঘাতক বীরেশ্বরের মধ্যে কোনো বিকার দেখা যায় না, বরং সে নিজেকে নিরপরাধ ভাবে।

মনীষার পর বীরেশ্বরের ছলনার শিকার হয় শোভনা চক্রবর্তী। মনীষার মতো সে দুর্বলচিত্তের নারী নয়। বীরেশ্বরকে সে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। 'মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের সমস্ত অতৃপ্ত কামনার সঞ্চিত লোভগুলোর পরিপূর্ণ সুযোগ'[২] নেয় বীরেশ্বর। বিলাতি হোটেল, নাইট ক্লাব, দামি খাবার এবং মদ্যপানে সে তাকে ভুলিয়ে রাখে। অবশেষে প্রেমিকাকে সে অর্পণ করে এক দুশ্চরিত্র মাড়োয়ারির কাছে। এতদিনের বিনিয়োগকৃত অর্থ সে উঠিয়ে নেয় সুদাসলে। শোভনার পর বীরেশ্বরের দৃষ্টি পড়ে মঞ্জু দত্তের ওপর। এ নারীর সৌন্দর্যের মাধ্যমে সে রায়বাহাদুরকে বশীভূত করতে চায়। কিন্তু কোনো প্রকারে সে মেয়েটির নাগাল পায় না।

বীরেশ্বর চরিত্রের বহুগামিতা 'হাঁস' গল্পে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়নি। জলসা নামক গ্রামে রজতের সঙ্গে শিকারকালে তথ্যগুলো পরিবেশিত হয়েছে। শিকারপদ্ধতি ভিন্ন হলেও বীরেশ্বরের কাছে পাখি এবং নারী একই। ক্যাঁটকেঁটিয়া, দীঘালি, সরালি, জলপিপি, চীনে হাঁস – এসব পক্ষীকুলের সঙ্গে মনীষা মিত্র, শোভনা চক্রবর্তী, সুরমা রায় কিংবা মঞ্জু দত্তের প্রভেদ তার নিকট গুণগত নয়, পরিমাণগত। রজতকে সে বলেছে – 'আধ সের মাংস আর একটা মোটা টাকার চেক, একই প্রয়োজনের দুটো রূপ।'[৩] এ অঞ্চলে পাখি শিকারে বেশ সাফল্য পায় বীরেশ্বর। নতুন কেনা বি-এস-এ বন্দুকে সে শিকার করে বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস। এতৎসত্ত্বেও তার তৃপ্তি মেটে না। সন্ধ্যাবেলা রজত বিরতি দিলেও, লালশর শিকারের লোভে সে বিভ্রান্ত হয়ে পথের দিকনিশানা হারিয়ে ফেলে। একপর্যায়ে সে চৈতন্য হারিয়ে ফেলে। চৈতন্য হারানোর প্রাকপর্যায়ে লালশরের কলরবের মধ্যে সে শুনতে পায় মঞ্জু দত্তের হাস্যধ্বনি :

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হাঁস', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৩

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৪

> ঘাসবনের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে-থাকা বীরেশ্বরের দেহটাকে নিয়ে সারারাত নাচতে লাগল আলেয়া, – হাঁসের ডাক প্রহরের পর প্রহর ধরে প্রেত-অন্ধকারটাকে মুখর করে রাখল মঞ্জু দত্তের উচ্ছলিত হাসির মতো।[১]

বীরেশ্বরের চাহিদা ছিল অপরিমিত, কিন্তু শক্তি ছিল সীমিত। শক্তির এ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সে ক্রমশ সর্বনাশের দিকে পা বাড়াতে থাকে। অন্যায়ের যে একটি সীমা রয়েছে এবং শক্তিধর মানুষও যে এক-পর্যায়ে চরম অসহায়, তা বীরেশ্বরের করুণদশাই প্রমাণ করে। এ গল্পে বীরেশ্বর মধ্যবিত্তসুলভ বিত্তপরিসর ভাঙতে যে পথ অবলম্বন করেছে তা অনৈতিক। অন্যদিকে তার বন্ধু রজতের জীবনযাপন মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডলে হলেও, স্বার্থপরতার কলঙ্ক তার চরিত্রে দাগ কাটেনি। বরং তার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে ইতিবাচক গুণাবলি। বীরেশ্বরের নিষ্ঠুর মানসিকতাকে সে ঘৃণা করেছে, লিপ্ত থেকেছে বাদানুবাদে। শিকারকালে সে বন্ধুকে একাধিকবার সাবধান করেছে – 'শুধু টাকা টাকা করেই গেলে।'[২] যদিও এ সতর্কবার্তার মধ্যে বীরেশ্বর প্রত্যক্ষ করেছে শ্রেণিগত সংকীর্ণতা :

> বস্তুতান্ত্রিকের দরবারে চিরপরিচিত অভিযোগ। আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ মনে হয়, কিন্তু বীরেশ্বর জানে এর পিছনে লুকিয়ে আছে একটা তীক্ষ্ণ, সূচীমুখ। টাকা করতে না পারার পেছনে মহত্ত্ব নেই, আছে অযোগ্যতা। প্রাকটিক্যাল না হতে পারার অক্ষমতার ওপর মানুষ চড়িয়েছে দার্শনিকতার রঙ, ঘুষ খেতে না পারার ভীরুতাকে স্বর্গীয় করে তুলেছে নীতিকথার নামাবলী জড়িয়ে। রজতও এর ব্যতিক্রম নয়।[৩]

মধ্যবিত্তের পলায়ন-প্রবৃত্তি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রতিনায়ক'[৪] গল্পের প্লট। দশ বছর পর প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে গল্পকথকের সাক্ষাৎ হয়। মেয়েটি তখন ক্যান্সারে আক্রান্ত। তার স্বামী সাধারণ চাকরি করলেও চিকিৎসার ত্রুটি করেনি। তবু অজস্র পরীক্ষাশেষে ডাক্তাররা ক্যান্সারের অবস্থান নির্ণয়ে ব্যর্থ হন। যন্ত্রণা-জর্জরিত জীবন থেকে মুক্তিলাভের জন্য মেয়েটি তার কাছে পটাশিয়াম সায়ানাইড, স্ট্রিকনিন কিংবা বেলেডোনা এনে দেবার জন্য অনুরোধ করে। শহরের বড় কেমিস্টের দোকানে চাকরি করলেও এ-আত্মঘাতী প্রস্তাবে সায় দিতে পারে না গল্পকথক।

গল্পকথকের পিছুটানের স্বভাব আকস্মিক নয়। দশ বছর পূর্বে এই মেয়েটি পরিবারের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে পালিয়ে আসে তার কাছে। কারণ গল্পকথককেই সে মনে করতো তার জীবনতরীর স্বপ্নকাণ্ডারী। স্টিমার ঘাটে

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৭

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] 'প্রতিনায়ক' *আনন্দবাজার* পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় (১৩৬১) প্রথম প্রকাশিত হয়।

যাওয়ার পথে মেয়েটির স্বজনরা গতিরোধ করলে গল্পকথক চম্পট দেয়। অবধারিতভাবে মেয়েটির বিয়ে ভেঙে যায় এবং এ কলঙ্ক তাকে বহন করতে হয় বছরের পর বছর। অবশেষে সংসার শুরু করলেও সেখানে আঘাত হানে মরণব্যাধি ক্যান্সার।

গল্পকথক নিশ্চিত যে, মেয়েটি তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। লজ্জায় সে স্থানত্যাগের প্রস্তুতি নিলে হঠাৎ গৃহকর্তা উপস্থিত হয়। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে জানায়, স্ত্রীর রোগটি ক্যান্সার নয়। তার বিলাতি ডিগ্রিধারী ডাক্তার-বন্ধু চিকিৎসার সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এছাড়া পরবর্তী মাস থেকে তার বেতন পঞ্চাশ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুখ-সংবাদে মেয়েটির দু-চোখ বন্ধ হয়ে আসে, প্রবল উত্তেজনায় তার স্বামী দক্ষিণের জানালা খুলে দেয়। বিকেলের আলো-বাতাসে ঘরটি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমন নির্মল আলোকচ্ছটা গল্পকথকের সহ্য হয় না। তাই সে দ্রুত প্রস্থান করে। মেয়েটির প্রথম জীবনের নায়ক থেকে গল্পকথক এভাবে নেমে আসে প্রতিনায়কের পর্যায়ে।

এ গল্পে লেখক মধ্যবিত্তের দোদুল্যচিত্ততাকে কটাক্ষ করেছেন। গল্পের শুরু থেকে শেষাবধি কথক-চরিত্র নিরাপদে থাকবার চেষ্টা করেছে। প্রেমিকা তাকে বিশ্বাস করে ঘর ছাড়লেও, সে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থেকেছে। স্বার্থচিন্তায় নিবিষ্ট থাকলেও গল্পকথক জীবনযুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত। জীবিকার তাগিদে চাকরির পাশাপাশি তাকে টিউশনি করতে হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তার শরীরের ভগ্নদশা। গল্পশেষে মেয়েটি যখন আগামীর সুখ-স্বপ্নে বিভোর, গল্পকথক তখন চরম হতাশায় বিপর্যস্ত। ব্যর্থতাই হয়ে উঠেছে তার জীবনের বিধিলিপি।

মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপড়েনের খণ্ডিত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'রেকর্ড'[১] গল্পে। মধ্যবিত্তের সাধ আছে, কিন্তু রয়েছে সাধ্যের সংকট। তাদের আকাঙ্ক্ষা যদিও সামান্য, তবু তা পূরণ হয় না আর্থিক দৈন্যদশার কারণে। তাই ব্যক্তিগত শখ বাস্তবায়ন করতে তারা অনেকক্ষেত্রে কৌশলের আশ্রয় নেয়। এ গল্পের কথক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। একটি বুককেস ক্রয়ের জন্য তিনি যান কলকাতার সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে। এ বাজারে কখনো লাভবান হওয়া যায়, আবার প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তৎসত্ত্বেও 'মধ্যবিত্তদের এখানে লটারীর টিকিটই কিনতে হয়।'[২]

'রেকর্ড' গল্পে শহরের 'ওপরতলার বাসিন্দা' ড. আইভি। এ ভদ্রমহিলা কথক-পত্নী করুণার বান্ধবী। ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ওপর তিনি ইউরোপে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বিয়ে করেছেন এক মারাঠি

[১] 'রেকর্ড' *ফসল* পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৬৬) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'রেকর্ড', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

প্রকৌশলীকে। করুণার সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে তিনি প্রায়ই ‘হরিজন পাড়া’য় আসেন। তৎকালীন উচ্চ-মধ্যবিত্তের একটি অংশ যে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার অনুকরণে নিজেদের আভিজাত্য প্রমাণে ব্যতিব্যস্ত থাকেন তা ড. আইভির জীবনাচরণসূত্রে এ-গল্পে পরিবেশন করেছেন গল্পকার। এ শ্রেণির আচারসর্বস্ব কর্মকাণ্ড এবং অন্ধ অনুকরণের প্রতি লেখক ব্যঙ্গ করেছেন। গল্পে সংগীত বিষয়ে আইভির মনগড়া বক্তব্য ইউরোপীয় উচ্চশিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকাশ করে।

আইভি মিথ্যা-আভিজাত্য এবং কৃত্রিমতাপ্রিয়। বান্ধবীর নিকট ব্যক্তিগত ব্যস্ততা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন – ‘অনেকক্ষণ এসেছি – ন্যান্সি ইজ্ ফিলিং ভেরি লোন্‌লি ! এ পুয়োর লিটল থিং শী ইজ !’[১] অল্পক্ষণে বোঝা যায়, ন্যান্সি তার দুহিতা নয়, পোষা কুকুরের নাম। করুণা তাঁর বান্ধবী সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন – ‘ইউরোপে গাছের তলায় তলায় ডক্টরেটের ডিপ্লোমা বিক্রী হয় শুনেছি। পাঁচ শিলিং কি সাত ফ্রাঙ্ক দিলে –।’[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেও বিদেশি ডিগ্রি-অর্জন প্রক্রিয়াকে অন্ধ-সমর্থন জানাননি। *সুনন্দর জার্নালে* তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ অভিমত এতৎপ্রসঙ্গে স্মরণীয় :

> লণ্ডন থেকে রাংতা কুড়িয়ে আনলেও ভারতবর্ষে তা ‘প্লাটিনাম’ হয়ে যাবে ? ‘ফোরেনে’র এমনি মহিমা যে স্থান পাত্র বিবেচনার দরকার নেই, গবেষণার বিষয়টা পর্যন্ত তলিয়ে দেখবার প্রয়োজন নেই, ডিগ্রীর পাশে ব্র্যাকেটে সেনিগেম্বিয়া কিংবা মাসাচুসেট্‌স গোছের একটা কিছু লেখা দেখলেই ‘পেয়েছি – পেয়েছি’ বলে উর্ধ্ব-বাহু নৃত্য শুরু করে দিতে হবে ? কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব বাছা বাছা ছাত্র রক্ত জল পরিশ্রমে সার্থক গবেষণা করলেন, গেঁয়ো যোগী বলে তাঁরা ‘ভিখ’ পাবেন না আর তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র যে – কোনো একটা ‘ফোরেনে’র জোরেই তাঁদের মাথার ওপরে চড়ে বসবে ?[৩]

‘দাম’[৪] গল্পে এক বক্তৃতাসর্বস্ব অধ্যাপকের অসংলগ্ন কর্মকাণ্ডের প্রতি বিদ্রূপ প্রদর্শিত হয়েছে। একইসঙ্গে একজন স্কুলশিক্ষকের সততা এবং কর্তব্যনিষ্ঠার কাছে তিনি কীরূপ ম্লান হতে পারেন, তাও নির্দিষ্ট হয়েছে। গল্পে সুকুমার একটি কলেজে বাংলার অধ্যাপক। সম্প্রতি লেখক হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন, যদিও উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা পাননি। স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের লেখা না পেয়ে একটি পত্রিকা তাঁকে অনুরোধ করে শৈশব-স্মৃতি বিষয়ক একটি গল্প দেয়ার জন্যে। সুকুমার তাঁর স্কুলের গণিত-শিক্ষকের চরিত্র অবলম্বনে একটি

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

[২] প্রাগুক্ত

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘ফোর এন’, *সুনন্দর জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

[৪] ‘দাম’ *তরুণের স্বপ্ন* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

স্মৃতিচারণধর্মী লেখা পাঠান। এ লেখায় তিনি শিক্ষাগুরুকে নিয়ে নানা কটূক্তি করেন। দুর্বল ছাত্রদের মাস্টারমশাই চপেটাঘাত করলেও, তাদের কান্না বারণ ছিল। চোখে জল দেখলে তিনি হুঙ্কার ছাড়তেন – 'পুরুষ মানুষ হয়ে অঙ্ক পারিসনে – তার উপর কাঁদতে লজ্জা করে না ? এখনি পা ধরে স্কুলের পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেব !'[১] স্মৃতিচারণের পাশাপাশি তিনি এ-লেখায় কিছু সদুপদেশ যুক্ত করেন। পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ এজন্য তাঁকে দশ টাকা সম্মানি দেয়। এর মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি কলেজ তাঁকে একটি অনুষ্ঠানের অতিথি নির্বাচন করে। এ ধরনের আমন্ত্রণের জন্য সর্বদা প্রতীক্ষা করেন অধ্যাপক সুকুমার। কারণ :

> এই সব উপলক্ষেই বিনাপয়সায় বেড়ানো যায়। তাছাড়া কলকাতা থেকে কেউ বাইরে গেলেই তার রাজোচিত সম্বর্ধনা মেলে – এখানকার চড়ুই পাখিও সেখানে রাজহংসের সম্মান পায়। কলকাতা থেকে দূরত্বটা যত বেশি হয়, আমাদের মতো নগণ্যের পক্ষে ততই সুখাবহ।
>
> আমি সুযোগটা ছাড়তে পারলুম না।[২]

এ কলেজের বার্ষিক উৎসবে অনেক ছাত্র সুকুমারের অটোগ্রাফ নেয়। রোমাঞ্চিত অধ্যাপক স্বাক্ষরের সঙ্গে বাণী বিতরণ করেন। মধ্যবিত্ত এ অধ্যাপক নিজেকে বাগ্মী প্রমাণিত করতে কপটতার আশ্রয় নেন। বক্তৃতাকালে তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে বারোটি উদ্ধৃতি দেন, অন্য একজনের মন্তব্য বানার্ড শ-র নামে চালিয়ে দেন। সবশেষে তরুণ ছাত্রদের উজ্জীবিত করতে তিনি টেবিলে প্রচণ্ড আঘাত করেন। অল্পের জন্য ফুলদানিটি রক্ষা পায়, দর্শকরা করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানায়। এরপর সুকুমার অসুস্থতার ভাণ করেন। এর উদ্দেশ্যও বোঝা যায় জনৈক শ্রোতার সবিস্ময় মন্তব্যে – 'শরীর ভালো নেই, তাতেই এইরকম বললেন স্যার ! শরীর ভালো থাকলে তো –।'[৩]

একটি নির্দিষ্ট বক্তৃতাই সুকুমারের সম্বল; যে কোনো আয়োজনে তিনি সেটিকে 'এদিক-ওদিক' করেন। অনুষ্ঠানশেষে সুকুমারের সঙ্গে সেই মাস্টারমশাইয়ের দেখা হয়; যাঁকে নিয়ে তিনি পত্রিকায় স্মৃতিচারণ করেছিলেন। অবসরগ্রহণের পর তিনি এ অঞ্চলে বসবাস করছেন। প্রাক্তন ছাত্রের বক্তৃতায় তিনি গর্বিত হন। এরপর জামার পকেট থেকে তিনি বের করেন একটি পুরাতন পত্রিকা। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে তিনি বলতে থাকেন :

> একদিন আমার ছেলে এইটে এনে আমাকে দেখালে। পড়ে আনন্দে আমার চোখে জল এল। কতকাল হয়ে গেল, তবু সুকুমার আমাকে মনে রেখেছে, আমাকে নিয়ে গল্প লিখেছে। সকলকে এই লেখা আমি দেখাই, বলি দেখো, আমার

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দাম', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

ছাত্র আমাকে অমর করে দিয়েছে।... দু-একজন বলে, যেমন ধরে ধরে মারতেন, তেমনি বেশ শুনিয়ে দিয়েছে আপনাকে। আমি বলি, শোনাবে কেন – কত শ্রদ্ধা নিয়ে লিখেছে। আর সত্যিই তো – অন্যায় যদি করেই থাকি, ওরা ছাত্র – ওরা সন্তান – বড় হলে সে অন্যায় আমার শুধরে দেবে বই কি। জানো সুকুমার, আনন্দে তোমাকে আমি একটা চিঠিও লিখেছিলুম। কিন্তু পাঠাতে সাহস হয় নি। তোমরা এখন বড় হয়ে গেছ – এখন –[১]

গল্পশেষে সুকুমারের মধ্যে শুভচিন্তার উদয় হয়। মাস্টারমশাইয়ের গণিত-শিক্ষাকে দশ টাকায় বিক্রয় করবার অপরাধে তিনি লজ্জিত হন। তবে তিনি বিশ্বাস করেন শিক্ষকের হৃদয় স্নেহ-মমতা-ক্ষমায় পরিপূর্ণ – 'যার দাম সংসারের সব ঐশ্বর্যের চাইতে বেশি; সেই ক্ষমা – কুবেরের ভাণ্ডারকে ধরে দিয়েও যা পাওয়া যায় না।'[২]

'দাম' গল্পের সুকুমারের মতো আরেকজন মলাট-পড়ুয়া সমালোচকের অসারতা প্রকাশ পেয়েছে 'রসিকতা' গল্পে। একটি গ্রন্থের আলোচনায় এ সমালোচক পত্রিকায় লেখেন – 'বিখ্যাত লেখকের নতুন উপন্যাস। যেমন কাহিনীর গতি তেমনি চরিত্র-চিত্রণ। উপন্যাসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহলকে সজাগ করে রাখে। যশস্বী লেখক এই বইতে নিজের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন।'[৩] তবে গল্পশেষে জানা যায় – আলোচ্য গ্রন্থটি উপন্যাস নয়, একটি 'ছোটগল্পের বই'।

'রাণীর গল্পে' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মধ্যবিত্তের প্রদর্শনী-মানসিকতার মুখোশ উন্মোচন করেছেন। এ গল্পে সীতাদের মহল্লায় ভাড়া বাসায় আসেন এক সম্ভ্রান্ত নারী। একটি বিশাল বাড়িতে তিনি একাকী বাস করেন। স্থানীয় লোকেরা তাকে রানি বলে সম্বোধন করে। তাঁর স্বামী এক মেমসাহেবকে বিয়ে করে বিলেতে থাকেন। মধ্যবয়সি হলেও সাজসজ্জার কারণে রানিকে যুবতী মনে হয়। রাতে উচ্চশব্দে তার ঘরে রেডিও চলে, প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত তিনি ইংরেজি গানে আত্মমগ্ন থাকেন। একদিন তিনি তাঁর মোটরগাড়িতে সীতাকে কলেজে পৌঁছে দেন। বান্ধবীরা এজন্য তাকে ঠাট্টা করে বলে – 'যাক, ভালো ঘাটেই নোঙর ফেলেছিস, তোর ভাবনা নেই।'[৪] এরপর রানি একাধিকবার গাড়িতে ওঠবার প্রস্তাব দিলেও সীতা এড়িয়ে যায়।

কিছুদিন পর স্থানীয় নারী সংগঠন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানের অর্থ-ঘাটতি পূরণের জন্য তারা রানিকে সভানেত্রী নির্বাচিত করে। সকলের অনুরোধে রানি ক্লাবে পদার্পণ করলে প্রদান করা হয় রাজকীয় সংবর্ধনা। পরিশেষে সদস্যরা তাঁর নিকট পাঁচশো টাকা দাবি করলে, তিনি চেকের পৃষ্ঠায় লেখেন পাঁচ হাজার

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

[২] প্রাগুক্ত

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'রসিকতা', *অগ্রন্থিত রচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'রাণীর গল্প', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

টাকা। এ ঘটনায় প্রত্যেকে বিস্মিত হয়। এরপর রানি অকস্মাৎ মেঝেতে পড়ে যান এবং রাতে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

রানির মৃত্যুর পর সকলে জানতে পারে তাঁর ব্যবহৃত মোটরগাড়ি, আসবাবপত্র, রেডিও – সবই ভাড়ায় চালিত, যদিও তিন মাস কেউ ভাড়া পায়নি। অর্থসংকটে তিনি এক মাস অনাহারে ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করলে দেখা যায়, হিসাবের খাতা শূন্য। সত্য প্রকাশের আশঙ্কায় এত দ্রুত তাঁর মৃত্যু হয়। মধ্যবিত্ত অনেকক্ষেত্রে ঋণ কিংবা প্রতারণার মাধ্যমে যে কৃত্রিম-আভিজাত্য প্রদর্শন করে, তা রানির জীবনযাপন ও পরিণামসূত্রে এ-গল্পে অঙ্কন করেছেন গল্পকার।

মধ্যবিত্ত পরিবারের চিরচেনা দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে 'তমস্বিনী'[১] গল্পে। ছুটির দিন গল্পকথক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় অতিবাহিত করেন। তাঁর আলোচনার বিষয় প্রধানত 'পরচর্চা'। একদিন কথকপত্নী মন্দিরে যাওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি এড়িয়ে যান। যদিও স্ত্রীর ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বরে তিনি সম্মানহানির ভয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন – 'সামলে নিয়ে বললুম, কিছু না – কিছু না। চলো – বেরুনো যাক।'[২] কালীঘাটে পূজা নিবেদনের পর ভদ্রমহিলা ভিক্ষুকদের অর্থ বিতরণ করেন। স্ত্রীর ভক্তি দেখে গল্পকথক ভাবেন – 'চাওয়া যেখানে অনন্ত, সেখানে মধ্যবিত্ত গৃহিণীর দাক্ষিণ্য কতক্ষণ চলে ?'[৩] মধ্যবিত্তের অনেকে সাংসারিক উন্নতিকল্পে পূজা-অর্চনা এবং দান-দক্ষিণায় বিশ্বাস করে। সামাজিক শোষণ-অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়ে তারা এভাবেই ভাগ্যপরিবর্তনে তৎপর থাকে।

এক মধ্যবিত্ত যুবকের হতাশার কাহিনি 'হলদে চিঠি'[৪]। সরকারি ডাকে একটি হলুদ খাম আসে অনিন্দ্যের ঠিকানায়, অথচ চিঠি পড়তে তার প্রবৃত্তি হয় না। কারণ এভাবে গত চার বছর অনেক পত্র এসেছে তার কাছে, যার সবই ছিল 'ইন্টারভিউয়ের প্রহসন'। কলকাতার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসে, অন্ধকার 'ঘুপচি ঘরে', দুপুর রোদে উত্তপ্ত টিনের তলায় সে অনেকবার ইন্টারভিউয়ের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু এবারের খামে রয়েছে সাউথ ইস্টার্ন রেলে কেরানি পদে নিয়োগপত্র। আশ্চর্যজনক সংবাদকে 'এপ্রিল ফুল' ভাবলেও চিঠিপ্রাপ্তির তারিখ দেখে

---

১ 'তমস্বিনী' *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৭০) প্রথম প্রকাশিত হয়।

২ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তমস্বিনী', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯

৩ প্রাগুক্ত

৪ 'হলদে চিঠি' *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৯) প্রথম প্রকাশিত হয়।

সে সংশয়মুক্ত হয়। এ চাকরি তার জন্য রীতিমতো 'মিরাকল'। খড়্গপুরের রেল অফিসে তিনটি পদের বিপরীতে প্রার্থী ছিল ষাটজন।

অনিন্দ্য চিঠিটি নিক্ষেপ করতে চায় বৌদির সামনে, যে প্রতিমুহূর্তে নানা কটূক্তিতে দুর্বিষহ করে তুলেছিল তার জীবন। এমনকি তার জ্যেষ্ঠ সহোদর ভাইও তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে। বিএ পাশের পর উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও ভাইয়ের বিরূপতায় সম্ভব হয়নি। এরপর অনিন্দ্য একটি স্কুলে অস্থায়ী ভিত্তিতে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছে, অবশিষ্ট সময় ব্যস্ত থেকেছে টিউশনি এবং চাকরির দরখাস্তে।

বন্ধু অমরেশের আড্ডায় অনিন্দ্যের চাকরিপ্রাপ্তির উচ্ছ্বাস কিছুটা স্তিমিত হয়। অমরেশ চাকরি করে না, পৈতৃক বাড়ির অর্ধেকাংশ ভাড়া দিয়ে উপন্যাস রচনা করে। কিন্তু তার উপন্যাসের কাটতি কম। এজন্য বাঙালি লেখক-পাঠকদের রুচিবোধ সম্পর্কে তার অভিযোগ বিস্তর। অমরেশের ধারণা, উচ্চমার্গীয় জীবনবোধ ও শিল্পকর্মের কারণে তার উপন্যাসের চাহিদা কম। বন্ধু মনোরঞ্জন পাঠক-রুচিকে প্রাধান্য দিয়ে উপন্যাস রচনা করতে বললে সে সাফ জানিয়ে দেয় :

> সেই একঘেয়ে মিড্‌লক্লাসিজ্‌ম্ – ওঃ হরিড্‌। ছাঁটাই – ইনক্রিমেন্ট – অভাবের ফিরিস্তি, ফাঁকে ফাঁকে মিনমিনে প্রেম, কখনো সেক্সের খোঁচা, ভাড়াটে বাড়ির একতলা, কল নিয়ে ঝগড়া আর এক আধ ডোজ সোশ্যালিজম পড়া যায় না।[১]

এ মূল্যায়ন অনিন্দ্যের জন্য নিঃসন্দেহে অপমানজনক। ইতঃপূর্বে কোনোদিন প্রতিবাদ না করলেও এ-পর্যায়ে নিজ শ্রেণির সম্মানরক্ষায় সে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়। তবু অনিন্দ্য উপলব্ধি করে – একদিন তার জীবনধারায়ও পরিবর্তন আসবে এবং –

> এই অফিস করতে করতে – এই কেরানীগিরির ধান্দায়, দিনের পর দিন তারও মনটা বিন্দু বিন্দু করে মরে আসবে ? কোনোমতে বেঁচে থাকা – একটা দিন কেটে গেলে আর একটা দিনের কথা ভাবতে থাকা – ইনক্রিমেন্টের চিন্তা, ছোটখাটো দাবিদাওয়া – এর ভেতরেই একটু একটু করে শুকিয়ে আসবে সে ? তখন কোথাও কোনো রং থাকবে না – রূপ থাকবে না – অমরেশের আধুনিক চিন্তার একটি বর্ণও তার মাথায় ঢুকবে না – কোনো জমাট গল্পওলা বাংলা উপন্যাস কোলের ওপর মেলে রেখে লোকাল ট্রেনের দোলায় দোলায় সে ঝিমুতে থাকবে ?[২]

অনিন্দ্যের স্মরণ হয় প্রতিবেশী হারাণবাবুকে, দশটা-পাঁচটার মধ্যে সীমাবদ্ধ যাঁর জীবন। কারণে-অকারণে তিনি সন্তানদের প্রহার করেন, স্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন কুৎসিত কলহে। সঙ্গত কারণে নিজেকে নিয়ে অনিন্দ্য

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হলদে চিঠি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬

একরাশ দুর্ভাবনায় নিমজ্জিত হয়। কেরানির ভঙ্গিতে এক লাফে ট্রামে উঠে সে নেমে পড়ে ফার্ন রোডে। চমকপ্রদ খবরটি সে জানাতে চায় একসময়ের সহকর্মী নমিতাকে। মেয়েটি একটি গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা। এই স্কুলে কিছুদিন চাকরি করেছে অনিন্দ্য। তখনই মেয়েটির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়, একসঙ্গে চা খায়, লেকের ধারে হাঁটতে যায় এবং সারাজীবন পথচলার স্বপ্ন দেখে।

একজন মধ্যবিত্ত নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে নমিতার মাধ্যমে। দেশভাগের পর ছোটোবোনকে নিয়ে শুরু হয় তার কঠিন জীবনসংগ্রাম। অনিন্দ্যর চাকরিলাভের সংবাদে প্রথমে আনন্দিত হলেও, কর্মস্থল খড়গপুর শুনে নমিতা হতাশ হয়ে পড়ে। কলকাতায় অবস্থান করা তার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা তিন মাস পরে অবসরে গেলে সে এ-পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হতে পারে। নমিতার সমস্যার কথা শোনার পর অনিন্দ্যের সমস্ত আনন্দ যেন মুহূর্তে উবে যায়। 'চাকরি-টাকা-স্বার্থ' – এই ত্রিধারায় স্বপ্নময় হলুদ খামটি তার কাছে হয়ে ওঠে বিষময়।

'মশা'[১] গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অপূর্ব একজন সাধারণ চাকরিজীবী। সংসার-খরচ, মায়ের অসুস্থতা এবং ভাইদের লেখাপড়ার ব্যয় মেটাতে সে দিশেহারা। উত্তর-পূর্ব কলকাতায় জলাশয় ভরাট করে যে উপশহর গড়ে উঠেছে, সেখানেই সে বসবাস করে। সন্ধ্যাবেলা অগুনতি মশার বিচরণ সেখানে। এজন্য অফিস-ছুটির পর সে বসে থাকে খোলা ময়দানে। অলস মুহূর্তে তার মনে পড়ে শ্যামপুকুর স্ট্রিটের শান্তাকে। শান্তার বাবা আরথ্রাইসিস রোগে আক্রান্ত। তার টিউশনির টাকায় চলে পুরো পরিবার। সংগীতপ্রতিভা থাকলেও 'পার্শিয়ালিটি' এবং সুপারিশের অভাবে মেয়েটি রেডিওতে সুযোগ পায়নি। একদিন রেস্তোরাঁর নিভৃত কেবিনে কথা হয় দুই জীবনসংগ্রামীর। এসময় অপূর্বের চোখে পড়ে শান্তার রুগ্‌ণ আঙুল, পুরাতন শাড়ি, মলিন ব্লাউজ এবং জীর্ণ হাতব্যাগ। অন্যদিকে অপূর্বের ছেঁড়া পাঞ্জাবিও শান্তার চোখ এড়ায় না। চার বছর ধরে শান্তাকে প্রেম নিবেদনের ইচ্ছা থাকলেও এখন পর্যন্ত বলতে পারেনি অপূর্ব। নিজ-নিজ পরিবারের ভবিষ্যতের প্রশ্নে এভাবেই বাধাপ্রাপ্ত হয় মধ্যবিত্ত নরনারীর সুখস্বপ্ন।

'আরো একজন'[২] গল্পে জীবনযুদ্ধে পরাজিত এক মধ্যবিত্তের আত্মপ্রত্যয়ের ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে। এ গল্পে লতিকা রূপসী হলেও বারবার সন্তান জন্মদানের কারণে সে রুগ্‌ণ ও হতশ্রী হয়ে পড়ে। স্ত্রীর শীর্ণ মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে মনোরঞ্জন নিজেকে অপরাধী ভাবে। হাসপাতালের ডাক্তার লতিকার রোগনির্ণয় করে বলেন –

[১] 'মশা' অমৃত পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১৩৭৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] 'আরো একজন' অমৃত পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় (১৩৭২) প্রথম প্রকাশিত হয়।

'অ্যানিমিয়া মশাই, শরীরে কিছু নেই।'[১] রোগীকে তিনি উত্তম আহার এবং দু-চার মাস বিশ্রামের পরামর্শ দেন। রেশনের ওপর নির্ভরশীল মনোরঞ্জন স্ত্রীর জন্য 'টনিক' আনতে চায়। কিন্তু নিজের শরীরের চেয়েও লতিকার কাছে গুরুত্ব পায় খুকির বেবি ফুড।

ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী, লতিকা স্বামীকে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যাপারে সচেতন করে – 'আজকাল তো নানারকম সব হচ্ছে, বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, কিছু করে নিলে হয় না ?'[২] অফিসের কাজে ব্যস্ত মনোরঞ্জন বিষযটি আমলে নেয়নি, ফলে পুনরায় সন্তানসম্ভবা হয় লতিকা। এ ব্যাপারে মনোরঞ্জন অসতর্কতা এবং দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিলেও স্ত্রীর অভিযোগ নেই। মূলত 'জীবনের কাছে ক্রমাগত মার খেয়ে লতিকা আর নালিশ করে না। দোষ কারোরই নয় – এ প্রতিদিনের পাওনা।'[৩]

অনুতপ্ত মনোরঞ্জন সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে সহকর্মী মৌলিকের শরণাপন্ন হয়। কলেজ-জীবনে প্রেমঘটিত ব্যর্থতার কারণে মৌলিক প্রচণ্ড নারীবিদ্বেষী। তবে বিয়ে না করেও সে আয়ত্ত করেছে দাম্পত্যজীবনের সকল রহস্য। সে মনোরঞ্জনকে পরিচিত গাইনোকলোজিস্টের সন্ধান দেয়। কিন্তু নাসিংহোমে এসে স্ত্রীর রক্তশূন্য চেহারা দেখে মনোরঞ্জন শঙ্কাবোধ করে। লতিকাও তাকে সাবধান করে – 'আমরা কি মানুষ খুন করতে যাচ্ছি না একটা ? ভগবান তো দেখছেন –।'[৪] ভগবানের নাম শুনে মনোরঞ্জন বিস্ফারিত হয় :

> 'ভগবান ! কচু!' – ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তার গলা দিয়ে এক টুকরো বিকট কটু স্বর বেরোল : 'আমাদের জন্যে তো ভাবনায় ভগবানের ঘুম হচ্ছে না। তাই ডজন দরে ছেলেপুলে পাঠিয়ে দিচ্ছে আমাদের ঘরে।[৫]

অধিক সন্তান মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য যথার্থই উদ্বেগের কারণ। তবুও ডাক্তারের কক্ষে প্রবেশকালে অমঙ্গল আশঙ্কায় লতিকা স্বামীর হাত আঁকড়ে ধরে। আসন্ন সন্তানকে হত্যা করে সে দীর্ঘায়ু লাভ করতে চায় না। স্ত্রীর ইচ্ছার কাছে মনোরঞ্জন হার মানে। অকস্মাৎ তার মনে হয়, লতিকার সন্তান বরাবরই মায়ের মতো সুন্দর হয়। আসন্ন সন্তানটি হতে পারে প্রতিভাধর দিকপাল, যে দূর করবে পিতামাতার সমস্ত দুঃখ-গ্লানি – এ ধরনের প্রত্যয়ে মনোরঞ্জন উদ্দীপ্ত হয়। পঞ্চম সন্তান 'আর একটা শনি' নয়, তার কাছে পরম সৌভাগ্যরূপে মূল্যায়িত হয়।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আরো একজন', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[৫] প্রাগুক্ত

স্বার্থরক্ষায় মধ্যবিত্ত কতটা হৃদয়হীন হতে পারে তার দৃষ্টান্ত 'মোহীনের কাকা'। এ গল্পে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত গল্পকথকের সঙ্গে পরিচয় হয় মোহীনের কাকার। তিনি এসেছেন মোহীনের জন্য পাত্রী দেখতে। সুশ্রী ও মেধাবী পাত্রীটি মোহীনের বন্ধুর বোন। মোহীনও অযোগ্য নয়, বিএ পাশ করে সে হেন্ডারসন কোম্পানিতে চাকরি করে।

অপরিচিত গল্পকথকের কাছে মোহীন সম্পর্কে লোকটি নানা অভিযোগ করেন। কোম্পানির বড়বাবু তার ভায়রা – এ সুবাদে মোহীনের চাকরি হলেও সম্প্রতি সে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ইউনিয়নের বিভিন্ন কার্যক্রমে সে সক্রিয় থাকে। একারণে তার বরখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মোহীনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তিনি মেয়েটির সর্বনাশ দেখতে চান না। প্রকৃতপক্ষে মোহীন সম্পর্কে এসব নেতিবাচক বক্তব্যের অন্তরালে তার মনে ছিল কুৎসিত বাসনা; যা তিনি বিবৃত করেন অবলীলায় – 'আমার পরিবার গেছেন প্রায় দু'বছর হল। সতী-লক্ষ্মী ছিলেন, ছেলে দুটোকেও বেশ করে রেখেই গেছেন। ভেবেছিলাম, নতুন করে আর সংসারধর্ম করব না। কিন্তু মেয়েটি বড় ভালো মশাই, হাতছাড়া করা যায় না।'[১]

কাণ্ডজ্ঞানশূন্য লোকটি মোহীনের পছন্দের পাত্রীকে নিজের জন্য নির্বাচন করেন। এ অপকর্মের সমর্থনে তিনি ব্যক্তিগত বিষয়সম্পত্তির ফিরিস্তি সামনে নিয়ে আসেন। কলকাতা শহরে তার চারটি বাড়ি এবং বড় কাপড়ের দোকান রয়েছে। সবকিছু জানার পর মোহীন বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে তিনি ওর চাকরিনাশের হুমকি দেন; এবং পাত্রীর পরিবারের সম্মতি আদায় করতে চান আর্থিক শক্তি প্রদর্শন করে :

> থাকবার মধ্যে বিধবা মা। মামাই সর্বেসর্বা আর ভাইটি তো মোহীনের দোস্ত... তাকে আর কে ধরছে বলুন ! আমি বিয়ে করব শুনলে ওর মামা লাফিয়ে উঠবে। সামান্য যদি গাঁইগুঁই করে শ' পাঁচেক টাকা হাতে গুঁজে দেব। তিনজন্মে একশো টাকা একসঙ্গে চোখে দেখেনি মশাই ![২]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ অনাচারকে গল্পে প্রশ্রয় দেননি। যাত্রীভর্তি ট্রেনে মোহীনকে না দেখে লোকটি উদ্বিগ্ন হয়। এ অবস্থায় গল্পকথক তার সঙ্গে ঠাট্টা করে – 'বোধ হয় টের পেয়েছে আপনি ওর মুখের গ্রাস কেড়ে খেতে যাচ্ছেন। তাই আগে থেকেই ঘর সামলাতে ফিরে গেছে !'[৩] অবশেষে মোহীনের সন্ধানে তার কাকা চলন্ত ট্রেন

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মোহিনের কাকা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

থেকে নামবার চেষ্টা করলে ঘটে বীভৎস দুর্ঘটনা। পরে জানা যায় মোহীন কোথাও যায়নি, ছিল পেছনের কামরাতেই।

মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকটি গল্পে বিন্যস্ত করেছেন। যেমন – ‘পাণ্ডুলিপি’, ‘তরফদার’, ‘জীবাণু’, ‘শেষ চূড়া’, ‘সুখ’ প্রভৃতি। সমাজে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সত্ত্বেও একাকীত্ব কিংবা অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখবোধ থেকে এসব গল্পের চরিত্রপাত্রের জীবনে নেমে এসেছে অস্বাভাবিক দুঃখ-দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা। তাদের পরিণামও হয়ে উঠেছে হতাশাব্যঞ্জক ও নৈরাশ্যভারাক্রান্ত।

মধ্যবিত্তের বিকারগ্রস্ততা নিয়ে রচিত একটি গল্প ‘পাণ্ডুলিপি’[১]। বিপত্নীক ও নিঃসন্তান তারাকান্তের একমাত্র অবলম্বন দূরসম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্র বিভূতি। মাতৃহারা বালকটিকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন। বিভূতি তাঁকে নিরাশ করেনি। সে ম্যাট্রিকুলেশনে বৃত্তি পেয়ে অতঃপর উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় যাত্রা করে। বিদায়কালে কান্নাকাতর বিভূতিকে সান্ত্বনা প্রদান করেন তারাকান্ত। তিনি চান ছেলেটিকে ‘Superman’ হিসেবে গড়ে তুলতে। শুধু কলকাতা নয়, পড়ালেখার স্বার্থে তিনি তাকে বিলেতে পাঠানোরও পরিকল্পনা করেন। তারাকান্তের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বিভূতি আপ্রাণ চেষ্টা করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের স্বীকৃতি-স্বরূপ স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়ে বিভূতি গ্রামে যাত্রা করে। তারাকান্ত এদিন খুব ভোরে স্টেশনে উপস্থিত হন। তিনি গাড়োয়ানকে চায়ের পানি প্রস্তুত করতে বলেন। ক্ষুধার্ত বিভূতির জন্য তিনি ব্যবস্থা করেন – ডিম, আলুভাজা এবং টাটকা রসগোল্লা। ইতোমধ্যে প্লাটফর্মে এগিয়ে আসে অল্পবয়সী স্টেশনমাস্টার। চুলের স্টাইল ও আধুনিক ফ্রেমের চশমা পরিহিত লোকটিকে দেখে সৌখিন মনে হয় তারাকান্তের। ট্রেন থেকে দুজন সুদর্শন যুবকের সঙ্গে নামে খদ্দর-পরিহিত বিভূতি। কাকার পদধূলি গ্রহণ করে সে নবাগতদের পরিচয় করিয়ে দেয় – ‘এরা আমার বিশেষ বন্ধু, হিতৈষীও বটে। খেয়ালের ঝোঁকে হঠাৎ চলে এল, তাই আগে থেকে জানাতে পারিনি।’[২]

‘বন্ধু’ ও ‘হিতৈষী’ শব্দ দুটি শুনে তারাকান্ত স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। তিনি অনুধাবন করেন বিভূতি তাঁর ‘সুচিন্তিত গল্পের সুসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি’ নয়, এর বাইরে তার স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি হয়েছে। আচমকা দৌড়ে এসে স্টেশনমাস্টার বিভূতিকে অভিবাদন জানায় – ‘আপনাকে চিনব না, বলেন কি। বাঙলা দেশে এমন কে আছে যে শ্রেষ্ঠ

[১] ‘পাণ্ডুলিপি’ *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৪৭) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘পাণ্ডুলিপি’, *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭০

আধুনিক সাহিত্যিক বিভূতি মৈত্রকে চেনে না ? কলকাতায় আপনাকে কতবার দেখেছি।'[1] ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহিত্যচর্চাকেও তারাকান্ত সহজভাবে গ্রহণ করেননি। তাঁর মনে হয়েছে, বিভূতি কেবল তাঁর একার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের। ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির জন্য তারাকান্ত এতদিন নিজের রুচি অনুযায়ী যে বিভূতিকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, তা এক পর্যায়ে সকলের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। এ গল্পে তারাকান্ত নেতিবাচক চরিত্র নয়, তবে বাস্তবতাকে অস্বীকারের জন্য তিনি অকারণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছেন।

মধ্যবিত্তের খামখেয়ালি স্বভাব উঠে এসেছে 'তরফদার'[2] গল্পে। এ গল্পে তারকনাথ গাঙ্গুলীর দৃষ্টিকোণ থেকে এক চিন্তানায়কের চারিত্রিক বিবর্তনের স্বরূপ প্রদর্শিত হয়েছে। লোকটির নাম অতুলন তরফদার। কলেজ-জীবনে কলকাতার 'অস্পৃশ্যতা নিবারণ সভা'য় যোগ দেয় গল্পকথক তারকনাথ। অডিটেরিয়ামে প্রবেশকালে তাকে জানানো হয় সাদর সম্ভাষণ। প্রথমে সম্মানিত বোধ করলেও, সে উপলব্ধি করে উষ্ণ অভ্যর্থনার কারণ। বিশাল হলরুমে দর্শক-সংখ্যা চল্লিশের কম। একজন এ্যাডভোকেট সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন। মঞ্চে প্রত্যেকে পুরাণকথা ও শাস্ত্রগ্রন্থ অবলম্বনে বর্ণপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার কুফল সম্পর্কে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন।

হঠাৎ অনুষ্ঠানস্থলে আসেন অতুলন তরফদার। সভাপতির অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি অস্পৃশ্যতার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে চাঞ্চল্যকর যুক্তি প্রদর্শন করেন। সবশেষে সভাপতিকে তিনি প্রশ্ন করেন – 'কাল যদি একজন রাস্তার বেলদার এসে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তাকে জামাই করতে রাজী আছেন কিনা ?'[3] অডিটেরিয়াম ত্যাগের পর সকলে তার সমালোচনা করে। তাদের বিবেচনায় এটি তরফদারের 'ওরিজিন্যাল' হওয়ার প্রয়াস। তবে তার বক্তব্যে সম্মোহিত হয় কিশোর তারকনাথ। লোকটির সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ থাকলেও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পাঁচ বছর পর গল্পকথক তারকনাথ গাঙ্গুলী কলকাতার একটি খবরের কাগজে কেরানিবৃত্তিতে নিযুক্ত হন। সস্তা ভাড়ার একতলা বাড়ি, ট্রামে-বাসের ভিড় এবং অভাবের পাপচক্রে মহানগরের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। বউবাজার থেকে পটলডাঙায় বাড়ি পরিবর্তন করার পর তিনি জানতে পারেন যে, অতুলন তরফদার তাঁর প্রতিবেশী। তবে তরফদার-বাড়িতে জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। এক ছুটির দিনে আগ্রহবশত অতুলন তরফদারের বাড়িতে যান তারকনাথ। অনেকক্ষণ পর বেরিয়ে আসেন অতুলন তরফদার। কথাপ্রসঙ্গে জানা

---

[1] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭১

[2] 'তরফদার' *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫৩) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[3] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তরফদার', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭

যায়, তরফদার নিজেকে উগ্র 'ইনডিভিজুয়ালিস্ট' হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। সামষ্টিক মানুষের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে তিনি একাকার হতে চান না। আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় তিনি থাকেন সর্বদা ব্যাকুল। তাঁর প্রতিভার প্রশংসা করেন তারকনাথ। একইসঙ্গে দেশের সাহিত্য-সমাজ এবং রাজনীতিতে তিনি তরফদারের সদর্প উপস্থিতি কামনা করেন। তবে এ ধরনের লৌকিকতায় তরফদারের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই :

> রাজনীতি ? ও কথাটার কোনো মানে হয় না – অ্যানিম্যাল ওয়ার্লডে যা ঘটছে, মানুষের রাজনীতিও সেই যোগ্যতমের উর্দ্ধতন। সুতরাং ওখানে মানুষের মনুষ্যত্ব কোথায় ? সমাজনীতি ? পিঁপড়ের কথা বলছিলাম – দেখুন গে তারাও মানুষের মতো সমাজবদ্ধ। সাহিত্য ? পাগলের প্রলাপ। ধর্ম ? চিরকেলে জোচ্চুরি – রিলিজিয়নের উৎপত্তির ইতিহাস পড়লে দেখবেন প্রিমিটিভ অজ্ঞতা থেকেই ওর সূত্রপাত এবং মানুষের স্বার্থবুদ্ধিতে ওর বিকাশ।[১]

প্রথাগত ধারণার বিপরীতে তরফদার পরলোকের রহস্য উন্মোচনে উদ্যোগী হন। প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটানোর জন্যই তিনি বাড়িটিকে নির্জন এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখেন। ভৌতিক বিষয়ে মতবিরোধ হওয়ায় তরফদার অতিথিকে বিদায় জানান। এ ঘটনার পর তীব্র বিতৃষ্ণায় তারকনাথ গাঙ্গুলী পুনরায় বাড়ি বদলান। তিন বছর পর পুজোর ছুটিতে তিনি বেড়াতে যান উত্তরবঙ্গে। সেখানে এক গির্জার পাদ্রিরূপে অতুলন তরফদারকে দেখতে পান তিনি। ধর্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তরফদার নিজের নামও বদলে ফেলেছেন। ইজেকিয়েল কিংবা ইমানুয়েল পরিচয়ে তিনি বরেন্দ্রভূমিতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। শুধু তাই নয়, একসময় বর্ণপ্রথার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখলেও তিনি বিয়ে করেন এক সাঁওতাল মেয়েকে। তাঁর এই জীবনপরিণাম প্রত্যক্ষ করে তারকনাথের মনোলোকে যে-প্রশ্ন উদ্রিক্ত হয়, তা নিম্নরূপ :

> ব্যাপারটা কী হল ? অসাধারণ হওয়ার চেষ্টার ঐকান্তিক ফলস্বরূপই কি তরফদারের এই পরিণতি ? এই গ্রামের মধ্যে তিনি একচ্ছত্র এবং একক – বৃহত্তর পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা না করতে পেরে এই ছোট গণ্ডিটুকুর মধ্যেই তিনি সীমাস্বর্গ রচনা করেছেন ? অথবা একান্ত হতাশ এবং অসহায় হয়ে পিতা যীশুর শান্তিময় ক্রোড়েই সমস্ত উচ্চাশার পরিনির্বাণ খুঁজে পেয়েছেন তিনি ?[২]

গল্পে তরফদারের জীবনের তিনটি পর্যায় চিহ্নিত হয়েছে। প্রথমে তিনি অস্পৃশ্যতা নিবারণের বিরোধী। পরবর্তীকালে তিনি সমাজ-ধর্মের প্রতি পুরোপুরি আস্থাহীন এবং সর্বশেষে তাঁর পরিবর্তন একবারেই অবিশ্বাস্য ও বিপরীতমুখী। সাঁওতাল নারীকে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি যেমন বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা উপেক্ষা করেছেন, তেমনি পাদ্রি হিসেবে স্বীকার করেছেন ধর্মীয় আনুগত্য।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫

শাহরিক মধ্যবিত্তের একাকীত্ব এবং পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপড়েন অবলম্বনে রচিত হয়েছে জীবাণু'[১] গল্প। কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়ের পাদদেশে একটি নির্জন বাংলোয় সারদাপ্রসাদের দিন কাটে। দীর্ঘদিন অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য তিনি প্রকৃতির সান্নিধ্যে বসবাস করছেন। অথচ তিনি জীবনভর চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধনায় নিবিষ্ট থাকতে চেয়েছেন। উচ্চতর ডিগ্রিলাভের জন্য একসময় তিনি পাড়ি জমান লন্ডনে। সেখানে তাঁর স্বপ্নকে বেগবান করেন এক বিদেশিনী – গ্লাডিস থার্স্টেন। কিন্তু পরীক্ষার প্রস্তুতিকালে সারদাপ্রসাদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রেমিকার উপর্যুপরি তাগিদে তিনি উন্নত চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যান্ডে যান এবং সেখানে তাঁর মেরুদণ্ডে টিউবারকুলেসিস শনাক্ত হয়। অস্ত্রোপচারের পর সারদাপ্রসাদ জীবনলাভ করলেও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি। তাঁর শরীরের কয়েকটি হাড় কেটে ফেলায় তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতে থাকে তাঁর প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম। বহিঃপৃথিবীর প্রতি তিনি হারিয়ে ফেলেন সমস্ত আকর্ষণ :

> পৃথিবীতে কোথায় কোন্ যুদ্ধ হচ্ছে, কোথায় বোমার বহরের বর্ষণে জার্মানির আধখানা শহরকে বেমালুম উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কোথায় ধানের ক্ষেতে পঙ্গপাল নেমে ফসলের সর্বনাশ করে দিয়েছে, কোন্ নেতা গর্জন করে বলেছেন এক মাসের মধ্যে তিনি বক্তৃতা দিয়েই স্বাধীনতা অর্জন করে নেবেন এবং কোন্খানে একটা গোরুর পাঁচপেয়ে বাচ্চা হয়েছে, এসব মূল্যবান খবরাখবরের কোনো লোভ, কোনো আকর্ষণ নেই সারদাপ্রসাদের। ও পৃথিবী তাঁর কাছে রূপকথা।[২]

যুদ্ধ-বোমা কিংবা বিবাদ-বিসংবাদের সংবাদ-পাঠের পরিবর্তে সারদাপ্রসাদ বরং বৈজ্ঞানিক জার্নালের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। কেবল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নয়, তিনি বিশ্বাস করেন – একদিন এসব জার্নালে প্রকাশিত হবে মনুষ্য শরীরে হাড়-প্রতিস্থাপনের সংবাদ। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, তাঁর প্রত্যাশিত সে-সংবাদের দেখা মেলে না। আশাহত হয়ে তিনি জার্নালের প্রতিও হারিয়ে ফেলেন আগ্রহ।

একদিন তাঁর বাংলোর বারান্দায় আশ্রয় নেয় বৃষ্টিস্নাত এক পাহাড়ি দম্পতি। গল্পকারের ভাষায় – এরা 'স্বাস্থ্য আর যৌবনের নির্ভুল প্রতীক।'[৩] বৃষ্টিতে ভিজেও তাদের আনন্দ বাধ মানে না। অথচ সারদাপ্রসাদের দুর্দিনে তাঁর প্রেমিকা মুহূর্তে সম্পর্ক ছিন্ন করে। জীবনবঞ্চিত সারদাপ্রসাদের কাছে এই পাহাড়ি দম্পতির হাস্যধ্বনি অসহ্য মনে হয়। বারান্দা থেকে ওদের বিতাড়িত করতে তিনি ভৃত্যকে নির্দেশ দেন। পাহাড়ি ভাষায় তারা ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেও দুঃখ পায় না, বরং 'হাসতে হাসতে' বৃষ্টিতে নেমে পড়ে। এদের শরীরের জীবাণুরোধে সারদাপ্রসাদ চাকরকে ফিনাইল দিয়ে বারান্দা পরিষ্কার করতে বলেন। তবে তাঁর ভয়ের উৎস জীবাণু নয়,

---

[১] 'জীবাণু' *পূর্বাশা* পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় (১৩৫৩) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'জীবাণু', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭

পাহাড়িদের জীবনীশক্তি। গল্পশেষে এমন প্রশ্নই উত্থাপিত হয়েছে – 'সত্যিই কাকে ভয় করেন তিনি ? ওদের জামাকাপড়ের ব্যাকটেরিয়াকে, না ওদের পাথুরে শরীরের শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে প্রবহমান যৌবনকে ? জীবনকে, না জীবাণুকে ?'[১]

'শেষ চূড়া'[২] গল্পে ভূপেন সেন একজন ক্রীড়াপ্রেমী ব্যক্তিত্ব। অকৃতদার ভূপেন ছোটো ভাইয়ের সংসারে নির্ভাবনায় দিনযাপন করেন। তিনশো টাকা বেতনের চাকরি তাঁর প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। বয়স পঞ্চাশ হলেও তিনি শারীরিকভাবে সুঠাম ও সুস্থ। মাস-দুয়েক পূর্বে জানা যায় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত। এজন্য কলকাতায় যখন ক্রিকেটের মৌসুম চলে, তখন তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঋতু পরিবর্তনে যান। এই সূত্রে গয়া জেলার এক মফঃস্বল শহরে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন। তিনি যে বাংলোয় অবস্থান করেন তার পাশের বাড়িটি একজন ডাক্তারের। অল্পদিনেই এ ডাক্তার-পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ডাক্তার ঘোষের এমএ পাশ মেয়ে এণাক্ষী কলেজে ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন ছিল। স্বভাবতই স্পোর্টসম্যান ভূপেনের কথাবার্তায় সে মুগ্ধ হয়। এরমধ্যে বাড়িতে আসেন ডাক্তারের বন্ধুপুত্র অরুণ দত্ত। পাটনার একটি কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। 'স্মার্ট' এ যুবককে ভূপেনের অপছন্দ। একদিন ভূপেন যখন তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যের গল্প করছিলেন, তখন অরুণ পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে লালশর শিকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এণাক্ষী ক্রিকেটের গল্পে আচ্ছন্ন হলেও অরুণের প্রস্তাবে সে রোমাঞ্চিত বোধ করে। অতঃপর তার সমস্ত অনুরাগ অরুণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। তার কাছে সে শিকারের কায়দা-কানুন রপ্ত করতে চায়। এ-পর্যায়ে শুধু পাখি নয়, অরুণ বর্ণনা করেন বাঘ-শিকারের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। পুরো আসর তখন তার নিয়ন্ত্রণে। অরুণের প্রতি এণাক্ষীর অতিরিক্ত আগ্রহ প্রত্যক্ষ করে বিপন্নবোধ করেন ভূপেন। তাই চা-কাটলেটের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তিনি বাংলোয় ফিরে যান। এসময় ডাক্তারের ড্রয়িংরুম থেকে ভেসে আসে অট্টহাস্য। ভূপেন সেনের সন্দেহ, তাঁকে নিয়েই হয়তো রসিকতায় মেতে উঠেছেন অর্বাচীন অধ্যাপক। এরপর এ-বাড়ির প্রতি তার মধ্যে তৈরি হয় বিরক্তি ও বীতশ্রদ্ধা।

পরদিন আড্ডার পরিবর্তে ভূপেন যান দুর্গা পাহাড়ে। এ স্থান থেকে প্রায় পাঁচশো ফুট ওপরে রয়েছে একটি মন্দির। দেওয়ালির পর মাত্র একদিন সেখানে পূজা হয়, বাকি সময় মন্দির-প্রাঙ্গণ থাকে নির্জন। ভূপেন

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

[২] 'শেষ চূড়া' *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৬৯) প্রথম প্রকাশিত হয়।

একাধিকবার মন্দিরদর্শনের চিন্তা করলেও, ডাক্তারের বারণে তা সম্ভব হয়নি। ফিরতিপথে তাঁর চেখে পড়ে প্রফেসরের স্কুটার। ভূপেনের ধারণা, অরুণ দুর্গা পাহাড়েই উঠেছেন। অকস্মাৎ তাঁর রক্তে সঞ্চারিত হয় তীব্র উত্তেজনা। ডাক্তারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তিনি পাহাড়ে আরোহণ করেন। কিছুদূর যেতেই একটি ছাতিম গাছের তলায় তিনি দেখতে পান অরুণ-এণাক্ষীকে। ভূপেনকে দেখে তারা অপ্রস্তুত বোধ করে। এণাক্ষী একটানা তাঁকে 'জ্যাঠামশাই' বলে সম্বোধন করতে থাকলে তিনি ক্রুদ্ধ হন। ক্ষুব্ধচিত্তে অরুণের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন ভূপেন – পাহাড়ে ওঠা আর স্পট ফেলে বাঘ মারা তা হলে এক জিনিস নয় প্রফেসর ! ... এসো আমার সঙ্গে দেখি কে আগে উঠতে পারে।'[১]

এরপর ভূপেন সরাসরি পাহাড়ে উঠতে থাকেন। তাঁর আহবান অরুণ গ্রহণ করেছে কী না – এটি পরখ করে দেখবার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেননি। সহসা তিনি বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন এবং মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। মৃত্যুলগ্নে অবচেতন সত্তায় ভূপেন স্কোরবোর্ডে তাঁর নামের পাশে আবছায়া দেখতে পান – নিরানব্বই রান। এ 'নিরানব্বই' তাঁর জীবনের অপূর্ণতার প্রতীক। ভূপেন আপাতদৃষ্টিতে সুখী হলেও, নিঃসঙ্গতার কারণে তাঁর মনোজগতে রোপিত হয় বিকারগ্রস্ততার বীজ। এজন্য তারুণ্যের স্বাভাবিক স্রোতকে তিনি স্বাগত জানাতে পারেননি। অরুণের সঙ্গে এণাক্ষীর ঘনিষ্ঠতার সহজ সমীকরণ তিনি মিলিয়ে দেখেননি। ব্যক্তি-অবস্থান এবং বাস্তবতাকে অস্বীকার করবার প্রবণতাই হয়ে উঠেছে ভূপেনের অকালমৃত্যুর কারণ।

'সুখ'[২] গল্পে পারিপার্শ্বিক চাপে মধ্যবিত্ত-মানসের অন্তর্যন্ত্রণা প্রকটিত হয়েছে। উত্তর বাংলার এক গ্রামে অবকাশ-যাপনে আসেন অধ্যাপক সুকুমার। তাঁর পিতৃব্য এতদঞ্চলের পোস্টমাস্টার। তিনি 'কনফার্মড ব্যাচেলর'। তাঁর মাধ্যমে অধ্যাপকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এখানকার স্কুলশিক্ষক, ডাক্তার-কম্পাউন্ডার, কেরানি এবং কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে। একপর্যায়ে স্থানীয় ছোটো নদীতে মাছধরার সময় সুকুমারের সঙ্গে পরিচয় হয় পাগলা চৌধুরীর। লোকটি এ-অঞ্চলে 'মডেল ফার্মিং' করে। সুকুমারকে তিনি তাঁর খামারে নিমন্ত্রণ করেন। এখানে এসে সুকুমার হারিয়ে যান বনতুলসী এবং লেবুঘাসের মধ্যে। প্রত্যন্ত গ্রামে 'মডেল ফার্মিং'–এর বিষয়টি অধ্যাপককে বিস্ময়াভিভূত করে। তিনি চৌধুরীর প্রতি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। পিতৃব্যের মাধ্যমে তিনি চৌধুরীর

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শেষ চূড়া', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮

[২] 'সুখ' *অমৃত* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৭০) প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিস্তারিত পরিচয় জানতে পারেন। স্বল্প জমিতে চাষাবাদের অবসরে লোকটি গ্রামবাসীকে 'টোটকা' চিকিৎসা দেন। সভ্যসমাজকে তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেন। পুলিশ তাঁকে পলাতক আসামী ভাবলেও পরবর্তীকালে তাদের সন্দেহ অমূলক প্রমাণিত হয়।

এক বিকেলে সুকুমার প্রাচীন কপালিনীর মন্দিরে যান। স্থানটি বিপৎসঙ্কুল হলেও বিষ্ণুপুরীর আদলে নির্মিত স্থাপত্য তাঁকে মুগ্ধ করে। ফেরার পথে সাইকেল নষ্ট হলে তিনি বিপত্তিতে পড়েন। এ সংকটে আত্মপ্রকাশ করেন হয় পাগলা চৌধুরী। চোর-ডাকাতের ভয় না থাকলেও, মন্দির-সংলগ্ন এলাকায় বংশবৃদ্ধি করেছে অসংখ্য গোখরো সাপ। বাতের অব্যর্থ ঔষধ তৈরির জন্য পাগলা চৌধুরী এসব সাপের খোলস সংগ্রহ করেন। এসময় তিনি সুকুমারকে দেখতে পান এবং গঞ্জের নিকট পৌঁছে দেন।

পাগলা চৌধুরীর অদ্ভুত জীবনযাপনের আকর্ষণে সুকুমার পরদিন তাঁর খামারে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে মডেল ফার্মের ন্যূনতম চিহ্ন নেই। টিনের একটি ছোটো ঘর এবং তার পাশে প্রায় তিন-বিঘা জমিতে রয়েছে সবজির আবাদ। ঘরের ভেতরে দেখা যায় শিশি-বোতল-কৌটো, রয়েছে কিছু শেকড়-বাকড় – এগুলোই হচ্ছে চৌধুরীর জীবিকার উৎস। আলাপকালে জানা যায়, লোকটির প্রকৃত নাম তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী। এ নাম উচ্চারিত হতেই সুকুমারের স্মরণ হয় দশ বছর পূর্বে পঠিত একটি আধুনিক কবিতার বইয়ের প্রসঙ্গ – 'খাঁচার সকাল'। বিখ্যাত সমালোচকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিল সেখানে।

কবি-পরিচয়ে তুহিনাংশু বিব্রত বোধ করেন। অধ্যাপকের কাছে এরপর তিনি কিছুই গোপন করেন না। লেখাপড়া শেষে তিনি যখন বেকার জীবন যাপন করছিলেন, তখনই একজনের সহযোগিতায় বইটি ছাপা হয়। এরপর আর তিনি ওপথে এগোননি। কাব্যসাধনার পরিবর্তে 'কন্‌স্ট্রাকটিভ' কাজের বাসনা তাঁকে তাড়িত করে। দার্জিলিং যাওয়ার পথে যান্ত্রিক গোলযোগে ট্রেন থামলে তিনি সেখানেই নেমে পড়েন এবং স্বল্পমূল্যে কিছু জমি ক্রয় করে এখানে স্থায়ী হন। সহসা সুকুমার আবৃত্তি করেন তুহিনাংশুর একটি কবিতাংশ :

মণিকা, তোমার বাঘিনী-প্রেমের
আদিম অন্ধ রাতে
নোনা সাগরের ক্ষুব্ধ নিশান
তোলে সুন্দরবন
আমি ছুটে চলি হিংস্র কিরাত
খর বল্লম হাতে

আলোর সঞ্চরণ –[১]

একপর্যায়ে কবিপত্নীর সঙ্গে সুকুমারের সাক্ষাৎ হয়। তার কালো-শরীরে কেবল একটি ময়লা কাপড় জড়ানো। সুকুমার নমস্কার জানালে তিনি প্রত্যুত্তর দেন না। তুহিনাংশু স্ত্রীর শারীরিক অক্ষমতা সম্পর্কে সুকুমারকে অবহিত করেন এবং গর্বের সঙ্গে বলেন – প্রতিবন্ধী এই নারী তাঁর কাছে আদর্শ পত্নী :

> এই তো ভালো মশাই – যাকে বলে আদর্শ স্ত্রী। লেখাপড়া জানে না – গরিবের মেয়ে, কানে শোনে না, কথা বলতে পারে না। আমি বিয়ে করেছি বলে চিরকৃতার্থ হয়ে আছে – কী করি না করি কোনোদিন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। এর চাইতে সুখ কিছু আছে বলতে পারেন আপনি ?[২]

কলকাতা-বিচ্ছিন্ন এ কবি দীর্ঘদিন ‘টোটকা-দর্পণ’ এবং ‘ভেষজ রহস্য’ ছাড়া অন্য গ্রন্থ পড়েননি, এমনকি সংবাদপত্রও নয়। নিজের জীবন থেকে তিনি শহরকে চিরতরে মুছে ফেলতে চান। প্রকৃত সুখের নাগাল না পেলেও তিনি নির্দ্বিধায় বলেন – ‘বেশ আছি’। ‘ব্যক্তিগত জীবনে যারা নিজেদের প্রেম-ভালোবাসার সঙ্গে আপোষ করে গেছে, আর সেই আপোষকামিতার চূড়ান্ত রূপই দেখা গেছে ... তুহিনাংশু দত্ত চৌধুরীর মধ্যে। চরম খ্যাতির মুখে সেও নিজেকে আত্মবিসর্জন দিয়েছিল এক ভিন্ন জগতে। যদিও যে জীবনে সে বাসা করেছে সেখানেও তো তার জীবনের ছন্দতাল মেলেনি।’[৩]

কথোপকথনের এক পর্যায়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়েন শস্যহীন মাঠের একপ্রান্তে। সেখানে একটি প্রকাণ্ড গ্রানাইট পাথরকে তুহিনাংশু স্থানচ্যুত করতে যান। গত আট বছর তিনি এটিকে সরাতে চেয়েছেন, কিন্তু সফল হননি। সুকুমারের দৃষ্টিতে এরূপ পণ্ডশ্রমের যৌক্তিকতা না থাকলেও, তুহিনাংশুর কাছে এর উপযোগিতা বিস্তর :

> চিরকাল কি এমনি করে একটা পাথরের তলায় সব চাপা পড়ে থাকবে ? কবিতা হারিয়ে যাবে – মণিকা হারিয়ে যাবে – যেখানেই যাব, এই পাথরের হাত থেকে আমি মুক্তি পাব না ? আপনি বিশ্বাস করুন – এইবারে এটা সরবেই, তার সময় এসেছে।[৪]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘সুখ’, *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩

[৩] স্বাতী চক্রবর্তী, ‘চিঠিপত্র ও ব্যক্তিগত আলাপচারিতার নিরিখে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের পুনর্বিচার’, উত্তম পুরকাইত (সম্পাদিত), *উজাগর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘সুখ’, *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪

এ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড তুহিনাংশুর জীবনের অসীম বেদনার প্রতীক। জান্তব চিৎকারে তিনি পুনরায় পাথরটিকে স্থানচ্যুত করতে চান। তবে 'তুহিনাংশু নিজেও হয়তো বুঝতে পারে না, পাথরটাকে অপসারিত করবার সাধ্য সত্যি সত্যিই তার নেই। নারায়ণের গল্প-উপন্যাসে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য।'[১] তুহিনাংশু নিজেকে সুখী ভাবলেও, সুকুমার উপলব্ধি করেন তিনি আত্মহত্যার সাধনাই করে চলেছেন। ঘন তুলসীবনে হারিয়ে যাওয়া, বিষধর সাপের খোলস কুড়ানো, কুশ্রী স্ত্রীর সঙ্গে নিরর্থক দাম্পত্য জীবনযাপন কিংবা পাথর সরানোর নিষ্ফল চেষ্টা – সবই মণিকাকে হারিয়ে কবি তুহিনাংশু দত্তচৌধুরীর শৈল্পিক আত্মহননের প্রয়াস।

নিম্নবিত্ত সমাজ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের উল্লেখযোগ্য উপকরণ নিম্নবিত্ত পরিশ্রমজীবী মানুষের জীবনযাপন। এদের নিরলংকার জীবন তাঁকে শিল্পরচনায় প্রাণিত ও প্রণোদিত করেছে। এসব জীবনসংগ্রামীর মধ্যে তিনি অন্বেষণ করেছেন তাঁর অস্তিত্ব। *সুনন্দর জার্নালে* তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন :

> আমি তো রাজনীতিক নই। আমিও সেই নিতান্ত সাধারণ মানুষদেরই একজন – সকলের সঙ্গে আন্দোলিত হই, দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণায় জ্বলি – সংকট-লগ্নে পথের দিশারী হতে জানি না – পথের নির্দেশ খুঁজি। ক্ষুধার খাদ্য, জীবনের নিশ্চয়তা, সন্তানের ভবিষ্যৎ, সুস্থ-সবল-কল্যাণময় স্বদেশের উজ্জ্বলতম উদ্বোধনের প্রতীক্ষা করি।[২]

শুধু বক্তব্যপ্রদান নয়, বিপন্ন মানুষের দুর্দিনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পায়ে হেঁটে সহযোগিতা চেয়েছেন। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এক স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন :

> উত্তরবঙ্গের বন্যার পর কলকাতায় সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে পথ-শোভাযাত্রা করে কিছু সাহায্য ও জামা কাপড় সংগ্রহ করার প্রস্তাব উঠেছিল। শ্যামবাজার থেকে সেই উপলক্ষ্যে একটা মিছিল বেরুবার কথা। গিয়ে দেখি বিশেষ কেউ আসেননি, কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আশা দেবী ঠিক উপস্থিত। উত্তরবঙ্গে উনি অনেকদিন কাটিয়েছেন, ওখানকার প্রতি ওঁর ছিল আন্তরিক টান। সেদিন ছিল প্রচণ্ড রোদ – সেই রোদের মধ্যেই ঘণ্টা চারেক পায়ে হেঁটে ঘুরে সেদিন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশা দেবী শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৩]

---

[১] সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ক্ষত', *সুনন্দর জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

[৩] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'আমার মাস্টারমশাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়', তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত), *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : মাস্টারমশাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

'প্রদীপ ও প্রজাপতি', 'ধন্বন্তরি', 'পিতরি', 'গন্ধরাজ', 'জন্মভূমিশ্চ', 'কালো মোটর', 'কেয়া', 'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু', 'যাচাই' প্রভৃতি গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিম্নবর্গের কষ্টকর জীবনযাত্রা বিশ্বস্ততার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দেশব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দায় এ শ্রেণি হারিয়ে ফেলে প্রতিবাদের ভাষা। অভাব-অনটন, ক্ষুধা-যন্ত্রণার কাছে পরাজিত মানুষগুলো সততাকেও বিসর্জন দেয়। বাঁচার তাগিদে তারা বিস্মৃত হয় স্নেহ-মমতা, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও মানবিকতা। সমকালীন জীবনের এসব নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যেমন তাঁর গল্পে বয়ন করেছেন, ঠিক তেমনি তাদের উত্তরণের বিষয়টিও কয়েকটি গল্পে প্রদর্শন করেছেন। 'সঞ্চার', 'গিলটি', 'দায়মোচন' ও 'মর্যাদা' গল্প এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

নিম্নশ্রেণির মানুষজনের প্রতি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছিল গভীর মমত্ববোধ। তাদের সঙ্গ ও সাহচর্য তিনি আন্তরিকভাবে উপভোগ করতেন। 'প্রতিদিনের চেনা অচেনা মানুষ, তা সে দূরবর্তী অতীত কালের হোক, অথবা সমসাময়িকের চৌহদ্দিবন্দী হোক, তিনি সেই মানুষের সঙ্গ কামনা করতেন।'[১] বরুণ মুখোপাধ্যায়ের একটি লেখায় বিষয়টি প্রত্যক্ষ করা যায় :

> রাজাবাজারের কাছাকাছি অঞ্চলে তিনি যখন একটি বাড়ী কিনে উঠে যান, অনেক ভীড় ঠেলে ঠেলে সেখানে পৌঁছে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ জায়গাটা আপনি পছন্দ করলেন কিসে ? উত্তরে সেই স্নিগ্ধ হাসি। বললেন, বাইরের এত ভীড়, এত বিচিত্র মানুষ, এঁদের মধ্য দিয়ে আমার নিত্য যাতায়াত, এইজন্যই তো জায়গাটা স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি। তা ছাড়া, এরা আমাকে কত শ্রদ্ধা করে ! মুগ্ধতার আবেশে ভরে ওঠা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সেদিন আরেকবার উপলব্ধি করেছিলাম সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর কত গভীর টান।[২]

'প্রদীপ ও প্রজাপতি' গল্পে মহানগরের বিশালতায় তলিয়ে যাওয়া এক গ্রামীণ দম্পতির দুঃখগাঁথা বিবৃত হয়েছে। আড়িয়াল খাঁ নদীতীরে পূর্ববাংলার এক সচ্ছল পরিবার মুখুজ্জে-বাড়ি। মামলা-মোকদ্দমা, পূর্বপুরুষদের অদক্ষতা এবং চারিত্রিক স্খলনে এদের সাংসারিক সচ্ছলতায় ভাঁটা পড়ে। তারপরেও তালুক থেকে তাদের সারা বছরের ধান-চালের বন্দোবস্ত হয়। গল্পকথক রঞ্জন মাঝেমধ্যে এখানে বেড়াতে আসেন। গৃহকর্ত্রী সোনা পিসির চিঁড়ের মোয়ার প্রতি ছিল তাঁর আকর্ষণ। বিএ পাশের পর মুখুজ্জে-বাড়িতে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয় টুনু বউদির। তখন সোনা পিসি ভয়ানক অসুস্থ, তার শরীর অসাড় হয়ে পড়েছে। টুনু বউদির স্বামী বঙ্কু কলকাতায় চাকরি

---

[১] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তিনি ছিলেন মানুষের কবি', তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বর্মণ (সম্পাদিত), *কোরক* (দ্বিতীয় পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[২] বরুণ মুখোপাধ্যায়, 'জীবনশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে', সঞ্জীবকুমার বসু (সম্পাদিত), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬

করেন। স্বামীকে নিয়ে বউদি নিজের মতো করে একটি ছোট্ট সংসারের স্বপ্ন দেখেন সারাক্ষণ। রঞ্জনের কাছে তিনি অকপটে বলেন :

> আমার ভাবতে বেশ ভালো লাগে ঠাকুরপো, ছোট্ট একটি বাসা ক'রে আছি দুজনে। ছিমছাম গুছনো একটি সংসার। সন্ধ্যেবেলা উনি আপিস থেকে ফিরলে কড়ায় ক'রে খানকয়েক লুচি ভেজে দোব, চা ক'রে দোব। ছুটির দিনে দুজনে যাব আলিপুরের চিঁড়িয়াখানায়, কোনো দিন যাবো বায়োস্কোপ দেখতে। টকি আমার খুব ভালো লাগে ঠাকুরপো।[১]

স্বামীর সঙ্গে সংসারযাপনে বউদির একমাত্র অন্তরায় সোনা পিসি। রঞ্জন শাশুড়িকে কলকাতায় স্থানান্তরের প্রস্তাব দিলে বৌদি মৌনীভাব অবলম্বন করে। গল্পকথকের কাছে এর অর্থ পরিষ্কার – 'মৃত্যু যেখানে অনিবার্য অথচ অকারণ-বিলম্বিত, সেক্ষেত্রে নিষ্ফল সহানুভূতির বোঝা টানতে টানতে মানুষের ক্লান্তি আসবেই – শুশ্রূষায় তিক্ততা, সেবায় বিরক্তি।'[২]

পিসির মৃত্যুর তিনবছর পর রঞ্জনের সঙ্গে বঙ্কুর আচমকা দেখা হয়। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছেদে দরিদ্রতার ছাপ। এখন সপরিবারে কলকাতায় বাস করেন তিনি। রঞ্জনকে তিনি তাঁর বাসায় নিমন্ত্রণ জানান। তবে কাজের ব্যস্ততায় রঞ্জন তখন যেতে পারেননি। কিছুদিন পর সেখানে গিয়ে রঞ্জন দেখেন, বঙ্কুদের বাসস্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর : পায়ের নিচে পচা ভাত, মাছের কাঁটা এবং খবরের কাগজে জড়ানো নোংরা আবর্জনা। তাদের গলির ধারে বসে থাকে বিকৃতরূপা এক শ্রেণির পতিতা; যারা সেখানে ধূমপান করে, অশ্লীল ভাষায় আনন্দ করে এবং পাশের পেঁয়াজ-ফুলুরি বিক্রেতার সঙ্গে অযথা কলহে জড়িয়ে পড়ে। বঙ্কুর ঘরের দিকে যেতে রঞ্জনের দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। টিউবওয়েলের কাছে কাদা আর একরাশ উচ্ছিষ্ট, কয়েকটি মেয়ে সেখানে বাসন পরিষ্কার করছে এবং তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ছেঁড়া গামছা পরিহিত এক লম্পট।

এসময় টুনু বউদির কঙ্কালসার দেহাবয়ব দেখে রঞ্জন আতঙ্কিত হয়। প্রতিরাতে জ্বর এবং কাশিতে বউদি অস্থির থাকেন। কলকাতা এসে রক্ত-আমাশয়ে মারা গেছে তাঁদের একমাত্র সন্তান। এদিকে অফিসে এক মাদ্রাজি যোগদান করলে বঙ্কু চাকরি হারায়, কেবল দুটি টিউশনি এখন তাঁদের ভরসা। নগরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় বঙ্কু সম্পর্ণরূপে পরাজিত। একদা গ্রামীণ সচ্ছল গৃহস্থের সন্তান নগরজীবনে এসে যাপন করছেন অমানবিক ও হতশ্রীকাতর জীবন। নগরের প্রতি তীব্র আকর্ষণে ঘর ছাড়লেও এখন টুনু বউদির মনে হয় 'এর

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্রদীপ ও প্রজাপতি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১

চাইতে গ্রামে থাকলেই বোধ হয় ভাল হত, কিন্তু ওঁকে এভাবে ফেলে কী করে যাই ?'[১] এভাবে প্রদীপরূপী কলকাতার প্রতি দুর্বার মোহে পতঙ্গের মতো নিঃস্ব হয়ে গেছেন প্রাণবন্ত টুনু বউদি।

নিম্নশ্রেণির মানবেতর জীবনযাপনের করুণ বর্ণনা রয়েছে 'ধন্বন্তরি'[২] গল্পে। গ্রামের একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে চাকরি করেন ডাক্তার খগেন দাস এবং কম্পাউন্ডার যতীন সমাদ্দার। সার্ভিংরুমে টেবিলের সামনে যতীন একটানা দাঁড়িয়ে থাকে, অন্যদিকে খগেন ডাক্তার ঔষধের স্বল্পতার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কম্পাউন্ডার যতীনকে তিনি টাইফয়েড, ডিপথিরিয়া, ব্লাকওয়াটার, ম্যালেরিয়া, নিমোনিয়া – সকল রোগের জন্য একই ঔষধ বিতরণের নির্দেশ দেন। যতীন নিঃশব্দে খগেনের হুকুম পালন করে। দুর্মূল্যের বাজারে ঔষধচুরির শঙ্কায় ডাক্তার আলমারির চাবি নিজের কাছে গচ্ছিত রাখেন।

কম্পাউন্ডারের বেতন মাত্র আটাশ টাকা। তার শরীরে ছিন্নবস্ত্র এবং পায়ে ক্যাম্বিসের ফিতাহীন জুতা। অভিজ্ঞ যতীন প্রেসক্রিপশন পড়বার প্রয়োজন বোধ করে না। সে প্রায়ই রোগীর অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ জমায়। দ্রুত আরোগ্যলাভের জন্য সে বাড়িতে ডাক্তার নেওয়ার পরামর্শ দেয়। ক্যানভাসারের মতো যতীন এসময় আত্মপ্রচারে লিপ্ত থাকে। নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনার সঙ্গে সে ডাক্তারের নিন্দা আরম্ভ করে :

> একেবারে চামার। চোখের পর্দা বলে বালাই নেই। গরীবের ঘরে ভাত নেই, কিন্তু দু' টাকার কমে উনি কোনো কথা কইবেন না। কাগজে সই করেই দু' দুটো টাকা – এ মামার বাড়ির আবদার নাকি ![৩]

খগেন ডাক্তারের দু টাকা ভিজিটের পরিবর্তে যতীন এক টাকায় চিকিৎসা করতে চায়। রোগীপক্ষ অসম্মত হলে দরদামশেষে তার পারিশ্রমিক ধার্য হয় আট আনায়। কেউ অস্বীকৃতি জানালে সে দুঃখিত হয় না, বরং সবকিছু স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। দুপুর পর্যন্ত ডিসপেন্সারিতে থাকবার নিয়ম থাকলেও ডাক্তার মাঝে-মধ্যে বাইরে যান। সাইকেল-যোগে দু-চারটি রোগী দেখে তিনি পুনরায় ফিরে আসেন। কিন্তু যতীনের বিশ্রাম নেই, জরুরি রোগী আসলে তার 'কোয়ার্টারে' ফিরতে বিলম্ব হয়, যেখানে রয়েছে বাঁশের বেড়া, খড়ের জীর্ণ ঘর, বিস্তর খানা-খন্দ এবং সাপের উপদ্রব।

পাঁচ-ছয়টি সন্তান আর অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে যতীনের সংসার। স্ত্রীর রক্তশূন্য চেহারা দেখে সে বুঝতে পারে ভিটামিন বি'-এর অভাব, অন্যদিকে ছেলেমেয়েরা আক্রান্ত হয়েছে ক্যালসিয়াম ডিফিসিয়েন্সিতে। রোগনির্ণয়

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

[২] 'ধন্বন্তরি' *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৫৩) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ধন্বন্তরি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০

করলেও ঔষধের অভাবে সে চিকিৎসা করতে পারে না। ঘরে এসে যতীনের দুদণ্ড শান্তি নেই। স্ত্রীর সদা অভিযোগ এবং ছেলেমেয়েদের চিৎকারে সে তটস্থ থাকে। স্ত্রীকে গালমন্দ এবং সন্তানদের প্রহার করে সে বারান্দায় বিড়ি জ্বালায়। এসময় তার দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে স্বদেশের বাস্তব চিত্র :

> মৃত্যু আসছে – জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, অলক্ষ্য হয়ে আসছে তার নিশ্চিত পদপাত। শুধু তার ঘরেই নয় – তারই পরিবারে নয়। সমস্ত দেশটাই অপমৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে টলমল করছে। চারদিক থেকে হাত বাড়িয়ে আসছে কালাজ্বর, নিমোনিয়া, কলেরা, বসন্ত, ম্যাল-নিউট্রিশন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সিঙ্কোনার জল আর কার্মিনেটিভ মিক্‌শ্চার তারই পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে মাত্র।[১]

আর্থিক সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় সন্ধান করে যতীন। এজন্য সে স্বল্প-ফি নিয়ে রোগীদের চিকিৎসা শুরু করে। অল্পদিনেই তার নাম ছড়িয়ে পড়ে, আর খগেন ডাক্তারের পসার কমতে থাকে। যতীন রোগীপ্রতি ফি নেয় আট আনা। তদুপরি যেখানে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই, সেখানে লাউ-কুমড়োও সে দক্ষিণারূপে গ্রহণ করে।

যতীনের চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়ে কৌতুক করেন খগেন ডাক্তার। তিনি যতীনের নাম দেন ধন্বন্তর, অর্থাৎ দেব চিকিৎসক। অবশ্য কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর হাস্য-কৌতুক বন্ধ হয়ে যায়। যতীনের দৌরাত্ম্যে তাঁর প্র্যাকটিস বন্ধের উপক্রম হয়। তাই তাকে আর প্রশ্রয় দিতে চান না তিনি। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি যতীনকে কর্তব্যসচেতন করার উদ্যোগ নেন। সরকারি দায়িত্বে অবহেলার জন্য তিনি যতীনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দেন। রোগীদের সম্মুখে ক্রুদ্ধ ডাক্তার তাকে অপদস্থ করেন এভাবে :

> ডাক্তার হয়েছেন – প্র্যাকটিস করা হচ্ছে! একটা প্রেস্‌ক্রিপশন রিপীট করতে পর্যন্ত ভুল করেন – লজ্জা হয় না আপনার ? আজ সরকারী কাজ ফেলে ধন্বন্তরী হওয়ার চেষ্টায় আছেন! যদি মন দিয়ে কাজ না করেন তাহলে আপনার নামে রিপোর্ট আমাকে পাঠাতেই হবে – এ কথা আর একবার জানিয়ে যাচ্ছি।[২]

অতর্কিত আক্রমণে যতীন দিশেহারা হলেও পরক্ষণে ডাক্তারের ঈর্ষা উপলব্ধি করে সে। এ কারণে মনঃপীড়ার পরিবর্তে সে গৌরববোধ করে। পুঁথিগত বিদ্যার তুলনায় বাস্তবজ্ঞানের যে অপরিমেয় শক্তি, তা সে গ্রামবাসীর মধ্যে প্রচার করে। চিকিৎসা প্রদানে যতীনের একমাত্র প্রতিবন্ধকতা হলো ঔষধ-সংকট। কারণ আলমারির চাবি খগেন দাসের দখলে।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪

এক রাতে যতীন ঔষধচুরির জন্যে ডিসপেন্সারিতে যায়। ভয়ে তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হলেও, এ অপকর্মকে সে মনে করে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এ-সময় তার অজান্তে সেখানে প্রবেশ করে ডাক্তার খগেন। এ ঘৃণ্য অপরাধের জন্য যতীনকে সে তুমুল ভর্ৎসনা করে। কিন্তু তাকে পুলিশে সোপর্দ না করে তিনি ডিসপেন্সারিতে চৌকিদার নিয়োগের ঘোষণা দেন।

পরদিন কম্পাউন্ডারের বাড়ি থেকে শোনা যায় মরাকান্না। মুমূর্ষের মতো মেঝের ওপর পড়ে আছে যতীনের স্ত্রী, মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। যতীনের এ-বিপদে এগিয়ে আসেন ডাক্তার খগেন, এবং জানতে পারেন, সীমিত জ্ঞান নিয়ে স্ত্রীর অসহ্য পেটব্যথার চিকিৎসা করতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছে যতীন। ডাক্তার এজন্য তাকে খুনিরূপে চিহ্নিত করেন। সহকর্মীর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন – 'কেন আপনি আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন না, একবার ডাকলেন না।'[১] প্রত্যুত্তরে ক্ষীণকণ্ঠে যতীন যা শোনায়, তাতে গল্পের বাঁকবদল ঘটে – 'আপনাকে ভিজিট দেবার পয়সা ছিল না।'[২] এ গল্পে যতীন নিঃসন্দেহে অপরাধী। তবে তার অভাবী জীবনযাত্রার বিপর্যস্ত-চিত্র উন্মোচিত হওয়ায় তার প্রতি নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তে করুণাই উদ্রিক্ত হয়। দারিদ্র্যের কষাঘাতে কাতর-কম্পাউন্ডার রোগীর দুদর্শার সুযোগ নিয়েছে, নিজ কর্মক্ষেত্রে ঔষধচুরির চেষ্টা করেছে। সবই সে করেছে অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে।

দারিদ্র্যের অভিশাপে নিম্নবিত্তের নৈতিক স্খলনের দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে 'পিতরি' গল্পে। এখানে সখানাথ মাত্র চল্লিশ টাকা বেতনের কর্মচারী। বাবলীতলী বস্তিতে পরিবারসহ বসবাস করেন তিনি। তার একমাত্র মেয়ে সত্যভামা 'বিদ্যায় সাক্ষাৎ সরস্বতী'। কর্পোরেশনের স্কুলে পড়বার সময় সে বৃত্তি পায়। ম্যাট্রিকে ভালো ফলাফলের সুবাদে বৃত্তিসহ তিন-চারটি কলেজ থেকে তার ভর্তির চিঠি আসে। রূপবিচারে খানিকটা ম্লান হলেও সত্যভামার ছিল মায়াবী দৃষ্টি। একারণে মেধাবী মেয়েটিকে জীবনসঙ্গী করতে চায় বিএ পাশ ধীরেন। বাড়িতে হবু জামাইয়ের আগমন উপলক্ষে সখানাথ বৈঠকখানা বাজার থেকে নিয়ে আসেন বড় বাঁধাকপি, গলদা চিংড়ি এবং পাটনাই পেঁয়াজ। এ স্বল্প আয়োজনে সত্যভামার মনে হয় 'বেশ বড়লোকের মতো বাজার'। সত্যভামার সঙ্গে বিয়েতে কালক্ষেপণ করতে চায় না ধীরেন। বিবাহের দিনক্ষণ পাকাপোক্ত করতে সে নিজেই বস্তিতে উপস্থিত হয়।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮

[২] প্রাগুক্ত

সত্যভামাকে গভীরভাবে ভালোবাসে ধনীপুত্র ধীরেন। অন্যদিকে তাদের জীর্ণ কুটিরের পার্শ্ববর্তী চারতলা বাড়ির একটি ছেলেও তাকে লোলুপদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে। যদিও ধীরেনের সঙ্গে ছেলেটির মানসিকতার ফারাক বিস্তর। ধীরেনের জন্য সত্যভামা নিজেই রান্না করে। কারণ, তার মা গিরিবালা দীর্ঘদিন রোগশয্যায়, ঘরের ভেতর থেকে শোনা যায় তার আর্তনাদ। ধীরেনের আগমনের পর গিরিবালা অতিকষ্টে নিজের শারীরিক কষ্ট নিয়ন্ত্রণ করে শান্ত থাকার চেষ্টা করে। ভাঙা আয়নার সম্মুখে নিজেকে সাজিয়ে ধীরেনের কাছে যায় সত্যভামা। ততক্ষণে সেখান থেকে প্রস্থান করেন সখানাথ। সত্যভামার জন্য ধীরেন উপহার হিসেবে আনে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ এবং পার্কার ব্র্যান্ডের একটি লেডিস কলম। কলমটি দিয়ে সত্যভামা আইএ পরীক্ষায় প্রথম হবে – এমনটি তার প্রত্যাশা।

সত্যভামা যখন ধীরেনকে নিয়ে আগামী দিনের সুখস্বপ্নে বিভোর, তখনই বাইরে এসে সে শুনতে পায় পিতামাতার কথোপকথন। তার পিতার আর্দ্র উক্তিতে উবে যায় তার রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনা :

> ভাবছি সংসারের অবস্থা। তোমার তো এই দশা। তা ছাড়া – সখানাথ খানিকটা শুষ্ক হাসি হাসল : হারাণ বলছিল মেয়ে তো তোমার ছেলের কাজ করবে, বুড়ো বয়সে খেতে দেবে – ছেলে তো আর নেই তোমার। তা ছাড়া যা তোমার শরীর, আর বেশিদিন তো খাটতে পারবে না, এখন মেয়ের ওপরেই নির্ভর করো। আমি বললাম, তা কেন ? আমি কি এতই স্বার্থপর যে –[১]

সহসা ভেঙে যায় সত্যভামার সুখস্বপ্ন, সে অনুধাবন করে পিতার মনোবাসনা। বৃদ্ধকালে পিতা সখানাথকে অন্ন জুগিয়ে তাকে পিতৃঋণ পরিশোধ করতে হবে। এ-পর্যায়ে তার মনে পড়ে যায় পিতার স্বার্থসংশ্লিষ্ট একটি দুঃসহ স্মৃতি। কর্মক্ষেত্রে সুবিধা অর্জনের তার পিতা সখানাথ দশ বছর বয়সী সত্যভামার সঙ্গে বৃদ্ধ হেডম্যানের বিয়ের আয়োজন করে। কেবল গিরিবালার হস্তক্ষেপে তার এ মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়নি, যদিও এজন্য অজস্র পদাঘাত পড়েছে মায়ের পৃষ্ঠদেশে। এতদিন পরেও পিতার মানসিকতার পরিবর্তন না দেখে সত্যভামা অকস্মাৎ আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে জেগে ওঠে এবং ধীরেনকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায়। এসময় তিন তলার বারান্দা থেকে তার সামনে পড়ে একটি নীল খাম। বিকৃতমস্তিষ্ক প্রতিবেশী তরুণের কামনার বার্তা সত্যভামার কাছে এই প্রথম গুরুত্ব পায় :

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'পিতরি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩

> এক মুহূর্ত সত্যভামা অনড় আর অনিশ্চিত হয়ে রইল। সে প্রতিশোধ নেবে – সমস্ত পৃথিবীর ওপর দিয়ে প্রতিশোধ নেবে। তারপরে লোকে যেমন করে বিষের পাত্র হাতে তুলে নেয়, তেমনি করেই সেই সুগন্ধ নীল খামখানাকে তুলে নিয়ে সে চলে গেল ঘরের মধ্যে।[১]

ধীরেনের ন্যায় সুপাত্রকে পরিত্যাগ করে সত্যভামা অতঃপর অন্ধকার পথে ধাবিত হয়। সে নিজের ওপর দারুণ প্রতিশোধ নিতে চায়। দারিদ্র্যের যাঁতাকলে এভাবে পিতা-কন্যা দাঁড়িয়ে যায় পরস্পর-বিরোধী অবস্থানে। এ গল্পে উচ্চবিত্তের সঙ্গে বস্তিবাসীর জীবনচর্চার ব্যবধানকে লেখক সুচিহ্নিত করেছেন। মূল কাহিনিতে প্রবেশলগ্নে তিনি এ বৈষম্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন এভাবে :

> বাজারের থলিটা সরিয়ে রেখে সখানাথ দীর্ঘ প্রসারিত রেখায় আকাশের দিকে তাকাল। কিন্তু আকাশটা খণ্ডিত, বস্তির খোলার চালাগুলোর ওপারেই তাকে প্রতিরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে লালরঙের মস্ত চারতলা বাড়ি। রেলিঙে রঙীন শাড়ি ঝুলছে, দাঁড়ের ওপর শাদা রঙের বড় একট কাকাতুয়া পাখা ঝেড়ে তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করছে কী একটা অভিযোগ নিয়ে। কোথা থেকে আট-ন বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে এসে কাকাতুয়ার ল্যাজ ধরে হালকা একটা টান দিয়ে গেল। রেডিয়োর চিৎকার ছড়াচ্ছে বাতাসে। তেতলার বারান্দাতে ডোরাকাটা পাজামাপরা চশমা চোখে একটি তরুণ পায়চারি করতে করতে কী একখানা মোটা বই পড়ছে।[২]

ধনী আর দরিদ্রের বিত্তগত এ-ব্যবধানের কারণেই বস্তিবাসীদের দৃষ্টিতে ওরা 'সব আলাদা জগতের জীব, ওরা বড়লোক। ওখানে যারা থাকে সখানাথ তাদের চিরদিন ভয় করে এসেছে, সম্মান করে এসেছে।'[৩] এভাবে 'ধনবণ্টন ব্যবস্থার বৈষম্যে মানুষের শ্রেণীগত বৈপরীত্য ও অবস্থান্তরের প্রকৃতি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।'[৪]

নিম্নবিত্তের জীবনসংগ্রামের গল্প 'গন্ধরাজ'[৫]। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুধাংশু চক্রবর্তী। দেশভাগের পূর্বে সে মেঘনা-তীরবর্তী একটি গ্রামের অধিবাসী ছিল। এখন সে কলকাতার ছকু খানসামা লেনে বসবাস করে, চাকরি করে একটি পাবলিশিং কোম্পানির ক্যানভাসারের। পতিতপাবনী এম. ই. স্কুলের হেডমাস্টার নিশাকর সামন্ত

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮

৩ প্রাগুক্ত

৪ সুচিত্রা সেন চন্দ্র, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সময়ের দর্পণ', সঞ্জীবকুমার বসু (সম্পাদিত), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২

৫ 'গন্ধরাজ' *যুগান্তর* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬০) প্রথম প্রকাশিত হয়।

তার কোম্পানির স্বত্বাধিকারী অক্ষয়বাবুর বন্ধু। এ-পরিচয়ে হেডমাস্টারের বাড়িতে থেকে সে পার্শ্ববর্তী স্কুলে প্রচারণা চালাবে। থাকা-খাওয়ার নিশ্চিন্ত বন্দোবস্তের সুযোগে তার মন আনন্দে ভরে ওঠে।

দুপুরে সুধাংশু প্রবেশ করে পতিতপাবনী স্কুলের টিচার্স রুমে। এ কক্ষের পরিবেশ অতি সাধারণ – কয়েকটি কাঠের চেয়ার, একটি বড় টেবিল, কাঁচভাঙা আলমারিতে কিছু বিদীর্ণ গ্রন্থ এবং কয়েকটি ম্যাপ। এ দীনতার ভেতর বেমানানভাবে শোভা পাচ্ছে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা পতিতপাবনীর একটি অয়েলপেন্টিং। শিক্ষক-মিলনায়তনে সুধাংশু নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। একটি বড় থালায় মুড়ি-চিনেবাদাম সহযোগে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন হচ্ছে এবং ছয়জন শিক্ষক ক্ষুধার্তদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে। সুধাংশু সম্ভাষণ জানালেও কেউ গুরুত্ব দেয় না, বরং আসন্ন টিফিনের ব্যাঘাত ঘটায় প্রত্যেকে বিরক্ত হয়। কিছুক্ষণ পর সে জানতে পারে, প্রধান শিক্ষক তিন মাসের ছুটিতে গ্রামে গেছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার তাকে পরদিন স্কুলে আসতে বলেন। এদিকে মধ্যদুপুরে শিক্ষকদের মুড়ি খাওয়ার বিচিত্র শব্দে ক্যানভাসারের ক্ষুধা পায়, তার শুকনো জিহবায় লালা ঘনিয়ে আসে।

প্রত্যাশিত আশ্রয়-অবলম্বন না পেয়ে সুধাংশু অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ে। জেলাবোর্ডের ডাকবাংলোতে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হলে তাকে গুনতে হবে দৈনিক দুই টাকা, যা তার পক্ষে অসম্ভব। একটি খইয়ের দোকানে মাত্র পনেরো পয়সায় সে দুপুরের আহার সম্পন্ন করে – চাঁপা কলা, মোষের দুধ এবং ভেলিগুড়। ক্ষুধা নিবৃত্তির পর তার মনে প্রশ্ন জাগে – 'এমন খই কলার ফলার কাছাকাছি থাকতে দুপুরবেলা খানিক শুকনো মুড়ি কেন চিবিয়ে মরে মাস্টারেরা?'[১] দরিদ্র ক্যানভাসারের তুলনায় গ্রামের স্কুলশিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা যে আরো নাজুক, সুধাংশু তা উপলব্ধি করতে পারে। এরপর একটি বটগাছের ছায়ায় সে নিমিষেই ঘুমিয়ে পড়ে।

গল্পের দ্বিতীয় পর্বে সুধাংশুকে পাওয়া যায় পতিতপাবনী স্কুলের শিক্ষক শশধর বাঁড়ুয্যের গৃহে। এ ভদ্রলোক টিচার্স রুমে পাত্তা না দিলেও, ঘুম ভাঙিয়ে তাকে নিজগৃহে নিয়ে আসেন। এখানে সুধাংশুর জন্য বেশ পরিপাটিভাবে ঘর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। টেবিলের ওপর সস্তা কাঁচের ফুলদানিতে শোভা পাচ্ছে একগুচ্ছ গন্ধরাজ। শীতকালে গন্ধরাজের মৃদু সৌরভ সুধাংশুর চারপাশে সৃষ্টি করে রহস্যলোক। কিঞ্চিৎ ঘোমটা সরিয়ে এক তরুণী তাকে মন্টুদা নামে সম্বোধন করে এবং নিজেকে কণা বলে পরিচয় দেয়। অতিথিকে আপ্যায়নের জন্য শশধর ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সুধাংশুর সম্মানে চা আসে, পরিবেশিত হয় গরম লুচি এবং বেগুনভাজা। স্টেশনের হোটেলের ঢেঁড়শ-চচ্চড়ি এবং কড়াইয়ের ডালের তুলনায় এগুলো তার কাছে অমৃত। সুধাংশু এই

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গন্ধরাজ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৬

নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে অনায়াসে মানিয়ে নেয় – 'দেশ ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালানোর চরম বিস্ময়টাকেই যখন রপ্ত করতে হয়েছে – তখন শিশিরে ভয় নেই তার।'[১] অন্তত একটি রাতের জন্য তাকে মন্টুর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।

ইত্যবসরে অতিথিসেবার জন্য শশধর নিয়ে আসেন দশটি বড় কৈ, দেশত্যাগের পর এমন সতেজ মাছ সুধাংশু দেখেনি। শশধর নতুন আত্মীয়ের সঙ্গে আলাপ জমান। যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিএ ফেল হেডমাস্টারের পরেই যে তার অবস্থান – একথা তিনি বারবার উল্লেখ করেন। কিন্তু সেক্রেটারির স্বজন বলে গজেন বিশ্বাস স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। দি গ্রেট ইন্ডিয়ান পাবলিশিংয়ের বইগুলো চালানোর ব্যাপারে তিনি অতিথিকে শতভাগ আশ্বস্ত করেন।

মধ্যরাতে ক্যানভাসারের বিস্ময়বোধ চরমে ওঠে। অত্যন্ত সংকুচিত অবস্থায় কণা তার ঘরে প্রবেশ করে এবং বলতে থাকে তার সীমাহীন অসহায়ত্বের বৃত্তান্ত। আঁচলের বন্ধন থেকে সে একটি চিঠি খোলে, যেখানে ছোটো ভাই বিনু ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফি চেয়ে দিদির কাছে অনুরোধ করেছে। পূর্বপ্রেমের দাবিস্বরূপ কণা তার কাছে কুড়ি টাকা সাহায্য চায়। ততক্ষণে সুধাংশু মন্টু-চরিত্রের অনেকটাই রপ্ত করে ফেলেছে। তার জীবনে কণা কিংবা বিনুর অস্তিত্ব না থাকলেও, এ মিনতি সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। সকালে গৃহত্যাগের পর তার মনে হয় – 'অভিনয়টা সত্যি সত্যি করেছে কে ? সে – না কণা ? কে বলতে পারে, এই পরিচয়ের ছদ্মবেশটা কুড়িটা টাকা আদায় করার একটা চক্রান্ত কিনা ?'[২]

কোম্পানির অর্থ সুধাংশুকে পূরণ করতে হবে এক মাস রেশন না নিয়ে, কণার অশ্রুর মূল্য পরিশোধ করবে তার স্ত্রী বুলু। আবেগের তাড়নায় কথিত বিনুর প্রতি সহৃদয় হলেও, সুধাংশুর সন্তানের স্কুলের বেতন জোটে না। তবে কুড়ি টাকার চেয়ে তার নিকট মূল্যবান হয়ে ওঠে কণার ফুলদানি থেকে চুরি করা গন্ধরাজ। এর সৌরভে সাংসারিক-পারিপার্শ্বিক গ্লানি থেকে অন্তত একটি দিনের জন্য হলেও সে মুক্তি পাবে। নিম্নজীবীর জীবনযন্ত্রণার পাশাপাশি এর অন্তর্গত সৌন্দর্যকে গল্পকার এ-গল্পে ধরতে চেয়েছেন। ক্যানভাসার-পেশার অন্তরালে সুধাংশুর একটি সুকোমল সত্তা রয়েছে, যা বিশেষ উপলক্ষে উদ্ভাসিত হয়েছে। গল্পে মিথ্যা-সম্পর্কের চেয়ে তার কাছে সত্য হয়ে ওঠে মানবিক আকুতি। এজন্য দু টাকা ভাড়ায় ডাকবাংলোয় না উঠলেও, ক্ষণিকের আবেদনে সে বিলিয়ে দেয় কুড়ি টাকার সম্বল।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০২

এক নিম্নজীবী মজুরের মাটিঘেঁষা স্বপ্ন ভাষারূপ পেয়েছে 'জন্মভূমিশ্চ'[১] গল্পে। জোতদার মাখন সাহার বাড়িতে সাত পুরুষ ধরে কাজ করে বঙ্কা ভুঁইমালি। 'কানা আর হাবা' গোছের এক মেয়েকে বিয়ের জন্য সে মালিকের কাছে অগ্রিম কিছু টাকা প্রার্থনা করে। অথচ তার এই আবেগকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে মাখন সাহা এবং অবজ্ঞার সঙ্গে বলে – 'হারামজাদা, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে ! নিজের চাল-চুলোর বালাই নেই, আবার বিয়ে করবার সখ !'[২] এরূপ অপমানে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বঙ্কা হত্যা করে তার মুনিবকে। এরপর ফেরারি হয়ে সে 'বরিন্দ' এলাকায় চলে যায়। রমন্দ পরিচয়ে সে সেখানে এক বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ নেয়। অবসরে সে গল্পকথকের কাছে জন্মভূমির নানা রূপসৌন্দর্য বর্ণনা করে। মহানন্দা নদীতীরবর্তী এক কাল্পনিক গ্রামের সমান্তরালে তার চোখে ভাসে এক গৃহকর্মনিপুণা বধূর জীবনযাপনচিত্র। দুটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

> ক) সে সোনার দ্যাশ। এমন 'অইদে'-পোড়া মরা মাটি নাই সেইঠে। অঢেল্ বর্ষা, অঢেল্ পানি, অঢেল্ ধান। ক্যাতে আমগাছ, আর – রোদের দিকে তাকিয়ে বললে, ক্যাতে যে ছায়া সিটা আর তোমাক্ কী কহিব বাবু ![৩]
>
> খ) কহিলে হয়তো ভাবিবেন বেশি কহোছি। অমন মেইয়া তিনখানা গাঁয়ে মিলে না। যেমন : গড়ন-পিটন, তেমন কাজ-কাম্। বাবুঘরের বৌ হইলে অক মানাইত।[৪]

ব্যক্তিজীবনে হাজারো বঞ্চনা ভুলতে রমন্দ আদর্শ গ্রামের স্বপ্ন দেখে। নতুন কর্মক্ষেত্রে এসে সে কখনো অসততার পরিচয় দেয়নি। গৃহকর্তার কাছে সে প্রতিটি পয়সার হিসেব দিয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। রমন্দকে পরীক্ষা করার জন্য দু-একটি টাকা যত্রতত্র ফেলে রাখা হলেও, সে তা ফেরত দিয়েছে বিশ্বস্ততার সঙ্গে।

নিরুদ্দিষ্ট বসবাসের কিছুদিন পরে পুলিশ রমন্দকে গ্রেপ্তার করে। জঘন্য হত্যাকাণ্ডের অপরাধে রমন্দের নিশ্চিত ফাঁসি হবে জেনেও, গল্পকথকের মনে হয়েছে :

> মহানন্দার ওই ওপারে ছায়াঘেরা গ্রাম, ক্ষীরশালী ধান আর টুকটুকে বউয়ের সোনার দেশটা, সে কি নিতান্তই মিথ্যে কথা ? অথবা নিঃসম্বল ক্ষেতমজুরের চিরকালের স্বপ্নে-গড়া সেই সোনার দেশ একদিন পরম সত্য হয়ে দেখা দেবার প্রতীক্ষা করে আছে, ক্ষুধিত অভাগা মানুষের চিরন্তন 'সব পেয়েছির দেশ' ?[৫]

---

[১] 'জন্মভূমিশ্চ' *পূর্বাশা* পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় (১৩৫৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'জন্মভূমিশ্চ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১৭

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১১

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১৬

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১৭

এ গল্পে রমন্দ অতি সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করে সংসার গড়তে চেয়েছে। কিন্তু তার সেই ছোট্ট ইচ্ছাও সে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। সাময়িক উন্মাদনায় রমন্দ পাষণ্ডের পরিচয় দিলেও, তার সুকোমলবৃত্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। সর্বহারা ক্ষেতমজুরের রিক্ত হৃদয়ের হাহাকার এবং জন্মভূমির প্রতি তার সুতীব্র ভালোবাসা গল্পের পূর্বাপর প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

নিম্নবিত্তের আত্মসম্মানবোধ কতবেশি প্রবল হতে পারে তা উঠে এসেছে 'দায়মোচন'[১] গল্পে। এ-গল্পে তনুশ্রীদের বাড়ির নিচ তলার ভাড়াটে ছিল ভূপেনের পরিবার। তনুশ্রীর বাবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, অন্যদিকে ভূপেনের পিতার মাসিক আয় মাত্র দেড়শো টাকা। স্থানীয় সরস্বতী পূজায় ভূপেনকে দেখে তার প্রতি মুগ্ধ হয় তনুশ্রী। ক্রমেই সামাজিক অবস্থান বিস্মৃত হয়ে তারা ঘনিষ্ঠ হয় এবং এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় তনুশ্রী নিজের আংটি ভূপেনকে উপহার দেয়। ভূপেনের বাবা বাড়ি পরিবর্তন করলে তাদের প্রেমে ছেদ পড়ে। অতঃপর ভূপেনের অশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ, বেমানান শার্ট এবং ময়লা জুতা তনুশ্রীর হাস্য-পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য ভূপেনকে দেয়া আংটির জন্য তার মনে বিরাজ করে চাপা উৎকণ্ঠা। কারণ আংটির ওপর ক্ষোদিত রয়েছে তার নামের স্বাক্ষর। এ অধিকারে ভূপেন তার সামনে দাঁড়াতে পারে – এরূপ দুশ্চিন্তায় সে প্রায়শ আচ্ছন্ন হয়।

গল্পে এক যুগ পর ভূপেনের সঙ্গে তনুশ্রীর দেখা হয়। চন্দননগর থেকে ফেরার পথে মেয়েটির গাড়ি বিকল হয়ে যায়। অফিসের কাজে স্বামী দিল্লিতে থাকায় তনুশ্রী নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল। বিকল গাড়িটি মেরামতের জন্য সে এসময় মোটর মেকানিকের খোঁজ করে। কিছুক্ষণ পর ভিড় ঠেলে যে আসে, সে অন্য কেউ নয় – ভূপেন। বলিষ্ঠ হাতে যন্ত্রাদি খুলে ভূপেন সমস্যা চিহ্নিত করে এবং বলে যে, দু ঘণ্টার পূর্বে গাড়ি সচল করা সম্ভব নয়। এজন্য মেরামতের প্রয়োজনে সে গাড়িটি কারখানায় নিয়ে যায়। এসময় মেয়েটিকে সে তার গৃহে বিশ্রামের প্রস্তাব দেয়। ভূপেনের স্ত্রী-সংসারের সংবাদ তনুশ্রীকে রোমাঞ্চিত করে। তার ধারণা – আংটি ভেঙে ভূপেন হয়তো স্ত্রীর গলার হারের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

কারখানার পেছনে ভূপেনের বসবাস। কেরানি পিতার তুলনায় তার রোজগার যে নিতান্ত কম, তা বাড়ির কাঠামো দেখেই বোঝা যায়। দরজা খুলতেই বেরিয়ে আসে ভূপেনের স্ত্রী রমা। অপরিচিতাকে দেখে বিস্মিত হলেও স্বামীর নির্দেশে সে অতিথিকে বরণ করে নেয়। ভদ্রমহিলার দামি শাড়ি এবং প্রসাধন-মার্জিত পরিচ্ছন্নতার পাশে রমাকে অত্যন্ত ম্লান দেখায়। ভূপেনের কালিমাখা চেহারা এবং জীর্ণ আবাসস্থলের সঙ্গী না

---

[১] 'দায়মোচন' মাসিক *বসুমতী* পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৫৮) প্রথম প্রকাশিত হয়।

হয়ে তনুশ্রী নিজেকে বিজয়ী ভাবে। পরমুহূর্তে আবার ভূপেনের নির্লিপ্ততায় সে বিষণ্নতা বোধ করে। তার প্রতি প্রাক্তন প্রেমিকের অবহেলা সে মানতে পারে না। রমার স্বামী-সৌভাগ্যের প্রতীক লাল শাড়ি এবং কপালের সিঁদুর তার মনঃকষ্টকে বাড়িয়ে তোলে। অজানা আক্রোশে সে ভূপেনের ওপর বিষিয়ে ওঠে।

চা পানের সময় দুই নারীর গল্প হয়। বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে রমাদের গ্রাম। নদী, শালবন এবং ধানক্ষেত-ঘেরা গ্রামটি ছিল ছবির মতো। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীর পদচারণায় বিনষ্ট হয় তাদের গ্রামের সৌন্দর্য। রমাদের দেড়শো বিঘা ধানি জমি ব্যবহৃত হয় যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট কাজে। এ সম্পত্তি তারা আর ফিরে পায়নি, সেখানে পড়ে রয়েছে মিলিটারিদের ভগ্ন ক্যাম্প, লোহালক্কড় এবং এরোপ্লেনের ধ্বংসাবশেষ। তৎক্ষণাৎ ঘরের ভেতর শোনা যায় ভূপেনের ছেলের কান্না, ম্যালেরিয়া আক্রান্ত শিশুটিকে দেখতে যায় তনুশ্রী। দরিদ্র প্রেমিকের স্ত্রী-সন্তান পরিবেষ্টিত জীবন তাকে ঈর্ষান্বিত করে। সমস্ত সংকোচ-সংশয় কাটিয়ে সে বলতে চায় –

> আমি – আমি সেই তনুশ্রী। ভালো করে তাকাও আমার দিকে, তাকাও আমার সেই পনেরো বছরের কালো গভীর চোখের ওপর। তার পর নতুন করে জীবনের প্যান্ডালে পরিপূর্ণ আলোর মধ্যে তুমি এসে দাঁড়াও।... এই ঘর নয়, এই বুক-চাপা অন্ধকার নয়, এই স্ত্রী আর অসুস্থ সন্তানে গ্লানির মধ্যে নয় – অফুরন্ত প্রাণের উৎসবে হোক তোমার শাপমোচন ![১]

নির্ধারিত সময়ের পূর্বে গাড়ির কাজ সম্পন্ন হয়। তনুশ্রী পারিশ্রমিক হিসেবে পাঁচ টাকার নোট দিলে ভূপেন ব্যবসায়িক ভঙ্গিতে তা তুলে নেয়। চলতিপথে মেয়েটি গাড়ির ভেতর দেখতে পায় তার দেওয়া আংটি। সে বুঝতে পারে, এতক্ষণ নিপুণ অভিনয় করেছে ভূপেন। দীনতার আভিজাত্যে সে আঘাত হেনেছে তনুশ্রীর ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে।

'দায়মোচন' গল্পে ভূপেনের নিস্পৃহতা এবং তনুশ্রীর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তাদের পারস্পরিক ভালোবাসাকে ইঙ্গিতময় করে তোলে। অসম সামাজিক অবস্থানে তাদের সম্পর্ক একপর্যায়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। সময়ের ব্যবধানে পারিবারিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে তনুশ্রী একাত্ম হয়ে যায়, ভুলতে চায় হৃদয় বিনিময়ের পূর্বস্মৃতি। তনুশ্রীর ভয় ছিল, ভূপেন যে-কোনো সময়ে ভালোবাসার দাবি নিয়ে এসে তার জীবন এলোমেলো করে দিতে পারে। সে আশঙ্কা যে অমূলক ছিল, তা ভূপেন তার নিস্পৃহতার মাধ্যমে যেন বুঝিয়ে দিয়েছে তনুশ্রীকে। এর ফলে তনুশ্রীর লালিত অহংকার হয়ে গেছে বিচূর্ণ।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দায়মোচন', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৭

'মর্যাদা'[১] গল্পেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অন্ত্যজ শ্রেণির আত্মগৌরবকে শিল্পমূল্য দিয়েছেন। এ গল্পে কলেজ-হোস্টেলে কমলা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। অল্পবয়সের এক মুচি তাকে দিদিমণি সম্বোধন করে। ছেলেটি তার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে, পারিশ্রমিকও নেয় অপেক্ষাকৃত কম। এ নিয়ে বান্ধবীরা কমলার সঙ্গে রসিকতা করে। মজুরির তারতম্যের কারণে ছেলেটির সঙ্গে অন্যদের গোলযোগ বাধে। পূজার ছুটিতে কমলার পুরী যাওয়ার সংবাদে ছেলেটি রোমাঞ্চিত বোধ করে। দিদিমণির সঙ্গে ভ্রমণের জন্য সে অর্থ যোগাড়ে মরিয়া হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যে তার বেশভূষায় আসে লক্ষণীয় পরিবর্তন। ছেঁড়া গেঞ্জির পরিবর্তে সে পরিধান করে নতুন শার্ট, পরিচ্ছন্ন ধূতি।

এরপর ঘটে ছন্দপতন। ভারী বৃষ্টিতে কমলার তিন জোড়া জুতা নষ্ট হয়ে যায়। অগত্যা জুতা সেলাইয়ের জন্য সে জানালা দিয়ে মুচিকে ডাক দেয়। তার এ ডাকে ছেলেটি সাড়া দেয় না, বরং চাকরের মাধ্যমে সে জুতা পাঠিয়ে দিতে বলে। কমলা জলদি ফেরত চাইলেও, দুদিন পর আরেকটি ছেলে চটিজোড়া দিয়ে যায়। তার মাধ্যমে কমলা জানতে পারে, ছেলেটি কলকাতায় কাজ করবে না। সকালে সে গ্রামে ফিরে গেছে। মুচি-পেশার বাইরেও সে যে মানুষ – এটিই সে কমলাকে বোঝাতে চায়। এ ঘটনা কমলাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। ছেলেটির নীরব অভিমান তাকে মানুষের প্রতি সহৃদয় অনুভবে জাগ্রত করে তোলে। তাই দীর্ঘদিন পর তার স্বামী একজনকে মুচি বলে ডাকলে সে বারণ করে। এ গল্পে ছেলেটি আত্মমর্যাদার জন্য চিৎকার করেনি। কমলাকে দিদির স্থানে রেখে সে অনুজপ্রতিম স্নেহ প্রত্যাশা করেছিল। অথচ তার ক্ষুদ্র মনোবাঞ্ছা মেয়েটি সেদিন পূরণ করতে পারেনি। ফলে অভিমানকে সম্বল করে সে বিদায় নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। তার এ-বিদায় যে একজন মানুষকে মানবীয় উপলব্ধিতে জাগিয়ে তুলতে পেরেছে, এটিই এ-গল্পের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন নারায়ণ।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আত্মদানের কাহিনি অবলম্বনে শিল্প-সাহিত্য নির্মিত হলেও, বাস্তবজীবনে এরা উপেক্ষিত হয় – এমন প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটেছে 'কালো মোটরে'[২]। এ গল্পে সেন মহাশয় তার অফিসের বেয়ারা অবনীশকে একটি থিয়েটারের আমন্ত্রণপত্র দেন। নিউ আর্টিস্টস ক্লাবের সদস্যরা সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ করবে – 'নতুন যুগ' নাটক।

---

[১] 'মর্যাদা' *আনন্দবাজার* পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় (১৩৬২) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] 'কালো মোটর' *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৬৪) প্রথম প্রকাশিত হয়।

এটি পেশাদার থিয়েটার নয়, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা এখানে অভিনয় করে। এ নাটকের টিকিট বাইরে বিক্রয় হয় না, তাই প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত।

বেয়ারা হলেও অবনীশ ভদ্রঘরের সন্তান, ম্যাট্রিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। এজন্য অফিসের কেরানিদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুভাবাপন্ন। সেন সাহেব যে স্নেহবশত কার্ডটি দিয়েছেন – এ ব্যাপারে সে সুনিশ্চিত। অফিস চলাকালে অবনীশ থিয়েটার উপভোগের স্বপ্নে শিহরিত হয়। ঘরে ফিরে সে দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বস্তির কাঠের দোতলার উপরের অংশে অবনীশের সঙ্গে থাকে আরো চারজন। এদের একজন কলেজের দপ্তরি, অন্যজন হাতকাটা ফেরিওয়ালা এবং বাকি দুজন তার মতো বেয়ারা। মেদিনীপুর থেকে তারা এ বস্তিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে বেচু সিনেমা দেখবার প্রস্তাব দিলে অবনীশ তা বিদ্রূপের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। থিয়েটারের কার্ডটি যেন তাকে বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তাই গরমের মধ্যে সে পরিধান করেছে কোর্ট-প্যান্ট, চোখে লাগিয়েছে ফুটপাতের পাওয়ারহীন চশমা এবং হাতে অচল ঘড়ি। বেচু তার সঙ্গী হতে চাইলে সে তাকে এড়িয়ে গেছে। একটি কার্ড তাকে নিয়ে গেছে ‘রেসপেকটেবল্ লোকের’ পর্যায়ে।

রূপমহল থিয়েটারে পা রাখতেই অবনীশের উৎসাহ-উত্তেজনা কমতে থাকে। সেখানে দামি মোটর থেকে নামছেন ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ; যাদের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। ফুলের ব্যাচ সম্বলিত তরুণ স্বেচ্ছাসেবী তার পথরোধ করে। কম্পিত হস্তে কার্ড প্রদর্শন করলেও এরা তার সামাজিক অবস্থান উপলব্ধি করতে পারে। এজন্য তাকে বসতে দেয় একেবারে পেছনের সারিতে। মুহূর্তে অবনীশের চৈতন্যোদয় হয়। বস্তির কাঠের দোতলা এবং ইটের অট্টালিকার যেরূপ ব্যবধান, কার্ডধারী অবনীশের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য অনুরূপ। এসময় বেচুর সিনেমায় যাওয়ার প্রস্তাব তার কাছে উত্তম বিবেচিত হয়।

নাটক আরম্ভের পূর্বে চলে আলোচনা-পর্ব। স্বনামধন্য ব্যারিস্টার এল. আর. চৌধুরী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এক ঘণ্টা ধরে তারা অভিনয়, সংস্কৃতি এবং ইউরোপীয় জীবন ও ভাবধারা সম্পর্কে বক্তৃতা করে। এসব জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা অবনীশের ভালো লাগেনি। নিজের অজান্তে সে ঘুমিয়ে পড়ে। আচমকা ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্যে তার ঘুম ভাঙে। মঞ্চে এক কিশোরী তার ভাইকে বন্যার আগমন-বার্তা শোনাচ্ছে। অবনীশের জীবননাট্যে ঘটেছিল একইরকম দৃশ্য। শত-শত মানুষ হত্যা করে মিলিটারিরা ফেলে রাখে উড়িষ্যা ক্যানালে। তারপর বানের জলে ভেসে যায় তাদের গ্রাম, বাঁধ ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয় কাজুবাদামের বন, নারিকেল গাছ এবং সেনাছাউনি। মঞ্চের মেয়েটির মতো তারও একটি বোন ছিল। এভাবেই সে ডেকেছিল বাবা-মা ও ভাইকে। ঝড়ের বাতাসে অবনীশ আটকে ছিল শিব মন্দিরের চূড়ায়।

মেদিনীপুরের জলোচ্ছ্বাসের দৃশ্য কলকাতার নাট্যমঞ্চে জীবন্তভাবে উপস্থাপন করা হয়। তবে এ নিয়ে দর্শকদের ন্যূনতম আকর্ষণ নেই। বিরতিলগ্নে কেউ পান খায়, গল্প করে, কেউ বাইরে গিয়ে সিগারেট জ্বালায়। কিন্তু অধীরচিত্তে অপেক্ষা করে অবনীশ। নাটকের পরবর্তী দৃশ্যপট কলকাতার রাজপথ। আর্দ্রকণ্ঠে এক যুবক তার কষ্টের বৃত্তান্ত জানায়। পরিবারের সকলকে হারিয়ে সে একাকী বেঁচে আছে। কলকাতার একটি অফিসে সে বেয়ারার কাজ করে। এ শহরে রয়েছে তার ছোটো বোন। যে কোনো উপায়ে ছেলেটি বোনকে উদ্ধার করতে চায়। অবনীশ আশ্চর্য হয় – এ তারই জীবনের গল্প। চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সে বলতে থাকে – 'খুঁজে পেতেই হবে। হয়তো সত্যিই পদ্ম বেঁচে আছে, হয়তো এই কলকাতা শহরে কোনো পরম দুর্ভাগ্যের মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে আছে।'[১] এভাবে চরিত্রটি হয়ে ওঠে অবনীশের 'দ্বিতীয় আত্মা'।

মঞ্চের অভিনেতা একটি কালো মোটরে বোনের প্রতিকৃতি দেখে চিৎকার করে। অবনীশও সেদিকে ছুটে যেতে চায়, তখনই হুইসেল বাজে। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর পি. কে বরাইয়ের মৃত্যুসংবাদে নাটক স্থগিত হয়ে যায়। দর্শকশূন্য থিয়েটারে স্থির বসে থাকে অবনীশ। কালো মোটরের যাত্রীর পরিচয় জানবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ফিরতি পথে সে ভাবে, তার দুঃস্মৃতি নিয়ে রসিকতা করেছেন সেন মহাশয়। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য অবনীশের তখন স্মরণ নেই যে – 'পিছন থেকে তীরবেগে আর-একটা কালো মোটর এসে পড়েছে। ঠিক তার দু'হাত পিছনেই।'[২] এভাবে উচ্চবিত্তের শিল্পালয়ে অবনীশ তাচ্ছিল্যের শিকার হয় এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গ্লানিময় জীবন থেকে মুক্তি পায়।

এক বেকার যুবকের দুর্ভাগ্যের কাহিনি সন্নিবেশিত হয়েছে 'কেয়া'[৩] গল্পে। এ গল্পে জয়ন্ত গ্রাম-সুবাদের কাকার গৃহে আশ্রিত। গৃহকর্তা আর্থিকভাবে অসচ্ছল, চিৎপুরে রেলওয়ে স্টেশনের তিনি সামান্য কর্মচারী। কাকা তার প্রতি সদয় আচরণ করলেও কাকি বরাবরই নির্দয়। টিউশনি থেকে জয়ন্তের যৎসামান্য উপার্জন চলে যায় আশ্রয়দাত্রীর আঁচলে। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও জয়ন্ত এ-বাড়িতে অবস্থান করে কেবল কেয়ার জন্য। কাকার একমাত্র মেয়ে কেয়াকে সে ভালোবাসে। তাকে পাওয়ার জন্য জয়ন্ত একটি চাকরি যোগাড় করতে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং এক্ষেত্রে সে ভরসা করে রামপদ মল্লিককে।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালো মোটর', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৭-১১১৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৯

[৩] 'কেয়া' *আনন্দবাজার* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৪) প্রথম প্রকাশিত হয়।

এ গল্পে রামপদ বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি। হাওড়ায় তাঁর কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কর্কশকণ্ঠী কাকাতুয়া পাখি পোষা তাঁর শখ। সপ্তম শ্রেণিতে তিনবার অকৃতকার্য হয়ে রামপদ উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর পিতা বিষয়টি লক্ষ করে পুত্রের বিবাহ দেন। এরপর রামপদ সংসারী হয়েছেন, দু-তিনটি সন্তানের পিতা হয়েছেন, পৈতৃক ব্যবসায় পেয়েছেন সমৃদ্ধি। তথাপি তাঁর মনে শান্তি নেই। কারণ তিনি পড়ালেখা করেননি। কমপক্ষে স্কুল ফাইনাল পাশের লক্ষ্যে তিনি জয়ন্তকে গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন।

জয়ন্ত আশাবাদী যে, রামপদ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার চাকরির ব্যবস্থা হবে। কিন্তু লোকটি লেখাপড়ায় যথেষ্ট উদাসীন। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে তিনি প্রতি সপ্তাহে পুজো দেন। জয়ন্ত একাধিকবার সচেতন করলেও তিনি বরাবরই থাকেন নির্বিকার। পরীক্ষা আসন্ন জেনেও রামপদ সপরিবারে থিয়েটারে যান। জয়ন্ত একাধিকবার টিউশনি ছাড়তে মনস্থির করেছে, কিন্তু সম্ভব হয়নি। পরীক্ষার দুদিন পূর্বে রামপদ ব্যক্ত করেন তাঁর বিদ্যাচর্চার গোপন রহস্য। জয়ন্তকে রামপদ সাজিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সমস্ত আয়োজন তিনি সম্পন্ন করেছেন।

এদিকে কাকির লোভ এবং স্বার্থপরতার কারণে কাকা জড়িয়ে পড়েন অনৈতিক কার্যক্রমে। টিউশনি থেকে ফিরে জয়ন্ত শোনে – চুরির অপরাধে কাকা গ্রেপ্তার হয়েছেন, নগদ পাঁচশত টাকা ছাড়া তাঁর জামিন অসম্ভব। বাবাকে রক্ষা করতে উদ্ভ্রান্ত কেয়া বলে – 'বাবাকে বাঁচাতে গেলে এখন আমাকে কোথাও চুরি করতে বেরুতে হয় জয়ন্তদা ! অথবা আরও কোন অধঃপাতের পথ খুঁজতে হয় !'[১] প্রেমিকার সকল দুশ্চিন্তা জয়ন্ত নিজ স্কন্ধে তুলে নেয়। এক অপরাধীকে রক্ষা করতে সে অন্য অপরাধের দিকে ধাবিত হয়। পাঁচশত টাকার বিনিময়ে সে মুহূর্তে রামপদ মল্লিকের কাছে বিক্রি হয়ে যায় এবং তাঁর পক্ষে পরীক্ষায় অংশ নেয়। কিন্তু পরীক্ষা শুরুর আধ-ঘণ্টার মধ্যে কক্ষ-পরিদর্শক তাকে ভুয়ো ছাত্র হিসেবে শনাক্ত করেন। ভালোবাসার জন্য জয়ন্ত জীবনবাজি রাখলেও, তার পরিণতি হয় অনিশ্চিত। এই ঘোর বিপত্তির কালে তার চৈতন্যলোকে সাড়া তোলে একটি মর্মবিদারী প্রশ্ন –

> জয়ন্ত জানে। অফিস থেকে তাকে পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করা হবে। সেখান থেকে থানার হাজতে। কাঁধের উপর কয়েকটা কঠিন আঙুলের নিষ্ঠুর চাপ অনুভব করতে করতে জয়ন্ত ভাবল : 'তার জামিনের ব্যবস্থা করবে কে ? রামপদ, না কেয়া ?'[২]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কেয়া', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

[২] প্রাগুক্ত

প্রতারক মানব চক্রবর্তীর জীবনের রূপ-রূপান্তরের গল্প 'সঞ্চার'[১]। লোকটি কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ কয়েকবার কারাগারে ছিল। কারামুক্তির পরও নানা অভিযোগে পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। ঠকবাজ হলেও সে সুপুরুষ – 'উজ্জ্বল রঙ, চমৎকার ওল্‌টানো চুল, ধারালো নাক, ঝকঝকে চোখের দৃষ্টি।'[২] দৈহিক গড়নের কারণে সে অনায়াসে ভদ্রমহলে মিশে যায়। শঙ্করী তার চতুর্থ স্ত্রী, কিছুদিন পর জন্ম নেবে তাদের সন্তান। শঙ্করীকে বিয়ের সময় মানব নিজেকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের কেরানি বলে মিথ্যা পরিচয় দেয়। পূর্বের স্ত্রীদের সে অবলীলায় ছেড়ে আসলেও শঙ্করীকে ছাড়তে পারে না। কারণ, শত নির্যাতনেও মেয়েটি প্রতিবাদ করে না, বরং প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়েও স্বামীর জন্য আহার প্রস্তুত করে। বস্তির পানির কলে হিন্দুস্থানি মেয়েরা যখন অকারণ ঝগড়ায় মেতে ওঠে তখনও সে নিশ্চুপ থাকে। স্ত্রীর এই নিস্পৃহতা কখনো কখনো মানবের কাছে অস্বস্তিকর ঠেকে।

একসময় ভাগ্যোন্নয়নের জন্য মানব চক্রবর্তী কলকাতায় আসে। সে নিজে চাকরি না পেলেও মানুষকে চাকরি প্রদানের প্রলোভন দেখায়। অপেক্ষাকৃত নিরীহ প্রকৃতির লোকজন, বিশেষ করে স্কুলশিক্ষকরা দ্রুত তার শিকারে পরিণত হয়। কারণ ধনী হওয়ার বাসনা না থাকলেও, অভাবের সংসারে সচ্ছলতার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তারা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়। গল্পে বৃদ্ধ করুণাময়কে সে 'নাইনটিন ফরটির' তারাপদ দাস বলে পরিচয় দেয়। প্রাক্তন ছাত্র আমেরিকান ফার্মে উচ্চবেতনে চাকরি করছে জেনে করুণময় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। অন্যদিকে শিক্ষকের দুরবস্থায় মানব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে – 'আপনারাই দেশ গড়ছেন – অথচ আপনারাই হচ্ছেন সবচাইতে এক্সপ্লয়টেড।'[৩]

এদিন করুণাময়কে মানব একটি টিউশনির প্রস্তাব দেয় – দুই জন আমেরিকান অফিসারকে সপ্তাহে দুদিন বাংলা শেখাতে হবে। এজন্য সম্মানি হিসেবে তিনি পাবেন আড়াইশো টাকা, সঙ্গে উত্তম ডিনার এবং আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগ। এরকম বেতনে অধ্যাপকদের নিয়োগ দেয়া যায় – এরকম মন্তব্য করলে করুণাময়ের প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিয়ে মানব বলে – 'ওরা বলে প্রফেসাররা ফাঁকি দেবে – স্কুল-টীচারেরাই সত্যিকারের সিরিয়াসনেস নিয়ে পড়ায়।'[৪] অভিভূত করুণাময় ত্রিশ টাকার দুটো টিউশনি ছেড়ে তৎক্ষণাৎ এ

[১] 'সঞ্চার' *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৬) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সঞ্চার', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

কাজে যোগ দিতে চান। শুধু তাই নয়, বিদেশিদের ভাষাশিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থ পড়ে তিনি মধ্যরাত পর্যন্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

পরদিন গুরুদক্ষিণার নামে করুণাময়কে মানব স্বপ্নময় পরিমণ্ডলে বিচরণ করায় – 'জীবনে কখনো ফাঁকি দিলেন না, অথচ বরাবর ফাঁকি পড়লেন। তবে আমেরিকানরা গুণীর কদর বোঝে, ওরা খুশি হলে হয়তো আপনাকে আর স্কুলমাস্টারিই করতে হবে না।'[১] এ বক্তব্যে আত্মসংযমী শিক্ষক হারিয়ে ফেলেন চারিত্রিক দৃঢ়তা, আবেগ-উত্তেজনায় তিনি কাঁপতে থাকেন। তবে করুণাময়ের জন্য মানবের হৃদয়ে কোনো করুণা নেই। বৃদ্ধকে নিয়ে সে উপস্থিত হয় পার্ক স্ট্রিটের একটি অট্টালিকার সামনে। এ পর্যায়ে সে কৌশলে আত্মসাৎ করে বৃদ্ধের জার্মান-প্রবাসী ছাত্রের পাঠানো কলম, যার সেকেন্ড হ্যান্ড মূল্য পঞ্চাশ টাকা এবং কথিত-ফর্মের মূল্য বাবদ ত্রিশ টাকা। এরপর মানব পালানোর চেষ্টা করলে বৃদ্ধের আর্তনাদে থমকে দাঁড়ায় – 'আমার চশমাটা যে হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল তারাপদ – চশমা না থাকলে আমি যে একেবারে অন্ধ !'[২]

এ ঘটনায় বাকরুদ্ধ-মানব টাকা-কলম ফেরত দিয়ে বৃদ্ধকে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দেয়, এমনকি ভাড়াও পরিশোধ করে। এভাবে করুণাময়ের সংস্পর্শে মানব চক্রবর্তীর মধ্যে সঞ্চারিত হয় মানবিকতার বীজ। উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্তের সঙ্গে জোচ্চুরি করলেও দরিদ্র শিক্ষকের কাছে সে হার মানে। এদিন শঙ্করী স্বামীর ললাটে শীতল হাত স্পর্শ করলে মানব বলে – 'গোটা পনেরো টাকা আছে বোধ হয়। কাল থেকে লোক্যাল ট্রেনে টফি-লজেন্সই ফিরি করব ভাবছি।'[৩]

'সঞ্চার' গল্পে নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয়েছে মানবের মানবেতর জীবনযাপন। সে একাই প্রবঞ্চনায় লিপ্ত হয়নি, সমাজের মানুষ তাকে বহুবার নিগৃহীত করেছে। শৈশবে বিমাতার নিষ্ঠুর আচরণে সে বাড়ি ছাড়ে। স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে মানুষের প্রতি ঘৃণা নিয়েই সে বেড়ে উঠেছে। সে দেখেছে ভয়ানক লোভ, ঘুষের বিনিময়ে চাকরিলাভ এবং চোরাকারবারের ব্যবসায়। একারণে তার কাছে 'এদের না ঠকানোই অন্যায়, ফাঁকি দিয়ে এরা পেতে চায় বলে ফাঁকিটাই এদের আসল পাওনা।'[৪] সুস্থ সমাজে মানবের জায়গা হয়নি, গুমোট এবং দুর্গন্ধময় বস্তি হয়েছে তার আবাসস্থল; ছারপোকা-ভর্তি তক্তপোশের কণ্টক-শয্যায় কেটেছে তার প্রতি রাত।

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

স্ত্রীর ক্ষুদ্র চাহিদা সে পূরণ করতে পারে না। গর্ভবতী শঙ্করীর জন্য কুচো চিংড়ি এবং কুমড়ো শাক ক্রয়ের সামর্থ্য তার হয়নি। মানব জানে – তার অনাগত সন্তান শুধু খাবার নয়, বঞ্চিত হবে মাতৃদুগ্ধে। কারণ অভাবের তাড়নায় শঙ্করীকে হয়তো ভিক্ষাবৃত্তিতে নামতে হবে।

শুধু মানব চক্রবর্তী নয়, করুণাময়ের অর্থনৈতিক অবস্থাও হতাশাব্যঞ্জক। তাঁর আইএসসি পড়ুয়া অসুস্থ-ছেলেটি বিনা-চিকিৎসায় মারা যায়। একটি ধূসর চশমায় তিনি অতিবাহিত করেন দিনের পর দিন। এরপরও সামান্য ভুলের কারণে প্রধান পরীক্ষক তাঁর 'এগজামিনারশিপ' কেড়ে নেন। সমাজের সর্বপর্যায়ে লাঞ্ছিত জনগোষ্ঠীর রূপ যে অভিন্ন – এটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিপাদন করেছেন।

'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু'[১] গল্পে 'প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা, গলদ, ফাঁকি, দুর্নীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাছাড়া বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় গরিব ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করা অসম্ভব; এই চূড়ান্ত সত্যটিও অধ্যাপক-লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সহানুভূতিশীল দরদী মন নিয়ে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।'[২] মেদিনীপুরের এক কৃষকপুত্র স্বাধীনকুমার। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তার পিতা মারা যান। পৈতৃক বৃত্তি কৃষিকাজ হলেও স্বাধীনকুমারকে তার চাচা গ্রামের মাইনর স্কুলে ভর্তি করেন। মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ সে স্কলারশিপ পায়। এরপর স্বপ্নচারী বালক দূরবর্তী একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র হয়।

বিদ্যালয়ের হোস্টেলে ওঠার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় স্বাধীনকুমারের আশ্রয় হয় সামন্তদের বাড়ি। এখানে পড়ালেখার পাশাপাশি তাকে ব্যবসায়িক হিসেব রাখতে হয়। রাতে তার ঘরে থাকে আড়তের মুহুরি। পড়ার সময় লোকটি অশ্লীল গল্প জুড়ে দেয়। স্বাধীনকুমার তাকে নিবৃত্ত করলে শুনতে হয় বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য – 'আরে থাম্ বাপু, থাম্ ! চাষার ছেলে বিদ্যাসাগর হবে – হেঁঃ! তার চেয়ে হুঁকোটা ধর – তামাক খাওয়াটা শিখে নে !'[৩] এরপরই নিভে যায় ঘরের লণ্ঠন। কেননা তার জন্য বরাদ্দকৃত কেরোসিনে রাত নয়টার পর আলো জ্বালানো সম্ভব হয় না। পাঠ্যবই কেনার সঙ্গতিও তার ছিল না। স্কুল ফাইনাল আসন্ন হলেও তার অর্ধেক বই কেনা হয়নি। মাইনরে ভালো ফল করলেও সঙ্গত কারণে সে এবারে তৃতীয় শ্রেণিতে পাশ করে।

পরীক্ষার ফলের এই বিপর্যয়ে স্বাধীনকুমারের মনোবল ভেঙে পড়ে। তথাপি মায়ের উৎসাহে সে কলকাতায় যায় এবং একটি 'অকুলীন' কলেজে ভর্তি হয় সামন্তদের সুপারিশে এখানে তার আশ্রয় জোটে সরকারবাড়িতে।

---

[১] 'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু' *স্বাধীনতা* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৭) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] বিজিত ঘোষ ড., *বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যালের কাছে 'কনসেশনে'র অনুরোধ করলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন – 'তা হলে কলেজে পড়তে এলে কেন ? চাষবাস দেখলেই পারতে ! হায়ার এডুকেশন তোমাদের জন্যে নয় – গো গো – ডোন্ট্ ডিস্টার্ব মী– ।'[১] অথচ কলেজের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এ অধ্যাপক হয়ে ওঠেন দারুণ ছাত্রবান্ধব। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য তার দুর্ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাব্যবস্থার হালচিত্র উপস্থাপন করে অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি বক্তৃতা করেন :

> আমরা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে দেখেছি – কলেজের টেন্ পার্সেন্ট ছেলে মোটামুটি সব বই কিনতে পারে, টুয়েন্টি পার্সেন্ট কিছু কিছু কিনতে পারে, বাকী সেভেন্টি পার্সেন্ট একখানা বইও কিনতে পারে না ! এই অবস্থায় কী শিক্ষা আমরা দেব – কাদেরই বা দেব ! এর যদি প্রতিকার না করা যায়, তা হলে শেষ পর্যন্ত দেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ![২]

ভাইস প্রিন্সিপ্যালের আচরণ কপট হলেও, এ চিত্র মিথ্যা নয়। কলকাতা শহরের এঁদোগলির এক দোকানে স্বাধীনকুমার রাত্রিযাপন করে। সারাক্ষণ সেখানে ইঁদুরের বিচরণ ও আরশোলার উৎপাত। কঠিন এই দুর্ভোগের মধ্যেও তাকে অনুপ্রাণিত করে মায়ের চিঠি। পাশের নেশায় উন্মত্ত হয়ে সে নির্দ্বিধায় সহপাঠীর বই চুরি করে। পিতা দেশের জন্য প্রাণ দিলেও, লেখাপড়ার জন্য সে বিবেক বিসর্জন দেয়। কলেজের দরিদ্র তহবিল থেকে কিছু সহায়তা পেলেও, পরীক্ষার ফি যোগানোর জন্য সে গৃহকর্তার দ্বারস্থ হয়। এজন্য সে রাত জেগে প্রস্তুত করে সরকারদের আয়কর ফাঁকির গোপন নথি। কিন্তু স্বাধীনকুমারের সমস্ত প্রয়াস অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না সে। একরাশ ব্যর্থতা নিয়ে সে ট্রেনের চাকার নিচে মুক্তি সন্ধান করে। মৃত্যুর পূর্বে সে পরীক্ষকের উদ্দেশে যে পত্র রচনা করে, তার প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ :

> কাপুরুষের মতো আত্মহত্যা করছি ? না স্যার – না। এ আমার পরাজয় নয় – আমার প্রতিবাদ। বেয়াল্লিশের সেপ্টেম্বরে এক প্রলয়ের রাত্রে আমার বাবা দেশের মাটিতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। আমার রক্তও দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে তেমনি একটি ইতিহাসের সূচনা রেখে যাবে, সে ইতিহাস কবে গড়ে উঠবে আমি জানি না – আপনি জানেন স্যার, আপনি বলতে পারেন ? প্রণাম।[৩]

ভারতবর্ষে দরিদ্র ছাত্রকে যেন পাঠ্যপুস্তক চুরি করতে না হয়, লজ্জায়-অভিমানে কোনো স্বপ্নমুখর তরুণ যেন আত্মহত্যার পথ বেছে না নেয় – স্বাধীনকুমারের বলিদান এ-সত্যকেই নির্দেশ করে।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের দিনযাপনের গল্প 'গিলটি'[১]। এ-গল্পে হিমাংশু ঘোষালের পেশা দালালি। এটি তার বংশীয় বৃত্তি নয়, ব্রাহ্মণ হিমাংশু পিতার সঙ্গে বিবাদ করে কলকাতা পাড়ি জমায়। দুর্দিনে এক আত্মীয়ের বাড়িতে সে সস্ত্রীক অবস্থান করে। পরবর্তীকালে আশ্রয়দাতার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে সে দালালি ব্যবসায় প্রবেশ করে। এ কাজ মোটেও সুবিধার নয়। 'পার্টি' যোগাড় করা, অ্যাটর্নি-উকিলের অফিসে যাওয়া, অর্থ লেনদেনের সময় দুপক্ষকে একত্র করা – এগুলো তারই দায়িত্ব। উপর্যুপরি অনুরোধের পর অনেকে পাওনা পরিশোধ করে, আবার কেউ ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রতারিত হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রবল আক্রোশে হিমাংশু গর্জন করে – 'দেখে নেব, দেখে নেব। গলায় পা দিয়ে আমার পাওনা টাকা আদায় করে ছাড়ব, তবে আমার নাম –।'[২]

হিমাংশু ও গৌরী একই গ্রামের অধিবাসী। বাল্যকালে তাদের বিয়ে হয়। চৌদ্দ বছরের দাম্পত্য জীবনে গৌরী কোনো সুখ পায়নি। শারীরিক গড়নেও তারা ভিন্ন আকৃতির। কুঁজো হিমাংশুর মুখমণ্ডলে বসন্তের চিহ্ন, অন্যদিকে গৌরী অনন্য সুন্দরী। হিমাংশু প্রায় তাকে বলে – 'ভাগ্যিস দশ বছর বয়সেই তোকে বিয়ে করে ফেলেছিলুম ! নইলে এই রূপ নিয়ে তুই কি ফিরেও তাকাতিস আমার দিকে ? কপালে লাথি মেরে দিয়ে কোন্ জমিদারের ঘরে গিয়ে উঠতিস।'[৩] এদিকে দারিদ্র্যের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। হিমাংশু ঘুমিয়ে পড়লে গৌরী ভাঙা একতলা বাড়ির ছাদে যায়। পাশের জানালায় এক ব্যক্তি সিগারেট জ্বালিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে। লোকটি তাকে একটি স্বর্ণের হার উপহার দেয়। হিমাংশু গয়নার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে গৌরী সত্য গোপন করে। এটিকে সে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কেনা গিলটির হার বলে প্রচার করে। হিমাংশু সরলচিত্তে স্ত্রীকে বিশ্বাস করে।

গৌরীকে স্বর্ণালঙ্কার দেওয়ার জন্য হিমাংশু অস্থির হয়ে ওঠে। তার ধারণা – 'ও গিলটির হার। দুদিন পরেই ময়লা হয়ে যাবে – বিবর্ণ পিতলের রঙ ধরবে। ও শুধু গৌরীর আত্মবঞ্চনাই নয়, ওর মধ্যে কেবল গৌরীর ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার বেদনাই মিশে নেই, ও হিমাংশুর চরম লজ্জা, তার অক্ষম পৌরুষের অবমাননা।'[৪] স্ত্রীকে সজ্জিত করতে সে হাঁটতে চায় 'বাঁকা রাস্তা'য়। কারণ – 'সোজা পথে চলবার চেষ্টা করে সবাই ফাঁকি দিয়েছে, এবার সে-ও অন্য উপায় দেখবে।'[৫] তাই সে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে একটা ভুয়া ফ্ল্যাটের জন্য অগ্রিম বাবদ এক

---

[১] 'গিলটি' *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৬৩) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গিলটি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

[৫] প্রাগুক্ত

পার্টির কাছ থেকে একশো টাকা আদায় করে। এরপর প্রাপ্ত অর্থকে তিনগুণে রূপান্তরিত করতে সে বসে জুয়ার আসরে। খেলাশেষে মাত্র সাত আনা পয়সা নিয়ে যখন সে বাড়ির কাছাকাছি আসে, তখন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সদ্য-প্রতারিত পার্টির গুণ্ডাদল। এসময় নিজের গলার হারের বিনিময়ে গৌরী স্বামীকে উদ্ধার করে। প্রাসঙ্গিক অংশ চয়নযোগ্য :

> তিনজোড়া চোখ মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল গৌরীর দিকে।
>
> "কত টাকা নিয়েছেন উনি ?"
>
> যে চড় বসিয়েছিল, সে একটা ঢোঁক গিলে বললে, "একশ – একশ টাকা।"
>
> হারসুদ্ধ হাতখানা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে গৌরী বললে, "এটা নিয়ে ওঁকে ছেড়ে দিন। এর দাম একশ টাকার বেশীই হবে।"[১]

ঘরে এসে হিমাংশু নিরাপত্তা বোধ করে না। স্ত্রী আশ্বস্ত করলেও গিলটির হার ধরা পড়বার আশঙ্কায় সে কাঁদতে থাকে। হিমাংশুর শিশুসুলভ কান্না গৌরীকে নাড়া দেয়। স্বামীর অগোচরে সে যে অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে, এজন্য সে লজ্জিত হয়। অন্যদিকে জীবিকার তাগিদে প্রতারণার আশ্রয় নিলেও স্ত্রীর প্রতি হিমাংশুর ভালোবাসা যে অকৃত্রিম – এটিও সে উপলব্ধি করতে পারে।

নিম্নশ্রেণির জীবনযাত্রা বিশ্লেষণের অভিনব শিল্পকৌশল 'যাচাই'[২]। এ গল্পে সুকুমার নতুন চাকরি পেয়ে সাক্ষাৎ করে প্রিয় শিক্ষকের সঙ্গে। দুজনের কথোপকথনকালে এক বালক এসে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। মাস্টারমশাই দু-টাকার নোট দিলে ছেলেটি অবাক হয়। কিন্তু বিষয়টি মানতে পারে না সুকুমার। তার ধারণা 'প্রোফেশ্যনাল বেগার ওরা – মিথ্যে বলাই ওদের পেশা।'[৩] সুকুমারের সংশয়ের সূত্রে প্রবীণ অধ্যাপক বর্ণনা করেন তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী অভিজ্ঞতা : আট বছর পূর্বে মানিকতলার মোড়ে এক কিশোর তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। অশ্রুসিক্ত নয়নে সে শুনিয়েছিল পরিবারের দৈন্যদশার কথা – অভাবের তাড়নায় তার লেখাপড়া বন্ধ রয়েছে, বাবাও ছয় মাস শয্যাশায়ী। স্বভাবত এসব গৎবাঁধা কথা তিনি বিশ্বাস করেননি। সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তিনি বস্তিতে যেতে চান। এ প্রস্তাবে ছেলেটি পালানোর চেষ্টা করলে তিনি বজ্রমুষ্টিতে ওর হাত চেপে ধরেন। বস্তিতে প্রবেশকালে অধ্যাপকের মনে হয় – 'এ তো নো-ম্যানস্ ল্যাণ্ড – সভ্য জগতের সঙ্গে এর

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গিলটি', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

[২] 'যাচাই' *গল্পভারতী* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৯) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'যাচাই', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

কোনো সম্পর্ক আছে বলে বোধ হল না।'[1] ছেলেটির গৃহে এসে তিনি সম্মুখীন হন নিদারুণ পরিস্থিতির। এক বাঙালি কনস্টেবল তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বলে :

> বুঝেছি, আপনি ডাক্তার – ছেলেটা আপনাকে ডেকে এনেছিল। কিন্তু এখন আর কিছু করবার নেই। লোকটা ছ'মাস ধরে ভুগছিল – রোগ আর অভাবের জ্বালা সইতে না পেরে শেষে গলায় দড়ি দিয়েছে। বড়ো ছেলেটা বাড়ী ছিল না, ছোট ছোট ভাই বোন দুটো কোথায় খেলতে গিয়েছিল, সেই ফাঁকে –[2]

গল্পে দেখা যায়, মৃতের সৎকার কিংবা এই পরিবারটিকে সহযোগিতার মাধ্যমে গুণী অধ্যাপক তাঁর কর্তব্য সমাপ্ত করেননি। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তিনি ছেলেটির জন্য চাকরির তদবির করেন। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নাইন-পাশ ছেলেটি কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে বেয়ারা পদে নিযুক্ত হয়। এই বাস্তব অভিজ্ঞতাই মানুষের প্রতি তাঁকে সহানুভূতিশীল করে তুলেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন মানুষ অকারণে নয়, দায়ে পড়েই অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।

সমাজে নারীর অবস্থান

সমাজে অবহেলিত নারীর দুঃখ-দুর্গতি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তারা বরাবরই বিস্তর বৈষম্যের শিকার। সামাজিক অনাচার, বর্ণপ্রথা কিংবা লগ্নভ্রষ্টের দোহাই দিয়ে দায়মুক্তির প্রয়োজনে মা-বাবা তাঁদের কন্যাসন্তানকে অপাত্রে সম্প্রদান করেছেন। স্বামীগৃহে গিয়ে এদের কেউ প্রত্যাশিত সুখভোগের পরিবর্তে অকারণ নির্যাতনে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে, কেউ অদৃষ্টের নির্মমতা ভেবে সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছে অসহনীয় দুঃখ-যন্ত্রণায়, আবার কেউবা বেছে নিয়েছে নিষিদ্ধ পল্লির অন্ধকার-জীবন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নারীদের এই দুঃসহ সংসার ও জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর 'লজ্জা', 'উর্বশী', 'একটি চিঠি', 'মহলা', 'শুভক্ষণ', 'একজিবিশন', 'বনতুলসী', 'প্রপাত' প্রভৃতি গল্পে।

'লজ্জা'[3] গল্পে দুর্গেশবাবুর একমাত্র মেয়ে উজ্জ্বলা। মেয়েটি একদিন বাবার কছে ওয়ার্ডওয়ার্থের 'ড্যাফোডিলস' কবিতার ব্যাখ্যা শুনতে চায়। তখনই তাদের বাড়িতে আসে প্রতিবেশী যুবক বিনয়। দর্শনশাস্ত্রে সে এমএ পড়ছে। জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে সে তাদের বাড়িতে দুর্গেশবাবুকে নিমন্ত্রণ করে। এটি তাদের পারিবারিক

---

[1] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

[2] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

[3] 'লজ্জা' *শনিবারের চিঠি*র আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৬১) প্রথম প্রকাশিত হয়।

পূজানুষ্ঠান। গত বছর পর্যন্ত বিনয়ের বাবা এসব সামাজিক কৃত্য নিজের উদ্যোগেই সম্পাদন করেছেন। পিতার মৃত্যুতে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার ওপর। ড্যাফোডিলস কবিতা বিশ্লেষণের জন্য দুর্গেশবাবু উদারচিত্তে বিনয়কে অনুরোধ করেন। পিতার হঠকারী অনুরোধে উজ্জ্বলা অপ্রস্তুত বোধ করলেও, বিনয় সপ্রতিভ ভঙ্গিতে সে অনুরোধ রক্ষা করে। উজ্জ্বলা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বিনয়ের কাব্যালোচনা শুনতে থাকে। আলোচনা সমাপ্ত হলে দুর্গেশবাবু মেয়ের লেখাপড়ার ব্যাপারে বিনয়ের সহযোগিতা কামনা করলে, সে নিস্পৃহভঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। উজ্জ্বলা বিষয়টিকে সৌজন্যরক্ষা ভাবলেও, ছেলেটি সত্যি তাকে পড়াতে আসে।

এরপর বিনয় প্রথম শ্রেণিতে এমএ পাশ করে, উজ্জ্বলা ভর্তি হয় কলেজে। এ অবস্থায় বিনয় তার দায়িত্ব বিস্মৃত হয়নি, উজ্জ্বলাকে সে ইংরেজির পাশাপাশি সংস্কৃত এবং লজিক পড়াতে শুরু করে। ক্রমশ বিনয়ের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে উজ্জ্বলা। বিনয়ের মা আত্মমগ্ন সন্তানকে সংসারমুখী করতে উজ্জ্বলাকে পুত্রবধূরূপে নির্বাচন করেন। এ সিদ্ধান্তে উজ্জ্বলা আত্মহারা হলেও তিন দিন পর বিনয় এসে দুর্গেশবাবুকে বলে :

> এই নিয়ে এইমাত্র মার সঙ্গে আমার কতকগুলো আন্‌প্লেজেন্ট আলোচনা হয়ে গেছে। আত্মীয় ভেবেই উজ্জ্বলাকে আমি পড়াতে আসি, কিন্তু বিয়ে করার কথা উঠতে পারে তা বুঝলে আমি আপনাদের এখানে কখনো আসতাম না।[১]

যে রঙিন স্বপ্নে উজ্জ্বলা বিভোর হয়েছিল, মুহূর্তে তা ভেঙে যায়। এর কিছুদিন পর দুর্গেশবাবুর উদ্যোগে ভিন্ন পাত্রের সঙ্গে উজ্জ্বলার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। উজ্জ্বলা পিতার এ-উদ্যোগে বাধা দেয়নি। বিবাহলগ্নে হঠাৎ বাইরে শুরু হয় তীব্র হট্টগোল। ষাট বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে কিশোরী মেয়ের বিয়ে হতে দেবে না যুবসমাজ। বরের গাড়ি তারা আটকে রেখেছে। আকস্মিক এ-বিপদে দুর্গেশবাবু বিনয়ের মায়ের শরণাপন্ন হন। লগ্নভ্রষ্টা মেয়েকে উদ্ধারের জন্য বিনয়কে নির্দেশ দেন তার মা। এতদিন বিয়েতে আপত্তি করলেও, বিনয় মাতৃআজ্ঞা পালনে উদ্যোগী হয়। এ-পর্যায়ে বান্ধবীদের কাছে উজ্জ্বলা জানতে পারে এক ব্যতিক্রমী নাট্যকাহিনি :

> শোন্, এই সমস্তই সাজানো। যিনি বর সেজে এসেছিলেন, তাঁর মাথায় ছিল সাদা পরচুলা, দাঁতে কালি-মাখানো। ভদ্রলোক অ্যামেচার ক্লাবের অভিনেতা। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গেও আগে থেকেই বন্দোবস্ত ছিল। তোর বাবা, বিনয়বাবুর মা, এ প্ল্যানের মধ্যে সবাই-ই ছিলেন।[২]

কেবল নাটকের বাইরে ছিল বিনয় ও উজ্জ্বলা। কিন্তু এরকম হীনপন্থায় উজ্জ্বলা মনের মানুষকে পেতে চায়নি। স্বাভাবিক উপায়ে নয়, বিনয়কে স্বামীরূপে বরণ করতে হচ্ছে প্রবঞ্চনার মাধ্যমে – এ-ভাবনা তাকে আত্মহননের

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'লজ্জা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৯-৭৮০

দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অতঃপর তিনতলার ছাদের অন্ধকার কোনায় দাঁড়িয়ে সে বিনয়কে নয়, আলিঙ্গন করে মৃত্যুকে। শূন্যতায় ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রাক্কালেও যেন এ লজ্জা তার শেষ হয়নি। তাই তার জীবনের অন্তিম উচ্চারণ ছিল – 'ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ'।

চলচ্চিত্রের নারী-শিল্পীদের প্রতি সাধারণ মানুষের প্রলুব্ধতা থাকলেও, ন্যূনতম সম্মানবোধ থাকে না। সমাজে তারা মূল্যায়িত হয়েছে লালসার দৃষ্টিতে। মানবিক আবেগ-অনুভূতি কেড়ে নিয়ে বিনোয়োগকারীরা তাদের পরিণত করে কামনার উপাদানে। 'উর্বশী' গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ-বিষয়টিকেই শিল্পমূল্য দিয়েছেন। স্টেশনের ওয়েটিংরুমে সাত বছরের টুটুলের সঙ্গে আলাপ জমায় এক অচেনা মেয়ে। শিশুসুলভ কথাবার্তায় মেয়েটি অল্পক্ষণে টুটুলের বড়দি হয়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে সে ওদের গ্রামে প্রত্যাবর্তনের কল্পনা করে। অজয় নদীতে সাঁতার কাটা, পাকা বৈঁচি ফলের স্বাদ নেওয়া, পুকুরঘাটে মাছধরা এবং চড়ুইভাতির মতো রঙিন ভাবনায় সে আচ্ছন্ন হয়। এসময় টুটুলকে আলিঙ্গন করে মেয়েটি সত্যি কাঁদতে থাকে।

হঠাৎ পাশের ডেকচেয়ার থেকে এক মাড়োয়ারি মেয়েটিকে রূপা বলে সম্বোধন করে। বাইরে ট্রেনের ঘণ্টা বাজায় লোকটি তাকে সতর্ক করে – "আবার তুমি ঘোমটা খুলেছ রূপা ? তুমি কি চাও, তোমার 'ফ্যানের' দল এখানে এসে চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াক ? তারপর একটা 'সীন' তৈরি হোক স্টেশনে ?"[১] দিল্লি মেল স্টেশন ছাড়লে টুটুলের বাবা রাধেশবাবু হন্তদন্ত হয়ে ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করেন। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে তিনি বলতে থাকেন :

> এইজন্যেই ঘোমটা দিয়ে বসেছিল। ইস্, আগে যদি চিনতে পারতাম ! ও কে, জানিস টুটুল ? নামকরা স্টার সুরূপা দেবী – বাংলা-বোম্বাই ওঁর নামে অজ্ঞান। ওঁর 'মধু চাঁদ' আর 'ঝুম ঝুমাঝুম' দেখে তিন রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। ইস্ – কী ভুলই হয়ে গেল ? যদি সাহস করে এগিয়ে এসে আলাপ করে নিতে পারতাম –[২]

এসময় নায়িকা রূপা তার সন্তানকে আদর করায় রাধেশবাবু খুশিতে বিহবল হয়ে ওঠেন। অকস্মাৎ টুটুল তাকে 'দিদি' বলে সম্বোধন করলে বিকৃত হয়ে ওঠে রাধেশবাবুর মুখমণ্ডল। ছেলেকে তিনি শাসনের সুরে বলেন – 'দিদি ! তোর দিদি আবার জন্মাল কবে ? ও যে প্রায় তোর মা-র বয়েসী ! আর অমন নচ্ছার মেয়েমানুষ তোর দিদি হতে যাবে কোন্ দুঃখে ! ওদের মুখ দেখলেও গঙ্গাস্নান করতে হয়।'[৩] একটু আগেও যিনি রূপাকে দেখার

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উর্বশী', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২৩

[৩] প্রাগুক্ত

জন্য দিশেহারা ভাব প্রদর্শন করেছিলেন, সেই তিনিই যখন তাঁর পুত্রের সঙ্গে নির্দোষ সম্পর্কসূত্রে এরকম মন্তব্য প্রকাশ করেন, তখন এ-বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অভিনয়-শিল্পীদের প্রতি সামাজিক মানুষের ধারণা কখনই সম্মানজনক ছিল না।

এ-গল্পে গল্পকার রূপার তারকা হয়ে ওঠার মর্মান্তিক বৃত্তান্তও পরিবেশন করেছেন। 'ছেলেধরা'র মতো পুঁজিপতিরা প্রথমে তাকে বন্দি রাখে 'জঙ্গল'রূপী নরকে। এরপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা তাকে প্রদান করে অভিনেত্রীর মুকুট। গল্পচ্ছলে রূপা টুটুলকে শুনিয়েছে তার উত্থানের ভয়ঙ্কর কাহিনি :

> গায়ে অনেক নখের আঁচড় লাগল তার, অনেক দাঁতের দাগ। তারপর আস্তে আস্তে বন-জঙ্গল তার অভ্যেস হয়ে গেল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বাঘ-ভালুকেরা ভয় পেতে লাগল – একে একে এসে লুটিয়ে পড়ল তার পায়ের তলায়। এখন লোকে তাকে বলে জঙ্গলের রাণী।[১]

'একটি চিঠি'[২] গল্পে প্রকাশ পেয়েছে নারীর অসহায়ত্ব। শৈশবে প্রতিবেশী বালকের সঙ্গে পত্রলেখিকার বন্ধুত্ব হয়। তারা একত্রে পুতুল খেলে, টগর ফুলের চারা রোপন করে। কিন্তু ফুল ফুটবার পূর্বে ছেলেটির বাবা বদলি হন। বিদায়-লগ্নে ছেলেটি খেলার সাথীকে বলে – 'ফুল গাছটাকে দেখিস খুকু – ফুল ফুটলেই আমায় খবর দিস।'[৩] মেয়েটি তার কথা রাখে, ছেলেটিও ফুলগুলো দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করে। কলেজে পড়বার সময় ছেলেটি হঠাৎ পত্রালাপ বন্ধ করে। এরমধ্যে পত্রলেখিকার জীবনে ঘটে নানা পট-পরিবর্তন। পিতার মৃত্যু, ভাইয়ের পৃথক সংসার এবং পরিবারের প্রতি তার অবহেলা – মেয়েটিকে বাস্তবসচেতন করে। লেখাপড়া ছেড়ে সে স্থানীয় একটি গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করে। এত শোকেও মেয়েটি বাল্যসঙ্গীকে ভোলেনি, অযত্ন করেনি টগর গাছটির। এমনকি পুতুল খেলার জন্য কোনো মেয়ে ফুল ছিঁড়লেও সে রুষ্ট হয়েছে।

ইতোমধ্যে ছেলেটি এতদঞ্চলে সার্কেল অফিসার হিসেবে যোগ দেয়। একদিন জিপযোগে সে মেয়েটির বাড়িতে বেড়াতে আসলে মেয়েটির মা তার কাছে 'দুঃখের পাঁচালী' শুরু করেন। ছেলেটিকে তিনি টগর গাছটির কথা মনে করিয়ে দেন। কিন্তু এসব আবেগী বক্তব্যে আন্দোলিত না হয়ে ছেলেটি পরিহাসের সুরে বলে ওঠে – 'কী যে সব ছেলেমানুষি ! তা গাছটা এখনো বেঁচে আছে ? হাউ ফানি!'[৪] ভদ্রমহিলা বিবাহের প্রসঙ্গ তুললে, ছেলেটি

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২১

[২] 'একটি চিঠি' *আবাহন* পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় (১৩৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'একটি চিঠি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

সোজাসুজি বলে – 'তা একরকম ঠিকই আছে। মানে কলেজে, একজন আমাদের সঙ্গে – মানে আমার ক্লাসমেট ছিল – সে আবার এখানকার ডি-সির ভাগ্নী।'[১] অতঃপর এ-বাড়িতে এক কাপ চা খাওয়ার ফুরসতও তার হয় না। কেননা ডিসি সাহেবের দরবারে তাকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকতে হবে।

উচ্চশিক্ষা এবং মর্যাদার গৌরবে ছেলেটি নিমিষে স্বার্থঘনিষ্ঠ আচরণ করে, প্রেম-ভালোবাসার নিষ্পাপ অনুভূতি তার কাছে হাস্যকর প্রতিপন্ন হয়। এই হচ্ছে সামাজিক বিধান এবং এ থেকে উত্তরণের পথ মেয়েটিরও অজানা। এজন্য আত্মসচেতন পত্রলেখিকা বহুযত্নের টগর ফুল প্রতিবেশী বালিকাদের বিতরণ করে। ছেলেটির আকস্মিক পরিবর্তনে সে বোঝে – 'পুতুল খেলার জন্যে যে ফুলের গাছ লাগিয়েছিলুম – পুতুল খেলা ছাড়া তার ফুল আর কোনো কাজেই লাগে না। জীবনের নিয়মই তাই।'[২] 'একটি চিঠি' গল্পে ছেলেটি এবং মেয়েটির নির্দিষ্ট নাম নেই। সামাজিক অবস্থানসূত্রে ছেলেটির রূপান্তর কিংবা মেয়েটির ট্র্যাজেডি কেবল এ গল্পে নয়, বরং তা নারীজীবনের স্বাভাবিক নিয়তি – গল্পকার এটি বোঝাতে চেয়েছেন।

সংসারে নারী যে কেবল প্রয়োজন পরিপূরণের সামগ্রী তা 'মহলা'[৩] গল্পে উপস্থাপন করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এ গল্পে জয়ন্তী বিধবা মায়ের স্বল্প-শিক্ষিতা কন্যা। অভাবী সংসারে কিছু অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় সে নাম লেখায় অভিমন্যু চৌধুরীর থিয়েটারে। অভিমন্যু মঞ্চনাটকের পরিচালক ও অভিনেতা। মেকআপ, অর্কেস্ট্রা, লাইটিং থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয়ে তিনি সমান পারদর্শী। তিনি তাঁর নাটকের জন্য জয়ন্তীকে নায়িকারূপে নির্বাচন করেন। তাঁর সিদ্ধান্তে অনেকে অসন্তুষ্ট হয়। সকলের পছন্দের নায়িকা কৃষ্ণা বোস, নাট্যজগতে যার দুর্দান্ত প্রতাপ। কিন্তু ত্রিশোর্ধ্ব কৃষ্ণাকে পাড়াগাঁয়ের সপ্তদশী চরিত্রে অভিমন্যু কল্পনা করতে পারেন না। পরিচালকের মতে, অভিনয়ে দুর্বল হলেও চরিত্র-রূপায়ণে জয়ন্তী যথার্থ। এ ইস্যুতে তিনি দলের নাট্যকর্মীদের চ্যালেঞ্জ করেন। নাটক আরম্ভের পূর্বে তিনি জয়ন্তীকে বলেন :

> শুধু আজকের থিয়েটারেই নয়, আমার জীবনেও তোমাকে নায়িকা করতে চাই। জয়ন্তী, আমি তোমাকে ভালোবাসি।... সেই ভালোবাসার আজ পরীক্ষা জয়ন্তী। আমার মান তোমাকে রাখতে হবে। পারবে না ?[৪]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

[২] প্রাগুক্ত

[৩] 'মহলা' *বিংশ শতাব্দী* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মহলা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

অভিমন্যুর ভালোবাসার নেশায় জয়ন্তী অবিশ্বাস্য অভিনয় করে। অডিটেরিয়ামের সমস্ত দর্শক তার প্রশংসা করে। যারা বিরোধিতা করেছিল তারাও আশ্চর্য হয়, এ ঘটনাকে তারা 'মিরাকল' ভাবে। প্রদর্শনী শেষে অভিমন্যুর পরিবর্তিত ব্যবহার জয়ন্তীকে অবাক করে। নাট্য-পরিচালকের ভঙ্গিতে তিনি বলেন :

> এখনো দাঁড়িয়ে কেন ? খেয়ে নাও গে। তোমাদের সব ফিমেল আর্টিস্টকে নিয়ে এখুনি গাড়ী যাবে ? টাকা পাওনি ?... এখন ইয়ার্কি দিলে আমার চলবে না। যাও, খেয়ে গাড়ীতে ওঠো গে – আমাকে বিরক্ত কোরো না।[১]

গল্প এখানে সমাপ্ত হতে পারতো। কিন্তু অভিমন্যুকে লেখক খলচরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করতে চাননি। এমন অপ্রত্যাশিত বাক্যবাণের পর তিনি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকেন। বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হলেও তিনি নিরুপায়। কারণ – 'নেশা ধরিয়ে না দিলে রেসের ঘোড়া ছুটতে পারত না।'[২] গল্পকার শেষে বোঝাতে চেয়েছেন, জয়ন্তীরও ক্ষতি হয়নি – 'এই তার সত্যিকারের মহলা। এর পর থেকে সম্পূর্ণ স্টেজ-ফ্রী হয়ে গেল সে, কোনো অভিনয়েই কোনোদিন তার আর আটকাবে না।'[৩] এভাবে অভিমন্যুর হাত ধরে জয়ন্তী কেবল নাট্যজগৎ নয়, অনুপ্রবেশ করে বাস্তবজগতে। 'মহলা' নিম্ন-মধ্যবিত্ত নারীর অস্তিত্বরক্ষার গল্প। ক্ষণিকের আনন্দ-বেদনায় থেমে গেলে এদের চলে না, প্রতিকূল জীবনাভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাদের এগিয়ে যেতে হয় জীবনযুদ্ধে।

সামাজিক অনুশাসনের কারণে নারীর ভাগ্যবিড়ম্বনার গল্প 'শুভক্ষণ'[৪]। এ গল্পে নারীর হতদশা বিবৃত হয়েছে পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে। বন্ধুর বিয়েতে নিশীথ একটি মেয়েকে পছন্দ করে। পরিবারও তার ভালো-লাগাকে মেনে নেয়। পণের ক্ষেত্রে নিশীথের বাবার আপত্তি থাকলেও, কুলশীল ও রূপের বিচারে মেয়েটি উতরে যায়। নির্দিষ্ট দিনে বরযাত্রা শুরু হলেও রাত্রিবেলায় ঘটে মহাবিপত্তি। পথপ্রদর্শকের দায়িত্বে যারা এসেছিল, সিদ্ধির নেশায় তারা ভুল পথ প্রদর্শন করে। ফলে ভোরবেলায় নৌকা ভেড়ে ঝা-পুরের স্টিমারঘাটে, যেখান থেকে গন্তব্যস্থলের দূরত্ব অনেক বেশি। এই পথ অতিক্রম করতে গেলে বিবাহলগ্ন অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। সন্ধ্যার পর দ্বিতীয় লগ্নও নেই। কনেপক্ষের লোকদুটি বিপত্তি বুঝে পালিয়ে যায়। অনেক কষ্টে লগ্নের আধঘণ্টা পূর্বে তারা বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হলেও লগ্নভ্রষ্টের আশঙ্কায় মেয়েপক্ষ অপেক্ষা করেনি। কারণ হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ ছিল :

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] 'শুভক্ষণ' *বসুধারা* পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় (১৩৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

বেলা ন'টায় যাদের আসবার কথা, তারা এসে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় পৌঁছলেও পৌঁছতে পারে – এ আশা তোমরা কী করে রাখবে? পাড়াগাঁয়ের সমাজ। লগ্নভ্রষ্ট হলে জাত যাবে – অন্যপূর্বাকে কেউ ঘরে নিতে চাইবে না – তোমার অত রূপের জন্যেও না।[১]

মেয়ের বাবা তাই এক অকর্মণ্য ছেলেকে বিয়ের পিঁড়িতে বসান। নিশীথের বাবাও একমাত্র সন্তানের জন্য অরক্ষণীয়া কন্যার সন্ধান করেন। এ অপমান নিয়ে তিনি গ্রামে ফিরতে চান না। তবে প্রিয়তমাকে হারিয়ে ছেলেটি গ্রহণ করে কঠিন সংকল্প – 'আমার পক্ষে এ অবস্থায় বিয়ে করা সম্ভব নয়, বাবা। আমাকে ক্ষমা করো। তাছাড়া কেবল আজই নয়, আমি আর বিয়েই করব না।'[২] এভাবে প্রথাসিদ্ধ সমাজব্যবস্থার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয় দুটি সবুজপ্রাণ।

ভগ্নহৃদয় ছেলেটি অতঃপর গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে সে যুক্ত হয় 'সিভিল সাপ্লাইয়ে'র কাজে। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও নিশীথ পূর্ব প্রেমিকাকে ভুলতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের হরিপদ কেরানির জীবনযন্ত্রণার সঙ্গে তাই সে একাত্ম হয় – 'ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য যাওয়া আসা, পরনে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর।... আর ভাবি তুমি কেমন আছো। সুখী হয়েছ নিশ্চয়ই। ঘর-সংসার, স্বামী, শিশু –।'[৩] একসময় যুদ্ধ শেষ হয়। যুদ্ধশেষে ভগ্নচিত্ত ছেলেটি যোগ দেয় ভবানীপুরের একটি স্কুলে। বাবার মৃত্যুর পর সে আদিগঙ্গার ধারে ঘরভাড়া নেয়। সকাল-সন্ধ্যা টিউশনি, দুপুরে স্কুল এবং রাতে বিয়ের জন্য মায়ের তাগাদা – এভাবে চলতে থাকে তার জীবন।

হঠাৎ সংবাদপত্রের একটি খবরে নিশীথ চমকে ওঠে। পূর্ব-কলকাতার এক হোটেলে মালিকসহ তিন পতিতা গ্রেপ্তার হয়েছে। এদেরই একজন তার প্রাক্তন প্রেমিকা। বিচারের দিন নিশীথ আদালতে মেয়েটির স্বীকারোক্তি শুনতে পায়। দেশভাগের পর শরণার্থী ক্যাম্পে তার দুটি সন্তান কলেরায় মারা যায়। এরপর কালীঘাটে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বামী তাকে পাচারকারীদের কাছে বিক্রয় করে দেয়। একটি ডাকাতির মামলায় তার নরপিশাচ স্বামী এখন কারাগারে। এভাবে নিয়তি তাকে ঠেলে দেয় পতিতাবৃত্তিতে। এ অবস্থায়ও নিশীথ মেয়েটিকে ঘিরে পুনরায় স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। তাই চিঠিতে সে লেখে :

কাল সন্ধ্যায় আমি তোমাকে আনতে যাব। তুমি আসবে আমি জানি। এমন শুভক্ষণকে তুমিও মিথ্যে হতে দেবে না।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শুভক্ষণ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

[৩] প্রাগুক্ত

লণ্ঠনের তেল ফুরিয়েছে – একটু পরেই নিভে যাবে – তা যাক। বাইরে চাঁদ উঠেছে। আর সেই হীরেটা ধকধক করে জ্বলছে আমার বুকের ভিতর।[১]

যুদ্ধকালের নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কারণে ছেলেটি সামাজিক প্রথাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। এজন্য পতিতা নারীকে সে স্ত্রীরূপে বরণ করার প্রস্তুতি নিয়েছে। নিশীথের বিশ্বাস – মেয়েটি তার আহবানে সাড়া দেবে। কিন্তু নতুন সংসারের সম্ভাবনা থাকলেও, এর রূপায়ণ গল্পে অনুপস্থিত। মূলত সমাজ পরিবর্তনের এ বিষয় লেখকের একান্ত অভীপ্সা। কিন্তু সমাজে তখনও এরূপ দৃষ্টান্ত ছিল বিরল। তাই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েই তিনি গল্প সমাপ্ত করেছেন।

'একজিবিশন'[২] গল্পেও পতিতা নারীর জীবনসংগ্রাম ও করুণ পরিণতি প্রদর্শিত হয়েছে। এ গল্পে মেলায় প্রবেশকালে অচেনা এক তরুণী বসন্তের কাছ থেকে একটি টিকিট নেয়। অথচ টিকিটের মূল্য পরিশোধের পরিবর্তে তরুণীটি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। মেয়েটির পতিতা-পরিচয় অবগত হয়ে বসন্ত সাফ জানিয়ে দেয় – 'তুমি ভুল লোককে ধরেছ, আমি তোমার শিকার নই !'[৩] পাঁচ টাকার নোট দিয়ে সে মেয়েটিকে বিদায় করতে চায়। তবে স্বৈরিণী হলেও সে ভিক্ষার দান প্রত্যাখ্যান করে। মেয়েটির কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেলেও বসন্ত স্বস্তিবোধ করে না। কারণ – 'বাংলাদেশ থেকে পাঁচশো মাইল দূরের এই শহরে একটি বাঙালীর মেয়ে বাঁচবার জন্যে বীভৎসতম অপমানের পথ বেছে নিয়েছে, এইটিকে কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না।'[৪]

কিছুক্ষণ পর একটি স্টলে বসন্ত যখন যিশুখ্রিস্টের ছবির মধ্যে মগ্ন, তখন মেয়েটির সঙ্গে পুনরায় দেখা হয়। প্রথমে তিরস্কার করলেও তরুণীর মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করে প্রাক্তন প্রেমিকার মুখচ্ছবি। এসময় মেয়েটি এক বখাটের সঙ্গে নাগরদোলায় বসে হাসতে থাকে। এ দৃশ্যে বসন্ত ঈর্ষান্বিত হয়। দোলনা থেকে নামলে সে তার বৃত্তান্ত জানতে চায়। জানা যায়, মেয়েটির প্রকৃত নাম চম্পা। কাকার সংসারে তার ঠাঁই হয়েছিল। দুইবার আইএ ফেল করায় কাকি বাড়িতে তাণ্ডব সৃষ্টি করে। তাই রূপের ওপর আস্থা রেখে সে ফিল্মে যোগ দিতে চায়। বোম্বে যাবার পথে দুজন ব্যক্তি তার হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে প্রতারণা করে, এবং চলচ্চিত্র জগতের নামে তাকে দেহব্যবসায় নিযুক্ত করে :

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[২] 'একজিবিশন' *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'একজিবিশন', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

ফিল্‌মই বটে। প্রতি রাত্রে মাতাল পশুদের সঙ্গে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছি, আর প্রায় দু'মাস তারা চাবুক মেরে আমাকে অভিনয়ের মহলা শিখিয়েছে। দুর্গের মতো প্রকাণ্ড বাড়ি, চারদিকে পাহারা, তিন-চারটে কুকুর। দেড় বছর পরে যখন পালাবার সুযোগ এল, তখন দেখলাম, নায়িকার পার্টেই আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আর কিছুই আমার করবার নেই।[১]

মেয়েটির জীবনকাহিনি শোনার পর বসন্ত তাকে চাকরিতে যোগদানে উৎসাহিত করলে সে বলে – 'রোজ রোজ মনিব বদলে যার অভ্যেস হয়ে গেছে – বাঁধা মনিবের চাকরি তার পোষাবে না।'[২] বিবাহের মতো পবিত্র সম্পর্কে তার আস্থা নেই। অন্তত তিনজন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে এবং প্রত্যেকে তাদের কামনা চরিতার্থ করে পালিয়ে গেছে। এসব বৃত্তান্ত শুনে বসন্ত মেয়েটির দুঃখের সঙ্গী হতে চায়। তবে এ আহবানে চম্পা অবাক হয় না, কাঁদতে থাকে। বসন্তকে বিশ্বাস করলেও তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সমাজ। অন্যদিকে সমাজকে উপেক্ষা করে ছেলেটি পথ চলতে চায় :

– আত্মীয়স্বজন নেই আপনার ? সমাজ ?

মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার হল বসন্তের মুখ। বাব-মা, ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব। কিন্তু আর ভাবা চলে না। দাম হয়তো কিছু দিতেই হবে। তবু ভয় করবে না বসন্ত। অন্ধকার আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেদনায় জর্জর, করুণায় বিষণ্ন একটা বিশাল মূর্তি তাকে আশ্বাস দিয়েছে।

– না, সে ভাবনা আমার নেই।[৩]

নিজের অজান্তে বসন্ত মেয়েটির হাত মুঠোবন্দি করে। তখনই মেলাজুড়ে অন্ধকার নেমে আসে। দর্শনার্থীরা চিৎকার করে নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটতে থাকে – 'ফায়ার – ফায়ার – আগ লাগা হ্যায়।'[৪] বিপুল মানুষের ছুটোছুটিতে বসন্তের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় চম্পা। ছেলেটি তাকে তুলতে চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। পরিশেষে বেঁচে থাকবার আদিম প্রেরণায় অন্যদের সঙ্গে সে-ও পালিয়ে যায়। একজিবিশনের নিয়ন আলোর বাইরে দাঁড়িয়ে বসন্ত পুরো ঘটনা ভুলতে চায়। বাস্তব পৃথিবীতে তার স্মরণ হয় পরিবার-সমাজের কথা। চম্পাকে হারিয়ে সে তাই অনেকটা হালকাবোধ করে :

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

> ভালোই হল। হয়তো অবচেতন মনে এমনি একটা কামনাই করেছিল বসন্ত। শেষ পর্যন্ত কি সাহস হত তার ? চম্পার জীবনের তিনজন পুরুষের মতো চতুর্থ পুরুষও যে তাকে বঞ্চনা করত না, এ-কথা কি জোর করেই বলতে পারে সে ?[১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বারনারীদের প্রতি সমব্যথী হলেও, তাদের পারিবারিক জীবনাবর্তে ফিরিয়ে আনেননি। 'শুভক্ষণ' গল্পে পতিতা নারীকে নিশীথ গৃহে আনবার স্বপ্ন দেখেছে, অথচ গার্হস্থ্য জীবনে তাকে মর্যাদা দিতে পারেনি। এ গল্পেও বিবাহের পূর্বে চম্পার অপমৃত্যু হয়েছে; তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন বিরূপ পরিস্থিতির তোড়ে উবে গেছে।

'একজিবিশনে' পতিতা-জীবনে অভ্যস্ততার যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, তার বিস্তৃত প্রকাশ ঘটেছে 'কুয়াশা'[২] গল্পে। এক হিমশীতল রাতে ডাক্তার অমূল্য দাশগুপ্তের কাছে এসেছে পার্শ্ববর্তী বাংলোর বেয়ারা বলবাহাদুর। উদ্দেশ্য, বাংলোয় আগত পি এস রায়চৌধুরীর পায়ে কাঁচ বিদ্ধ হয়েছে; তাকে দেখতে হবে। যথাস্থানে এসে অমূল্য দেখেন – এক সুন্দরী তরুণী তাঁর জন্য দরজায় অপেক্ষা করছে। মধ্যরাতেও মেয়েটি দামি প্রসাধনে সজ্জিত, অন্যদিকে খাটের ওপর রায়চৌধুরী বিকৃত মুখে বসে রয়েছেন। তার ক্ষতচিহ্ন দেখে ডাক্তার বলেন – 'পায়ে ভাঙা কাঁচ ফোটেনি – ইট্স্ এ গান-শট্-ইন্জুরি।'[৩] চিকিৎসার পূর্বে তিনি থানায় বিষয়টি অবহিত করতে চান। নিরুপায় মেয়েটি উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করে। এতে অমূল্য অতিশয় বিরক্ত হন। অকস্মাৎ ডাক্তারের পায়ের কাছে বসে মেয়েটি অনুকম্পা প্রার্থনা করলে তিনি থানাকে অবহিত না করেই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

ড্রেসিংশেষে ডাক্তার জানতে পারেন, মেয়েটির নাম মঞ্জু এবং রায়চৌধুরী তার বাবা। শিকারের প্রতি ভদ্রলোকের ঝোঁক প্রবল। এ অঞ্চলে প্রচুর গ্রিন পিজিয়ন এবং বনমুরগি রয়েছে শুনে তিনি একটি দোনলা শটগান এনেছেন। বন্দুকটি পরিষ্কারকালে ঘটে এ বিপত্তি। মেয়েটির বর্ণনভঙ্গি নিখুঁত হলেও, গল্পটি ডাক্তারের অবিশ্বাস্য মনে হয়। পরদিন বলবাহাদুরের অনুরোধে অমূল্য রোগীর ভালো-মন্দ জানতে চান। এসময় রায়চৌধুরীকে দেখে মদ্যপ মনে হয়। মেয়ের সম্মুখে পিতার মদ্যপান অমূল্যের ভালো লাগেনি। বিদায়লগ্নে রায়চৌধুরী ডাক্তারের হাতে তুলে দেন এক মুঠো টাকা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মঞ্জুর অনুরোধে অমূল্য তা গ্রহণ

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] 'কুয়াশা' *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৬৬) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কুয়াশা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২

করেন। দুবছর পর শিলিগুড়ি স্টেশনে মঞ্জুর সঙ্গে ডাক্তারের পুনর্বার সাক্ষাৎ হয়। অমূল্য তার বাবার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলে সে বলে :

> আমি ওঁর – কিন্তু কথাটা সোজা বাংলায় নাই বা শুনলেন। আমাকে নিয়ে ওখানে গিয়েছিলেন ফূর্তি করতে। বাড়িঘরে এসব সুবিধে হয় না, বুঝতেই পারেন। রাত্রে মদের মাথায় কেমন সন্দেহ হল, আমি ওঁকে তেমন ভালোবাসি না। নেশার ঝোঁকে বন্দুক নিয়ে গোবিন্দলালের পার্ট করতে যাচ্ছিলেন, আমি বাধা দিলুম। ফল যা হল তা আপনি জানেনই। তারপর আমাকে ওঁর মেয়ে সাজতে হল। আসল কথা জানলে আপনি তো থানা-পুলিস না করিয়ে ছাড়তেন না ![১]

ভদ্রলোকের মুখোশে রায়চৌধুরী কন্যাতুল্য মঞ্জুর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত থেকেছেন। অবশ্য সেদিনের ঐ দুর্ঘটনার পর তিনি মঞ্জুকে সত্যি নিজের মেয়ে ভাবতে শুরু করেন। স্বীয় অপকর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি মেয়েটির বিয়ে দিতে উদ্যোগী হন। এজন্য যৌতুকবাবদ তিনি দশ হাজার টাকা ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত নন। বিবাহের এ আয়োজন মঞ্জুর ভালো লাগেনি। রায়চৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে তাই অন্যত্র পালিয়ে যায়। অমূল্যের সঙ্গে আলাপকালে ওয়েটিংরুম থেকে বেরিয়ে আসেন এক মধ্যবয়সি পুরুষ। পরক্ষণে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে মঞ্জু লোকটির অনুগামী হয়।

কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে বত্রিশ নম্বর বাংলোর অভ্যাগতদের ঘিরে অমূল্যের মনে যে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল, শিলিগুড়ি স্টেশনেও তার সমাধান মেলে না। এসময় হিমালয়ের ওপার থেকে রাশি রাশি কুয়াশা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে – 'রায়চৌধুরী নিজের মেয়ে বলে ভাবতে শুরু করেছে, তাতে মঞ্জুর আত্মসম্মানে কোথায় যে ঘা লেগেছে, সেইটেই সে কোনোমতে বুঝতে পারল না।'[২] হাজারো মানুষের রোগ নির্ণয় করলেও, অমূল্য এ বারনারীর মনস্তত্ত্ব নিরূপণে ব্যর্থ হয়।

পরিবারে কন্যাশিশুর জন্মগ্রহণ যে অভিশাপতুল্য, তার দৃষ্টান্ত রয়েছে 'বনতুলসী'[৩] গল্পে। গল্পে দেখা যায় কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বিমলেন্দু তাকে স্বাগত জানাতে পারেনি, বরং অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছে।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮

[৩] 'বনতুলসী' *পূর্বাশা* পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৫৩) প্রথম প্রকাশিত হয়।

মেয়ের জন্মমুহূর্তেই কন্যাদায়ের বিড়ম্বনা ভেসে উঠেছে তার মানসচক্ষে। স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে যাপিত জীবনকে তার মনে হয়েছে 'যক্ষার মতো'[১]। এই ক্লান্তিকর জীবন থেকে বিমলেন্দু তাই মুক্তি খোঁজে।

'প্রপাত'[২] গল্পে নারীর অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতি প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে নারী কেবল সমাজ-পরিসরে নয়, পিতৃগৃহেও নিগৃহীত। গল্পে চিন্ময়ের সঙ্গে দেখা করে ছায়া নামের একটি মেয়ে। চারদিন পূর্বে কনে দেখার আসরে এই মেয়েকেই দেখেছে চিন্ময় এবং তার সঙ্গে আলাপ করেছে। চারদিনের ব্যবধানে সেই সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে মেয়েটি যা বলে, তা চিন্ময়ের কল্পনাতীত :

> আমার নাম ছায়া নয়। বন্দনা।... আপনি ছায়াকে দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ছায়া কালো, ছায়া কুৎসিত। তার কপালে একটা ধবলের দাগ। তাই ছায়ার ভূমিকায় আমাকেই অভিনয় করতে হয়েছে।[৩]

অতঃপর সত্য জেনেও চিন্ময় বন্দনাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে চায়, কিন্তু সে এতে সাড়া দেয় না। দু বছর পর মুনসেফির মনোনয়ন পেয়ে চিন্ময় কনে দেখতে রাঁচিতে যায়। কনেটি দেখতে সুন্দরী ও শিক্ষিতা; তার বাবা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। পাত্রী পছন্দ হওয়ায় চিন্ময় বিয়েতে সম্মত হয়। অতঃপর রাঁচির জলপ্রপাতের সৌন্দর্য উপভোগকালে সে বন্দনাকে দেখতে পায়। তার সঙ্গে কথা বলে চিন্ময় জানতে পারে – পাড়ার দুটি ছেলের সঙ্গে সে স্বেচ্ছায় পালিয়ে এসেছে, বোম্বে যাওয়ার কথা বলে তারা তাকে নিয়ে এসেছে রাঁচিতে। তার এই শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী তার বাবা রমাপ্রসাদ। চিন্ময়ের কাছে সে অবলীলায় প্রকাশ করে পিতার বিকারগ্রস্ততার বৃত্তান্ত :

> "কী করব বলুন ? বাবা কালো, মা কুৎসিত – হঠাৎ কোত্থেকে জন্ম হল আমার !"
>
> বন্দনার মুখটা বিকৃত হয়ে গেল, "বাবা কদর্য সন্দেহ করলেন মাকে। সে-সন্দেহ আরো বীভৎস হয়ে উঠল যখন পর পর ছায়া আর কমলা জন্মাল বাবার ঠিকে মিল দিয়ে। শেষ পর্যন্ত মাকে আত্মহত্যাই করতে হল, আর বাবা তাঁর সমস্ত প্রতিশোধ নিলেন আমার উপর। লেখাপড়া শেখালেন না – যারা দু-একজন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, জঘন্য অশ্লীল চিঠি লিখে ভাংচি দিলেন তাদের। তারপর বাবার দুটি খাঁটি কন্যার জন্যে আমাকে সিটিং দিতে হয়েছে। ছায়া, কমলা দু'জনকেই পার করেছেন বাবা। যদিও ছায়ার স্বামী দু'দিন পরেই ছায়াকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে, তবু তো কন্যাদায় উদ্ধার হয়েছে ও'র ![৪]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বনতুলসী', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

[২] 'প্রপ্রাত' *আনন্দবাজার* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্রপ্রাত', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

নিজের সৌন্দর্য কিংবা জন্মের ওপর বন্দনার নিয়ন্ত্রণ নেই। এছাড়া প্রতিটি সন্তান যে পিতামাতার দৈহিক অবয়ব লাভ করবে, তাও নয়। তবে এ ধরনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রমাপ্রসাদের মতো বর্বরের বোধগম্য নয়। নিজকন্যাকে ঘিরে মিথ্যা সন্দেহ তাকে অমানুষে পরিণত করে। মেয়ের বিয়ে ভেঙে লোকটি ক্ষান্ত হয়নি, ওর স্বল্পশিক্ষায় অর্জিত স্কুলশিক্ষিকার চাকরিও হরণ করে। এরপর বন্দনা ফিল্মে যোগ দিতে চেয়েছে, নার্স হতে চেয়েছে। কিন্তু সর্বত্র ছিল পিতার অপচ্ছায়া।

কথোপকথনকালে বন্দনা আকস্মিকভাবে রাক্ষুসে প্রপাতে তলিয়ে যায়। তবে আসন্ন মৃত্যু এবং জীবনের চরম অপমান থেকে তাকে উদ্ধার করে চিন্ময় – 'প্রায় মূর্ছিত বন্দনাকে বুকের মধ্যে আশ্রয় দিয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলতে ফেলতে বললে, আপনি আমার সঙ্গেই কলকাতা ফিরে যাবেন। আজকেই।'[১] চিন্ময়ের মতো সাহসী পুরুষ নারায়ণের গল্পে দুর্লক্ষ্য। এ গল্পে নারী শেষপর্যন্ত জীবনের সমস্ত দুর্ভাগ্যকে অতিক্রম করে একটি নিশ্চিত অবস্থানে পৌঁছতে পেরেছে।

নারীদেহকে কেন্দ্র করে একদল ভণ্ড, পাপাচারীর কুকর্মের বিবরণ পাওয়া যায় 'ছলনাময়ী', 'শৈব্যা', 'দরজা' এবং 'তমস্বিনী' গল্পে। ধর্ম এদের অনাচার বিস্তারের মোক্ষম অস্ত্র। ধর্মীয় বাণী বিতরণ করলেও পরনারীর প্রতি তাদের লালসা মাত্রাতিরিক্ত। এসব মুখোশধারী লম্পটের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ধর্মজীবীদের কপট অভিসন্ধিতে পড়ে এ-সব গল্পের অসহায় নারীরা অস্তিত্বহীনতায় ভুগেছে। অনৈতিক লালসা চরিতার্থ করার পর এসব নারীকে তারা নিষ্ঠুর উপায়ে পরিত্যাগ করেছে। আবার কখনো বা নিজেদের দুষ্কর্মকে আড়াল করার জন্য তারা হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে।

'ছলনাময়ী'[২] গল্পের দুই কাপালিক : ভৈরবানন্দ এবং ভূমানন্দ। দক্ষিণ কলকাতার একটি শ্মশানঘাটে তারা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়। এদের মধ্যে ভূমানন্দ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল। তার আশীর্বাদ লাভের জন্য এক ভক্ত তাকে প্রতিদিন গাঁজা নিবেদন করে। পাটের ফাটকা বাজারে যে আয় হয়, তা নেশা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহের জন্য ব্যয় করে যা থাকে তা এই ভক্ত গুরুসেবায় দান করে। এমন খাঁটি শিষ্যঅর্জনে ভূমানন্দ যথার্থই খুশি। দুই কাপালিকের মধ্যে সন্ন্যাসধর্ম ছাড়াও আরেকটি বিষয়ে সামঞ্জস্য রয়েছে – দুজনই নারীঘটিত কারণে ফেরারি জীবনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এর ফলে তারা হয়ে ওঠে অতিমাত্রায় নারীবিদ্বেষী।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[২] 'ছলনাময়ী' *শনিবারের চিঠি*র বৈশাখ সংখ্যায় (১৩৪৭) প্রথম প্রকাশিত হয়।

উত্তরবঙ্গের এক জমিদার পরিবারে ভূমানন্দের জন্ম হয়। সম্পত্তির অধিকাংশ সে তার প্রেমিকার পেছনে ব্যয় করলেও, তার দুর্দিনে মেয়েটি তাকে পরিত্যাগ করে। এ-বিশ্বাসঘাতকতা সে মানতে পারেনি। এক নির্জন রাতে মেয়েটিকে হত্যা করে সে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে নমঃশুদ্র ভৈরবানন্দ ভালোবাসতো এক ব্রাহ্মণ মেয়েকে। প্রেমিকার সঙ্গে কাশীতে আশ্রয় নিলেও মাসখানেক পর পুলিশ তাদের ঘেরাও করে। এসময় ভৈরবানন্দ মদের বোতল দিয়ে এক পুলিশ সদস্যকে হত্যা করে অদৃশ্য হয়। কিছুদিন পর সে শ্মশ্রুমণ্ডিত হয়ে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে আসীন হয়। অতঃপর ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ শেষে ভৈরবানন্দ কলকাতার এই শ্মশানঘাটে সাধকমূর্তি ধারণ করে। অতীত জীবন দুই সন্ন্যাসীর কাছে অসহনীয়। এ জীবনের স্মৃতিরোমান্থনের সঙ্গে ফাঁসির মঞ্চ এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে, যা স্মরণ করলে তারা শিহরিত হয়।

একদিন শ্মশানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রাকমুহূর্তে এক বৃদ্ধের মৃতদেহের পাশে অঝোরে কান্না করছিল এক অল্পবয়সী নারী। এ-সময় মেয়েটির প্রতি দুই সন্ন্যাসী তীব্র বিরূপতা প্রদর্শন করে। বিকৃত হাসিতে ভূমানন্দ বলে – 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা ! কিন্তু বুড়োর কোনো দোষ নেই ভায়া, নারী ছলনাময়ী – ছলনাময়ী।'[১] ভৈরবানন্দের সমর্থন আসে তৎক্ষণাৎ – 'হুঁ, মেয়েমানুষ ! বড় জটিল ব্যাপার ভায়া, কিচ্ছু বোঝবার জোটি নেই।'[২] নারীজাতির প্রতি বিতৃষ্ণার সুবাদে তারা যে একাত্মা, তার প্রমাণ মেলে অল্পদিনে। বসবার স্থান নিয়ে এক নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভূমানন্দের বিবাদ হয়। শক্তি-পরীক্ষায় বিশালদেহী বিহারির কাছে তার পরাজয় যখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়, তখনই তার সমর্থনে এগিয়ে আসে ভৈরবানন্দ। দুজনের সম্মিলিত প্রতিরোধে রাতেই শ্মশানত্যাগী হয় আহত নাগা সন্ন্যাসী।

এরমধ্যে শ্মশানে এক ভৈরবীর আগমন ঘটে। সারাক্ষণ তার চারপাশে লেগে থাকে দর্শনার্থীর ভিড়। ভূমানন্দরা তাকে শ্মশানছাড়া করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে ভৈরবী বলে – 'আহা-হা, কী সব বীরপুরুষ রে ! দুটো ষাঁড়ের মতো ষণ্ডা জোয়ান মিলে একটা মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিতে এসেছ, লজ্জা করল না ?'[৩] এরপর সংকল্পচ্যুত হয়ে উভয়ে ভৈরবীর দিকে তাকিয়ে থাকে। দীর্ঘকাল নারীসঙ্গ বঞ্চিত ভৈরবানন্দ মধ্যরাতে ঘুমন্ত সন্ন্যাসিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঠিক তখন বীভৎস স্বরে ভূমানন্দ চিৎকার

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ছলনাময়ী', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৫

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৮

করে বলে – 'শা – লা, তোকে আমি খুন করব।'[1] তাদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ফাঁকে ভৈরবী নিঃশব্দে সরে পড়ে বটে, কিন্তু একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এদের দেহলোকে গুপ্ত আদিম প্রবৃত্তি এরা বিসর্জন দিতে পারেনি। এদের সন্ন্যাসব্রত ভড়ং মাত্র।

'ছলনাময়ী' লঘুরসের গল্প হলেও লেখক এতে একটি বিশেষ জীবনসত্য উপস্থাপন করেছেন। সন্ন্যাসব্রত যে কেবল ধর্মীয় কারণেই উদযাপিত হয় তা নয়, বরং এ পরিচয়ের অন্তরালে আত্মগোপন করে সমাজের অনেক শীর্ষ অপরাধী। এ গল্পে আইনের ভয়ে ভূমানন্দরা ধারণ করেছে সন্ন্যাসী বেশভূষা। তারা নিজেদের নারীবিরূপ বলে প্রচার করেছে, অথচ এর মূলে ছিল অপ্রাপ্তিজনিত ক্ষুব্ধতা। দীর্ঘকাল শ্মশানচারী হলেও তারা চারিত্রিক বিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারেনি। তাই ছলনাময়ী ভৈরবীর জালে তারা শীঘ্রই আটকে যায়। গল্পে ভৈরবীও নিষ্কলুষ চরিত্র নয়। অস্তিত্বরক্ষায় সে ভৈরবানন্দ এবং ভূমানন্দকে প্রশ্রয় দিয়েছে, লিপ্ত থেকেছে রসময় আলাপে। আবার চূড়ান্ত বিরোধে উভয়কে নিবৃত্ত না করে সে পালিয়ে গেছে। গল্পের সমাপ্তিতে লেখকের মন্তব্য এরকম – 'নারী ছলনাময়ী – ইহাদের দুজনকে যত সহজে কাছে টানিয়া আনিয়াছিল, তত সহজে অবলীলাক্রমে আবার দূরে সরাইয়া দিল।'[2]

'শৈব্যা'[3] গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে সূর্যবংশীয় রাজা হরিশচন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রী শৈব্যার ভাগ্য-বিপর্যয়ের রূপকে[4]। এ গল্পে রাধাকান্তের অনৈতিক কামনার শিকার হয় নীরদা। লোকটি তার পাপাচারকে নিশ্চিহ্ন করতে গর্ভবতী-নীরদাকে পাঠিয়ে দেয় 'সর্বংসহ পুণ্যভূমি' কাশীতে। কারণ সমাজে তার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে – 'ধার্মিক ও চরিত্রবান বলে তাঁর খ্যাতি আছে এবং পত্নী-পুত্র-কন্যা পরিবৃত সংসার আছে, সর্বোপরি সমাজ তো আছেই।

---

[1] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬০

[2] প্রাগুক্ত

[3] 'শৈব্যা' *পূর্বাশা* পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় (১৩৫৪) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[4] "একদা হরিশচন্দ্র কর্তৃক ভ্রমণবশতঃ বিশ্বামিত্রের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটায় মুনির কোপে তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। তখন শৈব্যা স্বামী ও পুত্রের হাত ধরে একবস্ত্রে পথের ভিখারিণী হন। হরিশচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে সমস্ত রাজ্য ও ধন দান করেন এবং তা সম্পূর্ণ করবার জন্য শিশুপুত্র রোহিতাশ্ব সহ শৈব্যাকে কাশীর এক ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রয় করেন ও নিজেকে কাশীর শ্মশানপাল চণ্ডালের কাছে বিক্রয় করে দক্ষিণা সংগ্রহ করেন। রোহিতাশ্ব একদিন ব্রাহ্মণের পূজার ফুল সংগ্রহ করতে গিয়ে সর্পদষ্ট হয়ে নিহত হয়। রাত্রে শৈব্যা পুত্রের সৎকারের জন্য শ্মশানে উপস্থিত হলে হরিশচন্দ্র শবদেহের কর আদায় করতে তাঁর কাছে উপস্থিত হন। সেখানে উভয়ে পরস্পরকে চিনতে পারেন। হরিশচন্দ্রের মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র রোহিতাশ্বের পুনর্জীবন দান করেন ও হরিশচন্দ্রকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন।" [উদ্ধৃত : সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, পৃ. ৫১৬]

আর যাই হোক তিনি সাধারণ মানুষ – দেবতা নন !'[1] বেনারসের পুলিশ যখন চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে একটি নামগোত্রহীন নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার করে, তখন রাধাকান্ত বৈঠকখানায় নারীজাতির পাপপ্রবণতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখে। তার আলোচনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে বাচস্পতি যুক্ত করে একটি কদর্য সংস্কৃত শ্লোক।

কাশীতে নীরদাকে রাখা হয় রাধাকান্তের পাণ্ডা মহাদেব তেজওয়ারীর বাড়িতে। এখানে অবস্থানের সমুদয় ব্যয়-বহনের প্রতিশ্রুতি দিলেও, রাধাকান্ত তা বিস্মৃত হয়। এজন্য মহাদেব মেয়েটিকে কর্কশ ভাষায় ভর্ৎসনা করে। বাবা বিশ্বনাথের কাশীতে কেউ উপবাসী না থাকলেও, নীরদা দুদিন অনাহারে থাকে। সন্ধ্যার পর অসুস্থ শরীরে সে উপস্থিত হয় হরিশচন্দ্রের ঘাটে। জনবিরল শ্মশানে তথাকথিত ধর্মপালকদের দুরাচারের স্মৃতি তার মস্তিষ্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে এবং সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এসময় হরিশচন্দ্র মন্দিরের চাতালে বসে ধূমপান করছিল চণ্ডাল যুবক জীউৎরাম। বংশানুক্রমিকভাবে সে এই ঘাটে শবদাহ করে। চণ্ডাল হলেও ছেলেটি শৌখিন, মাঝেমধ্যে ভুলে যায় তার ব্রাত্য পরিচয়। একটি গাছের তলায় নীরদাকে প্রত্যক্ষ করে সে কর্তব্যসচেতন হয়। মেয়েটিকে বুকে তুলে নিয়ে সে গঙ্গাতীরে সেবা-শুশ্রূষা করে। সুস্থ হয়ে নীরদা চণ্ডাল যুবককে ছদ্মবেশী বিশ্বেশ্বর ভাবে। অভুক্ত মেয়েটির জন্য জীউৎরাম বাজার থেকে ক্রয় করে দই, মিষ্টি এবং সবজি। শ্মশানচারীর আচরণে নীরদা অভিভূত হয়। কিন্তু আহারের প্রাক্কালে যুবকের পরিচয় শুনে সে ক্ষোভে ফেটে পড়ে :

> চাঁড়াল হয়ে বামুনের বিধবাকে ছুঁলি তুই ? মুখে জল দিলি ?... তোর প্রাণে ভয় নেই ? এত বড় সাহস – আমাকে খাবার দিতে আসিস ? তোর মতলব কী বল্ দেখি ?[2]

পদাঘাতে খাবারগুলো ছড়িয়ে দিয়ে নীরদা হাঁটতে থাকে। নির্জন বাড়িতে দরজা খুলতেই সে হতভম্ব হয়ে পড়ে। এক মদ্যপ পুরুষ তাকে নিষ্ঠুরভাবে জাপটে ধরে। দুর্বলদেহে মেয়েটি আত্মসমর্পণ করলে, এক মুঠো টাকা নিয়ে বেরিয়ে যায় মহাদেব তেজওয়ারী। জাতরক্ষায় জীউৎরামকে তিরস্কার করলেও নীরদা পরিত্রাণ পায় না। ধর্মরক্ষকদের লোভ-লালসায় বারবার তার নারীত্বের অবমাননা ঘটে।

অন্যদিকে নীরদার কাছ থেকে ভর্ৎসনা প্রাপ্ত হয়ে জীউৎরাম বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জীবদ্দশায় যাদের স্পর্শ করবার অধিকার তার নেই, তাদের মৃত্যুর পর সে প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। চিতাস্থ শবদেহকে সে বাঁশ দিয়ে নিদারুণ প্রহার করে। এসব উন্মাদগ্রস্ততার পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধুরা তাকে নিয়ে যায় দেশি মদের দোকানে। দীর্ঘদিন পর জীউৎয়ের রক্তে উন্মাদনা আসে। ডালমণ্ডির প্রতি দরজায় যখন রাত্রির অপ্সরীরা দাঁড়িয়ে থাকে

---

[1] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈব্যা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৩

[2] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৭

‘শিকার ধরবার জন্য’, তখন নেশাগ্রস্ত জীউৎরাম দিব্যদৃষ্টিতে আবিষ্কার করে নীরদাকে। মেয়েটি হাত ধরলে সে তার পতিত-পরিচয়ের কথা উল্লেখ করে। প্রত্যুত্তরে উচ্চহাস্যে মেয়েটি বলে – ‘আমি চাঁড়ালনী। ভয় কি, চলে এসো –।’[১] আশ্চর্য যে, নীরদার কাছ থেকে উদ্ধার পেতে জীউৎরাম পালাতে থাকে। গল্পের শেষাংশে হরিশচন্দ্রের ঘাটে চণ্ডাল যুবককে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ব্যক্তিগত রাগ-অভিমান বিসর্জন দিয়ে সে অপেক্ষা করে ব্রাহ্মণী নীরদা নয়, মৃত নীরদার জন্য। কেননা :

> সেদিন তার অহঙ্কার থাকবে না, থাকবে না আজকের এই অপমানের কালো কলঙ্কের ছাপ। সেদিন জীউৎ তাকে নিজের মতো করে পাবে, পাবে তাকে স্পর্শ করবার অধিকার, চণ্ডালের ছোঁয়ায় সেদিন তার কাশীপ্রাপ্তির সার্থক মর্যাদা ফিরে আসবে। সেই দিনের প্রতীক্ষা করবে জীউৎ – অপেক্ষা করে থাকবে সেই দিনের জন্যে।
>
> রাধাকান্তের বাড়িতে তখন কথকতা হচ্ছিল। শ্মশানে চণ্ডাল মহারাজা হরিশচন্দ্রের সঙ্গে রাজরাণী শৈব্যার মিলন।[২]

‘দরজা’ গল্পে এক অসহায় ধর্ষিতা নারীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আশ্রয়দাতাই তার চরম সর্বনাশের কারণ। অথচ লোকটি প্রকাশ্যে সাধক, কালীকীর্তন গায় এবং রক্তবস্ত্র পরিধান করে। অনৈতিক গর্ভধারণের জন্য আশ্রয়দাতাকে নয়, বরং মেয়েটির সঙ্গে ধর্মভীরু আত্মীয়-স্বজন সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং তাকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করে। গল্পে মুমূর্ষু এ নারীর প্রাণরক্ষা করে অপরিচিত মুসলমান গাড়োয়ান। স্ত্রী-পরিচয়ে সে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং ভূমিষ্ঠ সন্তানকে হাসিমুখে বরণ করে। এ-পর্যায়ে ডাক্তারের সঙ্গে তার যে সংলাপ, তার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য :

> ডাক্তার হাসলেন : আদাব মিঞা সাহেব। আপনার বিবি ?
>
> – জী জনাব।
>
> – ব্যথা উঠেছে দেখছি। আচ্ছা, এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি।
>
> এখন আর কোচম্যান নয় – গোলাম রহমান সে। গায়ে ফর্সা জামা – পরনে ধোপাদুরস্ত লুঙ্গি। বিনীত হেসে বললে, আপনার মেহেরবানি।
>
> – কি নাম বিবির ?
>
> – রোকেয়া।
>
> – পাঠিয়ে দিন ভেতরে –
>
> আর একটি দরজা খুলল। আর একটি নতুন শিশুর জন্যে।[১]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯০

[২] প্রাগুক্ত

তান্ত্রিকতার ছলে দুটি নারীপ্রাণ কীভাবে নিঃশব্দে ঝরে যায়, তারই উদাহরণ 'তমস্বিনী'। এ গল্পে আড়িয়াল খাঁ নদীতীরে বলরাম চক্রবর্তীর আবাস। তার বাড়ির সম্মুখস্থ একটি নিথর বাঁশবনের পথে তার সঙ্গে প্রায় দেখা হয় গল্পকথক অন্তুর। লেখাপড়ায় কৃতবিদ্য না হলেও লোকটি পাণ্ডিত্য প্রকাশে ব্যস্ত থাকে। নিজেকে তান্ত্রিক প্রমাণিত করতে সে পরিধান করে লাল কাপড়, গলায়-বাহুতে পরে রুদ্রাক্ষের মালা এবং কপালে গলিত সিঁদুর। এমন সাজসজ্জার পরেও সে জনমনে ভীতি সঞ্চারে ব্যর্থ হয়। বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলে বলরামের কিছু শিষ্য রয়েছে, সেখান থেকে প্রতিবছর সে দক্ষিণা পায়।

বলরাম-পারুল দম্পতি ছিল নিঃসন্তান। স্ত্রীর দূরসম্পর্কের বোন তারামাসি এ পরিবারে আশ্রিতা, সর্পদংশনে স্বামীর মৃত্যু হলে সে বোনের সংসারে আসে। পারুলের তুলনায় তারামাসি বেশ রূপসী। তার আগমনের পর বাড়িতে দুটি পক্ষ তৈরি হয় : একদিকে বলরাম-তারা, অন্যপক্ষে পারুল একা। অসহায় পারুলের অনেক চিঠি লিখে দেয় অন্তু। বরিশালে পিতার ঠিকানায় প্রেরিত এসব পত্রে প্রকাশ পায় তার মনোবেদনা। পারুলের সঙ্গে অন্তুর স্নেহের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তারামাসি বিরক্ত হয়। অন্তুও যথাসম্ভব তাকে এড়িয়ে চলে। নবম শ্রেণির ছাত্র হলেও তারা-বলরামের সম্পর্ক-বিষয়ক নানা সন্দেহ ফেনিয়ে ওঠে তার কিশোর মনে। কেবল অন্তু নয়, প্রতিবেশীরাও এদের নিয়ে গুঞ্জন তোলে।

একদিন অন্তুকে তাদের গৃহে আসতে বারণ করে পারুল । পরদিন শোনা যায়, তারার খুন হওয়ার সংবাদ। বুনোপাড়ার দুজন ব্যক্তি হোগলার বনে মৃতদেহ খুঁজে পায়। এরপর গ্রামে আরম্ভ হয় দারোগা-পুলিশের তৎপরতা। সাতদিন পর শিষ্যগৃহ থেকে ফিরে বলরাম শোকে মূর্ছা যায়। অতঃপর জ্ঞান ফিরলে দারোগার নির্দেশে তাকে যেতে হয় গৌরনদী থানায়। কিছুদিন পর চাপা পড়ে তারার রহস্যজনক মৃত্যু।

এক বছর পর অন্তুর কাছে পারুল ছোট্ট সহযোগিতা চায়। গভীর রাতে স্টিমারঘাটে পৌঁছে দেবার জন্য সে তাকে অনুরোধ করে। পথিমধ্যে পারুল জানায় – তারার হন্তারক অন্য কেউ নয়, স্বয়ং বলরাম। শিষ্যবাড়িতে যাওয়ার কথা বলে সে মেয়েটিকে হত্যা করে। বিস্ফারিত কণ্ঠে পারুল বলে :

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তমস্বিনী', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৭

> তন্ত্রসাধনার ফল ফলেছিল কিনা – দিদি যে ওঁর ভৈরবী হয়েছিল ! – পারুল কাকিমার গলায় কেউটে সাপের ফোঁসানির মতো আওয়াজ উঠতে লাগল : একজন না চাইতেই সন্তান পেল, তাই মরতে হল তাকে। আর একজন সাত বছর চেয়েও পেল না – তাই তাকে বেঁচে থাকতে হল, বেঁচে থাকতে হল মরবার সাহস নেই বলে।[১]

স্টিমারঘাটে পৌঁছে পারুল যাত্রা করে গয়নার নৌকায়। পিত্রালয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও, তার গন্তব্যস্থল যে বরিশালের খালিশকোটা নয় – এ ব্যাপারে অন্তু নিশ্চিত। সাংসারিক জীবনে পারুল স্বামীর অনৈতিক তন্ত্রচর্চার প্রতিবাদ করেনি। তবে বোনের মৃত্যুর পর সে সচকিত হয়। একারণে স্বামীসঙ্গ ছেড়ে সে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ে।

প্রেম ও দাম্পত্যসম্পর্ক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নরনারীর প্রেম ভিন্ন তাৎপর্যে পরিবেশিত হয়েছে। জনৈক সমালোচকের মতে – 'যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রেম প্রধানত ভিত্তি পেয়েছে মনস্তত্ত্বে। জীবনের পোড় খাওয়া মানুষ প্রেমকে নিছক বিলাস হিসেবে গ্রহণ করেনি।'[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও যুদ্ধোত্তর বাস্তবতায় প্রথাগত প্রেমের আবহ নির্মাণ করেননি; বরং আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটে তাঁর গল্পে প্রেমানুভূতি বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ফলে নায়ক-নায়িকার মনোযন্ত্রণা, অন্তর্বিপ্লব এবং নিরাশার মধ্য দিয়ে এ-শ্রেণির গল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রতিকূল জীবনবাস্তবতার কাছে পরাজিত নায়ক-চরিত্র অনেকক্ষেত্রে কাপুরুষোচিত আচরণ করেছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তারা মুহূর্তে জলাঞ্জলি দিয়েছে ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভব। নারায়ণের প্রেমবিষয়ক গল্পের মধ্যে 'বন-বিড়াল', 'প্র্যাকটিস্', 'ঘাসবন', 'তিমিরাভিসার', 'কল্পপুরুষ', 'হাত', 'গলি', 'সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে', 'ট্যাক্সিওয়ালা', 'বনতুলসী', 'দিনান্ত', 'কমিশন', 'মাধ্যাকর্ষণ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নিম্নশ্রেণির প্রেমের বহুমাত্রিকতা প্রদর্শিত হয়েছে 'বন-বিড়াল'[৩] গল্পে। এ গল্পে দুলী ভুঁইমালীর মেয়ে, পেশায় সে পরিচ্ছন্ন-কর্মী। সম্পর্কের একপর্যায়ে সে তার দীর্ঘদিনের সঙ্গী মাখনাকে ত্যাগ করতে চায়। এর কারণ স্পষ্ট – মাখনা দাগী চোর, বছরের অর্ধেক সময় সে জেলে থাকে। এছাড়া সুখা নামের এক মেয়ের সঙ্গে তার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। চৌর্যবৃত্তির জন্য মাখনা অনুতপ্ত হলেও, দুলী নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকে। গল্পকথক-

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭০

[২] উদ্ধৃত : অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ড., *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : ছোটগল্পের রূপকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

[৩] 'বন-বিড়াল', *প্রভাতী* পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় (১৩৫০) প্রথম প্রকাশিত হয়।

রঞ্জন তাকে সামাজিক সংস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে দুলীর জীবনের গতি সরল; স্বর্গসুখ কিংবা নরকের বিভীষিকা তাকে বিচলিত করতে পারে না। এদের বিষয়ে রঞ্জনের দিদি শুরুতেই তাকে সতর্ক করেন এই বলে যে, 'ও মুখপোড়াদের যেমন সমাজ, তেমনি স্বভাব। বিয়ে নেই, নিকে নেই, যার সঙ্গে খুশি ভিড়ে যায়। ওদের ভাবনা ভেবে মিথ্যে মাথা খারাপ করছিস কেন ?'[১]

রঞ্জনের দিদির বক্তব্যই অবশেষে সত্য হয়। একদিন রঞ্জনের পা জড়িয়ে মাখনা একটানা ক্রন্দন করতে থাকে। কারণ বীরুয়া নামের এক ভিনদেশির সঙ্গে ঘর বেঁধেছে দুলী। লোকটি পথেঘাটে বানর-নাচ দেখায়; তদুপরি দৈহিকভাবেও আকর্ষণীয় নয়। প্রিয়তমাকে হারিয়ে মাখনা তাই প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। ফাঁসির ভয় তুচ্ছ করে সে দুলীকে হত্যার পরিকল্পনা করে।

অল্পদিনের মধ্যে দুলী হয়ে ওঠে বীরুয়ার যোগ্য সহধর্মিণী। সংসার-ধর্ম বিসর্জন দিয়ে সে যে সমাজ-গোত্রহীন এক যাযাবরের সঙ্গী হয়েছে – এ নিয়ে তার সঙ্কোচবোধ নেই। বেদের মেয়েদের মতো সে রঙিন পোশাক পরিধান করে। বীরুয়ার ঢঙে অস্পষ্ট বাংলা উচ্চারণে কথা বলবার কৌশল সে রপ্ত করে অবিশ্বাস্যভাবে। রঞ্জন তাকে বিদ্রূপ করলে সে উত্তর দেয় – 'লজ্জা ভদ্দরলোকের, লজ্জা করলে কি আমাদের পেট চলে ?'[২] বীরুয়া অসুস্থ হলে দুলী একাই বানর খেলা দেখায়। এ নিয়ে রঞ্জন পুনরায় কটাক্ষ করলেও সে গুরুত্ব দেয় না।

গল্পের পরবর্তী অংশে রঞ্জনের দিদিকে দারুণ চিন্তিত দেখায়। বন-বিড়াল তার অনেক পায়রা সাবাড় করেছে। পায়রার প্রতি দিদির ভালোবাসা অত্যধিক। তার বিশ্বাস পায়রা লক্ষ্মীর বাহন, সুতরাং এগুলোর উপস্থিতি সংসারের জন্য কল্যাণকর। প্রতি সকালে যথাসাধ্য পরিচর্যা করে তিনি এদের সন্তুষ্ট রাখেন। এমনকি তার স্বামী পায়রার মাংস খাওয়ার ইচ্ছাপোষণ করলে, তিনি খাশির বন্দোবস্ত করেন। শখের পায়রাগুলোর দুরবস্থা তিনি মানতে পারেন না।

দিদির অনুরোধে রঞ্জন বন-বিড়াল শিকারের জন্য প্রতীক্ষা করে। রাত দুটোর সময় সে বাড়িতে একটি চতুষ্পদ জন্তুর অস্তিত্ব অনুভব করে। আকারে-প্রকারে সেটি বন-বিড়াল নয়, চিতাবাঘের সমান। কয়েক মাইল দূরে সিংহাবাদের হিজলবন, অতএব এ আশঙ্কা অমূলক নয়। কম্পিত হস্তে সে বন্দুক চালালে শোনা যায় মর্মান্তিক চিৎকার। তবে এ গর্জন বাঘের নয়, দুলীর; গুলির আঘাতে মেয়েটির একটি হাত মারাত্মক জখম হয়। পরে

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বন-বিড়াল', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২৪

জানা যায়, বীরুয়ার অসুখ বৃদ্ধি পাওয়ায় সে-ই পায়রা চুরি করেছে। কবুতরের ঝোলে রোগীর শক্তি বৃদ্ধি পায় – এমনটি ছিল কবিরাজের বিধান। এ ঘটনায় রঞ্জনের মনে দুটি প্রশ্নের উদ্রেক হয় :

> মাখন চোর বলে দুলী তার ঘর ছেড়েছিল, আর বীরুয়ার জন্যে চুরি সে নিজেই করতে এল। তা হলে সেটা কি মাখনকে ছেড়ে আসবার একটা সাময়িক ছুতো মাত্র ? অথবা বৃহত্তর প্রেমের কাছে সে নিজের সমস্ত আদর্শকেই আজ নিঃশেষে বিসর্জন দিয়ে বসে আছে ?[১]

প্রেমের বাঁধভাঙা-রূপ লেখক দুলীর রূপান্তরের মধ্যে খুঁজবার চেষ্টা করেছেন। কোনো ভাবাবেগ নয়, দুলী তাড়িত হয়েছে নিজস্ব যুক্তিতে। পছন্দের সঙ্গী নির্বাচন করে সে সমাজকে অস্বীকার করেছে। পরিশেষে প্রেমের জন্য তার যে চারিত্রিক অধঃপতন, তা গল্পে বিশেষ আবহ সৃষ্টি করেছে।

ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি কনস্টেবল অচ্ছয়লালের চেতনাপটে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করে তার দৃষ্টান্ত 'প্র্যাকটিস্'। জগলালের কন্যা জানকী ছিল তার কৈশোরবেলার সঙ্গী। বাঁশি বাজিয়ে তখন সে মাঠে মহিষ চরাতো। একদিন অচ্ছয়লাল জানকীর ওপর চড়াও হলে সে বলে – 'বহুকে কেউ মারে নাকি ?... বাবা বলছিল তোর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে।'[২] সেদিন ছেলেটির বাঁশির সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে মাঠ-ভর্তি 'গহুমে'র প্রতিটি শিষে।

জানকীর বয়স বারো হলেও তার পিতা বিয়ে দেয়নি। স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী মেয়েটি অরক্ষণীয়া। গ্রামবাসীর কাছে বিষয়টি অস্বাভাবিক হলেও তারা প্রতিবাদ করেনি। কারণ জগলাল এতদঞ্চলের প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর। একদিন জগলালের তেজি ঘোড়া 'বাহাদুর' দড়ি ছিঁড়ে চলে যায় তালুকদার সূরযনারায়ণের পাকা গহুমের ক্ষেতে। অসুরমূর্তি ধারণ করে সূরযনারায়ণ অবলা পশুটিকে চাবুক মারে। বাহাদুর প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। প্রিয় ঘোড়ার ওপর অমানবিক নির্যাতন জগলাল মেনে নেয়নি। প্রতিবিধানস্বরূপ সূরযনারায়ণকে সে চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত করে।

পরবর্তী ঘটনা জগলালের জীবনকে করে বিপর্যস্ত। জানকীকে অপহরণ করে সূরযনারায়ণ তার খোঁড়া চাকরের সঙ্গে বিয়ে দেয়। জগলাল এজন্য মামলা করতে চাইলে কেউ সাক্ষী হয় না। অবশেষে অচ্ছয়লালের সঙ্গে

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২৮

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্র্যাকটিস্', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫

থানায় গেলে দারোগা উল্টো তাকেই ভীতিপ্রদর্শন করে। কারণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সবসময় ছিল ক্ষমতাবানদের পক্ষে। উন্মাদ জগলাল সেদিন চিৎকার করে – 'জান্ লে লেঙ্গে, উস্‌কো জান্ লে লেঙ্গে।'[১]

জগলাল তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করে; তবে সূরযনারায়ণকে নয়, হত্যা করে খোঁড়া চাকরকে। বিচারে তার ফাঁসি হয়, এরপর জানকীর কোনো খবর পায়নি অচ্ছয়লাল। সমাজপতিদের দাপটে প্রেমিকাকে হারিয়ে সে হয়ে পড়ে বেপরোয়া। দীর্ঘদিন পর সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালনকালে রাস্তায় গুলিবিদ্ধ কিশোরের রক্তের সঙ্গে জানকীর কপালের সিঁদুরের মিল খুঁজে পায় অচ্ছয়লাল। অন্যদিকে ব্যাটেলিয়ানের ইংরেজ মেজরের চেহারায় সে খুঁজে পায় তালুকদার সূরযনারায়নের প্রতিচ্ছবি। কৈশোরে নিরস্ত্র থাকলেও অচ্ছয়লাল এসময় মেজরকে হত্যা করে প্রতিশোধের স্বপ্ন দেখে। মূলত প্রেমবঞ্চিত এক যুবকের বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রতিক্রিয়াই এ-গল্পে শিল্পরূপ দিয়েছেন নারায়ণ।

প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মানুষ কতটা আদিম ও হিংস্র হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত 'ঘাসবন'[২]। উত্তরবাংলার এক নির্জন প্রান্তরে শ্যামলালের মহিষ-বাথান। তার মহিষের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, ছোটো-বড়ো মিলে আঠারোটি। অতীতে এ সংখ্যা আরো বেশি ছিল, মহামারিতে অনেক মহিষ মারা যায়। মহিষগুলো নিয়ে শ্যামলালকে প্রতিদিন ব্যস্ত থাকতে হয়। এজন্য নিঃসঙ্গ জীবনযাপনে তার কোনো দুঃখ-ক্ষোভ নেই। একদিন হারিয়ে যাওয়া মহিষের সন্ধানে শ্যামলাল আসে ভূতের জাঙ্গালে; বাঁধটিতে গোখরা সাপের অবাধ বিচরণ, শেয়াল পর্যন্ত সেদিকে যায় না। কিন্তু বাথানের সবচেয়ে দুধেল মহিষের অনুপস্থিতি সে মানতে পারে না। উচ্চৈঃস্বরে সে 'আঃ আঃ আঃ' সংকেত করলে কোনো সাড়াশব্দ মেলে না। প্রত্যুত্তরে তীক্ষ্ণ হাসিতে নিভৃত স্থান মুখরিত হয়। এ হাস্যধ্বনিতে শ্যামলাল ভয়চকিত হয়। এসময় তাকে অবাক করে পার্শ্ববর্তী ঘাসবন থেকে বেরিয়ে আসে হিন্দুস্থানি মেয়ে রুক্‌নি। আপৎকালে এরূপ ঠাট্টা শ্যামলালের পছন্দ হয়নি। এরপর মেয়েটি ঘাটোয়াল-কন্যা পরিচয় দিলে যুবক তাকে উপেক্ষা করে।

কাঞ্চন নদীর ছোটো খেয়াঘাটের ঘাটোয়ালের ওপর শ্যামলালের 'জাতক্রোধ'। মধ্যবয়সী লোকটি গাঁজায় আসক্ত। রোজগার কম হলে সে অহেতুক গালমন্দ করে। এরকম দিনে ঘাটোয়ালের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। শ্যামলাল মহিষে চড়ে নদীতীরে উঠলে লোকটি খাজনা দাবি করে। জমিদারের ভাণ্ডারে বহু টাকা দিয়ে সে ইজারা নিয়েছে। এজন্য শুধু নৌকা নয়, যে কোনো প্রকারে নদীপার হলে সে ন্যায্য পাওনাদার। শ্যামলাল

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬

[২] 'ঘাসবন' *আনন্দবাজার* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫৪) প্রথম প্রকাশিত হয়।

এসব কথা অগ্রাহ্য করলে আরম্ভ হয় মল্লযুদ্ধ। ঘাটোয়ালের লোকজন উভয়ের বিরোধ মিটিয়ে দিলেও এ শত্রুতার রেশ থেকেই যায়।

সন্ধ্যায় হারানো মহিষটি স্বেচ্ছায় বাথানে ফিরে আসে। এজন্য অনেকটা স্বস্তি ফিরে পেলেও সমস্ত রাত শ্যামলালের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে রুক্নি। পরদিন সে অকারণে জাঙ্গালের সে-জায়গাটায় যায়, যেখানে রুক্নিকে ছাগল চরাতে দেখেছিল। বাঁধের ওপর শিমুলগাছের নিচে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। শ্যামলাল জাঙ্গালের ভয়াবহতার বিষয়ে সতর্ক করলে মেয়েটি অকপটে বলে – 'এখানে না উঠলে তো দেখা যেত না তুমি আসছ কিনা।'[১] এরূপ সহজপন্থায় নির্মিত হয় তাদের প্রেমের সম্পর্ক। ঘাসবনের মধ্যে চলে এদের আদিম এবং অনাবৃত ভালোবাসার চর্চা। শ্যামলালের আলিঙ্গনে মুগ্ধ রুক্নি গুনগুন সুরে গান ধরে।

এ ঘটনার পর প্রাত্যহিক কাজে শ্যামলালের অনীহা আসে। একাকী রাত্রিযাপনে সে অসহ্য বোধ করে। পূর্বশত্রুতার কারণে ঘাটোয়ালের কাছে বিয়ের প্রস্তাব রাখা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। অনন্যোপায় হয়ে সে রুক্নিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। তবে মেয়েটির অকাট্য প্রশ্নে তার পরিকল্পনায় ভাটা পড়ে – 'এই বাথান, এই ভৈঁসার পাল ? এগুলোকে তো সবসুদ্ধ তাড়িয়ে দিতে পারবে না। ফেলে যেতে পারবে ?'[২] সংকোচ কাটিয়ে সে ঘাটোয়ালের শরণাপন্ন হতে চাইলে রুক্নি নিবৃত্ত করে। মেয়েটি জানে, শত অনুরোধ কিংবা প্রলোভনে বাবাকে রাজি করানো সম্ভব নয়।

একদিন ঘাটোয়াল নিজেই আসে শ্যামলালের বাথানে। লোকটির মুখে মিষ্টি হাসি, শত্রুতা ভুলে সে মিত্রতার প্রস্তাব দেয়। শ্যামলালের ধারণা, পিতার সম্মতি আদায় করেছে রুক্নি। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত – বাড়িতে জামাইয়ের আগমন উপলক্ষে ঘাটোয়াল দু সের খাঁটি ঘি চায়। নব্য বন্ধুর কাছে সে প্রকাশ করে মেয়ের বিবাহ-বৃত্তান্ত। দুবছর বয়সে রুক্নির সঙ্গে বিয়ে হয় হবিবপুর থানার এক সিপাহির। দীর্ঘদিন পর মেয়ে স্বামীগৃহে গমন করবে। চৌকিদারের মাধ্যমে সিপাহি পাঠিয়েছে লাল শাড়ি। শ্বশুরালয়ে আসবার দিন সে আনতে চেয়েছে নতুন গয়না।

পরবর্তী সাক্ষাতে মেয়েটি সবকিছু স্বীকার করে। বিবাহিতা রুক্নি শ্যামলালকে কাছে পাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারেনি। তার এরূপ বক্তব্যে শ্যামলাল শান্ত থাকে। রুক্নির নিকট তার অন্তিম অনুরোধ – 'তোর নতুন

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ঘাসবন', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪০

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪১

রাঙা শাড়িটা পরে আসবি রুক্নি, যেটা টকটকে লাল। আমার দেখতে ভারি ইচ্ছে করছে।'[১] পরদিন বাথানের একটি শক্তিশালী মহিষ নিয়ে শ্যামলাল যায় জাঙ্গালের রাস্তায়। রুক্নিও নববধূর সাজে উদ্‌যাপন করতে চায় 'শেষ বাসর'। তৎক্ষণাৎ গাঢ় লাল রঙের আকর্ষণে ভৈরবী-গর্জন করে মহিষটি ছুটতে থাকে। ক্ষ্যাপা মহিষের আক্রমণ থেকে মেয়েটি বাঁচার আকুতি করলেও শ্যামলাল কর্ণপাত করে না। পেছনে ফিরে সে নিশ্চিন্তে বিড়ি ধরায়। এরপরও শ্যামলাল ক্ষান্ত হয়নি, রুক্নির স্বামীর জন্য প্রস্তুতকৃত ঘিয়ে সে মেশাতে চায় গোখরা সাপের বিষ। প্রকৃতপক্ষে আকাঙ্ক্ষিত প্রেমে ব্যর্থতার ফলে মানুষ কীরকম প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠে তারই একটি চিত্র উঠে এসেছে এ-গল্পে।

'ঘাসবন' গল্পে প্রকৃতি সুন্দরের বার্তা বহন করেনি, বরং হিংসা ও প্রতিশোধের ফণাই উত্তোলন করেছে। এ হিংস্রতা ঘাসবনের ভালোবাসার মতো নগ্ন এবং নিরাবরণ। প্রকৃতির কোলে শুয়েও এর বিশালতা শ্যামলালের প্রেমিক-হৃদয়কে প্রসারিত করেনি। গল্পে তার হিংস্রতা পাঠককে শিহরিত করে। অবশ্য ব্যর্থ প্রেমিকের এরূপ আচরণ নারায়ণের অন্য গল্পেও রয়েছে। রুক্নির ন্যায় 'বনজ্যোৎস্না' গল্পের শিউকুমারী প্রেমের চরম মূল্য দিয়েছে। অকৃত্রিম বিশ্বাস তাদের মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

যুদ্ধোত্তর সমাজব্যবস্থায় একটি প্রেমসম্পর্ক কীভাবে বিনষ্ট হয়ে গেছে তা উপস্থাপিত হয়েছে 'তিমিরাভিসার'[২] গল্পে। মুমূর্ষু-দশায় সুনীলাকে নিজের রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে তোলেন ডাক্তার প্রণবেশ ঘোষাল। তাঁর সেবায় মুগ্ধ হয়ে সুনীলার মা জয়াবতী বারবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। হাসপাতাল ত্যাগের দিন সুনীলা ডাক্তারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। বাড়িতে ফিরে এসে ডাক্তারকে উপর্যুপরি কয়েকটি পত্র প্রেরণ করে জয়াবতী। প্রত্যেক পত্রে সে তাঁকে আতিথ্যরক্ষার অনুরোধ করে। প্রকৃতপক্ষে জয়াবতীর নামে পত্র প্রেরিত হলেও এর হস্তাক্ষর, ভাষা, আবেগ সবই সুনীলার।

একদিন ডাক্তার প্রণবেশ পত্রের আহবানে সাড়া দেন। কলকাতার একটি চারতলা ফ্ল্যাটের সামনে তিনি ট্যাক্সি থেকে নামেন। ভদ্রমহলে এলাকাটির বিশেষ সুনাম নেই, ফ্ল্যাট নম্বর অনুযায়ী কড়া নাড়তে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় জয়াবতী। ভেতরে প্রবেশ করে ডাক্তার অপ্রস্তুত হন। বিধবা মা এবং মেয়ের পক্ষে ড্রয়িংরুমের অত্যাধুনিক সাজসজ্জা তাঁর কাছে বেমানান লাগে। ঘরের মধ্যে একটি অ্যাশট্রের ওপর পড়ে-থাকা আধপোড়া চুরুট তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। দেয়ালে ঝুলানো নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে তিনি রীতিমতো লজ্জিত হন। এরূপ

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৪

[২] 'তিমিরাভিসার' *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫৯) প্রথম প্রকাশিত হয়।

উদ্ভট পরিবেশ থেকে মুক্তি চাইলেও, সুনীলার মিষ্টি সম্ভাষণ তাঁকে মোহাচ্ছন্ন করে। ক্রমশ সুনীলার প্রতি তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকে।

একদিন সুনীলাদের ফ্ল্যাটে প্রণবেশের সঙ্গে দেখা হয় এক প্রৌঢ়ের। লোকটি নিজেকে মি. মল্লিক বলে পরিচয় দেয়। তার গতিবিধিসূত্রে মনে হয়, এ-পরিবারের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠসূত্রে সম্পর্কিত। বেশভূষায় আভিজাত হলেও মি. মল্লিক স্থূল রুচিসম্পন্ন। প্রথম সাক্ষাতে সে প্রণবেশকে বাড়ি-গাড়ি সংক্রান্ত বৈষয়িক প্রশ্নে জর্জরিত করে। সুনীলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে সে আপত্তিকর মন্তব্য করে। অকস্মাৎ সুনীলা এসে ডাক্তারকে বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে। পরিণামে লোকটি তাকেও নানা প্রকারে উত্ত্যক্ত করে। এ ঘটনার পর সুনীলা প্রণবেশকে টেলিফোন করে ফ্ল্যাটে আসতে বলে। সুনীলার আকস্মিক প্রস্তাবে প্রণবেশ বিস্মিত হন, সন্দেহগ্রস্ততায় আচ্ছন্ন হয় তাঁর সমস্ত মন। এরপরও তিনি প্রেমিকাকে অবিশ্বাস করেননি। এদিন তাদের সিনেমা দেখবার পরিকল্পনা থাকলেও, তা উপভোগ্য হয় না। বাড়ি ফিরে সুনীলা মি. মল্লিককে ড্রয়িংরুমে দেখতে পায়। লোকটির চুরুটের ধোঁয়ায় ঘরটি হয়ে উঠেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন; তার মায়ের ঠোঁটেও জ্বলছে সিগারেট। এসময় সুনীলাকে লক্ষ করে জয়াবতী যেভাবে প্রশ্ন করে তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার শ্রেণিপরিচয় :

> কিছু দিলে আজ ডাক্তার ?... এত খরচ-পত্তর করে এখানে সব সাজিয়ে বসলাম, সে বুঝি দুটো মিঠে মিঠে কথা শোনবার জন্যে ? নগদ টাকা না হোক অন্তত একটা ঘড়ি দিলে দিতে পারত, দিতে পারত দু-একখানা গয়না। ভুল আমারই হয়েছিল। সুন্দর চেহারা আর কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল বেশ ভালো ঘরের ছেলে।[১]

যুদ্ধোত্তর সমাজের এ-এক বাস্তব চিত্র। জয়াবতীর কাছে মেয়ে এবং তার রূপলাবণ্য কেবল অর্থসংগ্রহের উপায়মাত্র। ডাক্তারের সঙ্গে সুনীলার সম্পর্ক নিয়ে বিদ্রূপ করতেও তাই তার বাধে না – 'ওসব ভদ্দর ঘরের নবেলপড়া মেয়ের সখ দিয়ে তোমার আর কাজ নেই বাছা !'[২] একপর্যায়ে জয়াবতীর লোভ-লালসা, বহুগামিতার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হন প্রণবেশ। মায়ের এই অধঃপতনের বৃত্তান্ত জেনেও প্রণবেশ তার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করবে না, এ-ব্যাপারে সুনীলা অনেকটাই নিশ্চিত। যার পরিপ্রেক্ষিতে সে প্রণবেশের কাছে ফিরে যাবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করে একটি পত্রে :

> পরশু রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, আমি তোমার কাছে আসব।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তিমিরাভিসার', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯০

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯১

> বিশ্বাস করো, ... এক জন্মের অপরাধ ছাড়া আর কোনো অপরাধই আমার নেই। সেই অপরাধ ক্ষমা করার মতো উদারতা তোমার কাছে আছে সে কথাও আমি বিশ্বাস করি।
>
> আমাকে যদি গ্রহণ না করো, তবে কোথায় আমাকে নেমে যেতে হবে সে তুমি জানো। তাই আমার সমস্ত পরিণাম তোমার হাতেই আমি তুলে দিলাম। আমার জীবন-মৃত্যু দুই-ই তোমার কাছে ধরে দিয়েছি – এবার তুমিই বিচার করো।[১]

প্রেমিকার আবেদনে সাড়া দিতে প্রণবেশ ঝড়ের রাতে দরজা খোলা রাখেন। বহুবার পঠিত পত্রে আর একবার চোখ বুলিয়ে তিনি মদের বোতল খোলেন। এই রাতে ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে সুনীলাও বের হয় তিমিরাভিসারে। ডাক্তারেরর মানসিক দৃঢ়তা সম্পর্কে সে নিঃসংশয় ছিল। কিন্তু উন্মুক্ত দরজা দিয়ে মদ্যপ প্রণবেশকে দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে প্রণবেশ সুস্থ-সুন্দর দেহমন নিয়ে নয়, বরং নেশাগ্রস্ত মাতালের উন্মাদনা নিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। মুহূর্তেই সে বাস্তবলোকে প্রত্যাবর্তন করে এবং নিঃশব্দে তার আবাসে ফিরে যায়।

'তিমিরাভিসার' গল্পে ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুনীলা লড়াইয়ে নামতে চেয়েছে এবং এ যুদ্ধে সে সারথি হিসেবে প্রত্যাশা করেছে প্রিয় প্রণবেশকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত পরাজয়ই হয়ে উঠেছে তার নিয়তি। মায়ের গড়া অপরাধের জগৎ ভাঙতে সে প্রণবেশের জীবন বিষিয়ে তুলতে চায় না। সুনীলা বাস্তবিকই এক আত্মমর্যাদাশীল নারীচরিত্র। পাপ-পঙ্কিলতার মধ্যে বসবাস সত্ত্বেও সে প্রেম ও প্রেমাস্পদের জন্য যে সততা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছে, তা তার চরিত্রের দুর্লভ সম্পদ।

'হাত' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যতিক্রমধর্মী প্রেমের গল্প। এ গল্পের কথক একটি ইন্সিয়োরেন্স কোম্পানিতে ভালো চাকরি করেন। একবার পাঞ্জাব মেলের ইন্টার-ক্লাস কামরায় তিনি সহযাত্রী হিসেবে পান এক প্রৌঢ় বাঙালি ভদ্রলোক এবং তার রূপসী স্ত্রীকে। তিনি বুঝতে পারেন, এই দম্পতির মধ্যে কেবল বয়স নয়, রুচিবিচারেও রয়েছে যথেষ্ট প্রভেদ। এই নারীর বাম হাতের একটি আংটি প্রায় পুরোটা সময় গল্পকথককে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। তাঁর চেতনাজুড়ে কেবলই এই নারীর অস্তিত্ব তিনি অনুভব করতে থাকেন।

একসময় ট্রেনটি ভয়ংকর দুর্ঘটনায় পতিত হয়। ট্রেনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গল্পকথক যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন। আচমকা তিনি গলায় সহযাত্রিণীর আংটি-খচিত হাতের স্পর্শ অনুভব করেন। এরপর শরীরের সমস্ত

---

[১] প্রাগুক্ত

কষ্ট ভুলে তিনি হাতটির মধ্যে বিভোর হয়ে পড়েন। অবচেতন সত্তায় তিনি সমস্ত দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে এই সুন্দরী অচেনা নারীর শরীরী স্পর্শে আন্দোলিত হয়ে ওঠেন এবং উপভোগ করেন 'নিষিদ্ধ উন্মাদনা' :

> আমি বিকারের ঘোরে যেন জানতে চাইলাম : আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে ?
>
> হাওয়ার মধ্যে যেন তেমনি ফিস্‌ফিসে স্বর শুনতে পেলাম : না বেশ লাগছে। আপনার ?
>
> হাতের স্পর্শ আর ছোরার ধারের বেদনাভরা রোমাঞ্চের মধ্য দিয়ে আমি বললাম, এতক্ষণ কষ্ট হচ্ছিল – এইবার ভালো লাগছে।[১]

বাস্তবিক অর্থে গল্পকথক নিজেও ট্রেন দুর্ঘটনার 'অন্যতম ভিকটিম'। ভদ্রমহিলার আংটির তীক্ষ্ণধারে প্রচণ্ড কষ্ট হলেও হাতটি সরানোর শক্তি তার নেই। প্রবল চেষ্টায় একটু ওঠার চেষ্টা করলে তিনি বুঝতে পারেন – এ মানবী নয়, তাকে আলিঙ্গন করেছে প্রেমিকার একটি বিচ্ছিন্ন হাত।

'হাত' গল্পের কথক চলতিপথে নারী সহযাত্রীর প্রেমে পড়েন – এটি সত্য। কিন্তু সমাজ-সংসারের ভয়ে তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণে বাধ্য হন। এ অবদমিত চেতনায় গল্পকথক সহযাত্রিনীর সঙ্গে কাল্পনিক প্রেমে মেতে ওঠেন। নিজের বিপন্ন-অস্তিত্বের মধ্যেও তিনি এই সুন্দরী নারীকে কেন্দ্র করে সুখসম্ভোগে আচ্ছন্ন হন। তাঁর এই মনোজাগতিক রূপান্তর মনঃসমীক্ষণধর্মী। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং এ-প্রসঙ্গে বলেছেন :

> কবি-গল্পকারের হাতে Imagination সহজেই Phycho-analysis-এর রূপ ধরতে পারে এবং তাদের পার্থক্য নির্দেশ যে সব সময়ে সহজ হতে পারে তাও নয়। মনোবিজ্ঞানের অনুবীক্ষণে যেমন জীবাণু ধরা পড়ে, তেমনি কল্পনাও কতগুলো অদ্ভুত ছায়ামূর্তি রচনা করে তাদের অন্তর্লোকে অবচেতনারূপে উপস্থিত করতে পারে।[২]

'কল্পপুরুষ'[৩] গল্পে প্রেমিকের দোলাচলবৃত্তিতে অমিতা বিপদগ্রস্ত। অমিতার বাবা শৈলেশ রায় পোর্ট কমিশনারে ভালো চাকরি করেন। তারই দূরসম্পর্কের আত্মীয় শিবেন, চাকরিলাভের পূর্বে সে কিছুদিন এ বাড়িতে আশ্রয় পায়। বাহ্যিকভাবে ছেলেটিকে বেশ 'ব্রাইট' দেখা যায়। তার পৌরুষ এবং ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয় অমিতা। তাই চাকরি পেয়ে শিবেন মেসে উঠলে মেয়েটি কান্নাকাতর হয়ে পড়ে।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হাত', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩৩

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্প-বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

[৩] 'কল্প-পুরুষ' *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৬০) প্রথম প্রকাশিত হয়।

আইএসসি পরীক্ষা শেষে অমিতার বিয়ের সম্বন্ধ আসে। পাত্র দীপঙ্কর এমএসসি ডিগ্রিধারী; দেরাদুন শহরে বনবিভাগে চাকরি করে। টেনিস খেলায় তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। সংসারে তার মা নেই, অবসরপ্রাপ্ত পিতা মুসৌরীতে থাকেন। পারিবারিকভাবে এরা পণপ্রথার বিরোধী। এমন 'গুপ্তধনে'র সন্ধান পেয়ে আত্মহারা হন শৈলেশ-মমতা দম্পতি। তবে এ 'দেবদূতে'র আবির্ভাবে খুশি হতে পারেনি অমিতা। চিঠি দিয়ে সে শিবেনকে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং ত্বরিৎগতিতে ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেয়। পাত্রের পরিচয় শুনে শিবেন থমকে যায়। কারণ দীপঙ্করের তুলনায় সে অনেকটাই নিষ্প্রভ। অথচ অমিতা তাকে ছাড়া কাউকে জীবনসঙ্গী ভাবতে চায় না। তাই অমিতা তাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেও বাস্তবতার বিচারে সে নিশ্চুপ থাকে :

> আইন অনুসারে এখনো পুরো সাবালিকা হয়েছে কিনা অমিতা, তাই বা কে জানে ! সামনে পুলিস কেসের সম্ভাবনা। তা ছাড়া চাকরি তো মাত্র মাস আষ্টেক হয়েছে, এখনো 'প্রোবেশন' চলছে। চাকরিটা পাওয়ার ব্যাপারে শৈলেশের হাত যতখানি কাজ করেছিল, যাওয়ার ব্যাপারে তার চাইতে বেশীই কাজ করবে হয়তো। আর এ-বাজারে একটা চাকরি গেলে –[১]

চাকরিরক্ষার জন্য শিবেন হঠকারি সিদ্ধান্ত নিতে চায় না। ইতোমধ্যে তাদের সম্পর্কের বিষয় অমিতার বাবা-মার নজরে আসে। শৈলেশের তুলনায় মমতা এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। 'আকাশের চাঁদ' দীপঙ্করের পাশে শিবেন তার কাছে 'বাক্যিসর্বস্ব' ছেলে। শীঘ্র সে অমিতার বিয়ের আয়োজন করতে চায়। শৈলেশ মেয়ের আত্মহত্যার ভয়ে আড়ষ্ট হলেও স্ত্রীর দৃঢ়তায় তৎপর হয়। দীপঙ্করের প্রস্তাব না পেলে তিনি শিবেনের ব্যাপারে ভাবতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে অন্য চিন্তা তার পক্ষে অসম্ভব।

দশ দিন পর শিবেনের সঙ্গে অমিতার পার্কে কথা হয়। এ পর্যায়ে সে শোকে বিহবল নয়, বরং প্রেমিকের নিষ্ক্রিয়তায় ভীষণ রুষ্ট হয়। তার বক্তব্যে উঠে আসে দীপঙ্করের নানামুখী প্রতিভার বৃত্তান্ত। বহুদূরের এ যুবকের গল্প শিবেনের কাছে রূপকথা মনে হয় – 'বাস্তব দীপঙ্করের সঙ্গে তবু একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা ছিল – কিন্তু এই মেঘনাদের মুখোমুখি সে দাঁড়াবে কী করে ?'[২] পরবর্তী সাক্ষাতে মেয়েটি শিবেনের কাপুরুষতাকে ধিক্কার জানায়। ইতোমধ্যে পাত্রপক্ষ তাকে আশীর্বাদ করে, দীপঙ্করও তার ছবি পাঠায়। অস্বস্তির মধ্যে শিবেন

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কল্প-পুরুষ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬১

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৩

স্থানত্যাগ করলে অমিতা তাকে দৃঢ়কণ্ঠে বলে – 'তুমি যদি একটা ব্যবস্থা না করো, তা হলে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে বিয়ের রাতে।'[১]

অমিতার সতর্কবাণী পরিশেষে সত্য হয়ে ওঠে। বিয়ের দিন স্নানঘরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দীপঙ্করের মৃত্যু হয় এবং তারই শূন্যস্থান পূরণ করতে বাধ্য হয় শিবেন। সবকিছু স্বাভাবিক থাকলেও মালাবদলের সময় ঘটে বিপত্তি। অমিতার মধ্যে শিবেন প্রত্যক্ষ করে দীপঙ্করের বিধবা স্ত্রীর মুখচ্ছবি। সেজন্য অমিতার গলায় মাল্যদানে সে অস্বীকৃতি জানায়। মানুষ যে কখনো কখনো সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না, তা শিবেনের মনস্তাত্ত্বিক এ পরিবর্তনসূত্রে অনুধাবন করা যায়।

কাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদকে জীবনধর্মে অর্জন করতে ব্যর্থ হয়ে অজিত কীভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছে তা 'গলি'[২] গল্পে অঙ্কন করেছেন নারায়ণ। অজিতের সঙ্গে প্রেমসম্পর্ক সত্ত্বেও সুমিত্রা শেষপর্যন্ত তার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে পারেনি। এক প্রকৌশলীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে হয়। এজন্য সুমিত্রার ওপর অজিতের কোনো ক্ষোভ নেই। কারণ সুমিত্রার পিতা সাধারণ কেরানি, স্বল্প আয়ের সংসারে তাকে স্ত্রী ও চার-কন্যার ভরণ-পোষণ করতে হয়। বড় মেয়ের বিবাহের পর তার সংসারে বিরাজ করে নিত্য অভাব-অনটন। এমতাবস্থায় বিনাপণে সুমিত্রার বিয়ের প্রস্তাব তার কাছে ছিল স্বপ্নের মতো। তাই তিনি অন্যত্র সুমিত্রাকে পাত্রস্থ করতে বাধ্য হন। একদিকে আর্থিক অনটন, রাজনৈতিক অস্থিরতা; অন্যদিকে সুমিত্রাকে হারিয়ে অজিত জীবনের প্রতি হয়ে পড়ে বীতশ্রদ্ধ।

অজিতের মেসজীবন সুখকর নয়। একটি ছোটো কক্ষে তারা কয়েকজন বাস করে। সবারই 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' অবস্থা। জীবনযাপন যখন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে তখনই কলকাতার একটি গলিকে কেন্দ্র করে অজিতের মনোলোকে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। চৌদ্দ বছর পূর্বে এ-গলিতে সংঘটিত হয়েছে একটি নারকীয় হত্যাকাণ্ড। পূর্বে এ রাস্তায় অজিত বহুবার চলাচল করেছে, কিন্তু কখনোই এ-গলিকে কেন্দ্র করে সে ভীতিবোধে সমর্পিত হয়নি। অথচ সুমিত্রার বিয়ের পর সে মনোজগতে বিপন্ন হয়ে পড়ে, মনোবলে চিড় ধরে। এতৎসত্ত্বেও এ-গলির মোহ সে ত্যাগ করতে পারে না। মেসে আসা-যাওয়ার একাধিক পথ থাকলেও, সে এ-গলিপথেই যাতায়াত করে। এ রাস্তা যে সময়-সাশ্রয়ী তাও নয়, তবু গলিটির মোহে পড়ে যায় সে :

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৫

[২] 'গলি' *যুগান্তর* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৬) প্রথম প্রকাশিত হয়।

> এই নেশার টানেই যত ভয় ধরে – তত ধীরে ধীরে হাঁটে এই গলি দিয়ে। এ পথ ছাড়াও তার দুটো যাবার রাস্তা আছে, অথচ এর মায়া সে কিছুতেই কাটাতে পারে না। অজিত জানে, এ মৃত্যু। এ নেশাখোরের আত্মহত্যা। একটু একটু করে – দিনের পর দিন।[১]

গলির সূত্র ধরে অজিতের প্রাত্যহিকতা ব্যাহত হয়। স্কুলে 'অ্যানালাইসিস' পড়াতে গিয়ে সে 'ম্যাকবেথে'র সংলাপ আওড়ায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অজিত চৌরঙ্গীতে সিনেমা দেখতে যায়। সাময়িক পরিত্রাণ মিললেও, হল-ত্যাগের পূর্বেই তার মনোরাজ্যে আরম্ভ হয় গলির বিষক্রিয়া। মানসিক যন্ত্রণা ভুলতে সে এক মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতার বাইরে যেতে চায়। এজন্য সে টিউশনিও ছাড়তে চায়। এখানে পিতৃমাতৃহীন মল্লিকা তার ছাত্রী। লেখাপড়ায় সে ভালো, গানের দিকে ঝোঁক কমালে ইন্টারমেডিয়েটে ভালো ফল করবে। দুদিন পর অজিত টিউশনিতে আসায় মল্লিকা অভিমান করে। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে মেয়েটি বলে :

> পরশু আমার জন্মদিন ছিল।... কেন এত শরীর খারাপ হয় আপনার ? – মল্লিকার চোখে জল এল : জানেন, পরশু রাত এগারোটা পর্যন্ত আমি আপনার জন্য আশা করে বসে ছিলুম ? আপনি এলেন না – আমার একটুও ভালো লাগেনি, একটুও না।[২]

মল্লিকার অনুযোগের মধ্যে অজিত সুমিত্রার বাচনভঙ্গি প্রত্যক্ষ করে। সে বুঝতে পারে গলির খুনের রক্ত বহুপূর্বে মুছে গেছে, বরং 'এত দিন ওখানে ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে যে অপেক্ষা করত সে সুমিত্রা।'[৩] নতুন ভালোবাসার সন্ধান পেয়ে অজিত গলির বিভীষিকা ভুলে যায়। সে জানে, মল্লিকাও একদিন সুমিত্রার মতো হারিয়ে যাবে; তবু সে নিরাশ হবে না। এ পর্যায়ে নারীপ্রেম নয়, প্রকৃতির সান্নিধ্যে অজিত প্রশান্তি খুঁজে পায়। তাই তার কাছে 'ফাঁকা গলির ক্ষণিক দুঃস্বপ্নের চেয়ে অনেক বেশি সত্য ওই জ্যোৎস্নার বকুল – ওই পামের পাতার গান। চিরকালের গান।'[৪]

সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের কারণে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ততা পরিলক্ষিত হয় 'সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে'[৫] গল্পে। রেজিস্ট্রেশন অফিসে ধনীপুত্র অংশুমান রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয় হিমানী নিয়োগীর। এ বিবাহে অংশুর

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গলি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭-২৭৮

[৫] 'সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে' *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৬৮) প্রথম প্রকাশিত হয়।

কয়েকজন বন্ধু ব্যতীত দুই পরিবারের কেউ উপস্থিত ছিল না। ফ্লোরা ক্যাফেতে নাস্তাশেষে বন্ধুরা বিদায় নিলে হিমানীর ঘনিষ্ঠ হয় অংশু। এমন মুহূর্তের জন্য সে অপেক্ষা করেছে দীর্ঘদিন। তবে হিমানীর ধারণা – এ সিদ্ধান্তের জন্য হয়তো তাদের অনুতাপ করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন ফর্মে স্বাক্ষরকালে অংশুমান বীরত্ব প্রদর্শন করলেও, সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় থমকে যায়। তার পিতা জাত-ব্যবসায়ী; তাদের ফার্মের নগণ্য কর্মচারী হিমানীর বাবা মন্মথবাবু। অংশুর পিতার সঙ্গে তুলনা চলে না হিমানীর পিতার। চাকরি হারানোর ভয়ে মন্মথবাবুও হিমানীর সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন না। মেয়ের সঙ্গে সকল সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করবেন। আসন্ন 'ঝড়ে'র সংকেত নবদম্পতিকে তাই বিষাদগ্রস্ত করে।

দুবছর পূর্বে অংশু-হিমানী জুটি পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়। হিমানীর এমএ পরীক্ষার পরে একটি সুবিধাজনক সময়ে তারা পরস্পরকে জীবনধর্মে বরণ করে নেবে, এ-ই ছিল সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাদের পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হয় হিমানীর আকস্মিক বিয়ের তোড়জোড়ে। পাত্র সরকারি চাকুরে, ট্রেনে যাতায়াতকালে হিমানীকে পছন্দ হওয়ায় সে-ই বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। বিনা পণে ফাল্গুনের আটাশ তারিখ বিবাহের দিন ধার্য হয়। এজন্যই দিশেহারা হয়ে অংশু ও হিমানী এ বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

ক্যাফে থেকে বেরিয়ে আসার পর হিমানীর উৎসাহে ভাটা পড়ে। কিছুতেই সে স্বস্তিবোধ করে না। স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে অংশুমান চৌরঙ্গীর হোটেলে বাসর-উদ্‌যাপনের প্রস্তাব দিলে সে শিহরিত হয়। অবশ্য এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের পর অংশুমানও খানিকটা বিব্রত হয়। রাতে বাড়ি না ফিরলে তার বাবা থানা-হাসপাতালে টেলিফোন করবেন, রাতভর গাড়ি নিয়ে খুঁজে বেড়াবেন কলকাতার রাস্তায়। বাস্তবতার মানদণ্ডে হোটেলের পরিবেশও তার কাছে মনোরম ঠেকে না :

> সেখানকার বাসর-রাত্রিটাই কি খুব মনোরম হয়ে উঠবে ? সঙ্গে জিনিসপত্র নেই – সোজাসুজি হোটেলে গিয়ে উঠলে সেটা কিরকম চেহারা নেবে ওদের চোখে ? এক রাতের জন্যে যারা ঘরভাড়া নেয়, তাদের ওরা কী মনে করে ? প্রত্যেকটা বয় বাবুর্চি সুইপারের দৃষ্টির তলায় যা ঝকমক করে উঠবে, সেই অশ্লীল কৌতূহলকে সে ঠেকাবে কোন্ উপায়ে ? সকলের চোখের সামনে ম্যারেজ সার্টিফিকেটা মেলে ধরে সে কি চিৎকার করে বলতে পারবে : আমরা স্বামী-স্ত্রী, আমরা বিবাহিত, আমাদের ভেতরে এতটুকুও পাপ কোথাও নেই ?[১]

বিয়ে উপলক্ষ্যে অংশুমান গয়না দিতে চাইলে হিমানী প্রত্যাখ্যান করে। সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে অংশু প্লাটফর্মের বেঞ্চিতে ঘুমিয়ে পড়ে। অন্যদিকে বাড়ি ফেরার পথে হিমানী খুঁজতে থাকে বাবার জিজ্ঞাসার

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭

উত্তর। রিক্সার একপাশে নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখে সে চমকে ওঠে। রেজিস্ট্রেশন অফিসে তার কপালে সিঁদুর দিয়েছিল অংশুমান, এ চিহ্ন সে নিমিষে মুছে ফেলে। এভাবে রোম্যান্টিক জগৎ থেকে তারা নিমিষে প্রত্যাবর্তন করে নিজস্ব বৃত্তে।

এ গল্পে অংশুমান এবং হিমানীর ভীতিসঞ্চারের উৎসস্থল পরিবার নয়, তারা নিজেরাই। তারা ভাবাবেগে আন্দোলিত হয়ে সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। বিবাহশেষে যখন তারা বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখনই তারা অস্তিত্বসচেতন হয়। তাদের মানসলোকে ভেসে ওঠে সমাজ-পরিবার-সংসারের বন্ধন, দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি। ফলে তারা বিপন্নবোধ করে এবং বিপদ-বাধা অতিক্রমের সাহস হারিয়ে তারা পারিবারিক বলয়ে একীভূত হয়ে যায়।

'ট্যাক্সিওয়ালা'[১] গল্পের সন্তোষও মেরুদণ্ডহীন প্রেমিক। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে নিবেদিতপ্রাণ হলেও নিজের ব্যাপারে সে বরাবরই অত্যন্ত উদাসীন। সন্তোষ একাই যে কোনো বিয়ে, শ্রাদ্ধ কিংবা অন্নপ্রাশনের আয়োজন করতে সক্ষম। এজন্য আত্মীয়স্বজন থেকে সহকর্মী – সকলে তার সহযোগিতা কামনা করে। তবে কেতকীর বিয়েতে দায়িত্বপালন তার জন্য কষ্টকর হয়ে ওঠে। মেয়েটিকে তার ভালো লাগতো এবং সেও যে তাকে অপছন্দ করতো, তা নয়। তার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনে কেতকীর বাবা নগেনও হয়তো আগ্রহবোধ করতেন। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মসংযমের কারণে সন্তোষ হৃদয়ের কথা প্রকাশ করতে পারেনি। বিবাহের আনুষঙ্গিক কর্মক্রিয়া সম্পাদনের জন্য নগেন তাকে মেদিনীপুর আসতে অনুরোধ করেন। এক্ষেত্রে সন্তোষই তার একমাত্র ভরসা। বিষয়টি পীড়াদায়ক হলেও কর্তব্যপরায়ণ সন্তোষ অগ্রাহ্য করতে পারে না। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে সে খাবার তদারকি থেকে শুরু করে সাতপাকের সময় বরের পিঁড়ি-ধরার কাজও অসংকোচে করে যায়। তারই সামনে কেতকী বরমাল্য পরিয়ে দেয় ইঞ্জিনিয়ার অনুতোষ মুখোপাধ্যায়কে।

অনুষ্ঠানশেষে সন্তোষ কলকাতা রওনা হয়। ট্রেনে বিলম্ব হওয়ায় সে মধ্যরাতে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে। এরপর একটি ট্যাক্সিযোগে সে যাত্রা করে খিদিরপুরে। ভ্রমণক্লান্তিতে সে পথিমধ্যে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়। আচমকা ঘুম ভাঙলে সে দেখে দ্রুত গতিতে গাড়ি ছুটছে। ট্যাক্সিওয়ালাকে গন্তব্যস্থল স্মরণ করিয়ে দিলেও কোনো লাভ হয় না। সন্তোষ পুলিশ ডাকতে চাইলেও লোকটি নির্বিকার থাকে। যাত্রীর অস্থিরতা লক্ষ করে সে হাস্যচ্ছলে জানায় – ডায়মন্ড হারবারের রাস্তার ত্রিসীমানায় পুলিশ নেই। সন্তোষ বলপূর্বক গাড়ি থামানোর চিন্তা করলেও, দুর্ঘটনার

[১] 'ট্যাক্সিওয়ালা' দৈনিক *বসুমতী* পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৭০) প্রথম প্রকাশিত হয়।

আশঙ্কায় বিরত থাকে। কিন্তু তার সমস্ত আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে একসময় ট্যাক্সিচালক তাকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। গাড়ির মিটার বিকল থাকায় সে ভাড়াগ্রহণেও অস্বীকৃতি জানায়। রাতের সমুদয় ঘটনা সন্তোষের কাছে অবাস্তব মনে হয়। এসময় তাকে অবাক করে দিয়ে ট্যাক্সিওয়ালা বলে :

> স্যার, সারাদিন তো পরের জন্যেই গাড়ী চালাই। এই রাতে নিজের জন্যে একটু চালিয়ে নিলুম – বাঁচতে তো হবে। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে একটু দেরী হল, কিছু মনে করবেন না।[১]

দিনভর যাত্রীবহন করলেও এ ড্রাইভারের রয়েছে কিছু ব্যক্তিগত সময়, যেখানে তার একক রাজত্ব। কিন্তু বিচিত্রমুখী ব্যস্ততা, কর্তব্যপালন, মানবসেবা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সন্তোষ কখনো অবকাশের চিন্তা করেনি। কেতকীকে ভালোবাসলেও আত্মসংকোচের কারণে তা ব্যক্ত করতে পারেনি। ট্যাক্সিওয়ালার জীবনমুখী বক্তব্যসূত্রে সে বুঝতে পারে – মানুষকে কখনো কখনো নিজেকে নিয়ে ভাবতে হয়।

'বনতুলসী'[২] গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রেমের নতুন ধারণা উন্মোচন করেছেন। প্রকৃতি ও নারী এখানে অভিন্নরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। গল্পকথক রঞ্জন তার কৈশোর এবং যৌবনে দুই প্রান্তিক নারীর রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগও তার ছিল। কিন্তু নারীদেহের তুলনায় তাকে বরাবরই আকুল করেছে বনতুলসীর উগ্র ঘ্রাণ। গল্পের প্রথম পর্বে রঞ্জন তার মামার একাকী জীবনের সঙ্গী ছিল। মামা ছিলেন পাড়াগাঁয়ের স্টেশনমাস্টার। কাজশেষে কোয়ার্টারে ফিরে তিনি শাস্ত্রীয় গ্রন্থপাঠে নিমগ্ন থাকতেন।

রেললাইন এবং স্টেশন ব্যতীত এ গ্রামে সভ্যতার আলো পৌঁছায়নি। স্থানীয় নদীতীরে রঞ্জন মাঝেমধ্যে মাছ ধরে। অবশ্য মাছধরা ছিল উপলক্ষ্য মাত্র, ছিপের প্রতি মনোযোগ হারিয়ে সে তাকিয়ে থাকে পার্শ্ববর্তী তুলসীবনে। কখনো গাছের মঞ্জরী ছিঁড়ে সে উপভোগ করে বনতুলসীর অরণ্যগন্ধ – 'এই গন্ধবিলাসের পেছনে হয়তো খানিকটা ফ্রয়েডিক মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন আছে, কিন্তু সত্যিই সেদিন আমি বন-তুলসীর প্রেমে পড়েছিলাম।'[৩] তুলসীবনের কাছাকাছি বারো-তেরো বছরের 'তুরীদের মেয়ে' রঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেয়েটির সমস্ত শরীর অপরিচ্ছন্ন, মুখমণ্ডলে কাদার চিহ্ন। হাতে ঝুড়ি নিয়ে সে নদীর বালি সংগ্রহ করছে। রঞ্জনের মাছধরার দৃশ্য তার কাছে উদ্ভট মনে হয়। সেদিন বনতুলসী-ঘেঁষা বালিকার হাস্যধ্বনি রঞ্জনকে মোহিত করে। পরবর্তী সময়ে মৎসশিকারে গেলেও সে মেয়েটির দেখা পায়নি। প্রকৃতির বিশুদ্ধ সংস্পর্শ ছেড়ে রঞ্জন এরপর শহরে যায়।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ট্যাক্সিওয়ালা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০

[২] 'বনতুলসী' *পূর্বাশা* পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৫৩) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বনতুলসী', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

লেখাপড়া, রাজনীতি এবং সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নাগরিক জীবনযাপনে। কিন্তু বনতুলসীর মাতাল গন্ধ তাকে এখনও সম্মোহিত করে। সে উপলব্ধি করে :

> আমি বন-তুলসীর প্রেমে পড়েছিলাম। বন তুলসীও যে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে তা কি বুঝতে পেরেছিলাম কোনদিন ? তোমাকে বলেছি, প্রেমের ধর্মই হচ্ছে পূর্ণগ্রাস। মানুষের পক্ষে কথাটার প্রমাণ দরকার নেই – ওটা স্বতঃপ্রমাণিত। কিন্তু বাংলাদেশের নিরীহ পল্লী-প্রান্তরেও যে রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে ভালোবাসতে পারে সেটা আমার জানা ছিল না।[১]

এমএ পাশের পর রঞ্জনের বন্ধু সুধীর শিকারের প্রস্তাব দেয়। এ অভিযানের অন্তরালে রঞ্জনের সুপ্ত বাসনা ছিল ভিন্নরকম – 'বিপ্লবী যুগে আমবাগানে টার্গেট প্র্যাক্টিস করে বন্দুক পিস্তলের হাত খানিকটা রপ্ত করেছিলাম – এবারে সেটা কাজে লাগাবার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যাবে।'[২] সুধীরের পিতা উত্তরবাংলার সম্ভ্রান্ত তালুকদার, তাদের বাড়িতে দুটি বন্দুক। গ্রামের জংলা বিলে দুই বন্ধু সারাদিন শিকার করে, সন্ধ্যায় রক্তমাখা পাখির ঝাঁক নিয়ে তারা বাড়ি ফেরে। এরমধ্যে সুধীর একটি 'বড় গেমে'র সন্ধান পায়। গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে কমলার বিলে হাজার খানেক রাজহাঁস বিচরণ করছে। শিকারের সন্ধানে তারা বেরিয়ে পড়ে।

চলতি পথে রঞ্জন হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। তার চোখে পড়ে পূর্ণ যৌবনা এক সাঁওতাল নারী, খালের ধারে বিন্না বনের আড়ালে সে স্নান করছে – 'চারিদিকের পৃথিবীর মতোই নিঃসংকোচ এবং নিরাবরণ।'[৩] লোভীদৃষ্টি নয়, মুগ্ধ নয়নে সে বিবসনা নারীর দিকে তাকিয়ে থাকে। একটি অপরিষ্কার বস্ত্রে শরীর আবৃত করে মেয়েটি হাঁটতে থাকে। রঞ্জনও অপরিচিতাকে অনুসরণ করে। অকস্মাৎ বনতুলসীর গন্ধে সে রোমাঞ্চিত হয়। 'কালো পাথরে তৈরি ভেনাস'কে ভুলে সে নেমে পড়ে তুলসী বনে। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর তার চৈতন্যোদয় হয়। তুলসী পাতায় দুই পকেট পূর্ণ করে সে বনত্যাগে উদ্যত হয়, যদিও সম্ভব হয় না। কারণ বনতুলসী তাকে প্রেমিকার মতো নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে :

> আমাকে আলিঙ্গন করলে সেই লাল নরম ডাঁটাগুলি, সেই খস্‌খসে্ পাতাগুলো আমার গালে মুখে ভালোবাসার ছোঁয়া বুলিয়ে দিলে। বন ভেঙে আমি এগোতে লাগলাম। কোথায় চলেছি জানি না। আমার নায়িকার সন্ধানে কি ? বোধ হয়

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

তাও নয়। ডাঁটাপাতার সেই স্পর্শ, দলিতমথিত গাছগুলোর সেই অপরূপ আদিম গন্ধ আর বাতাসের শিরশির শব্দই আমার কাছে একান্ত হয়ে উঠেছিল।[১]

বনতুলসীর কোমল সোহাগে শিহরিত হয়ে রঞ্জন উপলব্ধি করে – 'প্রেমের প্লেটোনিক রূপটাই নিরাপদ। হ্যাঁ মানুষের পক্ষেও, প্রকৃতির পক্ষেও।'[২] শতচেষ্টায় সে বনের শেষপ্রান্তে পৌঁছতে পারে না। দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর্তকণ্ঠে সে কয়েকবার চিৎকার করেও সাড়া পায় না। তারপর কী হয়েছে তা আর জানে না রঞ্জন। চেতনা হারানোর পূর্বমুহূর্তে সে কেবলই মনে করতে পারে আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত কলকাতার দিনগুলোর কথা। সৌভাগ্যবশত 'নায়িকার সেই ঊর্ণনাভ-প্রেম' থেকে সে জীবনলোকে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছে। জঙ্গলের বাইরে কুড়িয়ে পাওয়া টুপির সূত্র ধরে তাকে উদ্ধার করে এনেছে সুধীর।

'বনতুলসী' গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছকবাঁধা প্রেমের প্লট নির্মাণ করেননি। আমাদের কল্পনা যেখানে অকার্যকর, সেই পরিস্থিতিতে তিনি 'ইন্টেলেকচুয়্যাল' প্রেমের স্বরূপ উদ্ভাসিত করেছেন। এছাড়া 'গল্পের মধ্য থেকে এই ব্যাখ্যাও করে নেওয়া অযৌক্তিক হবে না, প্রাকৃতিক সর্বগ্রাসিতার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যৌনতাও থেকে গেছে। নারীও এখানে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।'[৩]

পরিবারের বিরোধিতায় প্রেমিক কর্তৃক প্রেমাস্পদকে পরিত্যাগের কাহিনি বিবৃত হয়েছে 'দিনান্ত'[৪] গল্পে। কেন্দ্রীয় চরিত্র হিমাংশুভূষণ বিএ পরীক্ষার পর তার বন্ধু কেশবের গ্রামে যায়। সেখানে অমিতা নামের এক মেয়েকে সে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখে। মেয়েটির বাবা গোকুল মল্লিক লম্পট প্রকৃতির, পুত্রের জন্য নির্বাচিত পাত্রীকে সে নিজেই বিয়ে করে। তার ছেলে রেলওয়েতে চাকরি করে, মেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। পণের ভয়ে সে কন্যার বিয়ে পর্যন্ত দিতে চায় না। পিতার ক্রমাগত অবহেলা এবং বিমাতার নিষ্ঠুর নিপীড়নে মেয়েটি আফিং খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কেশবের ডাক্তার-মামার তৎপরতায় মেয়েটি প্রাণে রক্ষা পায়। শান্তশিষ্ট অমিতার প্রতি ডাক্তারের স্নেহ অকৃত্রিম। পড়ালেখার ব্যাপারে তিনি ওকে যথাসাধ্য সহায়তা করেন। আত্মহত্যার বিষয় থানায় জানানোর বিধান থাকলেও, কর্মনিষ্ঠ ডাক্তার এই প্রথম আইনভঙ্গ করেন।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

[৩] উদ্ধৃত : (ভূমিকা : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[৪] 'দিনান্ত' *বেতার জগৎ* পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় (১৯৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

বাড়ি ফিরে হিমাংশু অমিতাকে বিয়ের সংকল্প করে। এ কথা সে কেশবকেও চিঠিতে জানায়। এরপর ডাক্তারের কাছে মেয়েটি পড়তে এলে, তিনি হিমাংশুর ওপর সে দায়িত্ব অর্পণ করেন। এর ফলে হিমাংশুর প্রতি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে অমিতা। তাদের বিশ্বাস, পণের দায় না থাকায় গোকুল অনায়াসে এ-বিয়েতে সম্মতি জানাবে, আপত্তি থাকলেও তা নিরসনের উপায় তাদের জানা আছে। এ-প্রসঙ্গে হিমাংশুকে অভয় প্রদান করে কেশব বলে :

> কয়েক বছর আগেও এটা-ওটা দোষ ছিল, কোত্থেকে খারাপ রোগও বাধিয়ে এসেছিল। মামাই গোপনে চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলেছিলেন। সে-সব অস্ত্র মামার হাতেই আছে – তাই ওঁকে যমের মতো ভয় করে বুড়ো।[১]

হিমাংশু নিজেই বিবাহের দিনক্ষণ ধার্য করে বাড়ি ফেরে। অসমবর্ণভুক্ত অসহায় এক মেয়েকে বিয়ে করে সে সমাজে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছে – এটি তার কাছে হয়ে উঠেছে শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু হিমাংশুর পিতা তার এ-সিদ্ধান্তে তুষ্ট হতে পারেননি। এজন্য তিনি সন্তানকে আশীর্বাদ নয়, তিরস্কার করেন। সুবর্ণবণিক গোত্রের মেয়েকে তিনি পুত্রবধূ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। সন্তানের অবাধ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে হিমাংশুর পিতা-মাতা আত্মহননে উদ্যত হন। তাই হিমাংশু বাধ্য হয়ে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। কয়েকদিন পর কেশব তাকে চিঠিতে জানায় :

> ভেবেছিলুম তুই দেবতা, দেখলুম জানোয়ারেরও অধম, গোকুল মল্লিকেরও পায়ের ধুলোর যোগ্য নোস। চিঠি তোকে দিতুম না – প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, কিন্তু একটা খবর না জানালেই নয়। এতদিনে সত্যিই তোদের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে অমিতা। কাল শেষরাতে সে যে কোথায় কোন্ দিকে চলে গেছে কেউ জানে না।[২]

লজ্জা-যন্ত্রণায় হিমাংশু আত্মদগ্ধ হয়। বাবার মৃত্যুর পর সে একটি কলেজে কেরানি-কাম-টাইপিস্ট হিসেবে যোগ দেয়। স্বল্প বেতনে পারিবারিক ব্যয়নির্বাহ তার পক্ষে অতিশয় দুরূহ হয়ে পড়ে। এজন্য টিউশনি, ইন্সুরেন্স কিংবা দালালি সংগ্রহের কাজে সে সদাব্যস্ত থাকে। প্রেমিকার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার মর্মপীড়ায় সে এতকাল বিয়ে করেনি। একদিন হিমাংশু জানতে পারে, অমিতা তারই কলেজের নতুন প্রিন্সিপ্যাল অজয় রায়চৌধুরীর স্ত্রী। রায়চৌধুরী স্বয়ং তার সঙ্গে স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দেন। তবে অমিতা তাকে চিনতে পারেনি, নমিতা নামধারণ করে সে অতীতকে পুরোপুরি মুছে ফেলেছে।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দিনান্ত', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯-৬১০

প্রায় এক যুগ পর অমিতাকে দেখে হিমাংশু জগৎ-সংসার থেকে পালানোর উপায় খোঁজে। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা এবং প্রেমিকার নবপরিচয় প্রাপ্ত হয়ে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে, এবং আত্মহননের পথ বেছে নেয়। অমিতার সম্মুখীন হওয়ার তার সাধ্য নেই। ঘটে-যাওয়া পরিস্থিতির ব্যাখ্যাদানও তার পক্ষে অসম্ভব। পকেটে রাখা চিঠিতে সে লেখে – 'কেহই দায়ী নয়'। সামাজিক অপবিধানের কাছে পরাজিত হিমাংশু অবশেষে আত্মহননের মাধ্যমে গ্লানিমোচন করে। গল্পের প্রারম্ভে অমিতার আত্মহত্যার চেষ্টায় সে মর্মাহত হলেও, তার মর্মন্তুদ পরিণতির সংবাদটি থেকে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে।

মানসপ্রিয়ার উপেক্ষায় নিজের সাহিত্যিক সত্তাকে বিসর্জন দিয়েছেন 'কমিশন'[১] গল্পের অমৃতলাল মজুমদার। তিনি কলেজ স্ট্রিটের বই-ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র প্রকাশক। একসময় ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল; যদিও খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের ভিড়ে তিনি এখন বিস্মৃতপ্রায়। অমৃতলালের লেখকজীবন কখনো সুখকর ছিল না। এক মার্চেন্ট অফিসে তিনি কেরানির চাকরি করতেন, সেখানেই চলতো তাঁর সাহিত্যরচনা। এছাড়া তাঁর অন্য উপায়ও ছিল না; কেননা মেসের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং সাহিত্যচর্চার অনুপযোগী।

অমৃতলালের সাহিত্যপ্রীতিতে পরিবারের সম্মতি ছিল না। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী, গ্রামে তার কাপড় এবং ধানের কারবার। পুত্রের প্রথম উপন্যাসের কপিরাইট মাত্র একশো টাকায় বিক্রয় হয়েছে জেনে তিনি হতাশ হন। বিএ পাশ পুত্রকে তিনি তাই পৈতৃক ব্যবসায়ে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন। তবে অমৃতলালের প্রেরণাদাত্রী ছিল তাঁদেরই এক জ্ঞাতিকন্যা। স্বল্পশিক্ষিতা এই তরুণীর আকর্ষণে তিনি অক্লান্তভাবে লিখে যেতেন। গল্পকথকের কাছে তিনি স্বীকার করেছেন – 'আমার সামনে বাস্তব ছিল একটিমাত্র পাঠিকা, তার হাসি, তার চোখের জল, তার ভালো লাগা, তার দীর্ঘশ্বাস।'[২] দ্বিতীয় উপন্যাস 'মায়াবী রাত্রি'র গ্রন্থস্বত্ব বাবদ তিনি পান একশো পঁচিশ টাকা। এভাবে যখন চলছিল তখন চাকরিতে অবহেলা ও অমনোযোগিতার অজুহাতে মালিকপক্ষ তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে :

> অমৃতবাবু, আপনি বেশ ভালো লেখেন বলে শুনেছি। খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানেন – আমাদের অফিসে লোহা-লক্কড়ের হিসেব রাখতে হয় – তাতে রসকষ কিছু নেই। এখানে আপনারও সুবিধে হচ্ছে না, আমাদেরও অসুবিধে হচ্ছে। আমি বলছিলুম কি, আসছে মাস থেকে আপনি আর কোথাও –[৩]

---

[১] 'কমিশন' *আনন্দবাজার* পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় (১৩৬৬) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কমিশন', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

ইতোমধ্যে তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের প্রেরণাদাত্রীরও অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়; তবু বন্ধ হয়নি তাঁর সাহিত্যসাধনা। শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তাঁর আরো দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এ-পর্যায়ে একদিন মেয়েটির সঙ্গে তাঁর কালীঘাটে দেখা হয়। সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস দুটি অমৃতলাল তাকে দিতে চাইলে সে বলে :

> এখনো ও-সব পাগলামি করছ নাকি তুমি ? আর কেন অমৃতদা, এবার ওসব ছেলেমানুষী ছাড়ো। বিয়ে-থা করো – দেশে গিয়ে ব্যবসায় মন দাও। জ্যাঠামশাই কত দুঃখ করছিলেন সেবার।[১]

চাকরি হারিয়ে অমৃতলাল ভেঙে পড়েননি, কিন্তু তন্ময় পাঠিকার বিরূপ মন্তব্যে প্রচণ্ড আঘাত পান তিনি। এজন্য সাহিত্য-প্রতিভাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি গ্রন্থব্যবসায় শুরু করেন। ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার জন্যে তিনি তাঁর উপন্যাস 'মায়াবী রাত্রি'র পরিবর্তে অন্য বই ক্রয়ের জন্য ক্রেতাকে উৎসাহিত করেন। গল্পকথকের সঙ্গে আলাপচারিতায় অমৃতলালের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এভাবে :

> আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলুম, " 'মায়াবী রাত্রি' সত্যিই আর কি বাজারে পাওয়া যায় না ?"
>
> "খুঁজলে হয়তো মিলতে পারে। কিন্তু কে এখন অত পরিশ্রম করে বলুন ? তা ছাড়া কমিশনও বড় কম দেয় ওরা। বদলে যে বইটা দিলুম, তাতে থার্টি পার্সেন্ট পাব।"– অমৃতবাবু এবার সশব্দে একটিপ নস্যি নিলেন : "তাহলে এবার একটু চা-ই আনানো যাক – কী বলেন ?"[২]

প্রকৃতপক্ষে প্রেমে ব্যর্থতাই অমৃতলালের এই মানসিক রূপান্তরের প্রধান কারণ। যে মেয়েটির অনুপ্রেরণা তাঁকে গ্রন্থরচনায় উৎসাহিত করেছিল, তাকে জীবনধর্মে অর্জনে ব্যর্থতা এবং তাঁর রচিত উপন্যাসের প্রতি তার অবহেলার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সাহিত্যরচনার পরিবর্তে বেছে নিয়েছেন ভিন্ন জীবন ও পরিবেশ। জীবনের দ্বৈত ব্যর্থতাই হয়ে উঠেছে তাঁর বেদনাময় জীবন-পরিণাম।

বিদ্যা ও বিত্তের অসাম্যই নারায়ণের গল্পভুক্ত নরনারীর প্রেমসম্পর্কিত ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। 'মাধ্যাকর্ষণ' গল্পেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানে দরিদ্রপুত্র আনন্দ আইএ ফেল, অপরদিকে মল্লিকা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী গ্র্যাজুয়েট। কলকাতা শহরে বেড়ে ওঠা মল্লিকার কাছে ভালোবাসা হচ্ছে 'খানিকটা থ্রিল' মাত্র। অথচ তাকে নিয়েই সুখস্বপ্নে আন্দোলিত হতে থাকে আনন্দ। তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দলিত করে অবশেষে মল্লিকা অন্যত্র বিয়ে করে। এতৎসত্ত্বেও আনন্দ তাকে দোষারোপ করেনি। সাময়িক কষ্ট কাটিয়ে সে স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু করে, এবং কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হয়।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[২] প্রাগুক্ত

পাঁচ বছর পর একটি বিমানে প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাৎ হয়। সম্মুখের নিরালা আসনে বসে আনন্দ অফিসের কাগজপত্র পরীক্ষা করছিল। এমতাবস্থায় তার পাশে এসে দাঁড়ায় এক ভদ্রমহিলা। আত্মমগ্ন আনন্দ প্রথমে এয়ার-হোস্টেস ভাবলেও, মল্লিকাকে দেখে সে বিস্মিত হয়। মুহূর্তের মধ্যে তাদের সম্পর্ক উষ্ণতা ফিরে পায়। মল্লিকা স্বীকার করে – 'তোমার ওপর আমি অন্যায় করেছিলুম। সে-কথা আজো ভুলতে পারি নি।'[১] আনন্দ নিবৃত্ত করলেও সে অকপটে প্রকাশ করে তার দুঃখ-বেদনা ও অতৃপ্তির কথা। স্বামীর ভালো চাকরি এবং একটি ফুটফুটে মেয়ে থাকলেও সে নিজেকে অসুখী মনে করে। অতীতের ভুল সংশোধন করে সে ফিরে আসতে চায় আনন্দের কাছে। মল্লিকা জানে, 'দুরন্ত প্রেস্‌টিজ'বোধসম্পন্ন প্রদীপ ঘোষচৌধুরী অনায়াসে ডিভোর্সের ব্যবস্থা করবেন। আনন্দ বিষয়টি ভাবতে চাইলে, সে মাত্র তিন দিন সময় বেঁধে দেয়।

এদিকে দমদম বিমানবন্দরে এসে মল্লিকাকে ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ করে আনন্দ। জানালা দিয়ে স্বামী-সন্তানকে দেখে সে খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আনন্দের হাতের মুঠো থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে মুহূর্তে বাইরে বেরিয়ে আসে। মল্লিকাকে এ যাত্রায় চিনতে ভুল করে না আনন্দ – 'আপাতত থ্রিলের বেলা কেটে গেল মল্লিকার, আর একদিন বিমানে হঠাৎ দেখা না হওয়া পর্যন্ত তার ভাবনা নেই। পরশু নয় – কোনদিনই মল্লিকাকে তার ফোন করবার দরকার পড়বে না।'[২] 'মাধ্যাকর্ষণ' গল্পে মল্লিকা কল্পনাবিলাসী চরিত্র। উচ্চবিত্তসুলভ খামখেয়ালিপনা তার চরিত্রে সহজাত। এ-কারণে জীবন তার কাছে খেলনার মতো। তার দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবনভাবনা অন্যের কষ্টের কারণ কি না, তা ভাবতেও সে অক্ষম।

দুই

শুধু নরনারীর প্রেম নয়, তাদের দাম্পত্য-সম্পর্কের রূপায়ণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বাস্তববাদী। অবক্ষয়দীর্ণ সমাজে দাম্পত্যজীবনও যে সমস্যাসঙ্কুল হয়ে ওঠে তা তিনি তাঁর গল্পে প্রদর্শন করেছেন। 'দাম্পত্য জীবনের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রোমান্টিকতাবর্জিত, ভাবালুতামুক্ত, নির্মোহ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এই দৃষ্টিটাই আধুনিক। ধীরে ধীরে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটগল্পে এই দৃষ্টির নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা হয়েছে।'[৩] সাংসারিক পরিমণ্ডলে সন্দেহ, অবিশ্বাস, কলহবিবাদ, অর্থলিপ্সা দুটি মানবপ্রাণকে কীভাবে

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মাধ্যাকর্ষণ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

[৩] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮

নিঃশেষিত করে – লেখক তা যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপন করেছেন। তবে এক্ষেত্রে 'পুরুষের দিক থেকে দাম্পত্যজীবনে রুদ্ধশ্বাস অবস্থানের কথা-ই নারায়ণ নিয়মিত শুনিয়ে এসেছেন।'[১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠিপত্র এবং তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের সাক্ষাৎকারসূত্রে জানা যায়, লেখক নিজেও পারিবারিক পরিসরে অসুখী ছিলেন। আশা সান্যালের সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহের কারণে তিনি আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অন্যদিকে প্রথম স্ত্রী রেণুদেবীর জন্য তিনি অনুভব করেন তীব্র অন্তর্যন্ত্রণা। পত্রযোগে রেণুর কাছে তিনি হতাশা ব্যক্ত করেন এভাবে– 'যেখানেই থাকি, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব খবরটা পাইবেই। আমার সম্বন্ধে কোনো আশা ভরসা রাখিও না – জানিও আমি আর মানুষ নই, সমাজের বাহিরে চলিয়া গিয়াছি। এখানে যদি আসিতে চাও আসিও, কিন্তু আমি বা আমার বাসার দেখা পাইবে না।'[২] মূলত প্রাক্তন স্ত্রীকে নিয়ে নারায়ণের নতুন সংসারে বিরাজ করে নিত্য অশান্তি। পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক হয়ে ওঠে যে, নারায়ণ-রেণুর একমাত্র কন্যা বাসবী বিয়ের সময় (১৯৫৫) পিতার আশীর্বাদলাভে বঞ্চিত হয়। সাহিত্য-সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্যের মাধ্যমে কিছু অর্থ, শাড়ি এবং গয়না পাঠিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সেদিন কর্তব্যপালনের চেষ্টা করেন। তারপরও এই সামান্য উপহার-প্রদান নিয়ে আশা দেবীর সঙ্গে তাঁর মনান্তর ঘটে।[৩]

নারায়ণের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা চেতনে কিংবা অবচেতনে তাঁর সৃষ্টিকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে তাঁর গল্প কেবল সামাজিক উৎপীড়নের তাণ্ডবে প্রতিবাদমুখর হয়নি, দাম্পত্যজীবনের বিচিত্রমাত্রিক সমস্যা সেখানে শিল্পসম্মতভাবে চিত্রিত হয়েছে। পারিবারিক-পারিপার্শ্বিক সংকটে দিশেহারা হয়ে বিকারগ্রস্ত আচরণ করেছে 'আত্মহত্যা', 'ধস্', 'তিলঙ্গমা' গল্পের নায়ক-চরিত্র, বিবাহ বিচ্ছেদের যাতনা ভোগ করেছে 'দক্ষিণান্ত', 'সেই পাখিটা' এবং 'হয়তো' গল্পের পাত্র-পাত্রী। অন্যদিকে 'শিল্পী', 'মর্গ', 'দুর্ঘটনা', 'তাস', 'কলঙ্ক', 'পুরোনো', 'কাণ্ডারী',' প্রতিপক্ষ', 'অমনোনীতা' গল্পে দেখা গেছে অসুখী দাম্পত্যচিত্র।

'আত্মহত্যা'[৪] গল্পে পিনাকী চৌধুরী অভ্যস্ত-দাম্পত্যলীলার সমাপ্তি টানতে চেয়েছে, যদিও তাকে 'লক্ষ্মী-সরস্বতীর' বরপুত্র বলা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন্ন এমএ পরীক্ষায় তার 'গোল্ড মেডেলিস্ট' হওয়ার

---

[১] সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

[৩] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (টেনিদা) স্মৃতিচারণ করেছেন – 'শুনেছি, বিয়েতে (বাসবীর বিয়ে) নারাণদা কিছু টাকা আর জামাকাপড় পাঠিয়েছিলেন। এ নিয়ে আশাদেবীর সঙ্গে একটু কথান্তরও হয়েছিল।... আমার ঠিক মনে হত আশাদেবী ঠিক নারাণদার মত নন – কেমন যেন একটা অমিল ছিল তাঁদের মধ্যে। (উদ্ধৃত : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬০)

[৪] 'আত্মহত্যা' *বিচিত্রা* পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় (১৩৪৪) প্রথম প্রকাশিত হয়।

সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে তার পিতা জমিদার, ঝড়িয়া অঞ্চলে তাদের বিশাল কোলিয়ারি ব্যবসা এবং আসামে চা বাগানের শেয়ার রয়েছে। পিনাকীর শ্বশুরও একজন খ্যাতিমান সরকারি কর্মকর্তা। চাকরিশেষে তিনি পশ্চিম-ভারতে বসবাস করছেন। বাংলাদেশের 'ম্যালেরিয়াদুষ্ট' আবহাওয়া তাঁর পছন্দ নয়। কিন্তু তাঁর মেয়ে সুপ্রভা কলকাতা ত্যাগ করেনি। হোস্টেলে থেকে সে পড়ালেখা করেছে, ছুটির সময় অবস্থান করেছে বালীগঞ্জের মাসি-বাড়ি।

ছাত্রাবস্থায় সুপ্রভার সঙ্গে পিনাকীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। বিদ্যালাভের অহমিকায় সুপ্রভা যে বাঙালিত্ব বিসর্জন দেয়নি – এটিই পিনাকীর ভালোলাগার কারণ। বিবাহিত জীবনে সুপ্রভা হয়ে ওঠে তার উপযুক্ত সহধর্মিণী। স্বামীর মাথাব্যথায় মেয়েটি সারারাত জলপট্টি দেয়, সামান্য জ্বরে ব্যস্ত থাকে সেবা-শুশ্রূষায়। দীর্ঘদিন পর পিনাকী সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে আসে। সেখানে চায়ের আসরে রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ক তুমুল আলোচনায় সে আগ্রহবোধ করে না। এজন্য আড্ডাস্থল ছেড়ে সে দোতলার বারান্দায় একাকী বসে থাকে। এসময় দাম্পত্যজীবনে পরিতৃপ্ত পিনাকীর চেতনাপটে যে দার্শনিক তত্ত্বের উদয় হয় তা এরকম :

> এইজন্যই মানুষ মরিতে ভয় পায়, মরিতে চায় না। জীবনের কাছ থেকে বারবার ঘা খাইয়াও সে জীবনকেই সবলে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। এমনও হয়তো হয় যে, পৃথিবীর কাছে তাহার সমস্ত প্রয়োজন যায় নিঃশেষ হইয়া, হয়তো তাহার বাঁচিয়া থাকাটাই এক সময় পরম অসত্য হইয়া ওঠে, হয়তো যক্ষ্মারোগীর মতো প্রতিটি দুর্বহ মুহূর্তকে অতিকষ্টে টানিয়া টানিয়া চলে, তবুও নিজেকে মুছিয়া ফেলিতে চায় না এই পৃথিবীর বুক হইতে।[১]

স্বামীর সন্ধানে সুপ্রভা দোতলায় এলেও বেশিক্ষণ থাকে না। সন্ধ্যার পর এ জায়গাকে সে অত্যন্ত ভয় করে। দুবছর আগে এখানে পড়ে গিয়ে মারা যায় এক কিশোর। ছেলেটির বাবা ছিলেন বাঙালি সিভিলিয়ান। সুপ্রভাদের পূর্বে তারাই ছিল এ-বাড়ির বাসিন্দা। ছেলেটির মৃত্যুর কথা জেনে পিনাকীর ভাবান্তর ঘটে। হার-জিতের পৃথিবীতে প্রতিযোগিতার তুলনায় মৃত্যুই তার কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়। তাই সুখী দাম্পত্যজীবন যাপন সত্ত্বেও পিনাকী অকস্মাৎ নতুন তত্ত্বে জাগরিত হয় – 'জীবনের এই মুহূর্তটিকেই কী সোনার সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া সমাপ্তির সীমারেখা টানিয়া দেওয়া যায় না ?'[২] তার বিশ্বাস, কেবল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ সুন্দর-বর্তমানকে আগামীতে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এই দার্শনিক প্রেরণায় পিনাকী এতটাই আচ্ছন্ন হয় যে, মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আত্মহত্যা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৯

'আত্মহত্যা' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ের গল্প। পরবর্তীকালে এটি *ভাঙাবন্দর* (১৯৪৫) গল্পগ্রন্থে সংযোজিত হয়। গ্রন্থের 'প্রথম সংস্করণের ভূমিকা'য় লেখক উল্লেখ করেন – "শেষ গল্প 'আত্মহত্যা' একান্ত হাতে–খড়ির রচনা... ইতিহাসের ধারা রক্ষার জন্য সে যুগের এই একটিমাত্র লেখাকে স্বীকৃতি দিলাম।"[১] সমালোচক সরোজ দত্ত এ-গল্প প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> 'আত্মহত্যা' গল্পের প্রথম প্রকাশকালে, একুশ বছর বয়সি নারায়ণ এমন নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব, পরিত্যক্ত জীবন যাপন করেননি ! এটাকে না হয় প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু আটাশ বছর বয়সে নতুন জীবনের মুখে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ এই একাকীত্বের জীবনকাহিনীকে তিনি কেন নির্বাচন করবেন ? তখনও তো দৃশ্যমান কোন সংঘাতের চিত্র তাঁর জীবনকাহিনীতে নেই। অনুমান করতে হয় লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী কোন চাপ তখনই তাঁকে পেষণ করছিল, যা থেকে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, একসময় জীবনটা 'পরম অসত্য' হয়ে যাবে তাঁর কাছে।[২]

এটি পরিষ্কার যে, দ্বিতীয় সংসারই নারায়ণের জীবনবিমুখতার কারণ। রেণু দেবীর সঙ্গে পত্রালাপে (২৭ জুলাই ১৯৪৫) তাঁর এ-মৃত্যুভাবনার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এ পত্রে লেখকচিত্তের হাহাকার অত্যন্ত মর্মস্পর্শী :

> তোমার যে কত কষ্ট হইয়াছে তা বেশ বুঝিতেছি। দুর্ভাগা পাষণ্ড স্বামীর হাতে পড়িয়াছ – এ কষ্ট তোমাকে ভোগ করিতে হইবে – হয়তো ইহাই অদৃষ্টের বিধান। আমার মনের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে আগুন জ্বলিতেছে – সে জ্বালা যে কিসে নিবিবে জানি না। নিজে পুড়িতেছি – তোমাদের সবাইকে পোড়াইতেছি। আমার মৃত্যু ছাড়া এ আগুন আর নিবিবে না।[৩]

'শিল্পী'[৪] গল্পে দাম্পত্যজীবনে যন্ত্রণাদগ্ধ হয়ে এক চিত্রকরের আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে। এ গল্পে সনাতন রাত জেগে ছবি আঁকে। তার কৃষক-পিতা সন্তানের এই জীবনবিমুখতা মানতে পারেন না। পিতা-পুত্রের মতান্তর তীব্র হলে সনাতন একসময় সংসারক্ষেত্র থেকে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমায়। তার শোকে বৃদ্ধ পিতা মৃত্যুবরণ করেন। বাবার মৃত্যুর পর সনাতন বাড়ি ফিরে চাষাবাদ করলেও, শিল্পীসত্তাকে বিসর্জন দিতে পারেনি। এরপর সে এক উড়িয়া মেয়েকে বিয়ে করে সংসারজীবনে প্রত্যাবর্তন করে; এবং দ্রুতই পিতার সঙ্গে জায়ার পার্থক্য অনুধাবন করে :

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *ভাঙাবন্দর*, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

[২] সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

[৩] উদ্ধৃত : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

[৪] শিল্পী' *চতুরঙ্গ* পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় (১৩৫৩) প্রথম প্রকাশিত হয়।

ভুল করেছিল সনাতন। সে জানত না, বাপের চাইতে স্ত্রীর দাবী বেশি; স্ত্রী তাকে আশ্রয় দিতে চায় না, আশ্রয় চায় তারই কাছে। স্নেহ-প্রেমের ব্যাপারটাকে স্ত্রী সংসারের মূল্যে বাজিয়ে নিতে চায়, যাচাই করে নিতে চায় জীবনের প্রয়োজন দিয়ে।

সুতরাং সংঘর্ষ বাধল।[১]

সংসারিক কাজে আপত্তি না থাকলেও, স্বামীর শিল্পচর্চায় নববধূ বিরক্ত হয়। একদিন ধৈর্যচ্যুত হয়ে সে সনাতনের চিত্রশিল্পচর্চায় বাধা প্রদান করে। এর ফলে শুধু বাক্যবর্ষণ নয়, উভয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। কলহলিপ্ত স্বামী-স্ত্রীকে প্রতিবেশীরা শান্ত করে এবং ভর্ৎসনা করে। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে সনাতন স্ত্রীর মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে। মেয়েটির বাবা সম্ভ্রান্ত লোক, এ রক্তপাতের বিচার চেয়ে তিনি থানায় অভিযোগ করেন। সনাতনকে পুলিশ 'খুনী' বলে সাব্যস্ত করলে ছেলেটি জীবন ও শিল্প সম্পর্কে নিরুৎসাহিত বোধ করতে শুরু করে।

এ গল্পে সনাতন একজন সম্ভাবনাময় চিত্রশিল্পী; পিতার শাসন ও মৃত্যু তাকে শিল্পের বন্ধন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। অথচ বিবাহিত জীবনের তিক্ত ঘটনাস্রোতে সে চিরদিনের জন্য রঙ-তুলি ত্যাগ করে। মধ্যবিত্ত কোনো শিল্পী হয়তো কৌশলী হয়ে সংসার টিকিয়ে রাখতে পারতো। কিন্তু সংসারজীবনের আপসকামিতা তার জানা ছিল না। একারণে শিল্প ও স্ত্রীকে হারিয়ে সে নিঃস্ব হয়ে ওঠে।

দাম্পত্যজীবনের বিভীষিকাময় চিত্র পরিলক্ষিত হয় 'মর্গ'[২] গল্পেও। এখানে আইএ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে মন্মথ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা শুরু করে। আর্থিক উপার্জন স্বল্প হলেও সে বিয়ে করে শিক্ষিতা ও সুন্দরী মমতাকে। বন্ধুরা এজন্য তাকে ঈর্ষা করে। এমন বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বিবাহের জন্য সকলে তার শাস্তি কামনা করে। অবশ্য এজন্য তাদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় না। এক মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায় দু-পা হারিয়ে মন্মথ পঙ্গুত্ব বরণ করে।

স্বামীর দুর্দিনে মমতা একটি চালের ফ্যাক্টরিতে চাকরি নেয়। কর্মক্ষেত্রে সে মালিকপুত্র অনিরুদ্ধের লালসার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ইতঃপূর্বে অনিরুদ্ধের এই অনৈতিক লালসাবৃত্তির বলি হয়েছে ললিতা, রত্না ও রিনির মতো কোমলমতী মেয়ে। তবে মমতা দৃঢ়প্রাণ, জীবনের সবকিছু সে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে শিখেছে।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিল্পী', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৭

[২] 'মর্গ' *যুগান্তর* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫৭) প্রথম প্রকাশিত হয়।

স্বামীর শোচনীয় অবস্থা নিত্যদিন প্রত্যক্ষ করে সে হয়ে উঠেছে ভয়শূন্য। ফলে অফিসশেষে অনিরুদ্ধ তার সঙ্গে হাঁটতে চাইলে সে সম্মতি জানায়। চলতিপথে লোকটি তার হাত ধরলেও সে সাবলীল থাকে। মেয়েটির চারিত্রিক দৃঢ়তায় অনিরুদ্ধ ইতস্তত বোধ করে। তাই আকস্মিক ঝড়ের কারণে সে দ্রুত বাড়ি ফিরতে চায়।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ডতায় তারা মাঠের ভেতর একটি ছোটো ঘরে আশ্রয় নেয়। এ ঘরে ক্লোরোফর্মের গন্ধ এবং টেবিলের ওপর রাখা পচা লাশ প্রমাণ করে – সেটি মর্গ। অনিরুদ্ধ তড়িৎগতিতে স্থানত্যাগে উদ্যোগী হলেও, দেয়ালের এক প্রান্তে বসে পড়ে মমতা। দাম্পত্যজীবনে তার প্রতি রাত কাটে এরকম লাশঘরে। অতএব জায়গাটি তার নিকট ভীতিকর নয়। মমতার অসংলগ্ন আচরণের জন্য তাকে বিকৃত, বীভৎস শবটির প্রেতাত্মা ভাবে অনিরুদ্ধ। প্রায় তিন ঘণ্টা পর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় তারা মন্মথের বাড়ির নিকট পৌঁছায়। সৌজন্যবশত মমতা মালিকপুত্রকে চায়ের নিমন্ত্রণ জানায় এবং অসুস্থ স্বামীর সঙ্গে আলাপ করায়। গৃহকর্তার দৈহিক অবয়ব দেখে অনিরুদ্ধ স্তম্ভিত হয়। মর্গের বিগলিত লাশের তুলনায় মন্মথকে ভয়ঙ্কর দেখায়। প্রবল আতঙ্কে সে জীবন্ত লাশঘর থেকে পালিয়ে যায়। তার দুরবস্থা দেখে তখন হাসতে থাকে মমতা। মানুষের জীবন শুধু কামবৃত্তির নয়, এর বাইরেও যে জীবনের রূঢ় রূপ রয়েছে – তা অনিরুদ্ধ বুঝতে পারে।

এ গল্পে মমতার বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকায় অনিরুদ্ধের পাশবিক সত্তার তুমুল পরাজয় ঘটে। ভয়কে জয় করে যে নারী পথ চলতে শিখেছে, তার পাশে অনিরুদ্ধ অতিশয় বেমানান। মমতা কেবল আত্মরক্ষা করেনি, তার নির্বিকার আচরণের মধ্য দিয়ে লম্পট-যুবককে শিক্ষা দিয়েছে। 'মর্গ' দাম্পত্য-সম্পর্কের গল্প হলেও, এখানে মন্মথ-মমতার সাংসারিক চিত্র নেই। তাদের পারস্পরিক আলাপচারিতা গল্পে মুখ্য হয়ে ওঠেনি। এ ধরনের প্লটনির্মাণের মাধ্যমে 'গল্পকার দেখালেন এক যান্ত্রিক সম্পর্ককে। শুধু দায়িত্ব, কর্তব্য আর বেঁচে থাকার তাগিদটুকু আছে... মন্মথ ও মমতার দাম্পত্যও একটা মর্গের মত, সেখানে আটকে আছে পচা দুর্গন্ধ, শুধু বাইরে তার প্রকাশ নেই।'[১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হরিণের রঙ'[২] গল্পে পাওয়া যায় প্রীতিস্নিগ্ধ পারিবারিক আবহ। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনিলের স্ত্রী। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত এ নারীকে রাখা হয় শালবন পরিবেষ্টিত একটি বাংলোতে। স্ত্রীর অন্তিম দিনগুলো শান্তিতে অতিবাহিত করবার সকল বন্দোবস্ত করেছে অনিল। তার বোন নন্দাও সর্বদা বৌদির সেবায়

[১] প্রীতম চক্রবর্ত্তী, 'মর্গ : লাশকাটা ঘরে', উত্তম পুরকাইত (সম্পাদিত), *উজাগর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

[২] 'হরিণের রঙ' *আনন্দবাজার* পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় (১৩৬১) প্রথম প্রকাশিত হয়।

নিয়োজিত থাকে। সকালে ধূপকাঠি জ্বালানোর সময় নন্দার কাছে বৌদি বারান্দায় যাওয়ার আবদার করে এবং প্রত্যয়ী কণ্ঠে বলে ওঠে :

> আমি মরব না। দু'দিনের ধাক্কা যখন সামলে উঠেছি – আর মরব না। দেখিস, এক মাসের মধ্যেই আবার আগেকার শরীর ফিরে পাব আমি – আবার ব্যাড্‌মিন্টন খেলব তোদের সঙ্গে। তোর দাদার জন্যেই দুঃখ হচ্ছে আমার। দিব্যি আর একটা বিয়ে করার চান্স পাচ্ছিলেন – একটুর জন্যে ফসকে গেল।[১]

পৃথিবীর আলো-বাতাসে জীবনকে উপভোগ করতে চায় অনিলের স্ত্রী। কলকাতায় ফিরে যাওয়ার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। স্বামীর সঙ্গে আবার সে কেনাকাটা করতে চায়, সাংসারিক খুনসুটি নিয়ে মগ্ন থাকতে চায়। আদরের দুই পুত্রের জন্যও তার ভাবনা অফুরন্ত। নন্দার চেহারার মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করে নিজের যুবতী বয়সের রূপশ্রী। নন্দা-রজতের সম্পর্কের মাঝে সে অনুভব করে প্রথম প্রেমের স্পন্দন। ননদের আসন্ন বিয়ের সানাই সে উপভোগ করে কল্পনায়। বৌদির অসংলগ্ন আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে নন্দা দাদাকে সতর্ক করে – "টি-বি'র লাস্ট স্টেজে ওটা জীবনের আলেয়া অনিলদা। রাতটাও বোধ হয় কাটবে না।"[২] প্রেমময় সংসারের প্রতি মানুষের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা – লেখক মৃত্যুপথযাত্রী নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন।

কেবল দাম্পত্য-সমস্যা নয়, বরং তা থেকে উত্তরণের অপূর্ব গল্প 'ধস্'[৩]। এ গল্পের স্বামী-স্ত্রী দুই বিপরীত স্বভাবের চরিত্র। ছাত্রাবস্থায় কিরণলেখাকে অনেকে পছন্দ করলেও, সে ভবতোষকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য দুজন রেজিস্ট্রি অফিসের শরণাপন্ন হয়। এখানে এসেও জড়তা অতিক্রম করতে পারে না ভবতোষ। সে স্ত্রীকে স্পর্শ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে কিরণলেখা মানসিক দৃঢ়তার স্বাক্ষর রাখে। বিয়ের পর ভবতোষ একটি ভালো চাকরি পায়; কিরণলেখাও গার্লস স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস পদে যোগ দেয়। তিন বছর পর ভবতোষ চাকরি হারালে সৃষ্টি হয় সংকট। অন্নাভাব না থাকলেও মর্যাদার প্রশ্নে সে বিপন্ন বোধ করে। দৈনন্দিন হাতখরচের জন্য সে স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। পরাশ্রয়ী জীবনযাপনে আত্মদগ্ধ ভবতোষ নার্ভাস ব্রেকডাউনে আক্রান্ত হয়। দেয়ালে নিজের ফটোগ্রাফকেও তার অচেনা মনে হয়।

ভবতোষের অসুস্থতায় কিরণলেখা কর্তব্যপালনে ত্রুটি করেনি। বাড়িভাড়া, সাপ্তাহিক রেশন, ছুটির দিনে উত্তম আহারের বন্দোবস্ত – সবকিছু চলে যথানিয়মে। দুটোর পরিবর্তে সে পাঁচটি টিউশনি সংগ্রহ করে। জীবনযুদ্ধের

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হরিণের রঙ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯১

[৩] 'ধস্' *আনন্দবাজার* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬১) প্রথম প্রকাশিত হয়।

এসব খবর ছিল স্বামীর অজানা। কেননা কিরণলেখার বাড়ি ফেরার সময় আগের মতোই অপরিবর্তিত, কেবল মাঝখানের ঘণ্টা দুয়েকের বিশ্রাম সে বিসর্জন দিয়েছে। ভবতোষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও কিরণলেখা তার চিকিৎসা চালিয়ে যায়। ডাক্তার তাকে বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। তাই সাধ্যানুযায়ী অর্থসংগ্রহ করে কিরণলেখা স্বামীকে নিয়ে দার্জেলিং যায়।

দার্জেলিঙে প্রাক্তন সহপাঠী রণজিতের সঙ্গে কিরণলেখার দেখা হয়। সে হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট; অবকাশ-যাপনের জন্য সে এখানে এসেছে। একটি রেস্তোরাঁয় দীর্ঘদিন পর উভয়ের আলাপ হয়। কিরণলেখার দৃষ্টিতে, রণজিৎ অনেকটা পাল্টে গেছে। বাংলা বিভাগের কবি-চেহারার লাজুক ছেলেটির সঙ্গে এখন আর তার কোনো মিল নেই। কলেজজীবনে কিরণলেখাকে প্রেমনিবেদন করতে গিয়েও সে ব্যর্থ হয়েছে। কিরণলেখার বিয়ের সংবাদে বিষণ্নতা-মুক্তির জন্য সে একটানা তিনদিন বেহালা বাজিয়েছে। এখন সে বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, রিভলবারের লাইসেন্স পেয়েছে, বাড়িতে পুষছে গ্রে-হাউন্ড। এদিন কিরণলেখাকে টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখবার জন্য রণজিৎ উদ্বোধিত করে। কিরণলেখা উপলব্ধি করে, তার প্রতি এখনও রণজিতের প্রেমজ আকর্ষণ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সিদ্ধান্ত হয়, ভোর চারটায় আরম্ভ হবে তাদের যাত্রা এবং নির্ধারিত সময়ে রণজিৎ গাড়ি নিয়ে আসবে লাডেন্ লা রোডে।

রেস্তোরাঁ থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর পার্শ্ববর্তী মারাঠি দম্পতির শিশু সন্তানদের কোলাহলে কিরণলেখা নিঃসঙ্গ বোধ করে। স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে সে টাইগার হিলে যেতে চায়। তবে ভবতোষকে কোনোক্রমে উদ্দীপ্ত করতে পারে না সে। এমনকি রণজিতের সঙ্গে স্ত্রীর গৃহত্যাগের মধ্যে যে কুৎসিত চিন্তা রয়েছে, তা নিয়েও সে উদ্বিগ্ন নয়। স্বামীর নিস্পৃহতা তাকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। শেষরাতে কিরণলেখা মোটরের হর্নের জন্য অপেক্ষা করে বটে, কিন্তু বাইরের অন্ধকার পরিবেশে রণজিৎকে তার বিশ্বাস হয় না। ভয়াল কল্পনায় সে শিহরিত হয়। আচমকা স্বামীর লেপের ভেতর সে আশ্রয় নেয়। দুবছর পর ভবতোষ তাকে জড়িয়ে ধরে। রণজিৎ ক্রমাগত হর্ন বাজালেও কিরণলেখা স্বামীর আলিঙ্গনচ্যুত হয় না। দুদিন ইচ্ছে করে সে এড়িয়ে চলে দার্জেলিঙের পথঘাট, ঘরে বসে সেলাই করে অসম্পূর্ণ স্কার্ফ। অন্যদিকে ভবতোষের মধ্যে পরিস্ফুটিত হয় লক্ষণীয় পরিবর্তন, ব্যক্তিগত কাজ সে একাই সম্পন্ন করে।

দুদিন পর তাদের গৃহে আসে রণজিৎ। তার দুঃসাহসিকতা ও অসঙ্কোচ আচরণে কিরণলেখা বিস্মিত হয়। বাইরে তখন একটানা বৃষ্টি, শোনা যায় বৈদ্যুতিক তারের গুঞ্জন এবং পাইন গাছের আর্তনাদ। এমন দুর্যোগের পটভূমিতে সে 'বন্য শক্তির' ন্যায় আবির্ভূত হয়। অকস্মাৎ প্রচণ্ড ভূমিকম্পে দুলে ওঠে তাদের ঘর। ভূমিধসের

আশঙ্কায় রণজিৎ পৈশাচিক আর্তনাদে বেরিয়ে যায়, কিন্তু বেশি দূর যেতে পারে না। নিমিষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় দুদিকের পথরেখা। সহসা ভেসে আসে কিরণলেখার গগনভেদী চিৎকার – 'আমাকে তোলো, আমাকে তোলো এখান থেকে। আমি এখনো বেঁচে আছি।'[১]

কিরণলেখার বাঁচার আকুতি রণজিৎ অগ্রাহ্য করে। অথচ এতদিন যাকে সে মৃতপ্রায় ভেবেছিল, সেই ভবতোষ 'দানবীয় শক্তিতে' অপসারণ করে ভগ্নবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। গল্পের সমাপ্তিতে স্নায়বিক রোগাক্রান্ত ভবতোষের উদ্দীপ্ত কর্মোদ্যোগ প্রত্যক্ষ করে লজ্জিত-রণজিৎ আত্মগোপন করে। বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত প্রেক্ষাপটে তার মনে হয় :

> একটা আকস্মিক আবেগ নয় – একটা উন্মত্ততা নয়, এ শক্তির মধ্যে অনেক প্রতীক্ষা, অনেক সংযম, অনেক নিঃশব্দ প্রস্তুতি। তার মৃত্যু হয়নি – শুধু আত্মপ্রকাশের জন্যে একটা উপলক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল। জড়তা ছিল কঠিন – তাই তার আবরণ ভাঙবার জন্যে প্রয়োজন হল এমন ভয়াবহ চরম মুহূর্তের।[২]

কেবল ভবতোষ নয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের অধিকাংশ পুরুষ 'কুঁকড়ে থাকা চরিত্র – কোন না কোন চাপের শিকার তারা এবং প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্বের বোধন ঘটেছে অভাবিতভাবে, কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্দীপনায়। গল্পগুলিকে বাধ্যতামূলক জীবনযাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলেই মেনে নিতে হয়।'[৩]

সন্দেহপরায়ণতা এবং তৃতীয় পক্ষের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ একটি প্রাণবন্ত সম্পর্ককে কীভাবে সংকটময় করে তোলে তা প্রতিপাদিত হয়েছে 'দুর্ঘটনা' গল্পে। ডাক্তার বিভাস ও ইলা নবদম্পতি; বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপনের জন্য তারা যাত্রা করে স্টিমারে। গল্পের প্রারম্ভে তাদের উচ্ছলতা ও খুনসুটি বেশ উপভোগ্য। তাদের রোম্যান্টিক আলাপচারিতায় সহযাত্রী ইন্দিরা চৌধুরী এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে এ-নবদম্পতির সঙ্গে তার আলাপ জমে ওঠে। তার মুখের ক্ষতচিহ্ন দেখে ইলা প্রশ্ন করলে জানা যায় তা 'নিতান্ত অ্যাক্‌সিডেন্ট'। এ-প্রসঙ্গে শ্রোতাদের আগ্রহ দেখে ইন্দিরা নতুন গল্পের অবতারণা করে।

গল্পে ইন্দিরা চৌধুরীর বর্ণনাংশ আত্মজৈবনিক। লক্ষ্মী নামের এক সাধারণ কালো মেয়ে তার গল্পের নায়িকা। কালো মেয়ের সৌন্দর্যবিচারে সে বলে – 'একটা জিনিস মনে রাখবেন। উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী মেয়ের প্রেমে যারা পড়েছে তাদের আত্মরক্ষার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু কালো মেয়েকে যারা ভালোবেসেছে তাদের

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ধস্‌', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৬

[২] প্রাগুক্ত

[৩] সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

উদ্ধারের বিন্দুমাত্র আশা নেই।'[১] বাবা-মার পছন্দের পাত্র সত্যেনের সঙ্গে লক্ষ্মীর বিয়ে হয়। ছেলেটি রয়টার্স বিল্ডিংয়ে চাকরি করে। সত্যেন-লক্ষ্মীর দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল মধুর। অফিস পালিয়ে সত্যেন স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমায় যায়, আইসক্রিম খায় এবং সন্ধ্যায় উপভোগ করে গঙ্গার সৌন্দর্য। এতৎসত্ত্বেও তাদের দাম্পত্যজীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। হঠাৎ সত্যেন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। তার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে পরিবারের সকল সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে যায়, বন্ধক রাখতে হয় স্ত্রীর গয়না পর্যন্ত। সত্যেনের প্রাণশঙ্কায় সকলে যখন উদ্বিগ্ন তখনও সে বাঁচার প্রেরণায় ব্যাকুল। স্ত্রী-বিবর্জিত জীবন সে কোনোভাবেই মানতে পারে না – 'এ রোগের ধর্মই নাকি এই। তার ধারণা সে সম্পূর্ণ সেরে গেছে, এখন আর ভয়ের কোনো কারণ নেই।'[২]

দুঃসময়ে সত্যেনের চিকিৎসার জন্য আসে ডাক্তার বিভাস। এ নাম শুনে শ্রোতা-দম্পতি চমকে উঠলে ইন্দিরা তাদের শান্ত করে – 'মনে করুন কাল্পনিক নাম। সামনে যাকে পাওয়া যায় তাকে মডেল করে নিয়ে গল্প বলতে সুবিধা হয় না ? তাছাড়া বিভাস নামে আর একজন ডাক্তার থাকলেই বা ক্ষতি কী ?'[৩] ইলা প্রতিবাদ করলেও বিভাসের সম্মতিতে গল্পটি অগ্রসর হয়। লক্ষ্মীর সঙ্গে সত্যেনের মেলামেশায় ডাক্তারের কড়া নিষেধ ছিল। স্বামী-স্ত্রীর দূরত্ব তাই ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এদিকে অসহায় পরিবারের প্রতি ডাক্তারের সহানুভূতি ছিল নজিরবিহীন। প্রতিদিন সে দুবেলা রোগী দেখতে আসে; পরামর্শ-ফি গ্রহণ না করে রোগীর জন্য পথ্য নিয়ে আসে। উপরিতলে রোগীর প্রতি দায়িত্ব প্রদর্শন করলেও প্রকৃতপক্ষে ডাক্তারের মধ্যে ছিল লক্ষ্মীর প্রতি প্রলুব্ধতা, রূপজ মোহ। বিষয়টি অনুমান করে লক্ষ্মী এড়িয়ে চলে ডাক্তার বিভাসকে। এ পর্বে স্বামীর প্রাণরক্ষার সঙ্গে লক্ষ্মীর জীবনে যুক্ত হয় সতীত্বরক্ষার সংগ্রাম। গল্পের এই বাঁকবদলে ইলা উৎসাহী হলেও, তার স্বামী বিভাস বিব্রতবোধ করে।

বিভাসকে এড়িয়ে যাওয়ায় লক্ষ্মীকে ভর্ৎসনা করে তার শাশুড়ি। এদিকে স্ত্রীর প্রতি সত্যেনের উন্মত্ততা নিয়ন্ত্রণহীন আকার ধারণ করে। সে ভোজনপাত্র দূরে নিক্ষেপ করে, ভেঙে ফেলে ঔষধের গ্লাস। এক রাতে বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লে সে লক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করে। প্রবল বাধা সত্ত্বেও সে স্ত্রীসম্ভোগে লিপ্ত হয়। তাৎক্ষণিক প্রতিফল হিসেবে – 'শেষবারের মতো এক ঝলক রক্ত তুললে সত্যেন। লক্ষ্মীর কাছ থেকে এ জন্মের শেষ পাওনা আদায় করে সে চলে গেল।'[৪] সত্যেনের প্রত্যাশিত মৃত্যুর পর শ্বশুর-শাশুড়ির বিরূপতার

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দুর্ঘটনা', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

শিকার হয় লক্ষ্মী। তাদের ধারণা 'জলজ্যান্ত স্বামীকে' সে-ই যেন বধ করেছে। উগ্র গালমন্দ উপেক্ষা করেও সে স্বামীর বাস্তুভিটে আঁকড়ে থাকে। শ্বশুরের পেনশনে সংসারনির্বাহ যখন অসম্ভব হয়ে উঠেছে, তখন অনন্যোপায় হয়ে সে একটি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করে। আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে লক্ষ্মীর গুরুত্বও বাড়তে থাকে শ্বশুরালয়ে।

সত্যেনের মৃত্যুর পরও বিভাসের যাতায়াত অব্যাহত থাকে এ-সংসারে। লক্ষ্মীর শাশুড়ির জন্য সে ফলের ঝুড়ি এবং উপাদেয় সন্দেশ নিয়ে আসে, বিজয়ার দিন বৃদ্ধার হাতে দশ টাকার নোট ধরিয়ে প্রণাম করে। সত্যেনের অনুপস্থিতিতে সে সত্বর বাড়ির ছোটো ছেলের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। লক্ষ্মীর নিকট সে অনুরূপ অধিকার দাবি করে। শ্বশুর-শাশুড়ি বিভাসের মনোভাব অনুধাবন করলেও তারা তখন নিরুপায়। লক্ষ্মীর শ্বশুরকে সে ইতোমধ্যে তিনশো টাকা কর্জ দিয়েছে এবং এ অর্থ শোধের জন্য তার বিশেষ তাগাদাও নেই। প্রতি রবিবার সত্যেনের মা-বাবা গঙ্গাস্নানে যায়। এই সুযোগে একদিন বিভাস অতর্কিতভাবে লক্ষ্মীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। লক্ষ্মী অতিকষ্টে এই নরপশুর বাহুবন্ধন থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়। অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানে ক্রুদ্ধ-বিভাস গৃহত্যাগ করে। লজ্জায়-অপমানে লক্ষ্মী কাঁদতে থাকে।

এ ঘটনার পর বিভাসকে তাদের পরিবারে আর দেখা যায়নি। এদিকে মহল্লায় হামের প্রাদুর্ভাব হলে আক্রান্ত হয় লক্ষ্মীও। অসহ্য যন্ত্রণায় সে যখন অস্থির, তখন অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে বিভাস। পরামর্শপত্র না দিয়ে সে নিজেই ঔষধ সরবরাহ করে এবং তা রোগীর মুখমণ্ডলে লেপন করতে বলে। মূলত চিকিৎসার ছলে সে লক্ষ্মীর মুখশ্রী এসিডে ঝলসে দিতে চেয়েছে। ঔষধের স্পর্শমাত্র লক্ষ্মী চিৎকার করে ওঠে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় তার সমস্ত মুখ। এভাবে চিরতরে রূপসৌন্দর্য হারিয়ে কুরূপা হয়ে ওঠে লক্ষ্মী। মধ্যবিত্তসুলভ আত্মসম্ভ্রমের কারণে তার শ্বশুর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। 'ঘরের কেলেঙ্কারি'র বিবরণ তিনি পত্রিকায় ওঠাতে চাননি। এছাড়া ঔষধ যে বিভাসই দিয়েছে – এমন কোনো প্রমাণচিহ্ন তাদের কাছে নেই। এ পর্যন্ত বলে গল্পের ইতি টানে ইন্দিরা। কিন্তু ডাক্তারের পরিণতি সম্পর্কে ইলার অতিরিক্ত কৌতূহল প্রত্যক্ষ করে ইন্দিরা অতি সন্তর্পণে ইলার অন্তস্তলে উপ্ত করে সন্দেহের বীজ – 'হ্যাঁ আর একটা কথা। লক্ষ্মী শেষে খবর পেয়েছে বিভাসের সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। বেশ সুন্দর একটি মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে, এই আপনার মতোই অনেকটা।'[১]

ইন্দিরার বাকপটুতায় ইলার সন্দেহ হয়। সে বুঝতে পারে লক্ষ্মীর জীবনবিনষ্টকারী ডাক্তার বিভাসই হচ্ছে তার স্বামী। ইন্দিরার স্টিমারত্যাগের পর তার মনে জমাট বাঁধে তীব্র অসন্তোষ। তাদের মধুচন্দ্রিমা রূপান্তরিত হয়

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

বিষাদযাত্রায়। স্ত্রীর অতি সংবেদনশীলতার কারণে বিভাস তাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়। অবিশ্বাসের যন্ত্রণায় মেয়েটি সশব্দে কেবিনের দরজা বন্ধ করে দেয়। নবদম্পতির শেষ পরিণতি লেখক উল্লেখ করেননি, তবে গল্পের সমাপ্তিতে তিনি প্রকাশ করেছেন ইন্দিরা চৌধুরীর বিকারগ্রস্ত মনের দুরভিসন্ধি :

> সত্যিই বানিয়ে বলা গল্প। নিজের সব ভেঙে গেছে বলেই যা কিছু সুন্দর দেখতে পায় তাকেই কি তার ভাঙতে ভালো লাগে ? তার মুখখানা পুড়ে গিয়েছিল কোনো ডাক্তারের অ্যাসিডে নয়, নিছক একটা স্টোভ দুর্ঘটনাতেই।[১]

'দুর্ঘটনা' গল্পে 'না পাওয়ার হতাশা কীভাবে যৌন ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে তোলে মানুষের মনে, ঠেলে দেয় মনোবিকারে, অকারণ হিংস্র প্রতিশোধের দিকে, সেই সমীক্ষণের কারখানা ঘরে নেমেছেন লেখক। যে কোনো সম্পূর্ণ, সুন্দর কিছুকে ভেঙে নিজের ভাঙাজীবনের যন্ত্রণা ভুলে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিতৃপ্তি পাচ্ছে ইন্দিরা এই ব্যাখ্যা স্পষ্ট করেই দিয়েছেন লেখক।'[২] গল্পশেষে ইন্দিরা চৌধুরীকে খলচরিত্র মনে হয়, তার কৃত্রিম নায়িকার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের কারণ থাকে না। তথাপি রোগাক্রান্ত স্বামীর মৃত্যুতে একটি প্রাণময় মেয়ের জীবন কীরূপ বিশুষ্কতায় পর্যবসিত হয় – তা গল্পের মধ্যে গল্পচ্ছলে পরিবেশিত হয়েছে। এসব অসহায় ও বিধবা নারীদের লোলুপ-পুরুষের কুদৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হয়। এরপরও তাদের নিস্তার মেলে না। গল্পের এ অংশ ইন্দিরা চৌধুরীর মনগড়া হলেও, তৎকালীন সমাজবাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে অসঙ্গত নয়।

'তাস'[৩] গল্পে দেখা যায় দাম্পত্যজীবনে একনিষ্ঠতার অভাব। এখানে দুই ভাইবোন : ডাক্তার অমূল্য এবং নমিতার তাস খেলায় ব্যাপক উৎসাহ। তবে এদের সঙ্গে যারা বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে, তারা ভিন্ন প্রকৃতির। বিএসসি পাশ করেও অমূল্যের স্ত্রী রেখা তাস খেলতে ভয় পায়। অন্যদিকে দর্শনের অধ্যাপক অসিত স্ত্রীর কাছে প্রায় তিরস্কৃত হয়। গ্রীষ্মের ছুটিতে অমূল্যের আমন্ত্রণে নমিতারা দার্জেলিং যায়। শালবন-ঘেরা জায়গাটি অসিতের দারুণ পছন্দ হয়। এক দুপুরে অমূল্যের নতুন প্রেসক্রিপশন তার সুখভঙ্গ করে – 'আরে, এসব জায়গায় দুপুরে ঘুমুলে শরীর খারাপ করে, গা ভারি হয়ে যায়। তার চাইতে এসো এক বাজি তাস খেলা যাক।'[৪]

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] গোপাদত্ত ভৌমিক, 'ক্ষোভ-ঘৃণা-ভৎর্সনা-জুগুপ্সার শতসঞ্চারী : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পভুবন', উত্তম পুরকাইত (সম্পাদিত), *উজাগর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

[৩] 'তাস' *শনিবারের চিঠি*র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১৩৬২) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তাস', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৮

এরপর ডিসপেন্সারির নিয়মরক্ষা ব্যতীত সারাক্ষণ চলে অমূল্যের তাস খেলা। তাসের যন্ত্রণায় অসিত কলকাতা ফিরতে চাইলে নমিতা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। ফলে দার্জেলিঙের স্নিগ্ধ প্রকৃতি অধ্যাপকের জন্য কোনো সুন্দরের বার্তা বহন করে আনে না। এ সংকটে তার দুঃখের অংশীদার হয় রেখা। সমব্যথীকে পেয়ে অসিতের মনে জেগে ওঠে প্রতিশোধস্পৃহা। দুই ভাইবোনকে খেলায় হারানোর জন্য সে অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে বিশেষ কৌশল উদ্ভাবন করে এবং এ কাজে সে রেখাকে সহযোগীরূপে নির্বাচন করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন তাসখেলায় যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। অসিত-রেখার দাপটে নমিতারা অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করে। পক্ষান্তরে চুরির নিষিদ্ধ আনন্দে রোমাঞ্চিত হয় নতুন জুটি। খেলাশেষে অসিতরা বাজিতে জয়লাভ করে।

বায়ান্ন তাসের মধ্যে এত আনন্দ রয়েছে, তা অসিতের এতদিন অজানা ছিল। এখন তারও নেশা ধরেছে, দুপুরে অমূল্য জরুরি প্রয়োজনে বাইরে গেলে সে ক্ষুব্ধ হয়। তাসের মাধ্যমে রেখার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পায়। ক্রমে পরস্ত্রীর নিটোল সৌন্দর্য অসিতের দৃষ্টিগোচর হয়। তার মনে হয় – 'এই মার্জিত দীপ্ত মেয়েটির পাশে অমূল্য যেন অনেকখানি স্থূল, কেমন যেন বেমানান।'[১] রেখাও আবিষ্কার করে ননদের শারীরিক ত্রুটি। অমূল্যের অনুপস্থিতে সে অসিতকে বাইরে বেড়ানোর প্রস্তাব দেয়। পথিমধ্যে অতিথির কাছে সে প্রকাশ করে স্বামীর উদাসীনতা এবং নিজের কর্মব্যস্ততার কথা। একইসঙ্গে সে মনের আনন্দে গান গায়, ইচ্ছেমতো ফুল তোলে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে রেখার কোমল শরীর অসিতের কাছে অপার্থিব সৌন্দর্যের আধার বলে মনে হয়। ঝরণার ধারে একটি প্রস্তরখণ্ডের ওপর বসে তারা পরস্পরের অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়। অকস্মাৎ রেখা শিউরে ওঠে – উভয়ে এতটাই নিকটবর্তী যে, অসিতের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস লাগছে তার দেহে। নতুন উপলব্ধিতে দুজন নিঃশব্দে বাড়ি ফেরে। এসময় রেখা তাসের প্যাকেট দুটি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। গল্পের শেষটি এরকম :

> দু প্যাকেট তাস পুড়তে সময় লাগে। সেই সঙ্গে বুকের ভেতরটাও ধিকিধিকি করে পুড়ছে রেখার। ঝাপসা চোখে তাকিয়ে দেখছে, প্রত্যেকখানা তাস কী অদ্ভুতভাবে বেঁকে বেঁকে পুড়ে যাচ্ছে –
>
> মনে হচ্ছে, অসংখ্য কেউটে সাপের ফণা।[২]

তাসগুলো যেন অসংখ্য কেউটে সাপ, যেগুলো অবিরাম বিষ উদগীরণ করছে, দংশন করতে চাইছে তাদের দাম্পত্যসুখ, তছনছ করে দিচ্ছে পরিবারজীবন। রেখা তাই এ-অবস্থার অবসান চেয়েছে; এবং প্রত্যাবর্তন করেছে নির্ঝঞ্ঝাট দাম্পত্যজীবনে। স্পষ্টত এ গল্পে অসিত-রেখার উচ্ছন্নে যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং এ

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭১

[২] প্রাগুক্ত

ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু লেখক তাঁর ইতিচেতনার কারণে তাদের বিকৃতপ্রায় জীবনাচার থেকে ফিরিয়ে এনেছেন সুস্থ জীবনে।

ডাক্তার আদিত্যের যন্ত্রণা-বিক্ষুব্ধ দাম্পত্যজীবনের গল্প 'কলঙ্ক'[১]। তার স্ত্রী বীথিকে সকলে সুন্দরী, বিদুষী ও গুণবতী হিসেবে চেনে। সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বীথি হাসিমুখে অতিথি-আপ্যায়ন করে। সংগীতশিল্পী হিসেবেও সে পরিচিত-মহলে সমাদৃত। বন্ধুরা ভেবেছে, এরা সুখী দম্পতি। কিন্তু গল্পকথকের কাছে আদিত্য জানিয়েছে অন্যকথা – তার স্ত্রী স্নায়বিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। গভীর রাতে তাদের ঘরের পরিবেশ হয় ভয়ঙ্কর। বীথি কখনো ফুলদানি ভাঙে, কখনো স্বামীর সঙ্গে উত্তেজিত আচরণ করে। স্ত্রীর এ-অনভিপ্রেত আচরণ সহ্য করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না আদিত্যের। পরিত্রাণের উপায় হিসেবে সে গভীর রাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে নিবিষ্ট থাকে।

কিছুদিন পর পাশের ফ্ল্যাটে আসে নতুন ভাড়াটে। নবাগত ভাড়াটের নাম নিশিবাবু; রাধাবাজারে তার কাগজের ব্যবসায় রয়েছে। যুদ্ধের কারণে খোলাবাজারে কাগজ প্রায় অদৃশ্য ছিল। সেনাবাহিনীর নীলনকশা এবং পোস্টারের জন্য ব্যবসায়ীরা প্রচুর কাগজ মজুত করে। নিশিবাবু সারাদিন বাইরে থাকে, রাতেও প্রায়ই ঘরে ফেরে না। এজন্য তার স্ত্রী খুকু সবসময় বীথির সঙ্গে গল্প করে। এ মহিলাকে আদিত্যের ভীষণ অপছন্দ। শিক্ষাদীক্ষায় গ্র্যাজুয়েট বীথির তুলনায় খুকু নিম্নস্তরের, এমনকি কথাবার্তায়ও অমার্জিত। অবস্থানগত পার্থক্য সত্ত্বেও সে হয়ে ওঠে বীথির অন্তরঙ্গ সুহৃদ। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীর নতুন পরিমণ্ডলকে সঙ্গতকারণে মেনে নেয় ডাক্তার আদিত্য।

প্রতি দুপুরে খুকু একটি পানের পাত্র নিয়ে আসে। তার সংস্পর্শে বীথি পানের নেশায় আসক্ত হয়। ক্রমশ আদিত্যের ওপর থেকে স্ত্রীর খরদৃষ্টি কেটে যায়। সে হয়ে ওঠে শান্ত ও আত্মমগ্ন। এরপর বীথিই পাশের ফ্ল্যাটে যাওয়া শুরু করে এবং সাংসারিক দায়দায়িত্ব এড়িয়ে চলে। আদিত্য অভিযোগ উত্থাপন না করলেও, একদিন তার চৈতন্যোদয় হয়। ড্রয়ারে রাখা চল্লিশ টাকা না পেয়ে সে খুকুকে সন্দেহ করে এবং বিষয়টি জানতে চাইলে বীথি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কেবল টাকা নয়, একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে স্ত্রীর গলায় তার শখের হারটি না দেখে আদিত্য বিস্মিত হয়। এ স্বর্ণালঙ্কারের মূল্য অন্তত সাত-আটশো টাকা। এত বড় ক্ষতি সে মানতে পারে না।

---

[১] 'কলঙ্ক' *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬২) প্রথম প্রকাশিত হয়।

দীর্ঘদিনের আত্মসংযম হারিয়ে সে স্ত্রীকে হারটি ফিরিয়ে আনতে বলে। বীথি অগ্রাহ্য করলে আদিত্য স্বয়ং উদ্যোগী হয়। এসময় বীথির উন্মাদগ্রস্ততা অতিমাত্রায় পৌঁছে। তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়, নাসারন্ধ্রের দু পাশ ফুলে ওঠে এবং মুখের রঙ ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে।

আদিত্যের কাছে পরিষ্কার, স্ত্রীর আচরণ কেবল স্নায়বিক রোগীর মতো নয়। তার স্মরণ হয় – বীথির অধিকাংশ রাত নির্ঘুম কাটে, অন্ধকার ঘরে সে ক্রমাগত পায়চারি করে। টেবিলের ওপর খুকুর দেওয়া পান নিয়ে আদিত্য সোজা ল্যাবরেটরিতে যায়। পরীক্ষাশেষে পানের মধ্যে কোকেনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হলে, আদিত্য পুলিশের ভয় দেখিয়ে খুকুকে ফ্ল্যাটছাড়া করে। প্রচণ্ড আক্রোশে খুকু তাকে হুমকি দেয় – 'জেনেশুনে আপনি আগুনে হাত দিলেন ডক্টর রায়। আমাকে আপনি চেনেননি।'[১] সত্যি তাকে চিনতে পারেনি আদিত্য। পরবর্তীকালে সে জানতে পারে খুকু নিশিবাবুর বিবাহিতা স্ত্রী নয়; রক্ষিতামাত্র।

খুকুর বিদায়ের পরদিন বীথির শরীরে নানা উপসর্গ দেখা যায়। দুঃসহ যন্ত্রণায় সে মেঝেতে ছটফট করে, ঘামে ভিজে যায় তার সর্বাঙ্গ। খুকুকে বিতাড়িত করবার কারণে সে স্বামীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্ত্রীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আদিত্য ঘর ছাড়ে। ওয়ালটেয়ারে বেড়াতে এসে মেডিকেল কলেজের সহপাঠিনী দীপা মজুমদারের সঙ্গে তার দেখা হয়। অর্থাভাবে সে মেডিকেল কলেজের পাঠ সম্পূর্ণ করতে পারেনি। ডাক্তারের পরিবর্তে সে হয়েছে প্রাইভেট নার্স। ছাত্রজীবনে তাদের সম্পর্ক থাকলেও, তা প্রেমে রূপ নেয়নি। বর্তমান দাম্পত্য-দুর্যোগে দীপাকে কাছে পেয়ে আদিত্য তার কাছে নিজের দুরবস্থা ব্যক্ত করে। একইসঙ্গে মানসিক প্রশান্তিলাভের জন্য সে দীপার সঙ্গে কয়েকদিন অতিবাহিত করে।

এ-পর্যায়ে আদিত্যের কাছে আসে বীথির আত্মহত্যার টেলিগ্রাম। আদিত্যের সঙ্গে দীপা ট্রেনের ডাবল বার্থে কলকাতা ফেরে। দীপার সাহসিকতায় ডাক্তার বিস্মিত হলে সে জানায় – 'তাছাড়া উপায় কী আদিত্যবাবু ? একমাত্র নিজের ওপর কলঙ্ক টেনেই আপনি স্ত্রীকে কলঙ্ক থেকে বাঁচাতে পারেন!'[২] আদিত্যের ডাক্তার-পরিচয়ের সুবাদে স্ত্রীর ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। পুলিশও তার প্রতি যথেষ্ট সদয় ছিল। তারা খুকুকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে। তবে বিচিত্ররূপিণী এ নারীর সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। এভাবে নিজেকে বিতর্কিত করে দীপা গোপন রাখে বন্ধুপত্নীর কলঙ্ক। সাত বছর পর আদিত্যও এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়।

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কলঙ্ক', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৫

আদিত্য-বীথির দাম্পত্যজীবনে নানাবিধ সংকট ছিল। তবে সংসারে খুকুর অবাধ অনুপ্রবেশ এ-সমস্যাকে ঘনীভূত করে। বীথির স্নায়বিক দুর্বলতার সে পরিপূর্ণ সুযোগ নেয়। অথচ বীথির কলঙ্ক নিজ স্কন্ধে নিয়ে নারীর মর্যাদা রক্ষা করে দীপা মজুমদার। এ দুই নারীর ব্যবধান মূলত শিক্ষার। শিক্ষার অভাব বারনারীকে করেছে কুটিল ও স্বার্থপর। অন্যদিকে সুশিক্ষার গুণে মেধাবী দীপা হয়েছে উদার ও পরার্থপর।

স্বামীর চূড়ান্ত অধঃপতনে বিধ্বস্ত নারীহৃদয়ের হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'দক্ষিণান্ত' গল্পে। দেরাদুন যাত্রাকালে ট্রেনের মহিলা কম্পার্টমেন্টে ঊর্মিলা একাকী বসেছিল। এসময় এক অপরিচিত পুরুষের আচমকা উপস্থিতিতে সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়। লোকটির মাথায় কালো হ্যাট, ট্রাউজারের ভেতর হাত রেখে সে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঊর্মিলা চিৎকার করলে আগন্তুক তার নাম ধরে ডাকে। লোকটি অন্য কেউ নয় – তার স্বামী ধীরাজ। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তাদের বিবাহ হয়নি, সিভিল কোর্টে এরা পরস্পরকে জীবনসঙ্গীরূপে নির্বাচন করেছে। বিয়ের এক মাসের মধ্যে স্ত্রী-প্রসঙ্গে ধীরাজের মোহভঙ্গ হয়। সে বাবার চেকের অর্থ আত্মসাৎ করে এক বন্ধুপত্নীর সঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে ঊর্মিলার জীবনে নেমে আসে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপর্যয়; জীবনপটে সংঘটিত হয় নানা পরিবর্তন। কলকাতার একটি কলেজে সে ডেমনস্ট্রেটারের চাকরি নেয়। ঊর্মিলার কাছে এ-সাক্ষাৎ কাকতালীয় হলেও, ধীরাজের ভাষ্যমতে – গয়া স্টেশনে স্ত্রীকে দেখে সে তার মুখোমুখি হয়েছে।

ঊর্মিলাকে নতুন জীবন আরম্ভ করতে বলে ধীরাজ। একইসঙ্গে সে তার কুকীর্তির জন্য অনুতপ্ত হয়। স্ত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে একত্রে পথচলার চিন্তা করে। যদিও সে জানে, কোনো অনুনয়ে ঊর্মিলা আশ্বস্তবোধ করবে না। উপরন্তু তিন বছরের বিচ্ছেদে স্ত্রীর মানসপটে যে প্রেম অবশিষ্ট রয়েছে, তা নিমিষে ঘৃণায় রূপান্তরিত হবে। এসময় ঊর্মিলাকে সে নতুনরূপে আবিষ্কার করে। আগের তুলনায় তাকে অধিক রূপসী রূপেই প্রত্যক্ষ করে সে। তার সঙ্গে ধীরাজের দেরাদুন যেতে ইচ্ছে করে। অবশ্য ধীরাজ দ্রুত নিজেকে সংযত করে। সামনের স্টেশনে নামবার জন্য সে আড়ষ্ট পায়ে এগিয়ে চলে। কোনো দিক না তাকিয়ে প্লাটফর্ম বরাবর সে সোজা হাঁটতে থাকে।

সহসা স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে ধীরাজ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ফিরে আসে। যদিও ঊর্মিলা যা বলে, এর জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না – 'টয়লেটের জানালা ভেঙে ঢুকেছিলে, পকেটে নিশ্চয় ছোরা কিংবা রিভলবার ছিল। আমার কাছ থেকেই বা পাওনাটা না নিয়ে ফিরে যাচ্ছ কেন ?'[১] স্ত্রীর প্রশ্নে সে বজ্রাহতের ন্যায় কাঁপতে থাকে। ঊর্মিলা অবিলম্বে তার

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দক্ষিণান্ত', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭৭

অলঙ্কারাদি স্বামীর পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে। এ অবস্থায় এক জোড়া ভারী কঙ্কণের আঘাতে ধীরাজের ডান চোখ রক্তাক্ত হয়, অন্যদিকে ক্ষোভে-দুঃখে ঊর্মিলা অবিরাম কাঁদতে থাকে।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্বামীর পরিচয়টুকু ঊর্মিলার সম্বল ছিল। এজন্য শ্বশুরালয় ত্যাগ করে সে অন্যত্র ঘর বাঁধেনি। দীর্ঘদিন পর ধীরাজকে পেয়ে সে অভিযোগ জানায়নি। কিন্তু স্বামীর দস্যুতাবৃত্তি তাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ধীরাজ শেষপর্যন্ত এত হীন-প্রকৃতির হতে পারে – এ তার ভাবনাতীত। চলন্ত ট্রেনে স্ত্রীর কামরায় ধীরাজ লুণ্ঠতরাজে নিবৃত্ত হলেও, ঊর্মিলা তাকে শূন্যহস্তে ফেরায়নি। শখের অলঙ্কারগুলো সে দক্ষিণারূপে পূর্বস্বামীর প্রতি নিক্ষেপ করে।

'ভালবাসার সম্পর্কের মধ্যে অভিমানের শক্ত একটা দেওয়াল থাকতে পারে, কিন্তু স্নেহ নিরঙ্কুশ।'[১] – এ সত্য বিভাসিত হয়েছে 'পুরোনো' গল্পে। শহরের একজন প্রসিদ্ধ এ্যাডভোকেট সুখময়। দর্শনার্থীদের আইনি-সহায়তা প্রদানে তিনি গভীর রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। একদিন সন্তানদের দাদির কোলে গল্প শুনতে দেখে সুখময়ও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ত্রিশ বছর পর মায়ের গল্পে তিনি ফিরে পান হারানো শৈশব। ইতোমধ্যে মায়ের দেহমনে এসেছে নানা পরিবর্তন। কপালের সিঁদুর, হাতের শঙ্খবলয় ত্যাগ করে তিনি বরণ করেছেন বৈধব্যদশা। অথচ অপরিবর্তিত রয়েছে তাঁর রূপকথার অনন্ত যৌবনা মেয়েটি।

এমন স্বপ্নঘন মুহূর্তে সুখময়ের সামনে দাঁড়ায় তাঁর স্ত্রী প্রতিমা। স্বামী-সন্তানকে রেখে সে গিয়েছিল বান্ধবীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। দামি শাড়ি এবং সুগন্ধির জৌলুশ ছড়িয়ে সে সদর্পে প্রদর্শন করে আপন আভিজাত্য। মায়ের পাশে স্বামীর শিশুতোষ অবস্থান তার ভালো লাগেনি। তাই শাশুড়ির সম্মুখে সে লিপ্ত হয় অশিষ্ট বাক্যপ্রয়োগে :

> বেশ তো, কাল একটা রুপোর ঝিনুক-বাটি কিনে দেব, মা আবার কোলে করে দুধ খাওয়াবেন। আবার চোখ বড় বড় করে শুনবে পুরোনো রূপকথার গল্প : এক ঝলক হেসে উঠেই গম্ভীর হল প্রতিমা : সত্যি – কী পাগলামি হচ্ছে বলো তো ? আসবার সময় দেখে এলাম সাত-আটজন লোক বসে রয়েছে নিচের ঘরে। আর তুমি এখানে –[২]

শুধু তাই নয়, দাদির সান্নিধ্যে ঘুমন্ত সন্তানদের অযত্ন হয়েছে ভেবে প্রতিমা গৃহকর্মীদের ভর্ৎসনা করে। এই ঘটনার দুদিন পর সুখময়ের প্রচণ্ড জ্বর হয়। ডাক্তার, ইন্জেকশন এবং আইসপ্যাডেও তাঁর অসুস্থতা সারছে না। বৃদ্ধ মাতা উদ্বিগ্নচিত্তে সন্তানের অবস্থা জানতে চান। কিন্তু তাঁর আগ্রহ কিংবা উপস্থিতি পুত্রবধূর কাছে অসহ্য

[১] সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'পুরোনো', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৯

বোধ হয়। বিরক্তির সুরে সে শাশুড়িকে বলে – 'আপনি কেন মিথ্যা ঘুরঘুর করছেন মা ? বুড়ো মানুষ – রাত হয়েছে, শুয়ে পড়ুন। আমি তো আছিই।'[১] একসময় সুখময়ের অবস্থার অবনতি হলে, প্রতিমা শাশুড়ির শরণাপন্ন হয়। এ পর্যায়ে পুত্রবধূ ভেঙে পড়লে, মা তাকে অভয় প্রদান করেন। ছেলের এমন জ্বর তিনি অনেক দেখেছেন, এর প্রতিকারের উপায়ও তিনি জানেন। এ-পর্যায়ে মায়ের হাতের স্পর্শে সুখময় অচেতন অবস্থায়ও সাড়া দেয়। ওদিকে একটানা উত্তেজনা-উৎকণ্ঠায় ক্লান্ত প্রতিমা ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরে সে দেখে – স্বামী বেশ নিশ্চিন্তে মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। এ পর্যায়ে 'প্রতিমা তাঁদের ঘুম ভাঙাল না। অনধিকারীর সংকোচ নিয়ে পা টিপে টিপে সরে এল খাটের পাশ থেকে।'[২]

'পুরোনো' গল্পে প্রতিমা নাগরিক অভিরুচির হলেও ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তের বাইরে কিছু ভাবতে চায়নি। স্বামীর ওপর সে কেবল অধিকার প্রয়োগ করতে চেয়েছে। সুখময়ের সনাতন আবেগ-অনুভূতি সে বোঝার চেষ্টা করেনি। মা-ছেলের চিরন্তন সম্পর্কের মধ্যে সে দাঁড়িয়েছে বাধা হয়ে। তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ গল্পের নিয়ন্ত্রণশক্তি প্রতিমার কাছে দেননি, দৃঢ়ভাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন মায়ের মর্যাদা। বাঙালি সংসারে বৌ-শাশুড়ির চিরবিরোধের ফলপ্রসূ সমাধানও তিনি নির্ণয় করেছেন। কেবল স্বামী-স্ত্রী নয়, পুরো পরিবারের মিলিত সমন্বয়ে কীভাবে সুখী জীবনযাপন সম্ভব – তার অপূর্ব নির্দেশনা রয়েছে এ গল্পে।

দাম্পত্য-সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখতে এক নারীর কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় 'তিলঙ্গমা'[৩] গল্পে। কলকাতা মিশনারি কলেজে কমলের সহপাঠিনী ছিল লীলা মিত্র। প্রবল ব্যক্তিত্বের কারণে সে ক্যাম্পাসে বেশ জনপ্রিয়। তার পারিবারিক কাঠামো অত্যন্ত অভিজাত। পরিবারের সবাই স্বল্পভাষী, দাম্ভিক এবং আত্মকেন্দ্রিক। তার মা জমিদার-কন্যা, বড় ভাই ভালো চাকরি করেন, বৌদি ক্লাসিক গানে পারদর্শী এবং ছোটো ভাইয়ের স্বপ্ন আকাশচুম্বী। এছাড়া তার দিদি সম্ভ্রান্ত ঘরের পুত্রবধূ, মোটরযোগে তিনি প্রায় বেড়াতে আসেন। পরিবারের সদস্যদের অহমিকা লীলাকে স্পর্শ করেনি, তবে 'এদের মনে আভিজাত্যের যে অঙ্গার ধিকি ধিকি করছে, সেইটেই জ্বলতে জ্বলতে লীলার ক্ষেত্রে হীরে হয়ে উঠেছিল।'[৪]

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭০

[৩] 'তিলঙ্গমা' *আনন্দবাজার* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৬) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তিলঙ্গমা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাকপর্যায়ে লীলাদের বাড়ি আসে দূরসম্পর্কের আত্মীয় সোমেন দে চৌধুরী। সে বিমান বাহিনীতে চাকরি করে। লীলার কাছে সে বর্ণনা করে তার বীরত্বব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা। এ 'অ্যাডভেঞ্চার' যোদ্ধার প্রতি মেয়েটির মুগ্ধতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এরপর সোমেন কলকাতা এলে লীলা কলেজে যায় না, দুজনে সিনেমা দেখে। এমনকি পরীক্ষায় অবতীর্ণ না হয়ে সে সোমেনকে বিয়ে করে।

এরমধ্যে কমল একটি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। আট বছর পর লীলার ভাইয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়। ভদ্রলোকের চলাফেরায় পূর্বের জৌলুশ আর নেই; যুদ্ধোত্তর বাস্তবতায় তার কথাবার্তায় শোনা যায় 'মধ্যবিত্ত অসন্তোষের গুঞ্জন'। কমলকে তিনি জানান, সোমেন বর্তমানে মানসিক ভারসাম্যহীন। পরবর্তীকালে লীলা মিত্রের মাধ্যমে জানা যায়, ভারতের স্বাধীনতার পর সোমেনের কর্মস্থল হয় ব্যাঙ্গালোর। এসময় পেশাগত দায়িত্ব ভুলে সে শুধু বলতে থাকে – 'ইস্ – রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন ! তা হলে ভারতবর্ষের রইল কী !'[১] ফলে 'মেন্টাল ডিরেঞ্জমেন্ট' হিসেবে সে চাকরিচ্যুত হয়।

কলকাতা এসে সোমেন সরাসরি চলে যায় নিমতলার শ্মশানঘাটে, যেখানে কবিগুরুকে দাহ করা হয়। শ্মশান থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে সে ঘরে আসে এবং প্রতিদিন এ ধুলোমাটি কপালে দিয়ে কাব্যচর্চা করে। তার কর্মকাণ্ডে সকলে বিরক্ত হলেও, লীলার স্বামীভক্তি কমে না। সোমেন প্রচণ্ড প্রহার করলেও সে প্রতিবাদ করে না, বরং স্বামীর পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করে – 'লেখার ধ্যানে ও যখন ডুবে থাকে তখন আমি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ওকে বিরক্ত করি – ওর চিন্তার সুতো কেটে যায় – মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। যারা সত্যিকারের শিল্পী, তারা এমন করে সংসারের হিসেব মেনে চলে না।'[২]

সোমেনের কাব্যগ্রন্থ 'তিলঙ্গমা' প্রকাশের জন্য লীলা উদ্যোগী হয়। এজন্য নিজের গয়না বিক্রয় করে সে অর্থ সংগ্রহ করে। তার ধারণা – কবি-স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। আভিজাত্য-ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে লীলা এ পর্যায়ে বন্ধু কমলের দ্বারস্থ হয়। তবে গ্রন্থের নাম ও কবিতা দুর্বোধ্য হওয়ায় কমল এ-নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। গ্রন্থ প্রকাশের পরিবর্তে সে বান্ধবীর জন্য 'তিলঙ্গমা'র মাত্র একটি কপি ছাপতে চায়। কারণ – 'দুনিয়ার সবাই চিৎকার করে সোমেনকে পাগল বললেও অসাধারণ লীলা জানবে এই অসামান্য কবিতা একদিন বিশ্বসাহিত্যে বিপ্লব আনবে।'[৩] নারায়ণের গল্পে এক অনন্য নারী লীলা মিত্র, তার

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

চারিত্রিক দৃঢ়তা অতুলনীয়। জীবনের সকল বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার অভূতপূর্ব ক্ষমতা রয়েছে তার মধ্যে। স্বামীর উন্মাদ-দশায় সে যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে, তা অকল্পনীয়।

নারী-পুরুষের সাংসারিক জীবনের মূলভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস ও নির্ভরতা – এমন বক্তব্য প্রতিপাদিত হয়েছে 'কাণ্ডারী'[১] গল্পে। মধ্যবয়সী অখিল ঘোষের সঙ্গে বিয়ে হয় যুবতী অলকার। শুধু বয়সের তারতম্য নয়, দৈহিক গঠন এবং চারিত্রিক আচরণেও তাদের ব্যবধান বিস্তর। অখিল আইএ পরীক্ষায় বারবার অকৃতকার্য হয়ে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে। স্ত্রীর মদ্যপান অপছন্দ হলেও, সে প্রায়শ মাতাল হয়ে ঘরে ফেরে। বাড়ি, গাড়ি, কাঠের ব্যবসায়, চায়ের ব্রোকারি থাকলেও সে বুঝেছে – 'টাকা দিয়ে পেশাদারী প্রেম কিনতে পাওয়া যায়, হয়তো কুরূপ কুশ্রীতা সত্ত্বেও সুন্দরী পরস্ত্রীর অনুগ্রহদৃষ্টি লাভ করা চলে, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে জয় করা যায় না।'[২]

অখিলের বাড়িতে থাকে তারই জ্ঞাতি-ভাই প্রতাপ। অখিলের কাঠের কারখানা পরিচালনা করে সে। প্রতাপ অনেক গুণে সমৃদ্ধ : তার মিষ্টি গানের গলা, টেনিসও খেলে চমৎকার। দাম্পত্যজীবনে স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব সত্ত্বেও অলকা প্রতাপকে এড়িয়ে চলে। অখিলের মনোযন্ত্রণা সেখানেই :

> সন্দেহ করতে পারলে আত্মদহন ছিল, আত্মতৃপ্তিও ছিল সেই সঙ্গে। একটা তুচ্ছতম উপলক্ষ পেলেও নিজেকে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে সে প্রকাশ করতে পারত – এক মুহূর্তে অলকার কাছে প্রমাণ করতে পারত, আর কিছু না থাকলেও তার একটা পৌরুষ আছে, যা আদিম, যা অবিশ্বাস্য রকমের নিষ্ঠুর।[৩]

একদিন অলকা ও প্রতাপকে নিয়ে অখিল জিপযোগে বেড়াতে যায়। পাহাড়ি রাস্তায় একটু অসাবধানতার কারণে ঘটতে পারে অবধারিত মৃত্যু। দীর্ঘদিনের ড্রাইভিংয়ের অভিজ্ঞতা থাকলেও অখিল এদিন 'পৃথিবীর সমাপ্তি' ঘটাতে চায়। মধ্যরাস্তায় গাড়ি চালানোর দায়িত্ব নেয় প্রতাপ। কিছুক্ষণ পর প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে জিপটি ডানদিকের পাহাড়ে আটকে যায়। এমন ভয়ংকর পরিস্থিতিতে অলকা স্বামীকে বলে – 'তখনই বলেছিলুম, ও আনাড়ীর হাতে গাড়ি দিয়ো না ! খালি টেনিস খেলতে পারলে আর গান গাইলেই কি সব পারা যায় সংসারে?'[৪] অখিলের কালো হাতটি আঁকড়ে ধরে সে জানায় – 'তুমি ছাড়া কাউকে আমার ভরসা নেই – কারুকে বিশ্বাস নেই।

[১] 'কাণ্ডারী' *শনিবারের চিঠি* পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় (১৩৬৩) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কাণ্ডারী', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

তুমিই গাড়ি চালাও, তোমার হাতে স্টিয়ারিং থাকলে কোনও পথকেই আমার ভয় করে না।'[১] সংসারযাত্রার আড়াই বছর পর অখিল নিজের অজান্তে হয়ে যায় স্ত্রীর সত্যিকারের কাণ্ডারী। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের নির্ণয় স্মরণযোগ্য – 'প্রেম কী ? অলস মুহূর্তের বিলাস, না, নিরাপত্তা ও জীবনের সুদৃঢ় আশ্রয় ? এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পাঠককে সচকিত করে তোলেন।'[২]

যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার নামই সংসারধর্ম – 'প্রতিপক্ষ'[৩] গল্পে এমনটি বোঝানো হয়েছে। এ গল্পের প্রধান চরিত্র ইন্দুভূষণ। বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন থেকে সে রেডিওতে গান করে। এরপর তার কয়েকটি রেকর্ড বাজারে আসে। রেডিওতে শিখা নামের এক সহশিল্পীর সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং পরবর্তীকালে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। শিল্পীসত্তা ছাড়াও কিছু বিষয়ে তাদের সাযুজ্য রয়েছে –

> দুজনেই কায়েত, দুজনেই মধ্যবিত্ত এবং আরো বড় যোগাযোগ – বহুকাল দেশছাড়া হলেও দুজনেরই আদি বাড়ি বরিশালে। কোনো পক্ষ থেকেই আপত্তির কোনো কারণ ঘটল না। বরং সবাই খুশি হয়ে বললেন, রাজযোটক ![৪]

বিয়ের পর ইন্দুভূষণ প্রচুর গানের টিউশনি করে। এছাড়া রেকর্ডের রয়্যালিটি, রেডিওর অনুষ্ঠান এবং সিনেমার প্লে-ব্যাক থেকে সে যথেষ্ট আয় করে। স্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী দ্বৈত-সংগীতের প্রস্তাব নিয়ে ইন্দুভূষণ যায় গ্রামোফোন কোম্পানিতে। কিন্তু ডুয়েট গানের ক্ষেত্রে কোম্পানি প্রবল আপত্তি করে। ইন্দুর রেকর্ডে আগ্রহী হলেও, তারা শিখার জন্য বিনিয়োগ করতে চায় না। পরদিন থেকে চলে মেয়েটির অবিশ্রান্ত সংগীতচর্চা। একজন বড় ওস্তাদের কাছ থেকে সে দুবছর প্রশিক্ষণ নেয়। তবে ইন্দু জানে ওর 'ন্যাক আছে, কিন্তু ট্যালেন্ট নেই।'[৫] সরস্বতী পূজায় ইন্দুভূষণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গায়। কিন্তু কোথাও আমন্ত্রণ না পেয়ে শিখা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। এসব আয়োজনে সে ইন্দুকে তার নাম প্রস্তাব করতে বলে এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে অহেতুক সন্দেহ করে :

> – তুমি তো ইচ্ছে করলেই আমার কথাটাও ওদের বলতে পারতে !
>
> – ওরা নিজে থেকে না বললে –

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

[৩] 'প্রতিপক্ষ' *সপ্তর্ষি* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৬) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্রতিপক্ষ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

[৫] প্রাগুক্ত

– ওদের হয়তো খেয়াল হয়নি। হয়তো ওরা জানেই না, আমিও এ বাড়ীতে থাকি। কিন্তু তুমিই তো সেটা ওদের মনে করিয়ে দিতে পারতে।

আমি চুপ করে রইলুম। আর হঠাৎ ঝকঝক করে উঠল শিখার চোখ দুটো।

– তার মানে, তুমিই চাও না যে লোকে আমাকে জানুক। তুমি ভাবো রেডিও আমাকে নিছক দয়া করে প্রোগ্রাম দেয় আর গানের আসরে আসবেন অমুক দেবী, তমুক শ্রীমতী – তাদের মাঝখানে আমাকে নিয়ে গেলে তোমার রসালাপেও তো কিছু অসুবিধা হবে !১

সাংসারিক শান্তি বজায় রাখতে ইন্দুভূষণ আয়োজকদের কাছে স্ত্রীর প্রতিভা তুলে ধরে। যারা বিনাপয়সার শিল্পী খোঁজে তারা খুশি হলেও, অন্যরা আপত্তি করে। এরপর শুধু গানের আবদার নয়, শিখা সম্মানীও দাবি করে। ইন্দুভূষণ বাধ্য হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অভিনয় করে। নিজের উপার্জন থেকে সে স্ত্রীকে কখনো ত্রিশ, কখনো পঞ্চাশ টাকা দিতে থাকে। সে জানে, অর্থের প্রতি শিখার লোভ নেই; শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি পেলেই খুশি হয়। ইন্দুভূষণের নাটকের যবনিকাপাত ঘটে শীঘ্রই। একটি বড় জলসা থেকে ফেরার পথে কিছু শব্দবাণ উভয়কে জর্জরিত করে :

– পয়সা দিয়ে এসব শিখা-ফিকাকে কেন যে আনে –

– পাগল! কে পয়সা দিয়েছে শিখাকে ? ইন্দুবাবুকে আনতে গেলে ওই এক জ্বালা! কেবল ইন্‌সিস্ট্‌ করেন স্ত্রীর জন্যে – বলেন, কিছু দিতে হবে না। – শুধু দু-একটা গান –২

এ মন্তব্য শুনে শিখা কান্নায় ভেঙে পড়ে। ইন্দু তাকে সমবেদনা জানানোর ভাষা হারিয়ে ফেলে। স্বামী-স্ত্রীর সম-অবস্থান যে সংসার-জীবনকে অনেকক্ষেত্রে বিপর্যস্ত করে – এ উপলব্ধি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছিল। বন্ধু ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়কে তিনি বলেছেন –

এই সংসার জীবনেই দ্যাখ – এক ছাদের নীচে বিপরীতধর্মী মানসিকতা নিয়ে আত্মসচেতন দুটি মানুষ থাকতে পারে না। খ্যাতির বিড়ম্বনায় এর থেকে লোকের পরিত্রাণের উপায়ও নেই। তাছাড়া আমার মনে হয় – ঘরের বৌ, 'বৌ' হয়ে থাকলেই সংসারে শান্তি বজায় থাকে।৩

'প্রতিপক্ষ' গল্পে ইন্দুভূষণ সংসার-সুরক্ষায় সংগীত-ত্যাগ করে। কারণ গানের চেয়ে সে স্ত্রীকে বেশি ভালোবাসে। তার ধারণা – গান প্রতিপক্ষ হয়ে দুজনকে বিচ্ছিন্ন করবে। তাই হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলা বিক্রয় করে

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

৩ উদ্ধৃত : সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

সে একটি মনোহারী দোকান দেয়; শিখাও বেছে নেয় শিক্ষকতা পেশা। এভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এ শিল্পীজুটির দাম্পত্যবন্ধন অটুট থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধানতম অন্তরায় হলো সন্দেহগ্রস্ততা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকটি গল্পে এ কথা বলতে চেয়েছেন। 'অমনোনীতা'[১] গল্পের বিষয়ও একই। গল্পে লোকেনের স্ত্রী মণিকা গ্র্যাজুয়েট এবং রূপসী। এমন গুণী স্ত্রী পেয়ে লোকেন নিজেকে ধন্য মনে করে। নববধূর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয় লোকেনের বন্ধু সুখেন্দু। বিদায়বেলায় অতিথির মাধ্যমে জানা যায় – মণিকার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল দুলাল চৌধুরীর। ছেলেটি তাদেরই এক সহপাঠী, যদিও এ বিবাহে দুলালের সম্মতি ছিল না। তিন মাস পূর্বে এক সড়ক-দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। সুখেন্দুর তথ্যে লোকেন বিব্রত বোধ করে। তার পর্যবেক্ষণে দুলাল মোটেও 'সুপারম্যান' নয়। বিত্র পাশ করে সে মামার সুপারিশে একটি ছোটো চাকরি পায়।

এদিন থেকে লোকেন সবকিছুতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তার অনিদ্রা ও ক্ষুধামান্দ্য শুরু হয়। দুলালের প্রতি অসন্তোষের কারণ না থাকলেও, মৃত-সহপাঠী দুলালকে সে বর্বর ও বীভৎসরূপে ভাবতে শুরু করে। নিজ আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সে স্ত্রীর কাছে এসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। মণিকার মতো বিদুষী নারীকে দুলাল প্রত্যাখ্যান করায় সে ক্ষুব্ধ হয়। তবে বাঙালি নারীজীবনে এ যে নিত্যদিনের ঘটনা, এ সত্য মণিকার জানা – 'এ অপমান বাঙালী মেয়েকে তো সইতেই হয়। আমি তো এমন অসাধারণ কিছু নই।'[২]

লোকেন বারবার দুলালের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চায়, কিন্তু পারে না। অতঃপর স্ত্রীকে ঘিরে সে নতুন ভাবনায় জড়িয়ে পড়ে। তার মনে হয়, মণিকার জীবনে হয়তো ভয়ানক ইতিহাস রয়েছে – যা জানতো কেবল দুলাল চৌধুরী। সত্য-উদ্ঘাটনের জন্য সে নিদ্রিতা স্ত্রীকে জাগ্রত করে জেরা করতে চায়। শেষপর্যন্ত লোকেন বুঝতে পারে, এটি তার মানসিক সমস্যা – 'একটা দুরারোগ্য নিষ্ঠুর ব্যাধির কীট তার হৃৎপিণ্ডে বাসা বেঁধেছে। এরপর থেকে দিনের পর দিন সেই বীজাণুরা তাকে তিলে তিলে খেয়ে চলবে, সে আর বাঁচতে পারবে না – তার আর পরিত্রাণ নেই।'[৩]

লোকেনের উদ্ভট আচরণের বাস্তবসঙ্গত ভিত্তি নেই এবং এগুলো তার ইচ্ছাবিরুদ্ধ। অথচ এক অজানা শক্তি তাকে দুলাল-মণিকাকেন্দ্রিক ভাবনায় তাড়িত করে। মনোবিকারে আক্রান্ত লোকেনের কাছে ঘুমন্ত স্ত্রীর নিঃশ্বাস

---

[১] 'অমনোনীতা' *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৭) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'অমনোনীতা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

বিষাক্ত মনে হয় – 'ঘরের ভেতরে কোথায় একটা লুকানো সাপ একটানা ফুঁসে চলেছে – কিন্তু সেটাকে দেখতে পাওয়ার কোনো উপায় নেই।'[১] লোকেন তার মনোরাজ্যে যেভাবে সন্দেহের জাল বিস্তার করে, এ থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। এরূপ মনোব্যাধির পরিণতি কত ভয়াবহ – গল্পে তা উল্লেখ না থাকলেও, সহজেই অনুমেয়।

'সেই পাখিটা'[২] গল্পে দাম্পত্য-সম্পর্কের সীমাহীন টানাপড়েন শব্দরূপ পেয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদের চার বছর পর সঞ্জীব মুখার্জি তার প্রাক্তন স্ত্রী সুনন্দার গৃহে উপস্থিত হয়। সুনন্দা একটি স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিস্ট্রেস, দুর্গম পাহাড়ি এলাকার নতুন ঠিকানায় সঞ্জীবকে দেখে সে আশ্চর্য হয়। হিমশীতল রাতে সে এসেই দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু সুনন্দা আপত্তি জানায়। অতীতে বন্ধ-ঘরে তাদের আলাপচারিতা সমাজের দৃষ্টিতে অসঙ্গত ছিল না; কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। অনেকক্ষণ মৌনীভাবের পর সঞ্জীব তাকে 'নন্দিনী' নামে সম্বোধন করলে সে প্রতিবাদ করে। বিয়ের পর সে এ-নামেই স্ত্রীকে ডেকেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সুনন্দার কাছে এটি আপত্তিকর মনে হয়।

সুনন্দার বিবেচনায়, সঞ্জীব চূড়ান্ত অপরাধী। মফস্বলে চাকরিকালে নীহারিকা নামের এক মেয়েকে বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতো সঞ্জীব। সাময়িক আবেগ ও উন্মাদনায় সে মেয়েটিকে বিয়ে করে। প্রকৃত সত্য জানতে পেরে নীহারিকা আত্মহত্যা করে। নিজ কৃতকর্মের সমুচিত শাস্তি পায় সঞ্জীব। সুনন্দা তাকে ডিভোর্স দেয়, এবং বিচারে তার জেল হয়। বর্তমানে সে সরকারি চাকরির অযোগ্য, তার শারীরিক অবস্থাও শোচনীয়। বেসরকারি ফার্মে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সে আবার তার জীবন শুরু করতে চায়। এজন্য সে স্ত্রীর কাছে শেষ-সুযোগ প্রত্যাশা করে। কিন্তু সুনন্দা তা অনুমোদন না করে তুলে ধরে তার অতীত অপরাধের বৃত্তান্ত :

> তুমি বোধ হয় ভেবেছিলে ট্রেনিং থেকে আর আমি ফিরে আসব না ? আর ফিরেও যদি আসি দু পাশে দুই যুগলমূর্তি নিয়ে তুমি সিংহাসনে বসবে ? আর রাত্রে দুই মহিষীর একজন তোমার মাথা টিপে দেবে, দু নম্বর পদসেবা করতে থাকবে ?[৩]

এত অপমানের পরও সঞ্জীব 'কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে' বসে থাকে। সহসা কাঁচের জানালার সামনে একটি পাখি চিৎকার করে ওঠে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পাখিটির মৃত্যু-আশঙ্কায় সঞ্জীব জানালা খুলতে বললে সুনন্দা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। তার ধারণা, পাখিটি সহজে আরেকটি আশ্রয় খুঁজে পাবে। অসহ্য বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণার অন্তরালে

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] 'সেই পাখিটা' *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৭১) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সেই পাখিটা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৪

প্রাক্তন স্বামীর রুগ্‌ণ ও দারিদ্র্যব্যঞ্জক চেহারায় সুনন্দার হৃদয় কিছুটা নমনীয় হলেও পরক্ষণে সে মিথ্যা-অস্ত্রে তাকে জর্জরিত করে – 'আমার স্বামীর ফেরবার সময় হয়ে গেছে। তিনি কাছেই একটি বাড়িতে তাস খেলতে গেছেন। তাঁর ফিরে আসার আগেই আপনার চলে যাওয়া উচিত।'[১] এ কথায় মুহূর্তে গৃহত্যাগ করে সঞ্জীব। স্ত্রীর জীবন পুনরায় ক্ষতিগ্রস্ত হোক, এটি সে চায়নি। পাহাড়ি রাস্তা তখন তুষারাচ্ছন্ন, আকাশ থেকে বর্ষিত হচ্ছে অশান্ত জমাট বৃষ্টি। ঘোর দুর্যোগের মধ্যে সে অজানার উদ্দেশে যাত্রা করে। দাম্পত্য জীবনের অব্যাহত বিরোধ-বিরূপতা ভুলে সুনন্দা অকস্মাৎ তাকে নিবৃত্ত করবার জন্য ছুটে যায় এবং ডাকতে থাকে। ততক্ষণে বরফের মধ্যে সঞ্জীব লুটিয়ে পড়ে; সুনন্দাও বিপুল আর্তনাদে সেদিকে ছুটে যায়।

স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সঞ্জীবের দ্বিতীয় বিবাহ ছিল সুনন্দার জন্য অবমাননাকর। এজন্য প্রাক্তন স্বামীর প্রতি সুনন্দার রূঢ় আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে স্বামীর অনুতপ্ত-আত্মা যথাযথভাবে অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছে। গল্পের সমাপ্তিতে সুনন্দার গৃহে নীড়চ্যুত পাখির আশ্রয়লাভের মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়েছে তাদের নতুন সংসারের শুভসূচনার সংবাদ।

'হয়তো'[২] গল্পটি সুদেব ও মঞ্জুশ্রীর বিবাহ ও বিবাহ-পরবর্তী বিচ্ছেদের গল্প। ভালোবেসে বিয়ে করলেও দুজনের গোত্রগত ব্যবধানের কারণে অল্পদিনে তাদের সংসারে ভাঙন ধরে। পরিণামস্বরূপ মঞ্জু 'নার্ভাস ব্রেক ডাউনে' আক্রান্ত হয় এবং সুদেব আত্মহত্যার ভাবনায় ভাবিত হয়। সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তারা আইনের শরণাপন্ন হয়; এবং বিচ্ছেদের ছাড়পত্র নিয়ে তারা আদালত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে।

অর্ধযুগ পর চলন্ত ট্রেনে প্রাক্তন এই দম্পতির সাক্ষাৎ হয়। ডিভোর্সের পরও মঞ্জুশ্রীর কপালে শোভা পায় সিঁদুরের মস্ত ফোঁটা। সুদেব বোঝে, মঞ্জুশ্রীর এ-সংস্কার কেবল সম্পত্তির জন্য নয়। আদালতে সম্পর্কের ইতি ঘটলেও, তার কাছে এ বিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন। অসুস্থ পিতার জন্য সে তারকেশ্বরে পুজো দিতে এসেছিল। তবে শুধু বাবা নয়, স্বামীর জন্যও সে দেবতার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করেছে। শ্যাওড়াফুলিতে ট্রেন থামলে সে নেমে পড়ে। কারণ, এ অঞ্চলেই সে চাকরি করে। তার বিদায়ে সুদেব তীব্র যাতনা অনুভব করে। স্ত্রীকে তার অকপটে বলতে ইচ্ছে করে – 'তুমি বিয়ে করতে পারোনি – আমিও না – হয়তো, হয়তো ছ'বছর আগের

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৮

[২] 'হয়তো' *উল্টোরথ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৭৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

সাপটা মরে গেছে এতদিনে, হয়তো আজ আমরা দুজন মিলে সেই ভুলের মূলটাকে খুঁজে বের করতে পারি।'[১] পরক্ষণে নিজেকে সে নিয়ন্ত্রণ করে; মঞ্জুশ্রীকে আর কিছুই বলা হয় না।

সমাজ-সংস্কার ভুলে মঞ্জুশ্রীকে বিয়ে করে সুদেব সুখী হয়নি, যার পরিণাম এই ডিভোর্স। তবে বিচ্ছেদের পর তারা স্বকীয়তা ও আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে পেরেছে। সামাজিক বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়েও তারা পরিচ্ছন্ন জীবনের অনুশীলন করেছে। মিলনের সম্ভাবনা তৈরি হলেও কেউ পূর্ববর্তী অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করতে চায়নি। মূলত নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সুদেব-মঞ্জুশ্রীর দৃষ্টিভঙ্গি বরাবরই পৃথক। ট্রেন চলাকালে তাদের উচ্চারিত সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে কিছু চিরন্তন বক্তব্য :

সুদেব :

ক) মিথ্যেটা পুরুষের ওপর দিয়ে যাওয়াটাই ভালো, মঞ্জু। তারা টেরিলিনের জামার মতো – ওয়াশ অ্যান্ড উইয়ার। কিন্তু মেয়েদের নিন্দের রঙটা পাকা – সত্য-মিথ্যের যাচাই সেখানে অবান্তর।[২]

খ) পুরুষেরা বদ-অভ্যেসটাই আঁকড়ে থাকে।[৩]

মঞ্জুশ্রী :

ক) অভ্যেস বদলাতে মেয়েদের সময় লাগে। আরো যদি সেটা সংস্কারের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।[৪]

খ) কপালের সিঁদুর নিয়ে বাঙালী মেয়েরা ঠাট্টা করে না।[৫]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাম্পত্যজীবন-নির্ভর গল্পের মধ্যে 'লক্ষ্মীর পা'[৬] স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রয়াসে অনেক প্রতিবন্ধকতা জয় করা সম্ভব – এ কথাই লেখক বলতে চেয়েছেন এ-গল্পে। স্টেশন থেকে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে বলাই যাত্রা করে গ্রামের পথে। এসময় মাঠভরা সোনালি ধান দেখে নববধূ আপ্লুত হয়। কারণ তার জন্মভূমি রাণীগঞ্জের কালো মাটিতে এমন 'চোখ-জুড়ানো ধান' অকল্পনীয়। অবশ্য তার পূর্বপুরুষ ছিল মেদিনীপুরের বাসিন্দা। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে বসতভিটা ও সহায়-সম্বল হারিয়ে তারা চলে আসে কয়লার

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হয়তো', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩০

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৭

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৬

[৫] প্রাগুক্ত

[৬] 'লক্ষ্মীর পা' *আনন্দবাজার* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৭৬) প্রথম প্রকাশিত হয়।

দেশে। তার বাবা এখানকার ক্ষুদ্র দোকানের অসচ্ছল ব্যবসায়ী। শিশুকালে মাকে হারায় সে; প্রতিপালিত হয় বিমাতার সংসারে। বলাই সেসময় একটি কোলিয়ারিতে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত ছিল।

স্বামীর কয়লাখনির কাজ মেয়েটির পছন্দ নয়। কোলিয়ারির গভীর সুড়ঙ্গে আকাশ দেখা যায় না, সর্বদা সেখানে বিরাজ করে চাপা উৎকণ্ঠা। গাঁতির আঘাতে যে কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে লুকোনো গ্যাস, ছিদ্র হতে পারে বৈদ্যুতিক তার। বলাই নগদ অর্থপ্রাপ্তিকে গুরুত্ব দিলে, মেয়েটি শুনিয়ে দেয় প্রকৃত বাস্তবতা। প্রাসঙ্গিক সংলাপ লক্ষযোগ্য :

> 'নগদ টাকার গল্প কোরো না আমার কাছে। পুরো টাকা লিখিয়ে নিয়ে অর্ধেক মজুরী দেয় ওরা।'
> বলাই চমকালো একটু।
> 'কোথায় পাও এসব খবর।'
> 'আমি সব জানি –' মেয়েমানুষের যে-রকম ঝাঁঝ থাকলে জীবনে বেশ একটা সোয়াদ আসে তেমনি ভাবে বউ ঝাঁঝালো হয়ে উঠল : 'ছ মাস কাজ করিয়েই কোম্পানী ছাড়িয়ে দেয় কিছু-দিনের জন্যে, নইলে মজুরের নামে কোম্পানীকে টাকা জমা রাখতে হয়। আইনে যে-সব করবার কথা আছে –'[১]

স্ত্রীর চমৎকার বিশ্লেষণে বলাই আশ্চর্য হয়। মেয়েটির কাছে কয়লাখনি 'মরণের গর্ত', এর পরিবর্তে ধানক্ষেতের মধ্যে সে খুঁজে পায় লক্ষ্মীর পদচিহ্ন। স্বামীকে সে তাই বলে :

> হাগাঁ, তোমাদেরও নিশ্চয় খেত আছে, সেখানেও নিশ্চয় এমনি করে ধান ছাপিয়ে পড়ে। সে-সব ছেড়ে কোন্ প্রাণে তুমি চলে গেলে ওখানে ? ওই মাটির তলার আঁধারে নেমে সাঁওতাল আর হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে কয়লার গাঁইতি মারতে ভালো লাগে তোমার ?[২]

গ্রামীণ প্রকৃতি আর পাখির সুখসঙ্গ ছেড়ে মেয়েটি রাণীগঞ্জে প্রত্যাবর্তন করতে চায় না। স্ত্রীর মৃত্তিকাঘনিষ্ঠতা এবং সোনালি ধানের আকাঙ্ক্ষা বলাইকে আশান্বিত করে। স্ত্রীর নিকট এতক্ষণ আত্মপরিচয় গোপন রাখলেও, 'চাষীর ছেলে' হিসেবে সে গৌরববোধ করে। বলাই স্বপ্ন দেখে – তার পিতা আর ক্ষেতমজুর নয়, ক্ষুধার যন্ত্রণায় মাকে ঝিয়ের কাজ করতে হচ্ছে না। পিতামহের ন-দশ বিঘা ধানি জমি তারা ফিরে পেয়েছে, তাদের ভাঙা বাড়ির জায়গায় নির্মিত হয়েছে টিনের কিংবা রঙিন টালির ঘর। যে বলাই আজীবন নিগৃহীত হয়েছে, স্ত্রীর সংস্পর্শে সে ভাবতে শেখে :

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'লক্ষ্মীর পা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

সব হতে পারে, কেউ বলতে পারে না, কী হতে পারে। এবার স্বপ্ন দেখার পালা বলাইয়ের। শেষ বেলার রোদে পাখায় রোদ জড়ানো উড়ে যাওয়া বকের দলের মতো বলাইয়ের স্বপ্নরাও ধানের গন্ধে, ধানের ছোঁয়ায় এক আকাশ ছাড়িয়ে আর এক আকাশের দিকে উড়ে চলল।

বউ ছোট্ট একটি হাঁসের মতো চলতে থাকল তার সঙ্গে, যেন লক্ষ্মীর রাঙা পা পড়তে লাগল আলোর ওপর লুটিয়ে যাওয়া ধানের শীষে।[১]

নবদম্পতির সংসার শুরুর গল্প হলেও, তা সমাপ্ত হয় নিপীড়িত মানুষের আশার স্পন্দনে। যে কোনো বিপ্লবকে এগিয়ে নিতে জীবনসঙ্গীর অনুপ্রেরণা কতোটা ফলপ্রসূ – তা বলাই ও তার স্ত্রীর চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ-গল্পে স্পষ্টভাবে সর্বহারাদের পক্ষ নিয়েছেন। নারায়ণের *গল্পসমগ্রের* 'ভূমিকা'য় উজ্জ্বলকুমার মজুমদার লিখেছেন – "একজন সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং একই সঙ্গে 'শিল্পীর স্বাধীনতা'য় বিশ্বাসী মানুষ যে কী গভীরভাবে স্বপ্ন আর বাস্তবকে একাকার করে দিতে পারেন তার প্রমাণ এই 'লক্ষ্মীর পা'।"[২]

আঞ্চলিক সমাজ

আঞ্চলিক জনসমাজের যথার্থ রূপায়ণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প অতুলনীয়। তাঁর গল্পে একদিকে রয়েছে পাহাড়-পরিবেষ্টিত সাঁওতাল পরগণার অপূর্ব বনশ্রী, বরেন্দ্রভূমির লালমাটি, দার্জেলিঙের পার্বত্য জীবনযাপন এবং ডুয়ার্সের শালবনের মায়াবী প্রকৃতি; অন্যদিকে পূর্ববাংলার নদী এবং নদীসন্নিহিত জনজীবনের রূপচিত্রাঙ্কনে তাঁর দক্ষতা অবিস্মরণীয়। শিল্প-সাহিত্যে এই আঞ্চলিকতার ধারণা নতুন নয়, এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক-ধারণা। ১৮৮০ সালে আমেরিকায় local color নামে মতবাদটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। এমনকি 'সে-সময় local color movement নামক একটা সাহিত্য-আন্দোলনেরও অস্তিত্ব ছিল। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ অঞ্চলের বাগভঙ্গি, রীতি-প্রকৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে সমসাময়িককালে প্রাধান্য পায় সাহিত্য-রচনার প্রবণতা।'[৩] অর্থাৎ আঞ্চলিক সাহিত্য হচ্ছে 'সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাহিনী'[৪]; এর বিষয়, চরিত্র, ভাষা সবই হবে নির্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে আঞ্চলিকতার যথাযোগ্য প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের শিল্পকৌশল সম্পর্কে তিনি স্বয়ং বলেছেন :

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[২] উদ্ধৃত : (ভূমিকা, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার), প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[৩] গিয়াস শামীম, *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[৪] গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

> সাহিত্যে ‘আঞ্চলিকতা’র একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঞ্চলিক-পরিবেশ মাত্র ফ্রেমের কাজ করে – তাকে অলংকরণের অতিরিক্ত কিছু বলা যায় না, কখনো কখনো কোনো বিশিষ্ট পটভূমি রচনায় বিশেষ ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে খানিকটা সাহায্য করে থাকে। এইগুলির ভিত্তিতেও কোনো লেখককে আঞ্চলিক বলা যায় না। ওই নির্দিষ্ট বিশেষণটি তখনই কোনো শিল্পীর ওপরে আরোপ করা সম্ভব – যখন বিশেষভাবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো সেই বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে – তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনাগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সেই বিশিষ্ট ভিত্তিক্ষেত্রের স্বাভাবিক শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর স্থানিক সাহিত্য হয়েও রসাবেদনে তা দেশকালের সীমা অতিক্রম করে যায়।[১]

পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন পদ্ধতি, তাদের আচার-বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতি প্রতিফলিত হয়েছে নারায়ণের ‘বীতংস’, ‘সৈনিক’, ‘ভোগবতী’, ‘জান্তব’, ‘বন-জ্যোৎস্না’ প্রভৃতি গল্পে। এসব পাহাড়ি ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠী দৈহিক দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী। তবে শিক্ষার আলো থেকে এরা বরাবরই অবহেলিত ও বঞ্চিত। অশিক্ষা ও অন্ধবিশ্বাসই এদের যাবতীয় বিপত্তির কারণ। বন্যপশুর আক্রমণ প্রতিহতের সামর্থ্য থাকলেও, নগরবাসীদের চক্রান্ত ও কূটকৌশলের কাছে তারা প্রায়শ পরাজিত। ‘বীতংস’ গল্পের বুধনী, ‘ভোগবতী’র শুকলাল ও সোনা, এবং ‘বন-জ্যোৎস্না’র শিউকুমারীর বলিদান তাদের পশ্চাৎপদ যাপিত জীবনের সঙ্গেই সম্পর্কিত। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির বিশ্বাসযোগ্য রূপায়ণে এসব গল্প অনবদ্য। নারায়ণের এরূপ জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ প্রসঙ্গে বরুণ মুখোপাধ্যায় এক স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন :

> ১৯৭০ সাল। পুজোর ছুটিতে সপরিবারে নৈনিতাল গেছি। সেখানেই একদিন বাসস্ট্যান্ডে আলো ঝলমল পাহাড়ী শীতের সকালে দেখলুম সহাস্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে।... একটু পাশে ডেকে নিয়ে হাত তুলে দেখালেন – নীচে পাহাড়গুলির দিকে। বেশ দূরে, কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্টতার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে দু'চারটে ছোট ছোট গ্রাম। বললেন, ঐ পাহাড়গুলির দিকে বেড়াতে গেছিলাম। ওখানকার মানুষদের মধ্যে অনেকটা সময় কাটালাম। ওদের অনেক কথা শুনলাম, জানলাম – ভারী আকর্ষণীয়।... অবাক হয়ে ভাবলাম, রাণীক্ষেতে বেড়াতে এসে পাহাড়গুলির মানুষের খোঁজে ক'জনই বা এমন ঘুরে বেড়ান। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, জীবনরসিক এই শিল্পীর পরবর্তী উপন্যাসের চরিত্রগুলি ঐ পাহাড়গুলির বস্তি থেকেই সম্ভবত উঠে আসবে।[২]

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্প-বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

[২] বরুণ মুখোপাধ্যায়, ‘জীবনশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে’, সঞ্জীবকুমার বসু (সম্পাদিত), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭

সমতলবাসীদের কূটচালে সাঁওতাল জনশ্রেণির প্রাণবন্ত জীবনধারা কীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তারই অনুপুঙ্খ বিবরণ 'বীতংস'[১]। গল্পে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে সংসারের প্রতি সুন্দরলালের বৈরাগ্যভাব জন্ম নেয়। পরিবার-সমাজ ছেড়ে সে সন্ন্যাসীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। নাগরিক জীবনের নানাবিধ দূষণ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের জন্য সে অরণ্যচারী হয়। সাঁওতাল পরগণার এক বনের মধ্যে গড়ে ওঠে তার কুটির। নীল পাহাড়ে ঘেরা এ-বনশ্রীর অপূর্ব সৌন্দর্য তাকে বিমোহিত করে :

> এখানে জঙ্গলের মধ্যে ডুমডুম করে টিকারা বাজে। হাওয়ায় হাওয়ায় স্বপ্নের মতো শালের ফুল উড়ে যায়। যখন মহুয়া বন আকুল হয়ে ওঠে, ছোট ছোট গোলাপজামের মতো মহুয়ার সাদা ফুলগুলি তিক্তমধুর রসে টস্‌টস্‌ করতে থাকে, আর তার গন্ধে হরিয়ালের দল এসে ডালে পাতায় নাচানাচি করে তখন সুন্দরলালেরও যেন নেশা ধরে যায়। সত্যিকারের আনন্দ তো এইখানেই।[২]

অল্পদিনে সুন্দরলাল জঙ্গলের সাঁওতালদের মন জয় করে নেয়। তারা তাকে সাধুরূপে ভক্তি করতে শুরু করে। সুন্দরলাল সন্ন্যাসব্রত পালন করলেও গেরুয়া পোশাক পরিধান করে না। তার লম্বা জামার পকেটে থাকে খিলিপান ও ধাতব মুদ্রা, হাঁটার সময় সেগুলো ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে বেজে ওঠে। হস্তরেখা দেখে সে ভবিষ্যদ্বাণী করে, যা সাঁওতালদের জীবনের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। ভেষজ-চিকিৎসার ব্যাপারে সুন্দরলালের জ্ঞানও অনেকটা নির্ভুল। 'শৈব, রামায়েৎ, গাণপৎ' – কোনো মতবাদে তার বিদ্বেষ নেই। ব্যোম ভোলার নামে সে গাঁজা সেবন করে, আবার সুরেলা কণ্ঠে পাঠ করে তুলসীদাসী রামায়ণ। এ জঙ্গলে যারা বোঙার পূজায় মুরগি বলি দেয়, তাদের প্রসাদগ্রহণেও সে আপত্তি করে না। এভাবে সাঁওতালদের কাছে সে সাধু থেকে মহাপুরুষে রূপান্তরিত হয়।

শিষ্যদের দর্শন দিতে সুন্দরলাল প্রতি সপ্তাহে শহরে যায়। ফেরার পথে তার দেখা হয় ঝড়ু সাঁওতালের সঙ্গে। মহুয়াবনে সে হরিয়াল শিকার করতে গিয়েছিল। গ্রামবাসী ঝড়ুকে মোড়ল বলে মান্য করে। তার শরীরে বস্ত্রের বাহুল্য নেই, ছোটো নেংটি দিয়ে সে লজ্জা নিবারণ করেছে। ঝড়ু মোড়লের কাছে সুন্দরলাল প্রকাশ করে তার সিদ্ধিলাভের বৃত্তান্ত। হিমালয়ের চূড়ায় পাঁচশো বছর ধরে তপস্যারত রয়েছেন বিশালদেহী নাঙ্গা বাবা। নেপালে পশুপতিনাথের মন্দিরে ধ্যান করে সে এ-সাধকের দর্শন পেয়েছে। নাঙ্গা বাবার আশীর্বাদে 'ভূত-পিরেত-পিশাচ-

---

[১] 'বীতংস' *আনন্দবাজার* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৪৯) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বীতংস', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

দানো' সকলে তার বশবর্তী। এ-ধরনের বক্তব্যে ঝড়ু রোমাঞ্চিত হয়। সবিনয়ে সে সন্ন্যাসীকে তাদের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করে।

সাঁওতালদের অনুষ্ঠানে সাধুপুরুষ সুন্দরলালের আগমনে থেমে যায় মাদল-নৃত্য। অতঃপর তার উৎসাহে দশ-বারোটি মেয়ে পুনরায় নাচ শুরু করে। এদের দেখে সুন্দরলালের মনে জেগে ওঠে সংসারের স্মৃতি। যুবতী স্ত্রীকে রেখে সে সন্ন্যাসব্রত পালন করছে। সাঁওতালী ঢঙে সে-ও মাটির পাত্রে মহুয়া-মদে মত্ত হয়। এসময় ঝড়ু সাঁওতালের মেয়ে বুধনীর আন্দোলিত দেহবল্লরী উসকে দেয় তার কামনাবহ্নি। মেয়েটিকে সে দু টাকা বকশিশ দেয়। এরপর গম্ভীর স্বরে সে উচ্চারণ করে দৈববাণী :

> তুই কেন এখানে পড়ে আছিস বুধনী ! তোর যে ভারী জোর বরাত। নাঙ্গা বাবার কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে শহরে গিয়ে যে তোর কপাল ফিরে যাবে এ তো আমি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।... চলে যা, চলে যা তুই। দেবতার নাম ক'রে বলছি তুই চলে যা। শাড়ি, চুড়ি, তেল – যা চাস সব পাবি।[১]

সাঁওতালরা জানে, সুন্দরলালের দেহে মাঝেমধ্যে ভর করেন ঠাকুর-দেবতা। ভয়ে-বিস্ময়ে মোড়ল প্রকম্পিত হলেও বুধনী সুখচিন্তায় শিহরিত হয়। একদিন সুন্দরলালের সঙ্গে দেখা করে তিলক সাঁওতাল। পাশের গ্রামের ডোমেন মাঝিকে বাণ মারতে সে সাধুর সহযোগিতা চায়। সুন্দরলাল শুধু বাণ নয়, ঘুমন্ত ডোমেনের ওপর 'পিশাচ চালান' করতে চায় – 'প্রকাণ্ড একটা কালো পিশাচ এসে বসবে তার গায়ের ওপর। তারপর সেই পিশাচটা তার মুখখানাকে নলের মতো ছুঁচলো করে দিয়ে তার মাথার ভেতর থেকে চোঁ চোঁ করে রক্ত আর ঘেলু খাবে।'[২]

তিলকের বিদায়ের পর সুন্দরলাল জাগতিক চিন্তায় বিভোর হয়। 'সীজন টাইম' অতিক্রান্ত হলে তার এসব কর্মকাণ্ড নিরর্থক হবে। রাস্তায় বুধনীর সঙ্গে দেখা হলে তার শরীরে কামনার শিখা জ্বলে ওঠে। সাঁওতাল নারীর দেহমন সে নিরীক্ষণ করে, তবে 'এ যোগীর দৃষ্টি – ভোগীর নয়।'[৩] কয়েকদিন পর শিং বোঙার পূজায় সুন্দরলাল তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করে। মুরগির রক্তে মুখমণ্ডল রঞ্জিত করে সে পৈশাচিক রূপ নেয়। সাঁওতালদের ধারণা, তার ওপর আশ্রয় নিয়েছেন স্বয়ং শিং বোঙা। এদের সরলতা ও অন্ধবিশ্বাসের সুযোগে সুন্দরলাল দেবতার সুরে আদেশ করে :

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

> ঝড়ু সাঁওতাল, শুনছিস ? আমি শিং বোঙা, তোদের ডাকছি – শুনছিস ?... আমার কথা শোন্‌। তোদের গাঁয়ে মড়ক লাগবে – 'হয়জা'র মড়ক ! একটি প্রাণীও বাঁচবে না, মরে সব শেষ হয়ে যাবে। 'করম' দেবতার রাগ পড়েছে তোদের ওপর – তোদের কাউকে রাখবে না, কাউকেই নয়।... উপায় আছে। নাঙা বাবার শিষ্য এই সাধু সুন্দরলালকে আঁকড়ে ধর্‌। ও তোদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, ওর সঙ্গে তোরা উত্তরে চ'লে যা। সেখানে ঘর পাবি, জমি পাবি, এর চেয়ে অনেক সুখে থাকবি।[১]

দেবতার রোষানল থেকে বাঁচাতে সুন্দরলাল এদের বনভূমি থেকে সমতলে নিয়ে যেতে চায়। পরদিন সাঁওতাল পুরুষরা বাঁশিতে করুণ সুর তুললেও মেয়েদের হাস্যোজ্জ্বল দেখা যায়। তাদের চোখে 'শহর, চুড়ি, তেল আর শাড়ি'র স্বপ্ন। গল্পকার সাঁওতালদের পরিণতি নির্দেশ না করলেও, খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছেন এভাবে :

> আসামের চা-বাগানে কুলি যোগানো কী যে অসম্ভব ব্যাপার, সেটা সাহেব জানে। কালাজ্বরে দলে দলে লোক মরছে, আশেপাশ থেকে একটি কুলি আনবারও জো নেই। বুধনীকে বাদ দিয়ে – আড়কাঠি সুন্দরলাল হিসেব করতে লাগল : বুধনীকে বাদ দিলে, বেয়াল্লিশজন কুলিতে তার কমিশন পাওনা হয় কত ?[২]

সুন্দরলাল মূলত চা-বাগান মালিকের কমিশনভোগী দালাল। কুলি সংগ্রহের জন্য সে সাঁওতালদের মাঝে ছদ্মবেশে অবস্থান করে। কাজের ফাঁকে সে আবিষ্কার করে সুন্দরী বুধনীকে। মেয়েটিকে সে প্রথমে সাহেবের জন্য নির্বাচন করে। কারণ – 'সাহেব ভালোমানুষের কদর বোঝে।'[৩] কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থের চেয়ে ব্যক্তিগত লালসা তার কাছে গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। একারণে বুধনীকে সে নিজের অঙ্কশায়িনী করতে চায়। বীতংস দিয়ে যেমন পশুপাখি বন্দি করা হয়, তেমনি করম দেবতার ফাঁদে সুন্দরলাল শিকার করে কিছু সজীব মানবপ্রাণ। আধুনিক সভ্যতার ভিড়েও 'বীতংস' গল্পের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। জনৈক সমালোচকের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এরকম :

> বীতংস গল্প আজকের ভারতবর্ষেও প্রবল প্রাসঙ্গিক। ভূমিহীন দরিদ্র মানুষদের দল স্টেশনে স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় যখন পিণ্ডাকৃতি হয়ে থাকে, তখন পাঠক একটু দাঁড়িয়ে দেখবেন – সুন্দরলালদেরও দেখতে পাবেন। তারা এখন আধুনিক বেশবাসে সুসজ্জিত, কানে মোবাইল, হাতে বিদেশি ঘড়ি। শ্রমের ভূগোলও সম্প্রসারিত হয়েছে বিশ্বায়নের

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯-২৯০

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

কল্যাণে। আরব দুনিয়া থেকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ – শ্রমশক্তির যোগান চলেছে, জীবনবীমা নেই, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ নেই। কোনো প্রশ্নও নেই, তাই উত্তর দেওয়ার দায় নেই কারুর।[১]

যুগে-যুগে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ধর্ম-সংস্কারকে তাদের স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার করেছে। তবে একেবারে প্রান্তিক জনসীমানার মধ্যেও যে এ-কুচক্রীদের বিচরণ থাকতে পারে, সে-সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পাঠককে সজাগ করতে চেয়েছেন এ-গল্পে।

'সৈনিক'[২] গল্পে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কঠিন জীবনসংগ্রাম পরিস্ফুটিত হয়েছে। গল্পটিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৩] 'সাঁওতালরা এ উপমহাদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী। কারো কারো মতে, এরা এদেশে বসবাস করছে আর্যদের আগমনের অনেক পূর্ব থেকেই।'[৪] কালের বিবর্তনে তারা মূল ভূখণ্ডের ওপর অধিকার হারায়। তাই বনজঙ্গল পরিষ্কার করে এরা নতুন বাসস্থান নির্মাণে উদ্যোগী হয়। প্রকৃতি এবং সভ্য-সমাজের সঙ্গে নানাবিধ সংগ্রাম করে তারা বেঁচে থাকে। সাঁওতাল জাতির যাযাবর-বৃত্তি প্রসঙ্গে *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস* গ্রন্থে বলা হয়েছে :

> ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন একটি এলাকা। এ এলাকাটি সাঁওতাল পরগনা নামে খ্যাত। অচিরেই তাদের ওপর নেমে আসে হিন্দু-ব্যবসায়ী-মহাজন কর্তৃক অর্থনৈতিক শোষণ ও অত্যাচার। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতালরা এ শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং বিদ্রোহ শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার নির্মমপন্থায় দমন করে এ বিদ্রোহ। অতঃপর অনন্যোপায় সাঁওতালরা নিরাপদ বাসস্থানের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে। বর্তমানে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুরের বিরল, সেতাবগঞ্জ, পঞ্চগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর সাঁওতাল বাস করে। রংপুর ও বগুড়া জেলায়ও সাঁওতালদের বসবাস রয়েছে।[৫]

'সৈনিক' গল্পে সাঁওতালরা নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে উপস্থিত হয় কুমারদহ গ্রামে। তাদের আগমনে এই এলাকায় প্রাণ সঞ্চারিত হয়, নতুন স্পন্দনে জেগে ওঠে – 'ডুম ডুম ড্রাম' – সাঁওতালদের নাগাড়া। 'বরেন্দ্রভূমির ঘুমন্ত

---

[১] গোপাদত্ত ভৌমিক, 'ক্ষোভ-ঘৃণা-ভৎর্সনা-জুগুপ্সার শতসঞ্চারী : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পভুবন', উত্তম পুরকাইত (সম্পাদিত), *উজাগর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

[২] 'সৈনিক' *আনন্দবাজার* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫০) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] বিশিষ্ট শিশু-সাহিত্যিক এবং অনুবাদক বিশু মুখোপাধ্যায়কে এক পত্রে (২৬ এপ্রিল ১৯৪৫) লেখক অবহিত করেন – "আপনাদের 'গল্প সঞ্চয়নে'র জন্যে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পটি চেয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু নিজের পক্ষে এ সম্বন্ধে রায় দেওয়া একটু শক্ত। তবু আমার মনে হয় ১৩৫০ সালের 'শারদীয়া আনন্দবাজারে' প্রকাশিত 'সৈনিক' গল্পটিই নানা কারণে আপনাদের সঙ্কলনে স্থানলাভের যোগ্য।" (উদ্ধৃত : সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭)

[৪] গিয়াস শামীম, *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

আকাশে অনেক দিন পরে জাগরণের ছোঁয়া'[১] লাগে। কুমারদহের তৎকালীন জমিদার চন্দ্র চৌধুরী ছিলেন শক্তিমান পুরুষ। শিকারকালে বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে গেলে তিনি বাঘের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। হাতের তিনটি আঙুল হারালেও বাঘকে তিনি ঠিকই বধ করেন – এরকম জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে এতদঞ্চলে। নীল বাহাদুর নামের একটি হাতির পিঠে চড়ে তিনি জমিদারি দেখাশোনা করেন।

মাদলে 'ধিতাং তাং ধিতাং তাং' সুর তুলে সাঁওতালরা জমিদার-বাড়িতে আসে। চন্দ্র চৌধুরীর কাছে তারা দুর্গম পালগ্রামে বসতিস্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করে। সেখানকার টিলার সাপ এবং বাঘের মাংস হবে তাদের আহার্যের উপকরণ। এ-প্রস্তাবে জমিদার সানন্দে রাজি হন। তাঁর মতে, পালগ্রামের 'যোগ্য বাসিন্দা' এরাই। জমিদারের জন্য তারা উপহার হিসেবে নিয়ে আসে সদ্যনিহত একটি প্রকাণ্ড শুয়োর। চন্দ্র চৌধুরী সাঁওতালদের প্রজা হিসেবে গ্রহণ করলেও, প্রত্যাখ্যান করেন তাদের শ্রেষ্ঠ উপচার। জমিদারগৃহে নীল বাহাদুরকে ঘিরে সাঁওতালরা এদিন নাচতে থাকে। উষ্ণ আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয় এই যূথপতি।

এই গল্পে স্থানিক পটভূমি নির্বাচনে গল্পকার ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষ্যণীয় :

> বাংলার পাল রাজাদের তলোয়ার একদিন সমস্ত উত্তর ভারতের আকাশে বিদ্যুতের মতো জ্বলে উঠেছিল। দেবপাল, ধর্মপাল। চক্রবর্তী রাজাদের দুর্দান্ত প্রতাপে বাংলার সমৃদ্ধি উছলে উঠেছিল সহস্রধারায়। হয়তো তারই কোনো বিস্মৃত বুদ্‌বুদ্ এই পালগ্রাম। মজে যাওয়া দীঘির শীতল কাদার তলায় অজ্ঞাত শিলালেখন হয়তো বিস্মৃত ইতিহাসের বন্ধ দুয়ার খুলে দিতে পারে। উত্তর বাংলার মাঠেঘাটে, বরেন্দ্রভূমির কাঁকরমেশানো রাঙা মাটিতে অতীতের চূর্ণ কঙ্কাল।
>
> স্বাধীনতার শ্মশানে এসে নতুন করে বাসা বাঁধল স্বাধীন মানুষের দল। কুঁচিলার বিষ মাখানো তীরের ফলা। নাগাড়াটিকারার রণ-দুন্দুভি।[২]

অল্পদিনে পালগ্রামের ভাঙা পাথর এবং ইটের গুঁড়ো ভেদ করে বেরিয়ে আসে প্রকৃতির রসধারা। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎপাদিত হয় সোনালি ফসল। তারা আর বন্যপশু শিকার করে না, দল বেঁধে ভুট্টা ও আখের চাষ করে। কলাবাগান পরিবেষ্টিত সাঁওতাল-পল্লির চারদিকে আবাদ হয় তামাক, শাক-সবজি প্রভৃতি। দুর্ভেদ্য পালগ্রাম ক্রমশ হয়ে পড়ে সবুজময়। একদিন চন্দ্র চৌধুরী পরিদর্শনে আসেন, তাঁর আগমনে আনন্দিত হয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। জমিদারের হাতিকে তারা এবার নৃত্যের ছন্দেই সম্মোহিত করে না, পরিবেশন করে কলা-মূলা-ভুট্টা ইত্যাদি। ধান উৎপাদনে তাদের কৃতিত্ব জমিদারকে শোনানো হয় – 'তিন বছরে এমন

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সৈনিক', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬

বোরো হয়নি।'[1] জমিদার হাস্যচ্ছলে খাজনা দাবি করলে এরা মুনিবের চরণে সর্বস্ব নিবেদন করতে প্রস্তুত হয়। চন্দ্র চৌধুরী পিতৃস্নেহে তাদের 'জঙ্গী পল্টনে'র মর্যাদা দেন এবং সমুদয় খাজনা মওকুফ করেন। আনন্দে, গর্বে ও কৃতজ্ঞতায় সাঁওতালরা সেদিন আত্মহারা হয়।

কিছুদিন পর পাগলা ঘোড়া থেকে ভূপতিত হয়ে চন্দ্র চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর একমাত্র পুত্র ইন্দ্র চৌধুরী জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এমএ পাশ করে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রামে অবস্থান করেন। পিতার নীল বাহাদুরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ নেই, শহর থেকে তিনি নিয়ে এসেছেন একটি বেবি অসটিন। জমিদারির পরিবর্তে পথঘাট ও বনজঙ্গলের প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রবল। এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গী নায়েব নৃসিংহ মুখুজ্জে। সনাতন ধারার লোকটি পাগলা ঘোড়ার তুলনায় মোটরগাড়িকে অধিক ভয় পায়। নায়েবের ভয়ার্ত চেহারা দারুণ উপভোগ করেন নতুন জমিদার।

একদিন পালগ্রামের টিলা দেখে ইন্দ্রের ঐতিহাসিক দৃষ্টি জাগ্রত হয়। পাহাড়পুরের মতো একটি প্রচ্ছন্ন বিহার আবিষ্কারের স্বপ্নে তিনি বিভোর হন। এসময় মোটরগাড়ির চারপাশে শিশুরা ভিড় করলে জমিদার তাদের ধমক দেন – 'যা যা, পালা সব। দেখছিস তো মোটর গাড়ি ! চাপা দিয়ে একদম মেরে ফেলব, ভাগ !'[2] পিতা-পুত্রের পার্থক্য সাঁওতালরা অনায়াসে বুঝতে পারে। ইন্দ্র পালগ্রাম থেকে সাঁওতালদের উচ্ছেদ করতে চান। খাজনা না পাওয়ায় এদের প্রতি তিনি কোনো দায়দায়িত্বও উপলব্ধি করেন না। টিলাটি খনন করে তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় থাকতে চান। নায়েবকে তিনি প্রবল উত্তেজনায় বলে ওঠেন :

> জানেন, ইতিহাসের কত বড় একটা তথ্য হয়তো ওই টিলাটার নীচে মুক্তির প্রতীক্ষা করছে ! হয়তো পাল রাজাদের মূল্যবান কোন তাম্রশাসন হয়তো তাঁদের দিগ্বিজয়ের – হয়তো কতো কী – আমি ভাবতে পারছি না।... ওদের উচ্ছেদ করে দিন। এক মাস সময় – ফসল কাটা শেষ হয়ে যাবে। আর এর ভেতরে কলকাতায় চিঠি লিখে সব ঠিক করে ফেলেছি আমি।[3]

সাঁওতালদের উদ্দাম জীবনীশক্তিকে উপেক্ষা করে ইন্দ্র চৌধুরী প্রত্নতত্ত্বের বিকাশ ঘটাতে চান। সাঁওতালরা এ সংবাদ শুনে অশান্ত হয়ে ওঠে। ইন্দ্রও প্রতিশোধ-গ্রহণে বদ্ধপরিকর হন। কেবল ঐতিহাসিক জ্ঞানলিপ্সা নয়, নিজের শক্তিও তিনি পরীক্ষা করতে চান। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি মাহুতকে হাতির খাবার বন্ধ রাখতে

---

[1] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

[2] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

[3] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০

বলেন। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় নীল বাহাদুর অস্থির হয়ে ওঠে। তিনদিন পর হাতিতে চড়ে নৃসিংহ পালগ্রাম অভিমুখে রওনা দেয়, ইন্দ্র যাত্রা করেন মোটগাড়িতে। এসময় ক্ষুধার্ত জন্তুটি ক্ষিপ্তগতিতে চলতে থাকে। পালগ্রামের পাকা ধানের গন্ধে অভুক্ত-হাতি সোজা খেতে ঢুকে পড়ে এবং নির্বিচারে তছনছ করতে থাকে ধানখেত।

সারা বছরের সঞ্চয় নষ্ট হতে দেখে সাঁওতালরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নাগড়ার শব্দে তারা সমবেত হয়। টিলার ওপর থেকে সাঁওতাল-সেনারা লক্ষ্যবস্তু স্থির করে। পূর্বে নীল বাহাদুরকে নৃত্য-প্রসাদে তুষ্ট করলেও অস্তিত্বরক্ষায় তারা পশুটির দিকে শাণিত ফলা নিক্ষেপ করে। ইন্দ্র চৌধুরীও তাদের দিকে বন্দুক চালান। ততক্ষণে রক্তে আর্সেনিকের তীব্র বিষক্রিয়ায় হাতিটি বেবি অসটিনের ওপর ঢলে পড়ে। নীল বাহাদুরের শরীরের ভারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় ইন্দ্রের শখের বাহন। এই যন্ত্রদানবের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে রূপকী তাৎপর্যে গল্পটি সমাপ্ত হয়।

বেবি অসটিনের বিলুপ্তি রূপকার্থে মেহনতি সাঁওতালদের কাছে আধুনিক ইন্দ্রের পরাজয়। 'এই সৈনিকরাই তো পরবর্তী প্রজন্মের পর পর সাঁওতাল বিদ্রোহর অদম্য শরিক। এরাই তো একদিন বৃটিশ সম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বুক-বিস্ফারিত ব্যক্তিত্বে দাঁড়াবে। গল্পের সাঁওতালরা সেই উত্তর প্রজন্মের পূর্বসূরি প্রতীক!'[১] সাঁওতাল সম্প্রদায়ের এই নির্ভীক ও আত্মপ্রত্যয়ী মনোভঙ্গিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ গল্পে রূপদান করেছেন।

সাঁওতালদের জীবনপ্রণালি, তাদের আনন্দ-বেদনা ও প্রেম-বিরহের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে 'ভোগবতী'[২] গল্পে। এখানে বিভিন্ন পেশার সাঁওতালদের পরিচয় পাওয়া যায় : চাষি সাঁওতাল, খেড়ে সাঁওতাল এবং কাঠুরে সাঁওতাল। চাষি সাঁওতালদের বসবাস ভদ্রপাড়ার সন্নিকটে, তাদের জীবনাচার অনেকটা সাধারণ মানুষের মতো। খেড়েরা নেংটি পরিধান করে, এদের কানে থাকে ফুল এবং মাথায় বাবরি চুল। ধনুর্বিদ্যা তাদের জীবিকা সংগ্রহের সহায়। চাষিদের ন্যায় এরা অন্নভোজী নয়; বনজঙ্গলে প্রাকৃতিক খাবার অন্বেষণ করে। এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে কাঠুরে সাঁওতাল। স্থানীয় জমিদারদের অধিকৃত পাহাড়ে তারা বিনা অনুমতিতে কাঠসংগ্রহ করে। জমিদারের গোমস্তা বৃক্ষনিধনের জন্য তিরস্কার করলেও এরা নিবৃত্ত হয় না। তাদের ধারণা – এসব পাহাড়ের প্রকৃতিদত্ত সম্পদে সাঁওতালদের অধিকার জন্মগত ।

[১] বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

[২] 'ভোগবতী' *আনন্দবাজার* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫৩) প্রথম প্রকাশিত হয়।

এ গল্পে রাঢ়বাংলার জঙ্গল-পরিবৃত ভৈরবী পাহাড়ে কাঠ কাটতে যায় শুকলাল ও তার স্ত্রী সোনা। পাহাড়ের পাদদেশে প্রতিহারীর দায়িত্বে রয়েছে সাঁওতাল-দেবতা ভৈরবী ঠাকুর। এটি হচ্ছে একটি প্রশস্ত শিলাখণ্ড, যার ওপরের অংশে খোদাই করা সিংহের আকৃতি এবং নিচে অশ্বারোহী বীরপুরুষের তেজস্বী মূর্তি। কোনো দিগ্বিজয়ী নৃপতি হয়তো নিজের শৌর্য-বীর্যকে অক্ষয় রাখবার প্রয়াসে এসব মূর্তি নির্মাণ করেছেন। প্রস্তরখণ্ডে রয়েছে কিছু হস্তলিপির চিহ্ন, এসবের অর্থ সাঁওতালদের অজানা। এরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, বৃক্ষতলে বড় পাথর দেখলে পূজা দেয়। ভগ্ন-মূর্তিকে তারা দেবতা ভেবে মুরগি বলি দেয়।

স্ত্রীর অনুরোধে শুকলাল ভৈরবী ঠাকুরকে প্রণাম জানাতে অগ্রাহ্য করে। সোনা বাঘের ভয় দেখালে সে শক্তি প্রদর্শন করে – 'বাঘের বরাত মন্দ না হলে বাঘ আমাকে ধরতে আসবে না।'[১] অবশ্য শরীরের সামর্থ্য নিয়ে শুকলালের অহংকারের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সে 'পাথরে তৈরি' দামাল ছেলে; তার কুড়ালের আঘাতে শুধু গাছ নয়, হার মানে শক্ত পাথর। দাম্পত্য-খুনসুটির পর ঠাকুরকে প্রণাম করে উভয়ে কাজে যায়। শুকলাল অর্ধ-শুকনো গাছে কুড়াল চালায় এবং সোনা গুলঞ্চের লতা দিয়ে খড়ির বোঝা বাঁধে। কাজের অবসরে সাঁওতাল মেয়েটি ধুঁদুল ও কাঠগোলাপ দিয়ে খোঁপা সাজায়, কখনো মৃদুস্বরে গান গায়। কিন্তু একটুও বিশ্রাম নেই শুকলালের।

হঠাৎ পাহাড়ি অঞ্চলে শোনা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণবাদ্য। সাঁওতালদের বিচরণক্ষেত্রে গড়ে ওঠে সেনা ছাউনি। যুদ্ধের ফলে এ নৃগোষ্ঠীর জীবনপদ্ধতিতে আসে আকস্মিক পরিবর্তন। জাতিভেদ বিস্মৃত হয়ে তারা একই মন্ত্রবলে সম্মিলিত হয়। নগদ অর্থের লোভে চাষি সাঁওতালদের লাঙ্গল, খেড়েদের ধনুক এবং কাঠুরেদের কুঠার অপসৃত হয়। টাকার পাশাপাশি তারা পায় বিস্কুট, কৌটোর দুধ ও চকলেট; কোনোদিন তাদের ভাগ্যে জোটে বিয়ারের বোতল। মহুয়া-মদ এবং ভাত-পঁচানো হাঁড়িয়ার স্বাদ তারা ক্রমে ভুলতে বসে। গল্পের এক পর্যায়ে গাড়িচাপায় সোনার মৃত্যু হয় এবং সেনাবাহিনীর দখল থেকে ভোগবতীকে মুক্ত করতে শুকলাল গুলিবিদ্ধ হয়। যুদ্ধের আবির্ভাবে সাঁওতালদের প্রাণোচ্ছল জীবনপ্রবাহ এভাবে শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হয়।

দার্জেলিঙের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস-সংস্কার ও অস্তিত্বরক্ষার গল্প 'জান্তব'[২]। এ অঞ্চল পাইন-দেওদারের ছায়াকুঞ্জে শোভিত। পার্শ্ববর্তী একটি উপত্যকা থেকে পাহাড়িরা বহুকষ্টে জল সংগ্রহ করে। তুষার ঝড়, পাহাড় ধস, বুনো জন্তুর আস্ফালন কিংবা বেতবনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অজগরের হিংস্রতা থেকে রক্ষাপ্রাপ্তির জন্য

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভোগবতী', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

[২] 'জান্তব' *দিগন্ত* পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় (১৩৫২) প্রথম প্রকাশিত হয়।

তাদের সতর্ক থাকতে হয়। এখানকার জীবন ‘সুখে দুঃখে প্রেমে বিরহে এবং সংঘাতে জান্তব জীবন।’[১] একদিন তুষার ঝড়ে পাহাড়িরা যখন ‘কুঁদি’ (শাল গাছের গুঁড়ি) জ্বালিয়ে আত্মরক্ষা করছিল, তখন শোনা যায় ‘ডুগ্ – ডুগ –’ শব্দ। এ শব্দ তাদের পরিচিত। তারা বুঝতে পারে, রহস্যমণ্ডিত গুম্ফা লামার পদার্পণ ঘটেছে গ্রামে।

গুম্ফা লামাকে পাহাড়িরা অপদেবতা ভেবে ভয় করে। তার আগমনের মধ্যে এরা আবিষ্কার করে অমঙ্গলের বার্তা। প্রকৃতপক্ষে ‘প্রতিকূল শক্তিকে প্রতিহত করতে না পেরেই তো আদিম জীবনে অপদেবতা, ভূত প্রেত এ-সবের প্রতি ভয়, বিশ্বাস। এ গল্প যেন বিশ্বাস সংস্কারের সেই উৎসটাকেই চিনিয়ে দিতে চায়।’[২] গুম্ফার বেশভূষা বিচিত্র – তার শরীরে জরাজীর্ণ আলখাল্লা, কানে দুটি প্রকাণ্ড রূপার মাক্‌ড়ি (কুণ্ডল), এক হাতে ডুগডুগি এবং অন্য হাতে নর-করোটির ভিক্ষাপাত্র। লোকটির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে একটি প্রকাণ্ড কুকুর – ‘ঝাঁকড়া লোমওলা পাহাড়ি কুকুর নয় – নিচের থেকে সংগ্রহ করে আনা বাংলা কুকুর। শাদায় লালে মেশানো বাঘের মতো রং, বাঘের মতো তেজী আর ভয়ানক।’[৩] ভিক্ষাসংগ্রহে তার বিলম্ব হয় না; শঙ্কিত পাহাড়িদের দানে-দক্ষিণায় করোটি-পাত্র দ্রুত পূর্ণ হয়।

পাহাড়চূড়ার সন্নিকটে একটি গুহায় গুম্ফা লামার আবাস। পাহাড় বেয়ে যখন দার্জেলিঙের ট্রেন চলে, তখন সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয় – ‘মানুষ তার শত্রু।’[৪] পাহাড় থেকে রেলগাড়ি ভূপাতিত হোক, সহসা প্রবল আর্তনাদে এ জনপদ ভারী হয়ে উঠুক – এমনটি তার মনোবাঞ্ছা। গুম্ফার মানব-বিদ্বেষের কারণ – স্ত্রী মাইলি। তাকে সে অনেক ভালোবাসতো, তারপরও সে এক কুঁজো-বাঙালির শয্যাসঙ্গিনী হয়। এরূপ অনাচারকে গুম্ফা প্রশ্রয় দেয়নি। ধারালো ‘কুঁকড়ি’র আঘাতে সে লোকটিকে হত্যা করে, ত্রস্ত মাইলি সেদিন পালিয়ে বাঁচে। এরপর প্রায় ত্রিশ বছর সে এই গুহায় আত্মগোপন করে। স্ত্রী-বিবর্জিত জীবনে পোষা-কুকুর লাল্লু তার একমাত্র সহচর। ভিক্ষার চালে উভয়ের অন্নসংস্থান হয়। কুকুরটি মুনিবভক্ত, গুহার পাশে বিষধর অজগর দেখলে গর্জে ওঠে। কুকুরের ডাকে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয় ভয়ংকর সরীসৃপ।

একসময় পাহাড়ে আরম্ভ হয় সাংঘাতিক ঝড়-বৃষ্টি। প্রচণ্ড বজ্রপাতে পাথর ধসে পড়ার উপক্রম হয়। এরকম দুর্যোগ গুম্ফা ইতঃপূর্বে দেখেনি। অসহ্য শীত ও ক্ষুধায় সে অস্থির হয়ে ওঠে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় কুকুরটির

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘জান্তব’, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

[২] মনুয়া পাঁজা, ‘নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে লোকসংস্কৃতির উপাদান’, উত্তম পুরকাইত (সম্পাদিত), *উজাগর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘জান্তব’, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

বেহাল দশা, ছেঁড়া কম্বলের মধ্যে 'কুকুর আর মানুষ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে এক সঙ্গে। জন্তু আর জান্তব জীবন।'[১] তুষার ঝড়ে দার্জেলিংবাসী লেপের মধ্যে আরাম-নিদ্রা যায়। তাদের চুলায় জ্বলতে থাকে কাঠকয়লার আগুন, চা-কফির উত্তাপে তারা শীতকে বেশ উপভোগ করে। এদের মধ্যে হয়তো স্থান পেয়েছে মাইলি। দুর্যোগের দিনে পাহাড়িরাও পচাইয়ের নেশায় মাতাল থাকে। সকলের মধ্যে গুম্ফা লামাই কেবল ব্যতিক্রম।

সঞ্চিত কাঠ নিঃশেষ হলে গুম্ফার 'কুঁদো'র আগুন নিভে যায়। এসময় মুনিবের কম্বল দখলে মরিয়া হয়ে ওঠে লাল্লু। কুকুরটির স্বার্থপরতার সঙ্গে গুম্ফা তার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার সাযুজ্য পায়। সীমাহীন আক্রোশে সে পশুটিকে লাথি দেয়। ঝড়ের তাণ্ডবে গুহার ভেতর গড়িয়ে পড়ে বরফগলা পানি। এ পরিস্থিতিতে লাল্লু অবাধ্য হলে গুম্ফা পুনরায় আঘাত করে। অস্তিত্বরক্ষায় কুকুরটি প্রদর্শন করে আদিম হিংস্রতা। প্রতিদ্বন্দ্বীর সক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন-গুম্ফা অবিলম্বে একটি ভারী পাথর নিক্ষেপ করে। মাইলির ওপর যে প্রতিশোধ সে নিতে পারেনি, তা দ্বিগুণ আকার ধারণ করে। আহত লাল্লুকে সে ছুঁড়ে ফেলে পাহাড় থেকে দেড় হাজার ফুট নিচে।

এক ঘণ্টা পর ঝড় শান্ত হয়। প্রকৃতির এরূপ স্তব্ধতা গুম্ফা লামার কাছে প্রহসন মনে হয়। পশুসঙ্গীকে হারিয়ে সে একাকী হয়ে পড়ে। অনুতপ্ত গুম্ফা তাই লাল্লুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। পাথর আঁকড়ে, গাছের শিকড় ধরে সে ঘনজঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলে। আচমকা কুকুরের ডাক শুনে সে আনন্দিত হয়। গুম্ফার ধারণা, মুনিবের জন্য লাল্লু আর্তনাদ করছে। তার অনুসন্ধান ব্যর্থ হয় না; কিন্তু একটি নয়, সেখানে ছিল এক পাল কুকুর। এসব হিংস্র বন্যকুকুর গুম্ফা লামাকে মুহূর্তে গলাধঃকরণ করে। পরদিন একদল পাহাড়ি দেখতে পায় তার ছিন্ন বস্ত্র এবং একরাশ রক্তমাখা হাড়। 'জান্তব' গল্পে বড় হয়ে ওঠে পশুর প্রতি মানুষের মমত্ববোধ। তবে অবপ্রাণির প্রতি মানবসন্তানের এই আত্মত্যাগের ভিত্তি রচনা করে নির্মল পাহাড়ি পরিবেশ।

পাহাড়ি প্রেম ও প্রকৃতির স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে 'বন-জ্যোৎস্না'[২] গল্পে। এ গল্পের ঘটনাস্থল ডুয়ার্সের নিবিড় বনাঞ্চল। পাহাড়, ঝরনা আর চা-বাগানের সেখানে অপূর্ব সমারোহ। চা ও কাঠসংগ্রহের প্রয়োজনে ঘন-বনের মধ্যে বসেছে রেললাইন। এ পথে যেসব ট্রেন চলাচল করে সেগুলো আকারে খুব ছোটো। বন্যহাতির উপস্থিতিতে ট্রেনের ইঞ্জিন পশ্চাদ্‌গামী হয়, শালগাছ পড়লে রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। জঙ্গলবাসীদের জীবনচর্চার এসব নানাপ্রসঙ্গ গল্পে বিধৃত হয়েছে – 'নন্‌রেগুলেটেড্ এরিয়া – আইনের বন্ধন এখানে শিথিল। অরণ্য-রাজ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে আরণ্যক মানুষেরাই, সে-জন্যে তাদের সদরে আদালতে ছুটে যেতে

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

২ 'বন জ্যোৎস্না' *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫২) প্রথম প্রকাশিত হয়।

হয় না।'[১] এজন্য থানা-পুলিশের প্রভাব এখানে গৌণ, একজন সার্কেল অফিসার থাকলেও তার দৃশ্যমান কার্যক্রম নেই। বনের সঙ্গে বনবাসীদের বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। অরণ্যই তাদের সমস্ত চাহিদা পূরণ করে। এমনকি জীবনসংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার উপকরণ তারা লাভ করে বনস্পতির কাছে :

> শালবনের পথ। নিচের দিকটা দাবানলে জ্বলে গেছে এখানে ওখানে। শাল শিশুরা আগুনে পুড়ে গিয়ে কালো কালো কতকগুলো খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে। কিন্তু আগুনে পুড়েছে বলেই ওরা মরবে না। এ হচ্ছে ওদের জীবন-শক্তির প্রথম পরীক্ষা, ভাবীকালে বনস্পতি হওয়ার গৌরব লাভ করবার পরে প্রথম অগ্নি-অভিষেক। তিন-চার বছর দাবানল ওদের ডাল-পাতা পুড়িয়ে নির্জীব করে দেবে, কিন্তু তার পরেই অগ্নি-উপাসক ঋত্বিকের মতো নির্দাহন শক্তি লাভ করবে ওরা। দিনের পর দিন বড় হয়ে উঠবে – ঋজু হয়ে উঠবে – নিজেদের বিস্তীর্ণ করে দেবে, ডুয়ার্স থেকে টেরাই পর্যন্ত।[২]

চা-বাগান থেকে কিছুটা দূরে কুলবীরের পচাইয়ের দোকান। স্থানীয় শ্রমিকরা এখানে প্রাণরস আহরণ করে। কুলবীরের আয় যে প্রচুর তা নয়, কন্যা শিউকুমারীকে নিয়ে সে কোনোরকম দিনযাপন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল কুলবীর, শেলের আঘাতে বাম পা হারিয়ে সে পঙ্গুত্ব বরণ করে। যুদ্ধাবসানে ভুটান-সরকার রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ তাকে কিছু জমি দেয়। তবে এ-জমি নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে, সে পাহাড় ডিঙিয়ে চলে আসে ডুয়ার্সের জঙ্গলে। শিউকুমারীর বয়স তখন মাত্র সাত বছর।

এক জ্যোৎস্না রাতে শিউকুমারী পাহাড়ি নদীতে জল আনতে যায়। এদিন তাকে অত্যন্ত খুশি দেখায়। তার গান গাইতে ইচ্ছে করে। এমন মায়াবী রাতে অভিসারে আসবে তার পিতম। হঠাৎ তার ভাবনার তাল কেটে যায়। সে দেখতে পায়, নদীর ধারে এক বাঙালি যুবক অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে শিউকুমারী তাকে সুস্থ করে। যুবকটির নাম মহীতোষ; জ্ঞান ফিরে সে চোখের সম্মুখে পুলিশ কিংবা ছুটে আসা শত্রু নয়, দেখতে পায় এক তরুণীকে। তার স্মরণ হয় অরবিন্দের সঙ্গে সে পালিয়ে যাচ্ছিল। শালবনের মধ্যে সঙ্গীকে হারিয়ে সে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় অসাড় হয়ে পড়ে। দুর্বল-মহীতোষকে সেখান থেকে ঘরে নিয়ে আসে শিউকুমারী।

বনজ্যোৎস্নায় শিউকুমারকে অপরূপ মনে হলেও, দিবালোকে মহীতোষের মোহভঙ্গ হয়। তার খর্ব নাসিকা, ক্ষুদ্র চক্ষু ও অপরিচ্ছন্ন শরীর দেখে তার প্রতি মহীতোষ আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। মহীতোষের সমুদয় বৃত্তান্ত

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বন জ্যোৎস্না', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮

শুনে কুলবীর তাকে আশ্রয়দানে অস্বীকৃতি জানায়। মহীতোষের পক্ষ নিয়ে শিউকুমারী পিতার কাছে একান্ত আবদার করে :

> না বাবা, বাঙালীবাবুকে কটা দিন রাখতেই হবে। এখন এখান থেকে বেরোলেই অংরেজ ধরে নেবে ওকে। তুমি স্বাধীন ভুটিয়া, স্বাধীন বাঙালীকে আশ্রয় দিতে আপত্তি করছ কেন ?[১]

মেয়ের যুক্তি কুলবীরের পছন্দ হয়। সে স্বয়ং যুদ্ধ করেছে বোমাবিধ্বস্ত ট্রেঞ্চে, রাশি-রাশি বুলেট এবং বেয়নেটের ধারালো ফলার মধ্যে। মহীতোষকেও সে সৈনিকের মর্যাদা দেয়। কারণ – 'স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে যে সে-ই তো সৈনিক।'[২] আশ্রয়প্রাপ্তির পর খড়ি কুড়িয়ে এবং দু-একটি বনমুরগি শিকার করে মহীতোষের সময় কাটে। নাগরিক জীবনের সঙ্গে আরণ্যক জীবনের পার্থক্য সে অল্পদিনে উপলব্ধি করে। সে বিশ্বাস করে – অরবিন্দ তাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে। শিউকুমারী অতিথিকে দূরবাসী 'পিতম' ভেবে স্বপ্নচারী হলেও, মহীতোষের চোখে ভাসে শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ, আগস্ট আন্দোলন, বিক্ষুব্ধ বোম্বাই এবং উত্তাল কলকাতা। কখনো কখনো সে নিজেকে অপরাধী ভাবে, কারণ বিপ্লবের অঙ্গীকার ভুলে সে হয়ে যাচ্ছে ব্রতচ্যুত।

বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত কুলবীরের দোকানে পাহাড়ি কুলিদের আড্ডা বসে। ব্যস্ত সময়ে পিতাকে সহায়তা করে শিউকুমারী। মৃদু হাসির সঙ্গে সে ক্রেতাদের বিতরণ করে পচাইয়ের ভাঁড়। পাহাড়িকন্যার পরিবেশনায় মাতাল কুলিরা বেশি পয়সা দেয়। এসময় কুলবীরের একটি হাফপ্যান্ট পরিধান করে মহীতোষ ঘরের পেছনে অজ্ঞাতবাসে থাকে। শিউকুমারীর হাসিতে সে অকারণে যন্ত্রণাবোধ করে। ইতোমধ্যে বনজ্যোৎস্না শেষ হয়ে যায়, আসে আরণ্যক তমসা। এক সন্ধ্যায় দোকানে আত্মপ্রকাশ করে কাঠের ব্যবসায়ী বলদেও। যুদ্ধের বাজারে সে অগাধ অর্থের মালিক হয়েছে। কূটবুদ্ধি ও নির্মমতায় সে জঙ্গলে অদ্বিতীয়। বলদেওকে দেখে শিউকুমারী সন্ত্রস্ত হয়, কুলবীরও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। একদিন লোকটি প্রণয় নিবেদন করলে শিউকুমারী চপেটাঘাত করে। এ অপমান যে সে বিস্মৃত হয়নি, শিউকুমারী তা জানে। সকলে দোকানত্যাগ করলে বলদেও শিউকুমারীকে পুলিশের ভয় দেখায়। শুধু বাঙালিবাবু নয়, ফেরারি আসামি ঘরে রাখার অপরাধে সে কুলবীরকে ফাঁসাতে চায়। শিউকুমারীর উৎকণ্ঠার সুযোগে বলদেও উত্থাপন করে অশালীন প্রস্তাব :

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৭

[২] প্রাগুক্ত

> শোনো শিউ। এ খবর আমি ছাড়া কেউ জানে না। আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি, রেয়াৎ করতে পারি বাঙালীবাবুকেও। কিন্তু দয়া করে নয়। আজ রাতে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। যদি আসো, কোনো ঝামেলা হবে না। যদি না আসো, কাল সক্কলকে ফাটকে যেতে হবে।[১]

মধ্যরাতে মহীতোষকে নিয়ে শিউকুমারী পালাতে চায়। আকস্মিক উত্তেজনায় বিভ্রান্ত বিপ্লবী শিউকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। তবে সে জানে রিক্তহস্তে পালানো সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজন অন্তত দু-তিনশো টাকা। এদিকে কুলবীরের বাক্সে কুড়ি টাকার বেশি নেই। অর্থসংগ্রহের জন্য শিউ বলদেওর 'ফাঁদে' পা দেয়। সমগ্র জীবনের সুখের জন্য সে একটি রাতের চরম গ্লানি আর অপমানকে স্বীকার করে। অন্যদিকে টাকার জন্য 'লোভীর মতো' বসে থাকে মহীতোষ। অনাস্বাদিত নতুন জীবনের আহবানে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দেশের প্রতি সংকল্প ভুলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'অ্যাডভেঞ্চারের সমুদ্রে'।

গল্পে শিউকুমারীর অনুপস্থিতিতে অরবিন্দ সহযোদ্ধাকে জঙ্গলত্যাগের নির্দেশ দেয়। পঁচিশ মাইল দূরে তারা একটি নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে, সেখান থেকে পরিচালিত হবে পার্টির 'আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্ক'। প্রথমে ইতস্তত করলেও, অরবিন্দের হাতের রিভালবার মহীতোষকে উদ্যোগী করে। অপরদিকে ধর্ষণের মর্মান্তিক যন্ত্রণাভোগের মাধ্যমে শিউকুমারী যোগাড় করে তিনশো টাকা। অতঃপর আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদের সন্ধানে সে বনের মধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেড়ায়। গাঢ় অন্ধকারে সামান্য দূরের মানুষকে দেখাও দুঃসাধ্য। অবশেষে আলোর সন্ধান পাওয়া যায়, যা ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে। তবে এ বনজ্যোৎস্না নয়, দাবাগ্নি। ভালোবাসার জন্য শেষপর্যন্ত অগ্নিদগ্ধ হয় পাহাড়ি মেয়ে শিউকুমারী। অন্যদিকে মহীতোষ প্রাণরক্ষায় চূড়ান্ত অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়। আঞ্চলিক জীবনের সঙ্গে নাগরিকতার এরূপ আশ্চর্য সংযোগ কেবল নারায়ণী গল্পেই সম্ভব।

দুই

পাহাড়ি-সাঁওতালদের মতো নদী-তীরবর্তী মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা রূপায়ণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পপ্রতিভা প্রশংসনীয়। লেখক স্বয়ং নদীবিধৌত পূর্ববাংলার সন্তান। তাই নদী এবং তৎসন্নিহিত জনজমিনের অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পে আরোপিত নয়। 'আলেয়ার রাত' গল্পের কথক-চরিত্রের মাধ্যমে তিনি বলেন – 'সাঁতার আমি মন্দ জানি না – পূর্ববাংলার জলের দেশে আমার বাড়ি – হাঁসের মতো সে সংস্কার আমার রক্তে রক্তে।'[২] কৈশোর-

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২২

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আলেয়ার রাত', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

যৌবনে বরিশাল-ফরিদপুরের যে নদীপ্রবাহ তিনি দেখেছেন, কলকাতার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার মধ্যেও তা ভোলেননি। গল্প-উপন্যাসের বাইরেও নানা রচনায় তিনি এতদ্বিষয়ক স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। এরকম একটি বর্ণনাংশ :

> সেই পূর্ব বাংলার স্টিমার, তারপরে নৌকো। খালের জলে সারা রাত চল্‌তি প্রশ্ন : 'কোন্ গ্রামের নৌকো ?' লগির শব্দ, দাঁড়ের আওয়াজ। চল্‌তি নৌকোয় পুজোয় কেনা নতুন গ্রামোফোনে নতুন রেকর্ডের সুর। হাসি-হল্লা-তাস পেটানো। কারা আবার চলেছে পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে। 'ভরার নৌকো'য় চাল-কুমড়ো, আক আর পাঁটার সম্ভার। জলের কোলে নেমে-আসা বেতবন হিজল গাছের নিকষ কালো ছায়া। অচেনা কোন্ গ্রাম থেকে এই রাতেও ঢাকের আওয়াজ – পুজোর বাজনার মহলা দিচ্ছে ঢুলীরা। ভোরের আলো ফুটতে বাড়ির ঘাট। চণ্ডীমণ্ডপে রঙ পড়ছে প্রতিমার। 'ও আমার দেশের মাটি –'[১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তৃণ', 'ভাঙা বন্দর', 'কালাবদর', 'ঘূর্ণি' এবং 'ধানশ্রী' গল্পে নদীনির্ভর মানুষের ভাব-ভাবনা, অনুভব-উপলব্ধি শিল্পরূপ পেয়েছে। এসব গল্পে জমিদার-মহাজনদের কাছে জেলেদের নিগ্রহ-নির্যাতনের কারণে তারা দীর্ঘদিনের পেশা পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে। নদীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে অনেকে চাষাবাদ কিংবা কুলিগিরি করতে চেয়েছে, কেউ রাতের অন্ধকারে জড়িয়ে পড়েছে অপরাধকর্মে। এছাড়া তাঁর 'কালো জল', 'তীর্থযাত্রা', 'নতুন গান' ও 'একটি অমর রাত্রি' গল্পের ঘটনাস্থল পূর্ববাংলার নদীবক্ষ। তবে এসব গল্পে জেলে-মাঝিদের হতদশা নয়, প্রাধান্য পেয়েছে সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত। বাংলার ছোটো-বড় অসংখ্য নদনদী নারায়ণের গল্পে প্রাসঙ্গিকভাবে স্থান পেয়েছে, যার তালিকা নিম্নরূপ :

পদ্মা – 'ঘূর্ণি', 'মাধ্যাকর্ষণ'
গঙ্গা – 'গাছের সারি', 'দ্বৈত'
মেঘনা – 'কালাবদর', 'গন্ধরাজ', 'তীর্থযাত্রা', 'মাধ্যাকর্ষণ', 'একটি অমর রাত্রি'
আড়িয়াল খাঁ – 'কালো জল', 'প্রদীপ ও প্রজাপতি', 'তমস্বিনী'
কীর্তনখোলা – 'ধানশ্রী', 'নতুন গান', 'পুরনো'
ব্রহ্মপুত্র – 'কালাবদর', 'রেকর্ড'
সুনন্দা – 'বাইশে শ্রাবণ', 'ভাঙা বন্দর'
কাঞ্চন – 'ঘাসবন', 'সীমান্ত'
ময়ূরাক্ষী – 'গন্ধরাজ', 'হরিণের রঙ'

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'এবারের শরতে', *সুনন্দর জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

এগুলো ছাড়াও বেশ কয়েকটি গল্পের পরিপ্রেক্ষিতরূপে ব্যবহৃত হয়েছে ধলেশ্বরী (বাইশে শ্রাবণ), মহানন্দা (জন্মভূমিশ্চ), করতোয়া (বন্দুক), ঝুমঝুমিয়া (তিতির), ডিহাং (কবর), চন্দ্রভাগা (শিল্পী), টাঙ্গন (খড়ুগ), কাঁসাই (ট্যাক্সিওয়ালা), অজয় (উর্বশী) প্রভৃতি নদনদী।

'তৃণ' গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ধাওয়া-সম্প্রদায়ের দুঃখদৈন্য-প্রপীড়িত জীবনকথা চিত্রিত করেছেন। ধাওয়ারা মৎস্যজীবী হলেও জাতিতে মুসলমান। এদের আদি নিবাস ছিল রাজশাহীর চলনবিলে। সেখানকার জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা দিনাজপুর জেলায় বসতি স্থাপন করে। মুসলমান সমাজে বর্ণভেদ না থাকলেও ধাওয়ারা অস্পৃশ্য। এ কারণে নিজ ধর্মের লোকজন তাদের এড়িয়ে চলে। মসজিদে প্রবেশকালে তাদের দেখে ইমাম-সাহেব ঘৃণায় কুঞ্চিত হন। মৃত্যুর পর সাধারণ কবরস্থানে এদের দাফন হয় না, গ্রামের শেষপ্রান্তে বিলের ধারে তাদের অন্তিম আশ্রয় জোটে। অভাব-অনটন-দুর্গতি তাদের নিত্যসঙ্গী। লজ্জা নিবারণের জন্য ধাওয়া নারীদের কাপড় জোটে না। এদিকে বিলের মাছ অবিশ্বাস্য হারে হ্রাস পায়। যুদ্ধের বাজারে মাছের মূল্য কিছুটা বাড়লেও বিশেষ লাভ হয় না। কারণ বড় মাছগুলো চলে যায় জমিদারের সন্তুষ্টি রক্ষার্থে। শত শোষণ-নিপীড়নের পরেও ধাওয়ারা নির্বিরোধ ও শান্তিপ্রিয়। নিজেদের দুরবস্থার জন্য তারা সমাজপতিদের নয়, স্রষ্টাকে দায়ী করে।

ধাওয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যতিক্রম কেবল বসির। জমিদারের অন্যায়ে তার মন বিষিয়ে ওঠে। প্রাণান্ত পরিশ্রম করেও আকাঙ্ক্ষিত মজুরি সে অনেকক্ষেত্রে পায় না। জমিদারের সিপাই পীরু মিঞা 'নজরানা' হিসেবে দাবি করে তার সবচেয়ে বড় বোয়াল মাছ। লোকটির মাধ্যমে সে জানতে পারে, শহর থেকে এক মৌলানা এসেছেন জমিদারগৃহে। তারই তুষ্টিবিধানে পরিবেশিত হবে বিশালাকৃতির মাছটি। অব্যাহত বঞ্চনার কারণে নিরুপায় বসির জেলেবৃত্তি ছেড়ে রোহণপুর স্টেশনে কুলির কাজে যেতে চায়। উপার্জন কম হলেও সেখানে কেউ 'তোলা' বসাবে না।

বসিরের গৃহে মাঝেমধ্যে রাত কাটায় এক ঠিকাদার। স্থানীয় অধিবাসীরা তাকে পাইকার বলে সম্বোধন করে। ধান-পাটের মৌসুমে লোকটি গ্রামে দালালি করে। এছাড়া সাগরদিঘির মেলায় সে গণিকা-সরবরাহের কাজ করে। যুদ্ধের সমস্ত খবর গ্রামবাসী তার মাধ্যমে জানতে পারে। জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বসিরকে উত্তেজিত করে তোলে পাইকার :

ইবলিসের বাচ্চা সব। কথা নেই বার্তা নেই, অত বড় মাছটা তুলে নিয়ে গেল ! আর হালিম শাহু হরদম মদে ডুবে থেকে রাতারাতি পীর হয়ে উঠেছে আজকে। ওর বাড়িতে বসে মৌলানা সাহেব ওয়াজ করবেন – মরি মরি ![১]

এসময় লোকটিকে বসির যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে। চলতিপথে পাইকার যে গৃহে আশ্রয় নেয়, তাদের জন্য নিয়ে আসে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল-ডাল-তেল। বসিরের স্ত্রী রোসেনা যে দু-একটি শাড়ি পরিধান করে, তা শুধু পাইকারের অনুগ্রহে। রোসেনা বসিরের দ্বিতীয় স্ত্রী। জেলে-পত্নী হলেও রূপ-যৌবনের ঐশ্বর্যে সে সম্পূর্ণা। সাজসজ্জার প্রতি মেয়েটির প্রবল ঝোঁক, সে আধুনিক স্টাইলে চুল কাটাতে চায়। বন্দরের ডাক্তারের কলেজপড়ুয়া মেয়ের রঙিন শাড়ি তাকে স্বপ্নীল করে তোলে। এদের শরীর থেকে নির্গত পাউডারের গন্ধে সে মোহাচ্ছন্ন হয়।

অপরদিকে বসির অত্যন্ত কুৎসিত এবং হৃতযৌবন। তার সর্বাঙ্গে দারিদ্র্য এবং ম্যালেরিয়ার ছাপ। রোসেনা যে সংসারজীবনে অসুখী, এটি বসির জানে। এজন্য পাইকারের প্রতি তার অকারণ বিদ্বেষ ও সন্দেহ। বসিরের তুলনায় পাইকার সুদর্শন এবং সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী। রোসেনা প্রায় দাঁড়িয়ে থাকে পাইকারের ঘরের কাছে, দরজার পাশে আচমকা বেজে ওঠে তার কাঁচের চুড়ি। স্ত্রীর আচরণের প্রতিবাদ করলে জেলেকে শুনতে হয় বিষবাক্য – 'কোথায় যাব শুনি ! তোমার সাতমহলা বাড়ির কোন্ মহলে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকব !'[২] পাইকার জেলেকে লাহিড়ীবাবুর জমিদারিতে ঘর বাঁধতে বলে, সেখানে রয়েছে কৃষ্ণকালীর বিস্তৃত বিল। কিন্তু যুদ্ধবিধস্ত পরিস্থিতিতে লোকটির প্রস্তাবে বসির সায় দিতে পারে না। কারণ – 'ভুলিয়ে কোন্ আঘাটায় ভিড়িয়ে দেবে কে জানে! হয়তো নাম লিখিয়ে দেবে পল্‌টনের দলে। লোকে বলে পাইকারের অসাধ্য কাজ নেই।'[৩]

পাইকারের সঙ্গে বসির যায় মৌলানা সাহেবের মজলিসে। সমবেত জনতার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি মালাজপ করছেন, তার পাশে বসেছেন জমিদার হালিম শাহু। বসিরের পরিচয় জেনে মৌলানা ভর্ৎসনা করেন। বসির বুঝতে পারে, সমাজ ও ধর্ম – উভয়ক্ষেত্রে সে পরিত্যক্ত। দুঃসময়ে পাইকার তাকে আরো ক্ষেপিয়ে তোলে – 'এর চাইতে হিন্দুর গাঁও ভালো। তারা যাই করুক, ধর্মের ওপরে জুলুম করে না। মোছলমানের বাচ্চা

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তৃণ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

[৩] প্রাগুক্ত

হয়ে এই বে-ইজ্জত সহ্য করে পড়ে থাকবে তুমি ?'[1] 'মোছলমানের বাচ্চা' শব্দটিতে জেলে-রক্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ সে গ্রামত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিন বসিরের কাছে জমিদারের অশ্লীল-বার্তা আনে পীরু মিঞা – 'ভয় নেই, খুব সুখবর ! হুজুর মেহেরবানি করেছেন তোকে।... তোর বিবি তো খুব খাপসুরৎ। খেতে পরতে দিতে পারিস নে, ছেড়ে দে ওটাকে। হুজুরের নজর পড়েছে।'[2] এমন কটু মন্তব্যে বসির কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে লোকটির ওপর চড়াও হয়। সে জানে, হালিম শাহুর জমিদারিতে এটি দণ্ডনীয় অপরাধ। কারাবাসের ভয়ে সে পাইকারের সঙ্গে অনতিবিলম্বে অন্যত্র যাত্রা করে। বিলের মধ্যে মাছধরার 'ডারকিনা'য় হঠাৎ আটকে যায় তাদের ডিঙ্গি এবং শোনা যায় বড় মাছের 'ছপাছপ আওয়াজ'। পাইকারের কথায় বসির মাছটি তুলতে গেলে ঘটে বিপত্তি। পানির মধ্যে সে আর্তনাদ করে জানায় – মাছ নয়, সেটি গোখরা সাপ। বিষধর সাপের দংশন-জ্বালায় জর্জরিত বসির বাঁচার আকুতি জানালেও পাইকার সাড়া দেয় না, নৌকো নিয়ে সে ক্রমশ সামনে এগিয়ে যায়। রোসেনা স্বামীর জন্য কান্না করলে ধূর্ত-লোকটি এভাবে সমবেদনা জানায় – 'কেঁদে আর কী করবে বিবিজান, মানুষ তো আর চিরকাল বাঁচে না।'[3]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝি* উপন্যাসের (১৯৩৬) কুবের এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বসিরের বঞ্চনার ধরন প্রায় অভিন্ন। তবে কুবের-কপিলাকে হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপে নিয়ে গেলেও, এ গল্পে বসির লাহিড়ীবাবুর জমিদারিতে পৌঁছতে পারে না। দরিদ্র জেলেকে কৌশলে হত্যা করে পাইকার ছিনিয়ে নেয় যুদ্ধবাজারের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ – রোসেনাকে।

সুনন্দা নদী-তীরবর্তী একটি বন্দরের অতীত গৌরব প্রকাশিত হয়েছে 'ভাঙা বন্দর'[4] গল্পে। একসময় বন্দর-সংলগ্ন চীনাবাজারে প্রতিদিন লক্ষ-লক্ষ টাকার বাণিজ্য হতো, গভীর রাতেও সরব থাকতো এখানকার পতিতাপল্লি। সময়ের বিবর্তনে চীনাবাজার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, জৌলুশ হারায় গণিকাদের দেহব্যবসায়। হাস্যমুখর তিনশো রূপোজীবিনীর ঘরের সংখ্যা কমে মাত্র পঁচিশ-ত্রিশে চলে আসে। ভাঙা বন্দরের কালের সাক্ষী শ্রীধর মিত্তির। এ অঞ্চলে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় জমিদারের নায়েব। সার্বিক বিবেচনায় বন্দর এলাকায় তিনি সম্মানিত ব্যক্তি। হারাণের দোকানে হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসে তিনি

---

[1] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০

[2] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

[3] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

[4] 'ভাঙাবন্দর' *আনন্দবাজার* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৪৮) প্রথম প্রকাশিত হয়।

বন্দরের সমৃদ্ধির কথা ভেবে স্বপ্নাচ্ছন্ন থাকেন – চীনাবাজারে কোটি টাকার ব্যবসায় হবে, তেলের কল পুনরায় চালু হবে, ত্রিনাথের পুজোয় বসবে ঢপের আয়োজন।

এসময় দোকানে আসে মালতী নামের এক মেয়ে। রামকুমারের ছেলে জগন্নাথের সে বাঁধা রক্ষিতা। বারবনিতা হলেও মালতীর চেহারায় রয়েছে শ্রী-সৌন্দর্য। রামকুমার জীবদ্দশায় অপব্যয় না করলেও, তার ছেলে প্রতি সপ্তাহে শহরে যায়। তাস এবং বিলাতি মদে সে সেখানে কয়েকদিন মত্ত থাকে। শ্রীধর জানে – জগন্নাথের পতন অবশ্যম্ভাবী, এ পথে রিক্ত হয়েছে রাধানাথ সাহা এবং হরিমোহন সাহার পুত্ররা। ভাঙা বন্দর সচল হলে শ্রীধর পতিতালয় উচ্ছেদ করতে চান। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে অতিরিক্ত করধার্য করে তিনি এদের বিস্তাররোধের পরিকল্পনা আঁটেন। সাহাপট্টির ঘাটে স্নানকালে যুবকশ্রেণির কথাবার্তায় তিনি শুনতে পান মালতী-প্রসঙ্গ। এদের দেখে তাঁর মনে হয়– 'প্রদীপের চারপাশে যেন পুড়ে মরবার জন্যেই উড়ে বেড়াচ্ছে পতঙ্গের দল।'[১] দুঃসহ ক্ষোভ ও বিরক্তিতে তিনি ঘাটত্যাগ করেন।

কাছারির কাজে শ্রীধর তৃপ্তিবোধ করে না। খাজনা-সংগ্রহের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। শুধু সাধারণ প্রজা নয়, মহাজনরাও পাওনা পরিশোধে বিলম্ব করে। তাই কর-আদায়ে নতুন ম্যানেজারের আগমন তাঁকে শঙ্কিত করে। কাজের ফাঁকে ম্যানেজার মদনবাবু জায়গাটিকে নোংরা বললে, শ্রীধর বন্দরের হারানো ঐতিহ্যের বর্ণনা দেন। আনন্দ-উত্তেজনায় তাঁর কণ্ঠ প্রকম্পিত হলেও মদনবাবু হাসতে থাকেন। বাস্তবসত্য ব্যতীত তিনি কিছু বিশ্বাস করতে চান না। শ্রীধর এবার কল্পনাবিলাস নয়, তাকে বাঁধতে চান বন্দরের হাল-সৌন্দর্যে। দীর্ঘদিনের শুভবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি উচ্চারণ করেন তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা কুৎসিত ভাষ্য – 'যদি কিছু মনে না করেন স্যার। এখানে মালতী বলে একটা মেয়েমানুষ আছে। যেমন চেহারা, গানবাজনাতেও তেমনি।... যদি ইচ্ছে করেন, তাহলে –।'[২] অতীত ও বর্তমানের দ্বন্দ্বে শেষাবধি শ্রীধরের পরাজয় ঘটে। এসময় মদনবাবু তাঁকে যে উপদেশ দেয়, তা একজন শুদ্ধাচারী ব্যক্তির পক্ষে অসহনীয় লজ্জার :

> মাপ করবেন মিত্তির মশাই। ওতে আমার রুচি নেই। আপনার সম্পর্কে যা শুনেছিলুম তাতে তো আপনাকে অন্য রকমের বলেই জানতুম। যাক, বুড়ো হয়েছেন – এখন ওসব ছেড়ে দিন। পরকাল বলে আছে তো একটা, কী বলেন?[৩]

এ অপমানের পর শ্রীধর জানতে পারেন, ভাঙা-বন্দর জোড়া লাগবার কোনো সম্ভাবনা নেই। যুদ্ধের বাজারে তেল কোম্পানি ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়েছে, এখন চলছে 'লোহা লক্কড়' বিক্রয়ের আয়োজন। এসব এখন আর

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভাঙাবন্দর', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩১

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৪

তাকে অবাক করে না। আধুনিক মদনবাবুর সংস্পর্শে লোপ পেয়েছে তাঁর চারিত্রিক উত্তেজনা। যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে নৈতিক অধঃপতনের মিছিলে শ্রীধরের শেষরক্ষা হয়নি। সুনন্দার নদীবন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েছেন। তথাপি নদীসংলগ্ন জীবনপ্রবাহকে জাগিয়ে তুলতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

বিশাল ও ভয়ংকর নদী কালাবদরের এক মাঝির গল্প 'কালা বদর'[১]। মেঘের মতো কালো বলে এ নদীর অপর নাম মেঘনা। দিনে-রাতে প্রচণ্ড গর্জনে এখানে জোয়ার আসে। এ নদীতে প্রায় ঝড় ওঠে, নৌকা ডোবে এবং অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটে। কালাবদরের কেরায়া নৌকার মাঝি কফিলদ্দি যখন পেঁয়াজকলি দিয়ে ইলিশ রান্নার আয়োজন করে, তখন আচমকা সোয়ারি আসে : মধ্যবয়সি এক পুরুষের সঙ্গে তার ঘোমটা পরিহিতা স্ত্রী। উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদে মধ্যবিত্তের ছাপ। এ দম্পতির গন্তব্যস্থান জাউলার হাট। 'ক্যারায়া' (ভাড়া) হিসেবে ভদ্রলোক পাঁচ টাকা বললে, সারারাতের যাত্রায় মাঝি অনাগ্রহ দেখায়। যুদ্ধ শুরুর পর নদীপথের চিত্র পাল্টে যায়। চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় আনুপাতিক হারে নৌকার ভাড়া বৃদ্ধি পায়। পূর্বে মাঝিরা যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করতো, অথচ যুদ্ধ-মন্বন্তরের পর তারা পাঁচগুণ ভাড়া দাবি করে। শেষপর্যন্ত তাদের রফা হয় সাত টাকায়।

আলাইপুরা খাল থেকে জাউলার হাটের দূরত্ব প্রায় বারো মাইল। যাত্রা আরম্ভের পর বাতাসের গতি বৃদ্ধি পায়, শোনা যায় জলের হিংস্র গর্জন। অভিজ্ঞতাসূত্রে কফিলদ্দি বোঝে, এ যাত্রা তার জন্য সহজ হবে না। উন্মাদ কালাবদরের স্রোতে বড়ো জাহাজ কিংবা ছোটো নৌকার প্রায় একই দশা। নৌকার ভেতর স্বামী-স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়লেও, কার্তিকী তুফানের তাণ্ডবে তারা চৈতন্যপ্রাপ্ত হয়। মাঝির অভয়বাণীতেও তারা আশ্বস্ত হয় না, কালাবদরের ঢেউয়ের বীভৎসতা তাদের জানা – 'রাইক্কোসা (রাক্ষুসে) গাঙ – মানুষ খাউনের লইগ্যা জেব্বা (জিহ্বা) বাড়াইয়া রইছে।'[২] আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় মেয়েটি বিলাপ করে। এদিকে স্রোতের চেহারা ক্রমশ উত্তাল হয় এবং কফিলদ্দি প্রাণপণে বৈঠা টানে। কালাবদরের মাঝির সক্ষমতা নিয়ে যাত্রীদের সংশয় নেই – 'কালাবদরের মাঝি – ওর আর কী, কিছুতেই ডুববে না, একটা খড়ের আঁটির মতো অবলীলাক্রমে ভাসতে ভাসতে ডাঙায় গিয়ে পৌঁছবেই শেষ পর্যন্ত।'[৩]

---

[১] 'কালাবদর' *মেঘনা* পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় (১৩৫৪) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালাবদর', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪২

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৩

তবে কফিলদ্দির আত্মবিশ্বাস এতটা শক্তিশালী নয়। কালাবদরের সঙ্গে তার সুদীর্ঘকালের পরিচয়, একারণে সে নদীকে বিশ্বাস করে না। অজস্র মানুষকে সে মেঘনায় ডুবতে দেখেছে। জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে মাঝির হাতের পেশি শিথিল হয়ে আসে। প্রতিকূল জলপ্রবাহে পাল উড়িয়ে দেওয়া বিপজ্জনক। মুহূর্তে নৌকা চলে যেতে পারে সমুদ্র কিংবা মোহনায়। কালাবদর মার্জনা করলেও সমুদ্রের কোনো ক্ষমা নেই। মৃত্যুভয়ে নৌকার স্বামী-স্ত্রী মূর্ছিতের ন্যায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে এবং কালাবদরের সঙ্গে কফিলদ্দি একাকী লড়াই করে। শেষপর্যন্ত জয়ী হয় কালাবদর নয়, কফিলদ্দি। জাউলার হাটে যাত্রী নামিয়ে মাঝির স্মরণ হয় – মহাজনের পাওনা মেটাতে সে প্রথমবার ডাকাতি করতে চেয়েছিল। মানবরক্তের আস্বাদ নেওয়ার বাসনা জেগে উঠেছিল তার চেতনালোকে। কিন্তু তা সম্ভব না হওয়ায় সে বিমূঢ়ের মতো শাণিত রামদায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

‘কালাবদর’ গল্পে নদীনির্ভর মাঝিদের জীবনকথা বিবৃত হয়েছে। জীবিকার প্রয়োজনে এরা রাক্ষুসে নদীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামলিপ্ত। তারপরেও সংসার-নির্বাহ তাদের জন্য দুঃসাধ্য। কেবল নদী নয়, অভাবকালে তারা মহাজনদের ওপর নির্ভর করে। এ গল্পে ঋণের দায়ে অতিষ্ঠ কফিলদ্দি মাঝির দানবসত্তায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও, শেষাবধি তা ঘটেনি। কেননা কফিলদ্দির সঙ্গে কালাবদরের সম্পর্ক আত্মিক, এজন্য তার চারিত্রিক স্খলন নদী সহ্য করেনি। রাতে উন্মত্ত ঢেউয়ে কালাবদর বিস্ফারিত হলেও, সকালবেলা পরিদৃষ্ট হয় শান্তরূপ। এ যেন কফিলদ্দির মনের প্রতিচ্ছবি :

> নরম রোদে অপূর্ব প্রশান্ত হয়ে গেছে কালাবদর। কফিলদ্দির নৌকার গায়ে কুল্‌ কুল্‌ করে সস্নেহ আঘাত দিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ কালনাগিনী যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে, শুনতে পেয়েছে কোনো সাপ-খেলানো বাঁশির সুর।[১]

পদ্মাঞ্চলের মানুষের জীবনধর্ম উৎসারিত হয়েছে ‘ঘূর্ণি’[২] গল্পে। পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত বৃহৎ-পরিসরের গল্প এটি। ‘ঘূর্ণি’র ১-সংখ্যক পরিচ্ছেদে কালাচাঁদের সঙ্গে যমুনার বিয়ে হয়। লোকটির বাবরি চুল, প্রশস্ত বক্ষ নববধূকে মুগ্ধ করে। অসম্ভব শক্তিধর জোয়ান হলেও কালাচাঁদের চেহারা শান্ত প্রকৃতির। দুমাস অন্তর শ্বশুরালয়ে আসবার ব্যাপারে সে যমুনার পিতাকে প্রতিশ্রুতি দেয়। এরপর পদ্মার ভরা স্রোতে এগিয়ে চলে তার নৌকা। উত্তাল পদ্মায় মাঝিরা সারি গান গায়, ধানের নৌকা গঞ্জে ভেড়ে, জেলেদের জালে ঝিলমিল করে রূপালি ইলিশ। যমুনার পর্যবেক্ষণে পদ্মা ‘রাক্ষুসী’ হলেও, এ নদীর ঘোলা জল কালাচাঁদের নিকট মাতৃদুগ্ধ। তাই আনন্দচিত্তে সে গেয়ে ওঠে :

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] ‘ঘূর্ণি’ *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৪৭) প্রথম প্রকাশিত হয়।

পদ্মা মোদের মা জননী রে,

পদ্মা মোদের প্রাণ,

তার সোনার জলে মোদের ক্ষেতে

ভরে সোনার ধান রে –

ভরে সোনার ধান –[১]

স্বামীর মিষ্টি কণ্ঠের গান শুনে যমুনা অবাক হয়। অকস্মাৎ তাদের নৌকার সঙ্গে ভেসে চলে একটি বড় কুমির। কালাচাঁদ হাতের বৈঠা দিয়ে কুমিরের পিঠে আঘাত করে। মুহূর্তে অদৃশ্য হয় জলচর জন্তুটি। এসময় কুমিরের চেয়ে কালাচাঁদকে নিষ্ঠুর ও হিংস্র দেখায়। উল্লেখযোগ্য কিছু না ঘটলেও যমুনা বোঝে – 'কালাচাঁদকে সে যা ভেবেছিল, কালাচাঁদ ঠিক তা নয় !'[২]

২-সংখ্যক পরিচ্ছেদে দেখা যায়, কৃষকপুত্র হয়েও কালাচাঁদ চাষাবাদ করে না, সে ঘরামির কাজ করে। মাছ-ভাত রান্না করে যমুনা স্বামীর অপেক্ষায় থাকে। এক রাতে লোকটি মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরে এবং অল্পদিনে স্বরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। তার মূলপেশা হচ্ছে ডাকাতি, রাতের অন্ধকারে সে পদ্মাবক্ষে লুণ্ঠতরাজ করে। নির্মম সত্য জানতে পেরে যমুনার কয়েক রাত নির্ঘুম কাটে। স্বামীর ভয়ে সে পিতৃগৃহে পালানোর সাহস হারিয়ে ফেলে। সন্ধ্যায় একদল মানুষ তাদের বারান্দায় মৃদুস্বরে আলাপ করে। তারা একত্রে মদ্যপান এবং গাঁজা সেবন করে, তারপর পদ্মার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। অসম্ভব উৎকণ্ঠায় যমুনা সারারাত দুঃস্বপ্ন দেখে।

ভোরে কালাচাঁদ ছিনিয়ে আনে প্রচুর অর্থ এবং রক্তমাখা স্বর্ণালঙ্কার। ঘরের ভেতর গর্ত করে সে এগুলো লুকিয়ে রাখে। স্ত্রীকে শাসিয়ে সে রাতের ঘটনা গোপন রাখতে বলে। কালাচাঁদের শরীর থেকে তখন নির্গত হয় মানবরক্তের 'আঁশটে' গন্ধ। পাষণ্ড স্বামীর আলিঙ্গনে যমুনা অনুভব করে 'একটা বাঘ যেন মেরে ফেলবার আগে খেলা করছে শিকারটাকে নিয়ে।'[৩] আবেগঘন মুহূর্তে কালাচাঁদ তাকে একছড়া হার উপহার দেয়। কিন্তু স্বামীর পাপের গয়না সে গ্রহণ করে না, বরং নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে। কালাচাঁদকে যমুনা সুপথে আনতে চায়। কিন্তু জগৎ-জীবন সম্পর্কে উভয়ের চিন্তায় প্রতিফলিত হয় বিস্তর ব্যবধান। প্রাসঙ্গিক সংলাপ লক্ষণীয় :

– আচ্ছা, তোমার পরকালের ভয় নেই ?

– দুত্তোর পরকাল ! ও-সব বুঝি না !

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ঘূর্ণি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৩

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫

– খুন করো কেন ?

– সহজে করি না তো ? চিনে না ফেললে কিংবা বাধা না দিলে হাত ছোঁয়াই না কারুর গায়ে।

– মানুষ মারতে কষ্ট হয় না ?

– কইমাছ কুটতে কষ্ট হয় তোর ? হাঁস কাটতে ?

– এক হল ?

কালাচাঁদ হাসে : তফাৎ কিছু নেই। লাল রক্ত বেরোয় – ছটফট করে, তারপর সব ঠাণ্ডা।[১]

যমুনা স্বামীকে কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ করে। আসন্ন সন্তানের ভবিষ্যৎ-ভাবনায় কালাচাঁদও সুস্থ জীবনচর্চার স্বপ্ন দেখে। তবে পদ্মার রাত্রিকালীন আহবান সে অগ্রাহ্য করতে পারে না, এ তার 'রক্তের টান'।

৩-সংখ্যক পরিচ্ছেদে দেখা যায়, পুত্রসন্তানের জন্মের পর কালাচাঁদ বছরখানেক পদ্মার অপপ্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। সন্তানের জন্য সে জমি ক্রয় করতে চেয়েছে, হাটে-হাটে খুঁজে বেড়িয়েছে পছন্দসই বলদ। বৃদ্ধ শ্বশুরকে সে দেখিয়ে এনেছে নাতির মুখ। তার এই পরিবর্তনের জন্য সঙ্গী ডাকাতেরা যমুনাকে দায়ী করে। তাদের ধারণা – পদ্মা নদীর কাছ থেকে কালাচাঁদকে বিচ্ছিন্ন করেছে কেবল যমুনা। এজন্য কালাচাঁদকে তারা স্ত্রীত্যাগের পরামর্শ দেয়। এদের একজন যমুনা সম্পর্কে অশালীন ইঙ্গিত করলে কালাচাঁদ ক্ষিপ্ত হয়।

দুমাস পর কালাচাঁদের মধ্যে পুনরায় জেগে ওঠে হিংসাত্মক বাসনা। স্ত্রী-সন্তানের মোহ তুচ্ছ করে সে উপস্থিত হয় পদ্মাতীরে। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে গয়না নিয়ে বাড়ি ফিরছিল বৃদ্ধ চক্রবর্তী। পরিচিত কালাচাঁদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই লোকটি আশান্বিত হয়। রায়গঞ্জে চাটুজ্জে বাড়িতে ঘরামির কাজের সময় উভয়ের আলাপ হয়েছিল। এই পরিচয়সূত্র বৃদ্ধের মৃত্যুর কারণ হয়। অজস্র হত্যাকাণ্ড ঘটালেও ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে কালাচাঁদ বিচলিত বোধ করে। এরূপ মানসিক দুর্বলতার জন্য সে যমুনাকে দায়ী করে। বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইলেও সে-সুযোগ তার হয়ে ওঠে না। কলেরা-আক্রান্ত নিথর যমুনাকে সে পড়ে থাকতে দেখে বারান্দার ওপরে।

৪-সংখ্যক পরিচ্ছেদে একটি নতুন চরিত্র পাওয়া যায় – মথুরানাথ ঘোষাল। এ পরিচ্ছেদে পদ্মা পূর্বের তুলনায় উত্তাল এবং ক্ষিপ্ত। কাজের ব্যস্ততায় মথুরা তিন দিন বন্দরে আটকে ছিল। পরদিন ভাগীদাররা গোলায় ধান তুলবে। গৃহস্থের অনুপস্থিতিতে স্ত্রী-সন্তানকে তারা ঠকাতে পারে – এমন আশঙ্কায় সে গভীর রাতে যাত্রা করে। বৈরী আবহাওয়ায় যথাসময়ে পৌঁছানোর ব্যাপারে সংশয় দেখা দেয়। অকস্মাৎ তাদের দিকে ধেয়ে আসে

---

[১] প্রাগুক্ত

আরেকটি নৌকা। মাঝিরা ডাকাতের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে যাত্রীকে সতর্ক করে। মথুরা পুলিশের তৎপরতার অভাবকে দোষারোপ করলে, মাঝিরা জানায় প্রশাসনের সীমাবদ্ধতা :

> – জলপুলিস কী করে ?
>
> – ঘুরে তো বেড়ায়। কিন্তু এত বড় গাঙ। তারপর কে কোন্দিক দিয়ে, কোন্ খাল বেয়ে সুট করে সরে পড়ে, তার কি ঠিকঠিকানা আছে ! শয়তানের সঙ্গে কে পেরে উঠবে বাবু ?[১]

পদ্মা নদীর মাঝি ইয়াকুবের রক্ত এসময় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ডাকাতদের প্রতিহত করতে সে সংকল্পবদ্ধ হয়। পাশের নৌকায় তখন পরিদৃষ্ট হয় বারো-চৌদ্দটি কালো মূর্তি। ডাকাতির ব্যাকরণ অনুযায়ী তারা মাঝিদের সঙ্গে আলাপ জমায়, এরপর তামাক চায় এবং অতর্কিতভাবে নৌকার সঙ্গে ভিড়ে যায়। বল্লম, সড়কি, রামদায় সজ্জিত হয়ে তারা লুঠ করে বাক্স-বিছানা থেকে সিলভারের পানের কৌটা পর্যন্ত। সমস্ত চেষ্টা বিসর্জন দিয়ে মাঝিরা নিশ্চুপ বসে থাকে। সহসা নদীতে আরম্ভ হয় 'বড় পাকের টান'। পদ্মার এই ঘূর্ণির পরিণতি সম্পর্কে সকলে অবগত :

> বড় পাকের টান ! পদ্মার এই অঞ্চলে সে পাকের খ্যাতি কে না জানে ! চুম্বক যেমন অনিবার্য আকর্ষণে লোহাকে টেনে আনে, তেমনি এই বড় পাকের টানও বহু দূর থেকে নৌকা বা যা কিছু পায় – সকলের অজ্ঞাতে বুভুক্ষু জলচক্রের ভেতর সেগুলিকে গ্রাস করে নিয়ে আসে। সাপের চোখের মতো তার আকর্ষণ-প্রভাব।... এ নিয়তির টান – এর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।[২]

শিকার এবং শিকারি – দু দলই এসময় হাহাকার করে ওঠে। রামদা হাতে যে ব্যক্তি মথুরানাথের সর্বস্ব লুঠ করছিল, ঘূর্ণির আতঙ্কে সে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ডাকাতির উত্তেজনা কিংবা অসাবধানতাই হোক – নৌকা এসে পড়ে টানের ভেতর। অস্ত্র ফেলে দুপক্ষ দাঁড় টানতে থাকে এবং চূড়ান্ত মুহূর্তে সবাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ততক্ষণে নৌকা দুটি উল্কাগতিতে ছুটে চলে অনিবার্য মৃত্যুচক্রে।

৫-সংখ্যক পরিচ্ছেদের ঘটনাপুঞ্জ সংঘটিত হয় জলের মধ্যে। স্রোতের টানে প্রত্যেকে ছন্নছাড়া। হঠাৎ নারকেল গাছের একটি সাময়িক আশ্রয় পায় মথুরা। শরীর ক্রমশ দুর্বল হলেও শেষ-অবলম্বনটুকু সে জড়িয়ে থাকে। অকস্মাৎ জোরালো ঝাঁকুনিতে সে দেখে, আরেকজন গাছের অন্যপ্রান্ত আঁকড়ে ধরেছে। ক্ষণিকের জন্য শিহরিত হলেও মথুরা হেসে ওঠে। একে বলে 'বিধাতার ঠাট্টা'; যে লোকটি মাথায় রামদা ধরেছিল, সে-ই তার

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫

আপৎকালীন সঙ্গী। নারকেল গাছের শক্ত অংশ মথুরার দখলে, ডাকাতের দুর্দশায় তাই সে উপহাস করে। দীর্ঘদিন কারাবাসের অভিজ্ঞতা থাকলেও এই দুর্যোগে ডাকাতটি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এই বিপর্যস্ত ব্যক্তিই হলো কালাচাঁদ।

মথুরার গোত্রপরিচয় শুনে কালাচাঁদ অশান্ত হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ চক্রবর্তীকে হত্যার ফলে সে হারিয়েছে তার স্ত্রীকে। এবার মথুরানাথকে বিপদে ফেলে সে হারাতে চলেছে সর্বস্ব। ইতোমধ্যে মথুরার মানসিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়। বিপদে পরম শত্রুকে সে আহবান করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অংশে। কিন্তু কালাচাঁদ এ পর্বে স্বার্থপর ডাকাত নয়। সে নিতান্ত সাধারণ মানুষ, যাকে প্রথম দৃষ্টিতে ভালো লেগেছিল যমুনার। ছোট্ট জায়গায় ভাগ বসিয়ে সে ব্রাহ্মণের মৃত্যুর কারণ হতে চায় না। কিছুক্ষণ পূর্বে কালাচাঁদ যাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তার চরণে সে নিবেদন করে জীবনের শেষ সম্বল :

> আর পারছিনে ঠাকুরমশাই, আমার হয়ে এসেছে। আর ন'-দশ বছরের একটা ছেলে আছে সংসারে, সে পড়ে আছে রতনগঞ্জে তার এক পিসির বাড়িতে। তুমি সেই পিসিকে এই গেঁজেটা দিয়ো, খানকয়েক মোহর আছে এতে। এ নিয়ে যেন আমার ছেলের নামে জমি কিনে রাখে – বড় হলে যেন আমার ছেলে চাষী হয়ে নিজের রোজগারের ফসল খেতে পারে। তা ছাড়া আরো বোলো, উত্তরের পোঁতায় দু' ঘটি –[১]

টাকার ঝুলি সমর্পণশেষে কালাচাঁদ ঘূর্ণির রাক্ষসগর্ভে তলিয়ে যায়। ডাকাতের পিতৃসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল মথুরাও। এজন্য তাকে যখন অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়, তখনও থলিটি বজ্রমুষ্টিতে বন্দি। ৫-সংখ্যক পরিচ্ছেদ কীর্তিনাশা পদ্মার ক্রুদ্ধ গর্জনে ভারাক্রান্ত হলেও, গল্পকার পরিশেষে ইতিচেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। পিতার আশীর্বাদে কালাচাঁদ-পুত্র ডাকাত কিংবা জেলে নয়, হয়ে উঠবে মথুরানাথের মতো একজন; মা যমুনার অন্তরাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সক্ষম হবে সে :

> সকালের আলো জাগল। জেগে উঠল পদ্মা – যে মা। যে ক্ষিদের ফসল দেয়, পিপাসার জল দেয়, যে পদ্মায় রঙিলা নাও ভাসিয়ে ভিনদেশিয়া বন্ধু দেশে ফিরে আসে। যে পদ্মার জলে কালাচাঁদের ছেলে ডিঙি বেয়ে ধান বেচতে যাবে লক্ষ্মীপুরার বাজারে।[২]

কীর্তনখোলা নদীর দুই মাঝির জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির গল্প 'ধানশ্রী'[৩]। এ গল্পও পাঁচটি পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত। পদ্মার মতো কীর্তনখোলাও সর্বনাশা নদী। তবে বন্দরের স্টিমারের ওপর নদীর নিয়ন্ত্রণ নেই, প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫০

[২] প্রাগুক্ত

মধ্যেও নৌযানটি সুরক্ষিত থাকে। ১-সংখ্যক পরিচ্ছেদে স্টিমারের বিশালতায় সুধাকর নিজেকে তুচ্ছ মনে করে। সে একটি কেরায়া নৌকার মাঝি। জাহাজের খালাসি হয়ে তার যেতে ইচ্ছে করে দূর-দূরান্তে। পূজার মৌসুমশেষে যখন যাত্রীর ব্যস্ততা থাকে না, তখন সে ইলিশের দরদাম করে। প্রতিটি ইলিশের দাম বারো আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত। সুধাকর বোঝে, ইলিশ মাছ সকলের জন্য নয়। অগত্যা তার পোষা উদ্‌বিড়াল বোয়াল শিকার করলে সে উনুন ধরায়।

আহারান্তে মকবুলের সঙ্গে সুধাকরের কথাবার্তা হয়। নৌকার কাজ ছেড়ে মকবুল শহরে রিক্সা চালাতে চায়। সঙ্গতকারণে বন্ধুর কাছে সুধাকর উত্থাপন করে প্রতিবেশী জয়নালের ট্র্যাজেডি। গ্রামত্যাগ করে সে শহরে রিক্সা টানে। নদী-তীরবর্তী লোকেরা তাকে সর্বাপেক্ষা সুখী ভাবে। মালিকের জমা পরিশোধের পর সে বাড়িতে টাকা পাঠায়, ভালো পোশাক পরিধান করে এবং সন্ধ্যাবেলা ফুর্তি করে। কিন্তু হোটেলের খাবারে তার ক্ষুধা মিটলেও, শরীরের ঘাটতি পূরণ হয় না। বেরিবেরি রোগে তার হাত-পা ফুলে যায়। শহরে সাইকেল-রিক্সার প্রচলন হলে জয়নাল সেদিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু নতুন রিক্সার চাহিদা দেখে মালিকপক্ষ অগ্রিম অর্থ দাবি করে। অতিরিক্ত রোজগারের জন্য সে প্রাণপণ পরিশ্রম আরম্ভ করে, এবং অবশেষে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে।

জয়নালের মর্মান্তিক পরিণতির কথা শোনার পর কক্ষচ্যুত হয় মকবুলের নগরকেন্দ্রিক ভাবনা। মূলত নৌকার মালিক ইদ্‌রিশ মিঞার আচরণে সে পেশা পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়। লোকটি তার কাছে প্রতিটি পয়সার হিসেব চায়। মকবুলের বেতন মাত্র তিন টাকা, এক মাসের বিড়ির খরচ বাঁচিয়ে তাকে লুঙ্গি কিনতে হয়। গোলাম আলী সর্দারের মেয়ে রোকেয়ার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক। বিয়ের জন্য সে মালিকের কাছে একশো টাকা কর্জ চায়। এ নিয়ে তাকে চরম উপহাস করে ইদ্‌রিশ মিঞা – 'শোধ করবি কী করে ? বিবি বাঁধা দিয়ে নাকি ?'[২] এই অপমানজনক উক্তি শ্রবণ করেও পরম ধৈর্যে মকবুল নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২-সংখ্যক পরিচ্ছেদের কাহিনি ছয় বছর পূর্বের। বিজয়া দশমীতে গ্রামের নৌকা-বাইচে অংশগ্রহণ করে তরুণ সুধাকর। বড় রায়কর্তা বিজয়ীদের জন্য অর্থের পাশাপাশি ঘোষণা করেন রূপার মেডেল। একারণে খেলার উত্তেজনা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সুধাকরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে রায়মহল বাজারের একটি নৌকা। অকস্মাৎ দু পক্ষের সংঘর্ষ বাধে। সুধাকর বল্লম নিক্ষেপ করে এবং অপরদিক থেকে ছুটে আসা টোটার ফলা তার পায়ে বিদ্ধ হয়। অসহনীয় যন্ত্রণায় সে নদীতে পড়ে যায় এবং ভেসে থাকা কচুরিপানার মধ্যে আত্মগোপন করে।

[১] 'ধানশ্রী' *উল্টোরথ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬১) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ধানশ্রী', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৫

এদিকে রক্তের আকষর্ণে তার দিকে ধেয়ে আসে একটি রাঘববোয়াল। নৌকায় তখনও চলছে হানাহানি, এজন্য তার চিৎকার কেউ শুনতে পায় না। জ্ঞান ফিরলে সুধাকর নিজেকে দেখতে পায় রায়মহলের ছোটোকর্তার বজরায়। ভদ্রলোক নেশায় আচ্ছন্ন, তার পাশে রয়েছে এক সুন্দরী রমণী। কর্তামশাই গম্ভীরস্বরে তাকে ডাঙায় নামানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু আহত সুধাকরকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য মেয়েটি তাঁকে অনুরোধ করে।

'রূপকথার রঙমহলে' সেবা-শুশ্রূষার পর মেয়েটি সুধাকরকে তার পরিচয় ব্যক্ত করে। সে কপালী গোত্রের রাধা; ছোটোকর্তার গৃহিণী নয়, রক্ষিতা। এ তথ্যে জেলেপুত্রের সাময়িক ঘৃণা হলেও, পরক্ষণে মেয়েটির প্রেমে পড়ে যায় সে। এরপর তারা বহু সন্ধ্যায় গোপনে মিলিত হয়। নেশার ঘোরে ছোটোকর্তা তখন নিশ্চল পড়ে থাকেন। সুধাকর শোনে রাধার দুঃখের কাহিনি – এক মুঠো টাকার লোভে নিজ-কাকা তাকে তুলে দেয় জমিদারের বজরায়। এখানে পাটরাণী হয়ে অর্থ-গয়না পেলেও, লুণ্ঠিত হয় তার সম্ভ্রম; নারীসত্তা। মহলে প্রচুর মেয়ে আসে, দেহভোগের পর ছোটকর্তা তাদের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেন। অন্ধকারপুরী থেকে উদ্ধারের জন্য মেয়েটি সুধাকরের দু-হাত জড়িয়ে ধরে। নিজের গয়না আর সঞ্চিত অর্থে সে গড়তে চায় সুন্দর আগামী। ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে সে বলে :

> চলো শহরে যাই। তুমি বিড়ির দোকান করবে – আমি পান সেজে দেব। কোনো অভাব আমাদের থাকবে না। না – না, এ শহরে নয় – কলকাতায়। আমি দেখেছি কলকাতা। কত বড় – কত লোক ! সেখানে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না –[১]

আচমকা ছোটোকর্তার পায়ের শব্দে সুধাকর প্রাচীর পেরিয়ে প্রস্থান করে। রাধাও হারিয়ে যায় তার জীবন থেকে। রাধাবিরহের ছয় বছর পরও সুধাকরের অন্তর্দাহ কমে না। ধারালো অস্ত্রে সে রায়কর্তাকে দ্বিখণ্ডিত করতে চাইলেও তার মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়নি। ছোটোকর্তা বেপরোয়া এবং দুশ্চরিত্র স্বভাবের; নেশায় তিনি 'সাক্ষাৎ বৃহস্পতি'। রেসের মৌসুমে তিনি কলকাতায় থাকেন, কখনো রক্ষিতা সহযোগে ভ্রমণ করেন খোলা নৌকায়। তার লাম্পট্যের কারণে সন্ত্রস্ত থাকে গ্রামের বউ-ঝিরা। বিয়ে হলেও ছোটোকর্তার সংসার টেকেনি। বিবাহের কিছুদিন পর শ্বশুরপক্ষ তার স্ত্রীকে নিয়ে যায়। এরপর তার উচ্ছৃঙ্খলতা আরো বৃদ্ধি পায়।

৩-সংখ্যক পরিচ্ছেদে গল্পের কাহিনি অতীত থেকে বর্তমানমুখী হয়েছে। কীর্তনখোলার ভূ-অঞ্চলে এসেছে ঢপের দল। বারোয়ারি তলায় গানের সংবাদ শুনে সুধাকর চঞ্চল হয়ে ওঠে। মুসলমান মকবুল এ আয়োজনে উৎসাহিত হলেও, ভেতরে প্রবেশের সাহস পায় না। তার অবস্থাসূত্রে সুধাকর বলে – 'সব গরীবেরই এক অবস্থা

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৩

ভাই, হিন্দু মুসলমান বলে কোনো কথা নেই।'[১] সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার রূপটি যে ধর্মীয় বেষ্টনীতে আবদ্ধ নয়, তা কীর্তনখোলার মাঝিও জানে। গলায় সিল্কের চাদর জড়িয়ে দর্শকদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন আসরের উদ্যোক্তা রামধন সাহা। কিন্তু চতুর্দিকের কোলাহলে তাঁর কণ্ঠ শ্রুতিগোচর হয় না। মঞ্চে প্রধান নায়িকা প্রবেশ করলে সুধাকর বিস্মিত হয়। এ অন্য কেউ নয়, তার প্রিয়া রাধা। গানের একটি চরণও তার কানে আসে না, মানুষের ভিড় ঠেলে রাধার কাছে যাওয়া তার সাধ্যাতীত। সকলে গানের ভুবনে নিমগ্ন থাকলেও, সে একপর্যায়ে আসর ত্যাগ করে।

গভীর রাতে সুধাকর নৌকা থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে। চৌকিদারকে ফাঁকি দিয়ে সে পৌঁছে যায় বারোয়ারি তলায়। সারাদিনের ক্লান্তির পর কীর্তনদলের সদস্যরা ঘুমে বিভোর। ভোগঘরের দরজার পাশে সুধাকর প্রাক্তন প্রেমিকাকে খুঁজে পায়। লঘুভাবে স্পর্শ করতেই মেয়েটি তাকে বাবাজি ভেবে আঘাত করে। তারপর সুধাকরকে চিনতে পেরে সে দ্রুত প্রস্থানের অনুরোধ করে। আলোক-উজ্জ্বল পরিবেশে মেয়েটির জীবনের রূপান্তর ঘটেনি। ছোটোকর্তার মহলের মতো এখানে সে সর্দার-বৈরাগীর মুঠোয় বন্দি। দুঃসাহসী সুধাকার এ-অবস্থা থেকে রাধাকে মুক্ত করতে চায়। অবশেষে রাধা পরদিন সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিলে সে ফিরে যায়।

৪-সংখ্যক পরিচ্ছেদে দেখা যায়, সুধাকর সকাল থেকে বেশ অস্থিরচিত্ত। ঘাটে অন্য মাঝিরা কর্মচঞ্চল হলেও, সে নিশ্চুপ থাকে। এসময় স্টিমার দেখতে ঘাটে আসে দু-তিনজন বৈষ্ণব। দূর থেকে সুধাকর চিনতে পারে সর্দারকে। চেহারায় স্পষ্ট যে, লোকটি এককালে ডাকাতি করতো। সুধাকর তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে। বৈরাগীর দৃষ্টি ছোটোকর্তার মতো নেশাসক্ত নয়। রাধাকে মুক্ত করতে সে সম্মুখীন হবে ভয়ানক শক্তির পরীক্ষায়। এসময় ভবিষ্যৎ চিন্তায় তার অস্বস্তি লাগে। পিসির তত্ত্বাবধানে রাধাকে রেখে তাকে যাত্রীবহন করতে হবে। নৌকায় নব-দম্পতির মধুর আলাপে সে বিষিয়ে উঠবে। 'নদী-মা' হলেও নিশ্চিত জীবনের প্রশ্নে কীর্তনখোলার মাঝি হতে চায় মৃত্তিকানির্ভর :

> আজ যদি কয়েক কাঠা ধানী জমি থাকত ! থাকত একটুখানি ক্ষেতখামার ! রাধাকে নিয়ে কী নিশ্চিন্ত আনন্দে তাহলে সংসার বাঁধত সে ! সামনে ধানের ক্ষেত, ঘরে রাধার সোনা মুখ, জানালা দিয়ে সোনার মতো চাঁদের আলো –
>
> ধান ! ক্ষেত ! মাটি !

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৫

নদীর মতো দুলে ওঠে না – রাক্ষসী ক্ষুধায় থাকে না মুখ বাড়িয়ে। একটু অসতর্ক হও – সঙ্গে সঙ্গে আর কথা নেই ! অমনি ডাইনীর মতো হাজারটা হাত বাড়িয়ে একেবারে টেনে নেবে পেটের মধ্যে। মেঘের লক্ষণ দেখে যদি বুঝতে না পারো, তাহলে অথৈ গাঙের ক্রোধ থেকে আর তোমার আত্মরক্ষা করবার কোনো আশাই নেই।...

তার চেয়ে ভালো মাটি। ঢের ভালো। সে স্থির – সে ভর সয়। জীবনকে আঁকড়ে রাখে দুহাতে। তার ওপরে ফুল ফোটে – পাখি গান গায়, ফসল ফলে। তার ওপরেই মানুষ ঘর বাঁধে। মাটি – একটুখানিও সে যদি পেত !

তা হলে রাধাকে নিয়ে সোনার সংসার গড়ে তুলত সেখানে।[১]

এদিন যাত্রী নামিয়ে মকবুল জানায় – ইদ্‌রিশ মিঞার সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়েছে। লোকটির ঘরে তিনটি স্ত্রী থাকলেও, টাকার লোভে গোলাম আলী মেয়েকে সম্প্রদান করে। সুখী জীবনের হাতছানি উপেক্ষা করতে পারেনি রোকেয়াও। কারণ ইদ্‌রিশের রয়েছে অগাধ অর্থ, জমি এবং গরু-ছাগল-মুরগির কয়েকটি খামার। মকবুলের নারী-বিতৃষ্ণা প্রত্যক্ষ করেও, সুধাকর রাতের অভিযানে তার সহযোগিতা কামনা করে।

৫-সংখ্যক পরিচ্ছেদে রাধার গানে মুগ্ধ হয়ে রামধন সোনার মেডেল দিতে চান। আসর-সমাপ্তির পর অন্ধকার গাবতলায় সুধাকর প্রতীক্ষা করে। কিছুক্ষণের মধ্যে উপস্থিত হয় স্বর্ণালঙ্কার-পরিহিতা রাধা। সুধাকর পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলে মেয়েটি আপত্তি তোলে। ধৈর্যচ্যুত-সুধাকর গামছা দিয়ে প্রেমিকার মুখবন্ধ করে এবং তাকে সহায়তার জন্য মকবুল এগিয়ে আসে। নিঃসাড় রাধাকে কাঁধে তুলে সুধাকর নৌকায় ওঠায়। ভোরে 'খাঁচার নেশা' অপসৃত হলে মেয়েটি সহজে বশ্যতা স্বীকার করে। সুধাকর প্রেমিকাকে নিয়ে শহর নয়, যেতে চায় দক্ষিণ দিকে – যেখানে নতুন চর উঠেছে। বিনা পয়সায় পত্তনি নিয়ে তারা সেখানে ঘর বাঁধবে।

সহসা মকবুলের অনুপস্থিতিতে তারা উৎকণ্ঠিত হয়। সুধাকর ভাবে, ঘুমন্ত-অবস্থায় মকবুল নদীবক্ষে বিলীন হয়েছে। কিন্তু গল্পকার দেখিয়েছেন মকবুল জলে ডুবেনি, একটি চর অতিক্রমকালে সে স্বেচ্ছায় নৌকা থেকে নেমে পড়েছে। রোকেয়াকে মকবুল পায়নি, কিন্তু প্রত্যক্ষ করেছে রাধাহরণের কৌশল। রূপসী রাধাকে ছিনিয়ে নিতে সে-ও হয়তো অনুসরণ করবে একইপন্থা। এজন্য বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতে সে সুধাকরের সঙ্গত্যাগ করে। রাতের অর্জিত অভিজ্ঞতায় সে বরং চেষ্টা করবে – 'রোকেয়াকে সত্যিই ফিরে পাওয়া যায় কিনা।'[২]

কীর্তনখোলার মাঝিরা প্রয়োজনের সময় নদীর মতোই উত্তাল হয়। ক্ষুধা-দারিদ্র্য, অভাব-অনটন, হতাশা-বেদনা কাটিয়ে তারা বৃহত্তর-জীবন অন্বেষণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নদী তাদের 'জল দেয়, অন্ন দেয়। জ্যোৎস্নার রঙে

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮২

– ভোরের আলোয় রূপসী হয়ে মন ভোলায়।'[1] কিন্তু এটি তাদের জীবনের খণ্ডিত রূপ। কীর্তনখোলার ভয়ালবক্ষে ফি-বছর কতো মানুষের সলিল সমাধি ঘটে, ডাকাতের হামলায় খুন হয় কতো অসহায় মানুষ – এসব ঘটনার তারা অসহায় দর্শকও বটে। তদুপরি নদী নির্মমভাবে কেড়ে নিয়েছে তাদের সুখ-স্বপ্ন, প্রেম ও আনন্দ। একারণে নদীর ওপর আগ্রহ হারিয়ে তারা 'ধানী জমি'র মধ্যে জীবনের শ্রী-সৌন্দর্য সন্ধান করেছে।

সামাজিক-প্রতিবাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কেবল শোষণ-বঞ্চনার চিত্রাঙ্কন করেননি, প্রতিবাদ-প্রতিরোধেও সক্রিয় ছিলেন। তাঁর গল্পের অনেক চরিত্র সমাজে বিরাজমান অন্যায়-অসঙ্গতির বিরোধিতা করেছে। নারী-পুরুষ, কিশোর-বৃদ্ধ থেকে শুরু করে প্রতিবন্ধী শ্রেণিও গল্পে প্রতিবাদমুখর হয়েছে। দীর্ঘদিনের নীরবতা ভেঙে আপসপ্রিয় মধ্যবিত্তের একটি অংশ যে খোলস থেকে বেরিয়ে এসেছে, তা নারায়ণের গল্পে প্রদর্শিত হয়েছে। পাঠক-সত্তাকে জাগ্রত করবার অভিপ্রায় থেকে তিনি গল্পে নিয়ে এসেছেন কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টান্ত। 'নীলা', 'মমি', 'কালনেমি', 'উন্মেষ', 'ইদু মিঞার মোরগ', 'একটি অমর রাত্রি', 'উদ্বোধন', 'রেকর্ড', 'উত্তম পুরুষ' এবং 'আসানসোলের লোকটা' – নারায়ণের প্রতিবাদী চেতনার গল্প। 'একদিকে সমাজবাস্তবতার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত এবং তার জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ, অন্যদিকে শোষকপীড়কদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা এই গল্পগুলিকে একটা তীক্ষ্ণ বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।'[2]

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে 'নীলা'[3] গল্পে। বাংলাদেশের মাটির উর্বরতা দেখে সীতাগঞ্জে একটি চিনিকল স্থাপনের পরিকল্পনা করে ভাস্বর নটরাজন। এক মাড়োয়ারি বিনিয়োগকারী সানন্দে তার প্রস্তাব গ্রহণ করে। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানের ছাত্র ছিল ভাস্বর। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সম্পন্ন করে সে চাকরি নেয় হীরালালের ফার্মে। কয়েক বছরের মধ্যে সে মালিকের সুনজরে পড়ে। এরপর আকর্ষণীয় বেতন এবং জেনারেল ম্যানেজার পদ নিয়ে সে চলে আসে সীতাগঞ্জে। ভাস্বরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় বিশাল চিনিকল। সীতাগঞ্জ-মতিহারীর বিপুল পরিমাণ আখ থেকে উৎপাদিত হয় হাজার-হাজার মণ চিনি। বৈদ্যুতিক আলো, অফিসার্স কোয়ার্টার, কুলিদের শেড, লরি ও ট্রলির সমারোহে প্রাণস্পন্দন পায় উত্তর-বাংলার এ

---

[1] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮

[2] উদ্ধৃত : (ভূমিকা : ক্ষেত্র গুপ্ত), শিপ্রা দে, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প*, প্রাগুক্ত

[3] 'নীলা' *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৫০) প্রথম প্রকাশিত হয়।

জনপদ। বছরের ছয় মাস এখানে পূর্ণোদ্যমে কাজ চলে, তারপর শুরু হয় 'অফ সিজন'। এসময় মিল বন্ধ থাকলেও, ওয়াগন-ভর্তি চিনি চালান হয় কলকাতায়। স্থানীয়দের জীবনযাপনে সূচিত হয় লক্ষণীয় পরিবর্তন। মিলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে ক্রমশ বন্ধ হয় গুড়ের কল। ফলে কৃষকরা গুড় তৈরিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। দাদন দিয়ে মিল-কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ জমির আখ ক্রয় করে; নগদ উপার্জনের স্বার্থে চাষাবাদ ছেড়ে অনেকে কুলিপেশায় সম্পৃক্ত হয়। সুগারমিলকে কেন্দ্র করে তাদের জীবনযুদ্ধ হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত সহজ।

চাকুরিতে প্রতিষ্ঠালাভের পর ভাস্বর ব্যক্তিগত-সহকারীর জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়। জাতিতে মাদ্রাজি হলেও বাঙালি নারীর প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ ও কৌতূহল। ছাত্রজীবনে সংবাদপত্রে সে জেনেছে বাঙালি মেয়ের 'উজ্জ্বল কালো চোখে বাংলার শ্যামশ্রীর মেদুরতাই শুধু ছায়া ঘনিয়ে তোলে না, তাদের হাতের পিস্তল থেকে ঝাঁঝালো আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সে-সব খবর পড়তে পড়তে চমকে উঠতো বুকের রক্ত, ঝম ঝম করে উঠতো শরীরে।'[১] সঙ্গতকারণে বাঙালি মেয়ে কুন্তলা রায়ের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। সে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত।

কুন্তলার আগমনে ভাস্বরের কঠিন জীবনাচারে পরিবর্তন আসে। একসময় ফ্যাক্টরির প্রয়োজনে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতো ভাস্বর। নিজের প্রতি যত্ন নেওয়ার ফুরসত তার ছিল না। কিন্তু কুন্তলার সংস্পর্শে সে পোশাক-পরিচ্ছদ-প্রসাধন – সবকিছুতে সচেতন হয়। কর্মনিষ্ঠ মাদ্রাজি যুবক বাঙালি মেয়েকে নিয়ে ভ্রমণে যায়। নতুন মডেলের আমেরিকান পন্টিয়াক গাড়িতে তারা বেরিয়ে পড়ে গ্রামীণ-পথে। শুধু সেক্রেটারি হিসেবে নয়, কুন্তলাকে ভাস্বর পেতে চায় আরো নিবিড়ভাবে। একদিন বাংলার চিরন্তন পল্লিকে সে কটাক্ষ করে – 'ইজ দিস্ বেঙ্গল ?'; এ অবজ্ঞার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে কুন্তলা – 'নো, দিস্ ইজ স্টার্ভিং বেঙ্গল।'[২] বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে সে ভাস্বরকে অনুরোধ করে – 'এই দরিদ্র বাঙলা দেশকে যারা লুঠ করে নিচ্ছে তাদের হাত থেকে একে বাঁচাও তুমি।'[৩] মেয়েটির চোখে সেদিন ফেনিয়ে ওঠে বিপ্লবী নায়িকার অগ্নিদীপ্তি। ভাস্বর প্রতিশ্রুতি দিলেও বুঝতে পারে – এটি তার টাইপিস্ট সেক্রেটারির বক্তব্য নয়। জালালাবাদ পাহাড় যাদের অস্ত্রে প্রকম্পিত হয়েছিল, হয়তো তাদেরই একজন কুন্তলা।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নীলা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

[৩] প্রাগুক্ত

একদিন জেনারেল ম্যানেজারের অফিস-কক্ষে আসে কেমিস্ট কান্তি সান্যাল। ভাস্বরের একটি মন্তব্যের ভুল ধরিয়ে দেয়ায় কান্তির ওপর সে সাংঘাতিক ক্ষুব্ধ হয়। কান্তিকে অপছন্দের আরেকটি কারণ আছে – কুন্তলার সে পূর্ব-পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ। তারা দুজন একত্রে চা খায়, পড়ালেখা করে। কান্তি কোম্পানির অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ম্যানেজারকে অবহিত করে – 'গ্রাম থেকে যারা আখ নিয়ে আসে, গাড়ির ওজন বাদ দিয়ে তাদের টাকা দেওয়ার কথা। কিন্তু গাড়ির ওজন বাদ দিতে গিয়ে তাদের আখের অর্ধেক ওজন বাদ দেওয়া হচ্ছে। এ গরীবের ওপর অত্যাচার !'[১] কান্তির দাবি যুক্তিসঙ্গত হলেও, ভাস্বর তাকে অপমান করে। কান্তিও হার মানে না, জেনারেল ম্যানেজারকে সে ছুঁড়ে দেয় কঠিন চ্যালেঞ্জ – 'আমি আপনাকে ইন্‌সিস্ট করছি স্টেপ নেওয়ার জন্যে, নইলে রেজাল্ট খারাপ হবে।'[২] এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ভাস্বর তাকে বরখাস্ত করে।

পরদিন প্রমাণিত হয় কান্তি সান্যালের জনপ্রিয়তা। দু-একজন দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারী ব্যতীত সকলে ধর্মঘট আহ্বান করে। এ পরিস্থিতিতে মানসিক প্রশান্তির জন্য ভাস্বর কুন্তলার সান্নিধ্য কামনা করে। কুন্তলাও তাকে সঙ্গদানে সম্মত হয়। সন্ধ্যায় কুলিবস্তির সম্মুখে তাদের গাড়ি বাধাপ্রাপ্ত হয়। কারণ, রাস্তা আটকে সভা করছে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। ভাস্বরের অসহিষ্ণু হর্নে তারা সরে দাঁড়ায় না, বরং উত্তাল হয়ে ওঠে। তাদের একটিই স্লোগান – 'কান্তিবাবুকে আবার বহাল করতে হবে। চাষীদের যারা ঠকায়, তাদের শাস্তি দিতে হবে।'[৩] রাগান্বিত ম্যানেজারকে স্পর্শ করে কুন্তলা মধুরকণ্ঠে বলে – 'আজকের সন্ধ্যাটাকে নষ্ট করে দিতে চাও তুমি ?... ওদের বলে দাও, কান্তিবাবুকে আবার কাজে নেবে তুমি। ওদের ওপর সুবিচার করবে।'[৪] ব্যক্তিগত সহকারীর অনুরোধে ভাস্বর মেনে নেয় জনতার দাবি। সে উপলব্ধি করে, কুন্তলার চাহিদা এভাবে ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। কুন্তলাকে সে নিছক বাঙালি-নারী নয়, ওর 'নীলার মতো' চোখে সে প্রত্যক্ষ করে নটরাজের ত্রিনয়ন :

> তবে কুন্তলা কি ? – কিন্তু সংশয়টা স্পষ্ট রূপ নিতে গিয়েই আবার পরক্ষণে বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে গেল। কুন্তলার নীলার মতো চোখ দুটো তখনো মোহিনী মায়ায় জ্বলছে। এই চোখ, এমনি চোখ আর একবার কোথায় দেখেছিল ভাস্বর ? হাঁ – তার নিজের দেশেই, মাদুরা অঞ্চলের এক নটরাজের মন্দিরে। নটরাজের তৃতীয় নেত্রে এমনি একখণ্ড হীরা জ্বলছে, উজ্জ্বল, অপরূপ। কিন্তু সে হীরায় তীব্র বিষ সঞ্চারিত, স্পর্শ করলেই অপমৃত্যু।[৫]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

[৪] প্রাগুক্ত

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮

নিরস্ত্র একজন নারীও যে সামাজিক অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে তার দৃষ্টান্ত কুন্তলা রায়। স্বজাতি ও সহকর্মীদের জন্য সে অনবরত বিষপান করেছে। কান্তি সান্যালের ন্যায় দাপুটে ও শ্রমিকবান্ধব সহযোদ্ধাকে ফিরিয়ে আনতে সে কর্মক্ষেত্রে কৌশলী হয়েছে। সর্বোপরি আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে কুন্তলা প্রতিষ্ঠিত করেছে গরিব কৃষকদের ন্যায্য অধিকার।

সামন্তবাদের বিপরীতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজয় ঘোষিত হয়েছে 'মমি'[1] গল্পে। এ গল্পে রত্নেশ্বর উগ্র সামন্তধারার প্রতিনিধি। তার শরীরে বাসা বেঁধেছে নানা রোগব্যাধি। পাঁচ বছর ধরে সে মমির মতো নির্বাক, অক্ষম ও স্থবির। অথচ একসময় রত্নেশ্বরের জীবনযাপন ছিল উদ্দাম, ছিল মদ-মারামারি ও নারী-নির্ভর। বর্তমানে সে লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত। মদ্যপান নিষিদ্ধ হলেও এ চাহিদা সে পূরণ করে মরফিয়া ইনজেকশনের মাধ্যমে। অথচ তার পুত্র মনীন্দ্র সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পিতৃপুরুষের দীর্ঘদিনের পরম্পরাকে সমূলে উৎপাটন করতে সে বদ্ধপরিকর। গভীর রাতে তার কলমে রচিত হয় মানবজাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা :

> সমাজে ও রাষ্ট্রে পূণররূর্প বিপ্লব সৃষ্টির জন্য ধনতন্ত্রকে জোড়াতালি দিয়া সরাইবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। তাহাকে নির্মূল করিতে হইবে – ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। যে দস্যুতার ওপর ভিত্তি করিয়া পুঁজিবাদ –[2]

মনীন্দ্র তার শয়নকক্ষকে পার্টি-অফিস বানিয়েছে, প্রায়শ সেখানে কোলাহল চলে। সে মদ্যপান করে না, গভীর রাতে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে না কোনো অভিসারিকা। পুত্রের অতি-নিয়ন্ত্রিত জীবনসূচি রত্নেশ্বরকে বিচলিত করে। একদিন মহলে আসে জমিদারের বাঁধা রক্ষিতা জয়া। মনীন্দ্র সম্প্রতি ওর মাসিক ভাতা বন্ধ করেছে। এজন্য বিনয়ী ভঙ্গিতে জয়া জমিদারের কৃপা প্রার্থনা করে।

বৃদ্ধ নায়েব ত্রিভুবনও কর্মস্থল ত্যাগ করতে চায়। রত্নেশ্বরের বিশ্বস্ত সঙ্গী সে; বহু উন্মত্ত রজনী তারা একত্রে কাটিয়েছে। তিনটি হত্যাকাণ্ড, দুটি অগ্নিসংযোগ এবং পাঁচটি দাঙ্গার সে অন্যতম আসামী। মনীন্দ্র সমস্ত জমিদারি প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ায় ত্রিভুবন উপযোগিতা হারায়। কৃষক-সমিতির একতার কাছে সে অসহায়। গুরুত্বপূর্ণ পারিষদের অপমানে রত্নেশ্বর হুঙ্কার ছাড়ে, নায়েবকে সে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দেয়।

এদিকে কৃষকদের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মনীন্দ্র গ্রামে-গ্রামে সভা করে। অনেক রাতে সে বাড়ি ফেরে, 'কাস্তেটারে দিয়ো জোরে শান' – গানটি গেয়ে সে টেবিলে বসে। এসময় তার কলমে রচিত হয় আশা-আনন্দের শব্দাবলি।

---

[1] 'মমি' *অরণি* পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৫১) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[2] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মমি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৯

আচমকা মনীন্দ্রের পাশে দাঁড়ায় রত্নেশ্বর, মরফিয়ার প্রভাবে তার চোখ দুটি বিস্ফারিত। পুত্রকে সে মহলের বাইরে নিয়ে যায়। অন্ধকারে মনীন্দ্রের ভাবনালোকে রত্নেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় অত্যাচারী প্রাকপুরুষের দল – রামেশ্বর রায়, যদুনন্দন রায় এবং বিস্মৃতনামা অনেকে। কুলদেবতার মন্দিরে পৌঁছলে সে পিতার মনোবাঞ্ছা অনুধাবন করে। কার্তিকী অমাবস্যায় এখানে নরবলি দিতেন পূর্বপুরুষরা। কালীদেবীর সম্মুখে রত্নেশ্বর জান্তব শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পুত্রকে ইচ্ছাবিরুদ্ধ শপথবাক্য পাঠ করাতে সে মরিয়া হয় – 'তুমি রায়বংশের ছেলে। প্রতিজ্ঞা করো, এই বংশের মর্যাদা তুমি রাখবে। তোমার পূর্বপুরুষেরা যে-পথে চলেছেন, সে-পথ ছাড়া আর কোনো পথ তোমার নেই। প্রতিজ্ঞা করো, প্রতিজ্ঞা করো এই কুলদেবতার সামনে।'[১]

পিতার ক্রমাগত বলপ্রয়োগে মনীন্দ্র দিশেহারা হয়ে পড়ে। রত্নেশ্বরকে প্রতিহত করবার সামর্থ্য সে হারিয়ে ফেলে। ব্যক্তিগত আদর্শ ও বংশানুক্রমিক প্রথার দ্বন্দ্বে সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। হঠাৎ রত্নেশ্বর অঝোরে ক্রন্দন করলে মনীন্দ্র জীবনীশক্তি ফিরে পায়। অবিলম্বে তার মধ্যে জাগ্রত হয় কর্মীসত্তা, অনুসন্ধিৎসু হয় তার বৈজ্ঞানিক চেতনা। এতক্ষণ রত্নেশ্বর তার কাছে অস্বাভাবিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও, এবার রক্তমাংসের মানুষ মাত্র। বলিষ্ঠ মুষ্টিতে পিতার হাত ধরে সে সহানুভূতি প্রদর্শন করে – 'এই রাত্রে কী ছেলেমানুষি করছেন বাবা ! ঘরে চলুন। আমি রায়বংশের ছেলে তা আমি জানি, তার চাইতে বড় পরিচয় যে আমার আছে, সে-ও আমি জানি। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না – চলুন।'[২] বিশেষ বংশগৌরবে মনীন্দ্র নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চায় না, 'মানুষ' পরিচয়ই তার কাছে মূল্যবান হয়ে ওঠে।

'মমি' গল্পে রহস্যঘন পরিবেশে লেখক সামন্ততন্ত্র-সমাজতন্ত্রের ন্যায় জটিল বিষয়ের অবতারণা করেছেন। পুঁজিবাদ যে কার্যকর সামাজিক বিধান নয়, তা রত্নেশ্বরের জীর্ণ জীবনধারাই প্রমাণ করে। বিনষ্ট সমাজব্যবস্থার বিপরীতে সঞ্জীবনী সুধার মতো গল্পে প্রভাব বিস্তার করে মনীন্দ্রের কর্মচাঞ্চল্য। কৃষক-প্রজা, ধনী-দরিদ্র সকলকে নিয়ে সে গড়তে চায় সাম্যবাদী সমাজ। জমিদারগৃহের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে সে প্রজ্বলন করে সাম্যবাদের আলোকবর্তিকা।

'ইজ্জৎ'[৩] গল্পে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় বিভেদ-বিভক্তি ভুলে অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়েছে। তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে এক দাঙ্গাবাজের হীন কর্ম-পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়েছে। গ্রামে ফকিরের সমাধি এবং ডাকাতে-কালীর

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৫

[৩] 'ইজ্জৎ' *যুগান্তর* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫৪) প্রথম প্রকাশিত হয়।

পীঠস্থানকে কেন্দ্র করে প্রায় বিরোধ বাধে। স্থানীয় মৌলবির ওয়াজে সম্মোহিত হয়ে ধলা মন্তাই পূজা বন্ধের হুমকি দেয়। ঢাক-ঢোলের বাদ্যে ফকিরের সুখনিদ্রা ব্যাহত হয় বলে এ-প্রথাকে তারা 'ধর্মের অপমান' হিসেবে সাব্যস্ত করে। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ জগন্নাথ ঠাকুর মুসলমানদের বিরুদ্ধে নমঃশূদ্রদের উত্তেজিত করে। কারণ এদের রক্তে রয়েছে 'শম্বুকের নিষ্ঠা, একলব্যের দৃঢ়তা'। সমবেত কণ্ঠে তারা জয়ধ্বনি দেয় – 'কালী মাইকি জয়'। ইসলামের ইজ্জৎ রক্ষার্থে অপরপক্ষ পাল্টা জবাব পাঠায় – 'আল্লা-হু-আকবর'।

ধলা মন্তাইকে দাঙ্গায় উত্তেজিত করে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি হাবিব মিঞা – 'তোমরা কী করবে ? ভয় পেয়ে সব পিছিয়ে যাবে নাকি ছাগীর বাচ্ছার মতো ? ... সব ওই ব্যাটা ঠাকুরের জন্যে। ও-ই হচ্ছে ওদের মাথা।'[১] এমনকি দাঙ্গা-পরবর্তী মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে সে তাকে আশ্বস্ত করে। এ সংঘর্ষের ফলে হাবিব নির্বিঘ্নে কার্যোদ্ধার করবে। জগন্নাথের সঙ্গে জমির বিরোধ নিয়ে তার মামলা-মোকদ্দমার প্রয়োজন হবে না। এদিকে আসন্ন দাঙ্গার জন্য দুদল প্রস্তুত হলেও পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে তাদের অন্দরমহলের চিত্র ভিন্নতর; সেখানে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা প্রকট :

> মন্তাইয়ের বৌ শাসায় : একদিন সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবে।
>
> ঘরের ভেতরে বিনিয়ে বিনিয়ে শোনা যায় জগন্নাথের বৌয়ের কান্না : এবারে তার গলায় দড়ি না দিয়ে আর উপায় নেই।[২]

লজ্জা নিবারণের এসব কাপড় ছিল হাবিব মিঞার মজুত-ভাণ্ডারে। গল্পে হাবিবের স্ত্রী লালবিবি কলেরায় মৃত্যুবরণ করে এবং গ্রামের মুসলমান জনগোষ্ঠী এজন্য শোক পালন করে – 'গত মন্বন্তরেও বুঝি দেশের এতবড় সর্বনাশ হয়নি।'[৩] রাতেই কাফন চুরির সংবাদ আসে। একটি দোনলা বন্দুক নিয়ে হাবিব সদলে উপস্থিত হয়। টর্চের আলোয় সেখানে দেখা যায় দুজনের মুখচ্ছবি – একজন ধলা মন্তাই, অন্যজন জগন্নাথ ঠাকুর। হাবিব গর্জন করলেও গ্রামবাসী স্তম্ভিত হয়। সকলের বিস্মিত ও বিমূঢ় মনে প্রশ্ন জাগে – 'ফকির আর কালীর ভেতরে এত সহজে মিটমাট হয়ে গেল কেমন করে ?'[৪] সাম্প্রদায়িক সংঘাতে একটি মহল স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে এবং আবেগি জনতা এ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে 'ইজ্জৎ' গল্পে নিপীড়িত শ্রেণি

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ইজ্জৎ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৮

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৯

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০০

শোষণের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছে। সমাজপতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর না হলেও, এদের একতা ও অনুশোচনায় হাবিব মিঞা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

'কালনেমি'[১] গল্পে মুক্তিকামী জনতার প্রতিরোধে এক ইংরেজ ব্যবসায়ীর অপপ্রয়াস ভূলুণ্ঠিত হয়েছে; একইসঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতীয়দের জাতিগত বিদ্বেষের ভয়াবহতার চিত্রও পরিবেশিত হয়েছে। পুরাণ অনুসারে, কালনেমি হচ্ছে রাবণের মামা। মূর্ছিত-লক্ষ্মণের পুনর্জীবনপ্রাপ্তির জন্য হনুমান বের হয় বিশল্যকরণী-সংগ্রহে। এসময় রাবণ তাকে হত্যার জন্য কালনেমিকে প্রেরণ করে। এ কাজের পুরস্কারস্বরূপ সে মামাকে লঙ্কার অর্ধেকাংশ প্রদানের অঙ্গীকার করে। এদিকে এক অপ্সরা অভিশপ্ত-জীবন থেকে মুক্ত হয়ে হনুমানকে রাক্ষসদের প্রবঞ্চনা সম্পর্কে সচেতন করে। গন্ধমাদন পর্বতে এসে কালনেমি হনুমানকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু হনুমান তাকে চিনতে পেরে সজোরে নিক্ষেপ করে এবং কালনেমির দেহ গিয়ে পড়ে রাবণের সিংহাসনের ওপরে। রামায়ণের এ কাহিনি স্মরণে রেখে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নির্মাণ করেছেন 'কালনেমি' গল্পের প্লট।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। এদিন নিজের বিশাল চা-বাগানের দিকে তাকিয়ে অ্যাঞ্জেল্ বিষণ্নবোধ করে। নগদ মূল্যে ভারতীয়-চা ক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করে লিভারপুল, ডোভার, বোস্টন এবং সানফ্রান্সিসকোর ব্যবসায়ীরা। অস্তিত্বরক্ষায় অ্যাঞ্জেল এই ক্রান্তিকালে অনেকটা কৌশলী হয়ে ওঠে। কপট অনুরাগে সে উচ্চারণ করে – 'বন্ডে মাটরম'। বাঙালিদের তুলনায় সে-ই এসময় বেশি উল্লসিত থাকে। স্বাধীনতার উপহার হিসেবে অ্যাঞ্জেল্ শ্রমিকদের এক দিনের ছুটি ঘোষণা করে। ভারতপ্রেমে সে একটি খদ্দরের স্যুট বানানোর পরিকল্পনা করে। অ্যাঞ্জেলের উদ্যোগে চা-বাগানের সামনে নির্মিত হয় দেবদারু পাতার তোরণ এবং সেখানে ওড়ে স্বাধীন ভারতের পতাকা। এছাড়া মূলফটকে বৈদ্যুতিক অক্ষরে শোভা পায় – 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া'। বিড়ালতপস্বী সাহেবের আচরণে বিরক্ত হয়ে রামময়বাবু বলে – 'ভক্তি না করে যাবে কোথায় ? হুঁ হুঁ বাবা, স্বাধীন দেশ। ইচ্ছে করলে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিতে পারি।'[২]

নেহেরু সরকার দায়িত্বগ্রহণের পর চা-বাগানের শ্রমিকরা সরব হয়। একসময় এই চা-বাগানে দেশের পতাকা উত্তোলনের অপরাধে চা-শ্রমিক পরিতোষ চাকরি হারিয়েছে। জুতার তলায় সাহেব দলিত করেছিল ভারতের জাতীয় পাতাকা। অপমান সহ্য করেও সেদিন নীরব থাকেছে বাঙালি কর্মচারীরা। শ্রমিকদের কখনো একত্র হতে দেয়নি অ্যাঞ্জেল। অতীতে ধর্মঘটের সম্ভাবনা দেখা দিলে সে নিজেই বন্দুক হাতে বাগান পাহারা দিয়েছে।

---

[১] 'কালনেমি' *পরিচয়* পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় (১৩৫৪) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালনেমি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯৪

পার্শ্ববর্তী চা-বাগানের স্বত্বাধিকারী জনস্টনের সঙ্গে আলাপসূত্রে অ্যাঞ্জেল নয়াকৌশল অবলম্বন করে। ত্রিশ বছর বাগান পরিচালনা করছে জনস্টন। শ্রমিক নিয়ন্ত্রণে সে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও চতুর। বর্তমান রাজনৈতিক দুরবস্থায় সে মোটেও উদ্বিগ্ন নয়। দীর্ঘদিন বসবাসসূত্রে সে ভারতীয়দের চরিত্রে যে দুর্বলতার সন্ধান পেয়েছে, তা তাকে আশাদীপ্ত করে। বন্ধুকে আশ্বস্ত করে সে বলে – 'এখন স্রেফ গিভ অ্যান্ড টেক্, বখরা কিছু বেশি দিলেই দিব্যি চলে যাবে, কিছু ভেবো না।'[১]

এক সন্ধ্যায় অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে দেখা করে ধনরাজ গুরুং। পূর্বের মতো সাহেবের সম্মুখে সে বিনয়াবনত হয় না। অধীন কর্মচারীর ঔদ্ধত্যে অ্যাঞ্জেল অতি কষ্টে সংযত থকে। দুঃসময়ে সে বিসর্জন দিয়েছে শাসকের মেজাজ। ধনরাজ গম্ভীরস্বরে তাদের আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সাহেবকে অবহিত করে – 'গুর্খা ল্যান্ড ফর গুর্খা পিপ্‌ল। ধুতি-পরা ভাটিয়াদের মুরুব্বিয়ানা আমরা সহ্য করব না, আমরা থাকব না তাদের তাঁবেদার হয়ে। অটোনমি চাই আমাদের – আমাদের হোমল্যান্ড চাই।'[২] এ এজেন্ডা বাস্তবায়িত হলে অ্যাঞ্জেল্ লাভবান হবে। এজন্য ধনরাজের দাবিকে সে 'গণতান্ত্রিক' আখ্যা দেয়। এমনকি গুর্খা জাতির আন্দোলনে সে পৃষ্ঠপোষকতা করতে চায়।

চা-বাগানের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে উদ্বিগ্ন হন ডাক্তার তারাপদ। তিনি বাগানের একটি অবান্তর অলঙ্কার মাত্র। শ্রমিকদের চিকিসার জন্য নিযুক্ত হলেও, তাঁর ডিসপেনসারি ঔষধশূন্য। তিনি অনুধাবন করেন – পাহাড়ি কুলিদের সঙ্গে বাঙালি কর্মচারীদের বিরোধ-সৃষ্টিতে সাহেব তৎপর। তাছাড়া কংগ্রেস সম্পর্কে সে নানা অপপ্রচারে লিপ্ত। সাহেবের প্ররোচনায় বাগানে জোরদার হয়েছে 'ভাটিয়া খেদাও' আন্দোলন। চা-গাছের শান্ত পরিবেশ হয়ে উঠেছে শ্লোগানমুখর – 'কংগ্রেস – মুর্দাবাদ ! ভাটিয়া – ভাগ যাও !'[৩] শুধু এ বাগান নয়, ভাটিয়াদের ওপর আক্রমণ চলছে দার্জেলিঙে। খাসিয়া পাহাড় থেকে অবৈধ ট্রান্সমিটারে ছড়ানো হচ্ছে সমতল-বিদ্বেষের উস্কানি।

বিবেকচালিত ডাক্তার সাহেবের শরণাপন্ন হন। আসন্ন দাঙ্গা নিরসনে তিনি মালিকের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তবে এ আবেদনে অ্যাঞ্জেল সাড়া দেয় না। শোষণের রাজত্ব সুদৃঢ় করতে সে হিংস্রতা অবলম্বন করে। তারাপদ জানেন, চা-বাগানে সকলের সহ-অবস্থান নিশ্চিত করতে পারতো কেবল পরিতোষ। কিন্তু এ বীরপুরুষকে

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯৭

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯৮

কর্মচ্যুত করতে ইন্ধন জুগিয়েছে রামময়, অজিত এবং হরকিঙ্করের মতো কিছু বাঙালি কর্মচারী। পরিতোষ বিদেশি মূলধনের বিভীষিকা সম্বন্ধে সকলকে সতর্ক করেছে। প্রত্যুত্তরে টেবিল চাপড়ে অজিত বলেছে – 'লাল ঝান্ডাফান্ডা এখানে চলবে না। শুধু কুলি ক্ষ্যাপানোর ফন্দি।'[১]

আড়াইশো বিক্ষুব্ধ কুলি উপস্থিত হয় তারাপদের ডিসপেনসারির সামনে। তাদের নেতৃত্বে রয়েছে স্বয়ং ধনরাজ গুরুং। আন্দোলনকারীরা প্রচুর মাত্রায় মদ খেয়েছে। উত্তপ্ত জনতাকে শান্ত করতে বেরিয়ে আসেন ডাক্তার তারাপদ। কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় বিশেষ ফল হয় না, উপরন্তু কুলিদের আক্রোশে তিনি রক্তাক্ত হন। প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়াই সুবিশাল শিকারপ্রাপ্তিতে অ্যাঞ্জেল অত্যন্ত খুশি হয়। কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার পাশাপাশি জঙ্গলের শিকারও তার জুটেছে বেশ; দু জোড়া বনমুরগি পেয়েছে সে। প্রসন্নচিত্তে বাংলোয় পা রাখতেই অ্যাঞ্জেল্ থমকে দাঁড়ায়। যেসব নোংরা কুলিদের সে দাঙ্গায় লেলিয়ে দিয়েছে, এরাই তার ঘর দখল করেছে। নিষ্ঠুর হাসিতে ধনরাজ তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে – 'কাম ইন স্যার, গুড মর্নিং। ডোন্‌ট মাইন্ড্ স্যার – ইউ ব্রিটিশ পিপল আর ফাইটিং ফর ডিমোক্র্যাসি –।'[২] বাঙালি ব্যারাকে অগ্নিসংযোগের ষড়যন্ত্র করলেও, ঘরছাড়া হয় অ্যাঞ্জেলই। তার হাতের বন্দুক 'ন্যাস্টি ব্রুটগুলোর' তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ মনে হয়। সে রাজ্য আর রাজত্ব দুই-ই হারায়। কালনেমির মতো তার রাজ্যলোভের প্রয়াস শেষপর্যন্ত বুমেরাং হয়ে যায়।

'উন্মেষ'[৩] গল্পে পিতার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছে স্বয়ং তার মেয়ে। বিশালদেহী দুর্ধর্ষ শিকারি নৃপেন রায়ের ব্যাপারে প্রতিবেশীদের কৌতূহল সীমাহীন। পিতার সঞ্চিত-সম্পদ কয়েক বছরে নিঃশেষ করেছে নৃপেন। বর্তমানে চা-বাগানের একটি পৈতৃক শেয়ারই হয়ে উঠেছে তার জীবনযাত্রার অবলম্বন। এর পরিমাণও কম নয়; যার অধিকাংশ সে অপচয় করে শিকার নির্বাহে এবং বিলাতি মদে। বারো বছরের মেয়ে গৌরীকে নিয়ে নৃপেনের সংসার। মেয়েকে সে শিকার-সঙ্গী করে। এ ধরনের কর্মপ্রক্রিয়ার বিস্তর সমালোচনা থাকলেও তাতে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। তার বাড়ির সম্মুখে রয়েছে একটি বাগান – যেখানে শোভা পাচ্ছে গন্ধরাজ, ম্যাগনেলিয়া ও শিউলি ফুলের গাছ। এছাড়া সেখানে রয়েছে হরেক প্রজাতির ক্যাকটাস। উদ্যানের পাশে বিস্তৃত হয়েছে কেয়াঝোপ, বর্ষাকালে কেয়াফুলের উগ্র-গন্ধে গোখরা সাপের উপদ্রবের সম্ভাবনা থাকলেও নৃপেন একেবারেই উদ্বেগহীন।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০১-১০০২

[৩] 'উন্মেষ' *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫৭) প্রথম প্রকাশিত হয়।

মেয়ের দুবছর বয়সে নৃপেনের স্ত্রী আত্মহত্যা করে। এরপর সে দ্বিতীয় বিয়ে করেনি। নারীজাতির প্রতি সে লালন করে দুঃসহ ঘৃণা। মায়ের মৃত্যুতে গৌরী অসাড় ও নিরুদ্যম হয়ে পড়ে। প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ডাক্তার নৃপেনকে জানান – 'আপনার পাপেরই ও প্রায়শ্চিত্ত করছে, এর কোনো ওষুধ নেই।'[১] চেয়ার থেকে উঠে নৃপেন মারমুখী হলেও, ডাক্তার অত্যন্ত শান্ত ও দৃঢ় উচ্চারণে তাকে বলেন – 'আপনার আর আপনার মেয়ের ব্লাড দিয়ে যান। কাল কান্ টেস্টের রিপোর্ট পাঠিয়ে দেব – তা থেকেই আশা করি সব বুঝতে পারবেন।'[২]

এরপর নৃপেন মেয়ের চিকিৎসা করেনি। পাপবোধে সে কিছুদিন আচ্ছন্ন থাকলেও তা স্থায়ী হয়নি। গৌরীর মানসিক সুস্থতার জন্য নৃপেন গ্রহণ করে অভিনব কৌশল। মেয়েকে সে 'নিষ্ঠুর হিংসার খোঁচা' দিয়ে জাগ্রত করতে চায়। শিকারকালে সে মেয়েকে ছেড়ে দেয় রয়েল বেঙ্গল টাইগার কিংবা বন্য হাতির সম্মুখে। এভাবে গৌরীকে সে আদিম প্রবৃত্তির সঙ্গে পরিচিত করার প্রয়াস পায়। তৎসত্ত্বেও অসহায় প্রাণীর জন্য মেয়ের মনস্তাপ লক্ষ করে সে হতাশ হয়। ক্রুদ্ধ নৃপেন মেয়েকে পাখির পালক ছাড়িয়ে রান্না করতে বলে, যদিও কাজটি এতদিন করেছে বৃদ্ধ পরিচারক বৃন্দাবন। গৌরী ঘুঘুর গুঞ্জন উপভোগ করছে জেনে, সে মেয়েকে পাখিটি বধ করতে বলে। কিশোরী মেয়ে বন্দুক চালাতে বিলম্ব করলে সে তেড়ে আসে। পরিশেষে গৌরী শিকারকার্যে সফল হলে নৃপেন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। নিজ-কন্যার অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি এসময় পিতার কাছে উপেক্ষিত হয়। গৌরীর কাছে সদ্য ফোটা গন্ধরাজ দেখে সে ওটাকে নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করে। বাগানে সব ফুলের গাছ সরিয়ে সে রোপণ করে কেবল ক্যাকটাস, যেগুলোর প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত রুক্ষ ও কণ্টকময়।

এরপর বড় খাঁচার মধ্যে জালের ঘের দিয়ে নৃপেন আমদানি করে একটি বন্য লেপার্ড এবং আট হাত লম্বা শঙ্খচূড়। বিভীষিকাময় সাপটি দেখে গৌরী পালানোর চেষ্টা করলে নৃপেন ওর হাত চেপে ধরে। মেয়েকে সে বাঘ-সাপের চিরবৈরিতা দেখাতে চায়। এবারে তার চেষ্টা ব্যর্থ হয় না। উৎসুক-আনন্দে গৌরী রোমাঞ্চিত হয়, সারাদিন অমানুষিক স্নায়ুযুদ্ধ উপভোগ করেও তার তৃষ্ণা মেটে না। সন্ধ্যায় বাঘটি ক্লান্ত হলে সে লাঠির আঘাতে পশুটিকে উত্তেজিত করে। রাতে ঘুমন্ত গৌরীকে খাঁচার সামনে থেকে নিয়ে আসে বৃন্দাবন।

গভীর রাতে ঘুম ভাঙলে গৌরী পিতার হান্টিং টর্চটি হাতে নেয়। অনেক রাত পর্যন্ত মদ খেয়ে নৃপেন মেঝের ওপর পড়ে আছে। বাইরে এসে মেয়েটি খাঁচা নাড়তে আন্দোলিত হয় শঙ্খচূড়, কিন্তু বাঘটি নিশ্চেতন। সারাদিনের লড়াইয়ে বাঘটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আসন্ন যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীর নিস্পৃহতায় সাপটি বিধ্বংসী হয়ে

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উন্মেষ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৫

[২] প্রাগুক্ত

ওঠে। বাঘের নীরবতায় গৌরীও বিক্ষুব্ধ হয়। সাপের খাঁচাকে ধাক্কা দিয়ে সে পাঠিয়ে দেয় বাবার ঘরে। শঙ্খচূড়ের গর্জনে উঠে দাঁড়ায় আতঙ্ক-বিহবল নৃপেন রায়। প্রাণরক্ষায় দরজা খোলার চেষ্টা করলেও সে পরাস্ত হয়, কারণ বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়েছে গৌরী। মেয়েকে সে ডাকলেও উত্তর আসে না, উপরন্তু শোনা যায় তার হাস্যধ্বনি। কাঁচের জানালা দিয়ে নৃপেন দেখে – গৌরী নতুন নেশায় উল্লসিত। ততক্ষণে প্রচণ্ড বেগে তাকে ছোবল দেয় শঙ্খচূড়। সর্প-দংশনের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে নৃপেন বুঝতে পারে গৌরী 'প্রাণ পেয়ে উঠেছে – কোথাও কিছু বাকি নেই তার। আর শঙ্খচূড় সাপের মতো তারও জান্তব চোখ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে আদিম হিংসার নীল আলোয়।'[১]

নৃপেন রায়ের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি এবং একগুঁয়ে স্বভাবের কারণে গৌরীর কিশোরী-মনস্তত্ত্ব বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তার চেতনাশক্তিকে উদ্দীপিত করতে পিতা নৃপেন হীন ও অমানবিক পন্থা অবলম্বন করেছে। পরিশেষে নৃপেন সাফল্য পেয়েছে। গৌরী প্রকৃত লেপার্ডের স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হয়েছে। এজন্য শঙ্খচূড়কে সে প্রেরণ করেছে পিতার কাছে। 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিবাদী-চেতনার গল্পগুলির অধিকাংশেরই পরিণতি ঘটেছে প্রতিবাদের চাবুক দিয়ে।'[২] 'উন্মেষ' গল্পেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সর্বহারা শ্রেণির বিজয় রূপকের আবরণে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে 'ইদু মিঞার মোরগ' গল্পে। এ গল্পে গৃহপালিত একটি মোরগ নিয়ে স্ত্রী-জোহরার সঙ্গে ইদু মিঞার ঝগড়া হয়। জোহরা মোরগটি বিক্রয় করতে চায় অথবা রান্না করতে চায়। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ইদু স্ত্রীকে পরিত্যাগের হুমকি দেয়। জীবনে অনেকক্ষেত্রে আপস করলেও, মোরগের ব্যাপারে সে অনড়। খরিদ্দাররা উপযুক্ত মূল্য প্রস্তাব করছে, তথাপি সে বিক্রয় করেনি। গ্রামবাসী ভেবে নিয়েছে মোরগটি ইদু মিঞার 'ধর্মব্যাটা'। দুবছর পূর্বে অতিথি আপ্যায়নের জন্য বাড়ির সকলে যখন মোরগটি ধরতে যায়, তখন সেটি গৃহকর্তার কোলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। মোরগের আশ্রয়-প্রার্থনায় ইদু সেদিন সাড়া দেয়। এরপর তারই আশ্রয়-প্রশ্রয়ে মোরগটি নির্ভয়ে বিচরণ করতে থাকে।

একদিন ইদু মিঞার বাড়িতে আসে দবিরুদ্দিন দফাদার। মোরগটি দেখে তার ভীষণ পছন্দ হয়, এবং এর দাম হিসেবে সে মালিকের হাতে তুলে দেয় দু টাকা। ইদু তাকে শতবার নিবৃত্ত করলেও কাজ হয়নি। মোরগের প্রতি বিতৃষ্ণ হলেও, জোহরা এ অন্যায়ের জন্য দফাদারকে অভিশাপ দেয় – 'ওই মোরগ কক্ষনো ও খেতে

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১১

[২] বিজিত ঘোষ ড., *বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

পারবে না। খোদা আছেন – তিনিই বিচার করবেন।'[1] জোহরার অভিসম্পাত দ্রুতই ফলে যায়। মোরগটি দবিরুদ্দিনের অদৃষ্টে জোটেনি। পথিমধ্যে তার সঙ্গে দেখা হয় দারোগা দীন মুহম্মদের। দফাদার তাকে সম্ভাষণ জানালে দারোগার দৃষ্টি পড়ে মোরগের ওপর। এমন হৃষ্টপুষ্ট খাসি মোরগের লোভ সেও সংবরণ করতে পারেনি। দফাদারকে সে মোরগটি সাইকেলের সঙ্গে বাঁধতে বলে। দীন মুহম্মদ ক্রয়মূল্য জিজ্ঞেস করলে ক্রোধে-হতাশায় দবিরুদ্দিন এক টাকা অতিরিক্ত নেয়। দফাদারের দুঃসাহসিকতায় দারোগা বিস্মিত হয় এবং এজন্য সে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায়। এরপর অতি উৎসাহে দারোগা ঘরে ফেরার প্রস্তুতি নেয়। কারণ তার বড়বৌ চমৎকার রাঁধুনি, আগ্রিম রান্নার গন্ধে তার দেহমন প্রশান্ত হয়ে আসে।

থানায় এসে দীন মুহম্মদ বিব্রত হয়। বারান্দায় তার জন্য অপেক্ষা করছে ইন্সপেক্টর ইমতিয়াজ আলী। অত্যন্ত জটিল অফিসার সে, তার যন্ত্রণায় মহকুমার সকল দারোগা তটস্থ থাকে। সাপুইহাটির একটি ডাকাতির মামলা নিয়ে সে দীন মুহম্মদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। কিন্তু সাইকেলে বাঁধা মোরগটি দেখে ইন্সপেক্টর পেশাগত দায়িত্ব বিস্মৃত হয়। কোনোরকম ভণিতা ছাড়া সে কর্মচারীকে হুকুম দেয় – 'এটার লোভ আমি সামলাতে পারছি না। আবদুল, যা তো মোরগটাকে জীপে তুলে নে।'[2] কিন্তু মোরগটি হাতছাড়া করতে চায় না দীন মুহম্মদ। উপায়ান্তর না দেখে সে-ও মোরগের মূল্যবাবদ আরও এক টাকা বেশি দাবি করে। শেষপর্যন্ত মোরগটির মূল্য দাঁড়ায় চার টাকা। দীন মুহম্মদের চালাকি বুঝতে পারে চতুর ইন্সপেক্টর। ফেরার পথে চলন্ত জিপ থেকে উড়ে যায় ইদু মিঞার মোরগ এবং 'পাক্ড়ো – পাক্ড়ো' বলে ইন্সপেক্টর লাফিয়ে পড়ে। কিন্তু এঁটেল মাটির কাদায় সে আচমকা পিছলে পড়ে এবং হাঁটুতে আঘাত পায়। তার দুই সহযোগী শত চেষ্টায়ও মোরগটিকে ধরতে পারে না।

সন্ধ্যাবেলা ঠিক নীড়ে ফেরে ইদু মিঞার মোরগ। ঘরের চালে বসে মোরগটি জয়ধ্বনি করে। এরপর শোনা যায় তিনটি উল্লেখযোগ্য খবর। কর্তব্যে অবহেলার দরুণ দফাদার চাকরিচ্যুত হয়েছে, সাপুইহাটির মামলায় ঘুষগ্রহণের অভিযোগে দীন মুহম্মদ বরখাস্ত হয়েছে এবং দেড় মাস হাঁটুর যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছে ইন্সপেক্টর ইমতিয়াজ। তৎকালীন প্রশাসনযন্ত্র ও বিচারব্যবস্থার নৈরাজ্যকর চিত্র এ-গল্পে হাস্যরসচ্ছলে চমৎকারভাবে পরিবেশন করেছেন নারায়ণ। অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে তিনি লিখেছেন :

---

[1] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ইদু মিঞার মোরগ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮২

[2] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৫

গরীবের প্রার্থনা খোদা কখনো শুনতে পান না – তিনি হাইকোর্টের জজের মতো। উকিল-ব্যারিস্টারকে বিস্তর টাকা খাওয়াতে পারলে, অর্থাৎ মোল্লা-মৌলবীদের জুৎ মতো ভেট যোগাতে পারলে তবেই আরজি পেশ করা যায় তাঁর দরবারে। সবাই একথা জানে, দবিরুদ্দিন দফাদারও জানত।[১]

'একটি অমর রাত্রি'[২] গল্পে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিবাদী চেতনাকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করেছেন। সরকারি চাকরিসূত্রে দীনবন্ধু প্রায় যাত্রা করতেন নৌপথে। একবার মেঘনা নদীতে নৌকার পাটাতন বিচ্ছিন্ন হলে তিনি বিপত্তিতে পড়েন। রাঢ়ভূমির সন্তান বলে নদীমাতৃক পূর্ববাংলার ভয়ংকর রূপ তাঁর অচেনা। তদুপরি তিনি সাঁতার জানেন না। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে অনিবার্য মৃত্যুকে বরণ করা ব্যতীত তাঁর গত্যন্তর ছিল না। কর্মসূত্রে দীনবন্ধু দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছেন যশোর, খুলনা ও নদীয়া জেলায়। এসব অঞ্চলে মানুষের লাঞ্ছনা, অপমান ও শোষণের নির্দয় চিত্র তিনি সদ্যরচিত নাটকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ-নাটকটির প্রকাশকাল পর্যন্ত তিনি বাঁচতে চান। অকস্মাৎ মাঝিদের ডাকে তিনি সম্বিৎ ফিরে পান। নদীবক্ষে অকল্পনীয়ভাবে একটি নতুন চরের সন্ধান পেয়ে তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। যাত্রীদের প্রাণরক্ষার্থে তারা নৌকাটি চরে এনে নোঙর করে। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে ফিরেও দীনবন্ধু আনন্দে উদ্বেলিত হননি, বরং তাঁর দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে নীলকুঠির বীভৎসতা। ইংরেজ নীলকরদের বর্বরতা এবং চাষিদের করুণ চেহারা তিনি দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকন করেন :

একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দে খুলে গেল লোহার দরজা। মশালের একরাশ রক্তিম আলোয় কড়ায় বাঁধা মানুষগুলির ছায়া কতগুলো প্রেতমূর্তির মতো নোনা–ধরা দেওয়ালের ওপর দুলতে লাগল। ভারী পায়ে উদ্ধত বুটের শব্দ তুলে একটা সাদা মানুষ এসে দাঁড়াল তাদের সামনে।

ঘর কাঁপিয়ে গমগমে গলায় সে জানতে চাইল : রাজী ?

কড়ার গায়ে শবদেহের মতো ঝুলেই রইল মানুষগুলো – কেউ কোনো জবাব দিলে না !

ড্যাম্‌ – সোয়াইন ! – বাঘের মতো গর্জে উঠল লোকটা, সাপের ছোবল মারার মতো আওয়াজ তুললো তার হাতের চাবুকটা। তারপর –

তারপর চলতে লাগল তার চাবুক। কালো মানুষগুলোর মুখ থেকে যন্ত্রণার গোঙানি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল। কালো চামড়ার ভেতর থেকে ফেটে বেরিয়ে আসতে লাগল রক্তের ধারা – মানুষগুলোর মাথা কাত হয়ে ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়তে লাগল।

অস্ফুট কণ্ঠে কে বললে, জল – একটু জল –

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮২-৭৮৩

[২] 'একটি অমর রাত্রি' *তরুণের স্বপ্ন* পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় (১৩৫৮) প্রথম প্রকাশিত হয়।

জল ? – লোকটা হিংস্র হায়েনার মতো শব্দ করে হেসে উঠল : শালা, তোর মুখে –

একটা অশ্রাব্য পাদপূরণ। মশালের রাঙা আলোয় তার সাদা দাঁতগুলোকে অদ্ভুত জান্তব দেখাতে লাগল, মনে হল যে এখনি সে এদের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে এদের বুকের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। তার চোখে-মুখে নরখাদক-রাক্ষসের একটা প্রাগৈতিহাসিক ক্ষুধা ![১]

এসব নিষ্ঠুর নিপীড়নের যারা প্রতিবাদ করেছে, তারাও নীলকরদের রোষানলের শিকার হয়েছে। তাদের বসতবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, অকারণে থানায় মামলা হয়েছে এবং মিথ্যা অপরাধের মর্মযন্ত্রণায় সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ আত্মহত্যা করেছেন। নীলকরদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে গৃহলক্ষ্মীরাও। দীনবন্ধু চূর্ণ করতে চান এসব অভিশপ্ত নীলকুঠি, এবং এক্ষেত্রে তাঁর হাতিয়ার কেবল নাটক। *নীল-দর্পণ* প্রকাশিত হলে তাঁর চাকরি হারানোর সম্ভাবনা কিংবা কারারুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া নীলকরদের রিভলবারের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। তথাপি নিষ্ঠুর সত্যের একটি অক্ষরও তিনি বর্জন করেননি। স্বদেশের মানুষের পক্ষে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

এদিকে রাত গভীর হলেও আাশেপাশে নৌকার সন্ধান না পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠে আকবর আলী মাঝি। জোয়ার এলে তাদের শেষরক্ষা অসম্ভব, ছোটো চরটি তখন নিমজ্জিত হবে নদীবক্ষে। দীনবন্ধু উপলব্ধি করেন বিপদ তাঁর পিছু ছাড়েনি। ভরা নদীতে বেঁচে গেলেও, শুকনো চরেই তাঁর জীবননাট্যের অবসান ঘটবে। কঠিন সংকটের মধ্যেও তিনি মাঝিকে *নীল-দর্পণে*র পাণ্ডুলিপি-রক্ষার অনুরোধ করেন। যে কোনো ডাকঘরে গিয়ে তিনি এটি প্রেরণ করতে বলেন বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঠিকানায়। মাঝির দুচোখ অশ্রুসিক্ত হলেও পরক্ষণে সে আশান্বিত হয়। দূরের একটি নৌকা তাদের বাঁচার স্পৃহাকে পুনরায় জাগ্রত করে। এসময় নাটকের পাণ্ডুলিপি বুকে জড়িয়ে দীনবন্ধু দেখেন দূরাগত নৌকার ক্ষীণ আলো। এ আলোকরশ্মি তাঁর কাছে আভাসিত হয় 'নতুন জীবন – নতুন সাহিত্যে'র রূপকল্পে।

'একটি অমর রাত্রি' গল্পে দীনবন্ধু মিত্রের স্বদেশপ্রেম ও সাহিত্য-ভাবনাকে গল্পকার সমকালীন পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। ইংরেজদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দীনবন্ধু তৎকালে যে সাহসিকতা দেখিয়েছেন, তা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। স্বজাতির প্রতি ভালোবাসার কারণে পোস্ট ইন্সপেক্টরের লোভনীয় চাকরি তাঁর কাছে

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'একটি অমর রাত্রি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮১

গুরুত্ব হারিয়েছে। দীনবন্ধুর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন প্রজন্মের সাহিত্যিকরা প্রতিবাদী-ভাষ্যে মুখর হবেন – এমনটি গল্পকারের অন্বিষ্ট।

একজন শান্তশিষ্ট যুবক কীভাবে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তারই অসাধারণ রূপচিত্র 'উদ্বোধন'[১]। এ গল্পে জ্যোতির্ময় এবং নিরাপদ কাঞ্জিলাল পরস্পরের বন্ধু। কলেজ পর্যন্ত তারা একত্রে পড়ালেখা করেছে। যদিও জ্যোতির্ময়ের দৃষ্টিতে কাঞ্জিলাল 'মূর্তিমান শয়তান'। পথেঘাটে সে মেয়েদের নানাভাবে উত্যক্ত করে। ভদ্রসন্তানরা প্রতিবাদ করতে চাইলেও ওর ছুরির ভয়ে পিছিয়ে আসে। কাঞ্জিলালের বন্ধু হবার কারণে জ্যোতির্ময়কে অনেকে অপছন্দ করে। অবশেষে পরীক্ষার হলে এক পরিদর্শককে অস্ত্র দেখিয়ে কাঞ্জিলাল কলেজ ছাড়ে। অতঃপর ভগ্নিপতির সংসারে থেকে সে প্রতিনিয়ত জুয়া খেলে। দীর্ঘদিন পর তার সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের দেখা হয়। এসময় কাঞ্জিলাল বন্ধুকে সাবধান করে :

> মনে রাখিস, ও-বাড়ির উপর চব্বিশ ঘণ্টা আমার চোখ থাকে। আমাকে ফাঁকি দিয়ে বুড়ো কেমন করে মেয়ের বিয়ে দেয় – আমি দেখে নেব। আর তোকেও বলে দিচ্ছি জ্যোতির্ময়, কলকাতা শহরে বিয়ে করবার মতো মেয়ের অভাব নেই। জেনেশুনে তুই সাপের গর্তে হাত দিসনে।[২]

মূলত জ্যোতির্ময় বাড়িটিতে গিয়েছিল ঘরভাড়ার ব্যাপারে। এ-বাড়ির ভাড়াটে অখিল ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্রী জ্যোৎস্নাকে পছন্দ করে কাঞ্জিলাল। ভুয়া পরিচয়ে সে মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। এমনকি তাদের মধ্যে পত্র-বিনিময়ও চলে। কিন্তু তার বিনষ্ট জীবনের ইতিবৃত্ত জানতে পেরে জ্যোৎস্না পিছিয়ে আসে। এরপর কাঞ্জিলাল বেপরোয়া হয়ে ওঠে। মেয়েটির ক্ষতিসাধনের জন্য সে নানা অপপন্থার আশ্রয় নেয়। জোরপূর্বক ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা-অর্জন যে সম্ভব নয় – জ্যোতির্ময় এটি বন্ধুকে বোঝানোর চেষ্টা করে। প্রত্যুত্তরে কাঞ্জিলাল বলে – 'বৌয়ের কাছ থেকে শ্রদ্ধা দুই লাথিতে আদায় করে নেব।'[৩]

এরূপ কুৎসিত মন্তব্যে জ্যোতির্ময় সংক্ষুব্ধ হয়। কাঞ্জিলালের দুষ্কর্ম প্রতিরোধের জন্য সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। সে ভাবে – 'কাপুরুষতারও একটা সীমা আছে। এইবার নিরাপদের ভয়টা তাকে জয় করতে হবে। এইবার একটা জবাব দিতে হবে তার। যদি না পারে, তবে তার মত অপদার্থ ক্লীবের আত্মহত্যা করা উচিত।'[৪] মেয়েটিকে

---

[১] 'উদ্বোধন' *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উদ্বোধন', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

বিপদ্দশা থেকে বাঁচাতে জ্যোতির্ময় বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। কাঞ্জিলালও নিশ্চুপ থাকে না, রাস্তায় নবদম্পতিকে লক্ষ করে এসিড নিক্ষেপ করে। এ ভয়াবহ অপরাধের তথ্যসংগ্রহের জন্য হাসপাতালে পুলিশ আসে। তারা অপরাধীকে চিহ্নিত করলেও জ্যোতির্ময় সাফ জানায় – 'না নিরাপদ কাঞ্জিলালের উপর আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই।'[১] জ্যোৎস্নার চিঠিগুলো যেন আদালতে না ওঠে – এজন্য সে ওর নাম গোপন করে। এই এসিড সন্ত্রাসীকে সে একাই মোকাবেলা করতে চায়। কারণ –

> সে আজ জেনেছে – তাকে তুচ্ছ করবার শক্তি এসেছে জ্যোতির্ময়ের। জেনেছে – তার শেষ অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। একবার অ্যাসিড ছুঁড়েছে – কিন্তু দ্বিতীয়বার সামনে এসে দাঁড়াবার শক্তি নেই তার। এদের সীমা ওই পর্যন্তই।[২]

'উদ্বোধন' গল্পে বোঝা যায়, প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে সুপ্ত প্রতিবাদ-স্পৃহা। এ-শক্তি জাগ্রত করতে প্রয়োজন কেবল বিশেষ পরিস্থিতির। সংকটজনক মুহূর্তে ভয়-ভীতি তুচ্ছ করে মানুষ উদ্বোধিত হয় সত্যপ্রতিজ্ঞায়, এবং অদম্য ইচ্ছায় প্রতিহত করতে সক্ষম হয় সামাজিক অন্যায়-অনিয়ম।

শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'রেকর্ড' গল্পে। সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে অচেনা ভাষার একটি রেকর্ড গল্পকথকের দৃষ্টিগোচর হয়। রেকর্ডটি পুরাতন না হলেও, এমন গান তিনি ইতঃপূর্বে শোনেননি। নারী-পুরুষের চার-পাঁচটি সম্মিলিত কণ্ঠস্বর কথকের রক্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিহারি মুসলমান দোকানদার রেকর্ডের বৃত্তান্ত জানে না। তার কাছ থেকে গল্পকথক সেটি সংগ্রহ করেন। কোরাসের সুরে বিরক্তি বোধ করেন কথক-পত্নী করুণা। গান শেষ হলে এ দম্পতির মনোজগতে শুরু হয় তীব্র অস্বস্তি। 'কোথায় শুনেছি – কবে শুনেছি, কিন্তু কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না'[৩] – এ প্রকারের চিন্তায় তারা আচ্ছন্ন হয়। করুণা রেকর্ডটির সঙ্গে আসামের খাসিয়াদের গানের সাযুজ্য পান। এরপর তাঁর মনে হয় – এ গান খাসিয়াদের নয়; বর্ষার ব্রহ্মপুত্র, বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে বালুরঘাটের সাঁওতাল-পল্লি থেকে ভেসে আসা নাগরা-টিকারার আওয়াজ[৪] কিংবা ছৌ-নাচের বাজনা।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

[৪] 'রেকর্ড' গল্পে সাঁওতাল-বিদ্রোহের অবতারণা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – "ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে বাঙালি মহাজন ও কুশীদজীবীদের শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা গণসংগ্রাম শুরু করে। অর্থনৈতিক বিড়ম্বনা থেকে মুক্তিই ছিল সে বিদ্রোহের একমাত্র লক্ষ্য। এর পর ইংরেজ, জমিদার ও বাঙালি মহাজনদের যে সমবেত অত্যাচার, তারই বিরুদ্ধে দাঁড়ায় সাঁওতাল পরিবারের চারজন বীর বিপ্লবী – সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব। ভারতীয় ইতিহাস ৮ই আগস্ট ১৯৪২ সালে ইংরেজদের

এরমধ্যে গল্পকথকের বাড়িতে আসেন ড. আইভি, যিনি পাশ্চাত্য সংগীত-বিশেষজ্ঞ। আইভি রেকর্ডটির সঙ্গে সুইৎসারল্যান্ডের একটি বিয়ের গানের মিল পান। এ সমাধান শিক্ষক-দম্পতির মনঃপূত হয় না। এক পর্যায়ে প্রশ্নোত্তরের ভয়ে আইভি নিউ এম্পায়ারে রিহার্সালের অজুহাত দেখিয়ে পলায়ন করেন। মধ্যরাতে সার্কাসের বন্দি-বাঘের নিরুপায়-গর্জনের মধ্যে গল্পকথক রেকর্ডের সুর শুনতে পান। অবশেষে চোরাবাজারে প্রাপ্ত রেকর্ডের উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করেন একজন ভূপর্যটক। তিনি জানান – এটি ইউরোপের একটি ছোট্ট দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের গান। নাৎসী অধিকারের সময় এ রেকর্ডের কয়েকটি সংখ্যা গোপনে তৈরি, বিক্রয় ও বিতরণ হয়েছিল। হিটলার বাহিনীর দানবিক আক্রমণ প্রতিহত করতে এটি প্রতিবাদী শিল্পীসমাজের রণসংগীত। এ রেকর্ডের প্রত্যেক শিল্পী নাৎসীদের রাইফেলের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। হিটলারের গোয়েন্দা বিভাগের দাবি, এর সবগুলো কপি তারা নিশ্চিহ্ন করেছে। অথচ রেকর্ডটি পাওয়া যায় কলকাতার সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে।

এসময় স্বাধীনতা-উত্তর কলকাতায় শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে রাস্তায় বের হয় একটি বিক্ষুব্ধ শোভাযাত্রা। ছাত্রদের এ মিছিলে নিক্ষিপ্ত হয় টিয়ার গ্যাস, একইসঙ্গে চলে পুলিশের লাঠিচার্জ। আন্দোলনকারীদের স্লোগান এবং রেকর্ডের সুর গল্পকথকের কাছে একরকমই মনে হয়। প্রতিবাদী ছাত্রসমাজের ওপর অযাচিত নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন কথক-দম্পতি।[১] অসহ্য ঘৃণায় করুণা বলেন – 'এ রেকর্ডকে কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। কেউ পারবে না।'[২] তাঁরা উপলব্ধি করেন প্রতিটি দেশে প্রতিবাদের সুর এক, এর কোনো স্থান-কাল-পাত্রভেদ নেই; শত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে বিপ্লবী বাণী প্রচারিত হয় যুগে-যুগে। গল্পের শেষাংশ লক্ষণীয় :

বিরুদ্ধে গান্ধীজি ও তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবে তীব্র আন্দোলনের সূচনা করেন। তারই সূত্রে সাঁওতালরাও বালুরঘাটে নাগরা-টিকারার ভয়ঙ্কর ধ্বনিতরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপ্লবে। বিহারের সাঁওতাল পরগণার রাজমহল ক্ষেত্রের ভাগনাডি গ্রামেও এর প্রায় একশোরও বেশি বছর আগে ৩০শে জুন ১৮৫৫ সালে নেতা সিদোনের নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হয়। 'রেকর্ড' গল্পের মূলে যে বড় ধরনের বিপ্লবের প্রাণবেগকে স্বীকৃতি দিয়েছেন লেখক, তা এমন প্রাচীন বিপ্লবের রক্তের আত্মীয়তার সূত্রেই বিশিষ্টতা পায়।" [উদ্ধৃত : বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬]

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও ছাত্রদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের সবসময় ঘোর বিরোধী ছিলেন। *সুনন্দর জার্নালে* তিনি লিখেছেন : দেশের – বিশেষ করে বাংলা দেশের – এই ক্ষুব্ধ-তিক্ততাকে মোকাবেলা করতে হবে, বলা বাহুল্য, কেবল জেদ দিয়ে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়েও নয়। কি দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী দল – আরো যোগ্য নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে আসুন, মানুষের সামনে নিশ্চিন্ত কোনো একটা ভবিষ্যতের রূপ তাঁরা তুলে ধরুন।... আর নইলে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে কিংবা লাঠিপেটা করে মনের আগুন কিছুতেই নেভানো যাবে না। (উদ্ধৃত : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দুর্দিনের ছায়া', *সুনন্দর জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১২৯)

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'রেকর্ড', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

দূরে শুনছি প্রাণের বন্যা – ক্রোধের ঝোড়ো গর্জন। না – এখন আর সুরটাকে চিনতে বাকী নেই। ব্রহ্মপুত্রের বর্ষা-মাদল, নাগা পাহাড়ের ঢাক, ছৌ-নাচের নাগরা – বালুরঘাটের রাত্রি-কাঁপানো টিকারার আওয়াজ – মার্কস স্কোয়ার থেকে বাঘের ডাক, আর – আর আজকের এই ঘা-খাওয়া মিছিল, সব একসঙ্গে মিলে ওই সুরটাকে সৃষ্টি করেছে। দেশে দেশে, কালে কালে এ-সুর এক। জানতুম, আমরাও এ সুরকে জানতুম। ঘুমন্ত রক্তের মধ্যে তলিয়ে ছিল বলেই এতদিন চিনতে পারিনি।[১]

এভাবে রেকর্ডটির সংগ্রামী ভাষ্য ইউরোপীয় ভূগোলে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা একটি সর্বজনীন সত্যে রূপলাভ করেছে। এ গল্পে লেখক 'মুক্তিকামী মানুষের সুরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে পৌঁছতে চেয়েছেন জাতীয়তাবাদ থেকে আন্তর্জাতিকতাবাদে। মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন নিজেকে বিশ্বের বৃহত্তর ভাবনার সঙ্গে।'[২] জনৈক সমালোচক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

রেকর্ড এখানে বিপ্লবের প্রতীক, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির প্রতীক। একতা, মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক।... রেকর্ড আক্ষরিক অর্থে গতিময়। রেকর্ডের মধ্যে আছে আবহমানকাল ধরে এক চলমানতার প্রতিশ্রুতি ! রেকর্ড মানুষের হৃদয়েও চলে। মানুষের চেতনায়ও। সেই চলমান সজীব, সজাগ বস্তুটিকে, আর বিশেষ করে যার মধ্যে ধরা আছে মুক্তিযোদ্ধাদের গান, তাকে চিরতরে কখনোই নষ্ট করা যায় না। যায়ওনি এখানে। রেকর্ড ঘোরে আর ঘোরে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তা ঘুরে ফিরেই আসে। রেকর্ড বাজে। সুপ্ত মানুষর অন্তরাত্মাকেও বাজিয়ে দেয়। জাগ্রত করে। রেকর্ডের বিশেষ সুর মানুষের অন্তরেও সঞ্চারিত করে অন্য ভাবনা। মানুষের ঘুম ভাঙে। মানুষ উঠে দাঁড়ায়। ঘুরে দাঁড়ায়। রুখে দাঁড়ায়।[৩]

'উত্তম পুরুষ' গল্পে সামাজিক প্রতিকূলতা মোকাবেলার জন্য সন্তানকে প্রস্তুত করেছে মানিক সর্দার। পুত্র বলাইকে নিয়ে সে একদিন যাত্রা করে কুসুমডাঙার হাটে। দীর্ঘপথ অতিক্রমের কারণে সে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন সুস্পষ্ট হলেও, তার মনে কোনো রঙ নেই। ঘরে আধিচাষের ধান ফুরিয়ে গেছে, প্রচণ্ড অভাবে সে বিক্রয় করতে চলেছে হালের একটি বলদ। শুধু এটি নয়, ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাকে আরেকটি গরু হাটে তুলতে হবে। এরমধ্যে প্রতিবেশী খাদেম আলি শূন্য গোয়ালে গরুর দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মানিকের জন্য হয়তো অপেক্ষা করছে একই পরিণতি। একসময় চাষাবাদের বাইরে সে গ্রামগঞ্জে দিনমজুরি করতো, দূরের স্টেশনে যেতো কুলির কাজে। কিন্তু সান্নিপাতিক জ্বরে তার শরীর এখন দুর্বল হয়ে

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] স্বাতী চক্রবর্তী, 'চিঠিপত্র ও ব্যক্তিগত আলাপচারিতার নিরিখে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের পুনর্বিচার', উত্তম পুরকাইত (সম্পাদিত), *উজাগর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

[৩] বিজিত ঘোষ ড., *বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯

গেছে। দীর্ঘ বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে মানিক জেনেছে – 'আগবাড়িয়ে দুনিয়ার টুঁটি চেপে ধরতে না পারলে দুনিয়াই মানুষের গলা টিপে ধরে।'[১]

অন্যদিকে বলাইয়ের কোনো জীবনবোধ এখনও তৈরি হয়নি। মাইতিদের বাড়িতে সে কলের গান শোনে, বন-জঙ্গলে খুঁজে বেড়ায় নীলকণ্ঠ পাখির পালক, কোঁচড় ভরে নিয়ে আসে লাটা আর কুঁচফল। সন্তানের চঞ্চলতা মানিককে উদ্বিগ্ন করে। কুসুমডাঙার পথে রয়েছে বাঘ-ভালুকের উৎপাত, একারণে মানিক সঙ্গে এনেছে একটি বল্লম। কিছুদূর যেতেই সে বাঘের অস্তিত্ব অনুভব করে। অসীম হিংস্রতায় মানিক বল্লমটি প্রস্তুত রাখে, বাঘও চিনে নেয় সশস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে। হঠাৎ তীব্র হুঙ্কারে পশুটি মানিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পিতার আকস্মিক বিপর্যয়ে বলাই আর্তচিৎকার শুরু করে। মানিকের বল্লম তখন বাঘের বুক থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাঁধে আঘাত হানে; এবং আহত জন্তুটি বনের ভেতর প্রবেশ করে। এ-সময় বলাইয়ের ভীতসন্ত্রস্ত চেহারা দেখে মানিক রেগে যায়; এবং তাকে প্রতিবাদী চেতনায় জেগে ওঠার মন্ত্রে উদ্বোধিত করতে চায় :

> পিঠে মেরুদণ্ড নেই – এতটুকু সাহস নেই! হতচ্ছাড়া – মেয়েমানুষের অধম! কেমন করে বেঁচে থাকবি দুনিয়ায় – কী করে লড়বি চারদিকের এত সব বুনো জন্তুর সঙ্গে!'... ওঠ হারামজাদা – ওঠ্! এমন করে ব্যাঙের মতো বসে থাকলে চলবে না। পা চালিয়ে চল। এখানে শুধু যে একটা বাঘই আছে সে কথা বলা যায় না। বার বার বুড়ো বাপ তোকে বাঁচাতে পারবে না।[২]

পুনরায় বাঘের গর্জনে জঙ্গল প্রকম্পিত হয়। আঘাতপ্রাপ্ত বাঘ যে সহজে পালায় না – তা বিস্মৃত হয়েছিল মানিক সর্দার। প্রতিশোধ-স্পৃহায় বাঘটি ফের তার পথ আগলে দাঁড়ায় এবং মানিককে ধরাশায়ী করে ফেলে। তার হাতের বল্লমটিও ছিটকে পড়ে। পিতার দুর্গতিতে জেগে ওঠে বলাইয়ের পৌরুষ – 'বল্লম এবার আর কাঁধে গিয়ে লাগেনি। পাঁজরার ভেতর দিয়ে সোজা বাঘের হৃৎপিণ্ড ভেদ করেছে। পঞ্চাশ বছরের মানিক সর্দারের হাত কেঁপেছিল – পনেরো বছরের বলাইয়ের হাত কাঁপেনি।'[৩] ব্যাঘ্রহননের পর পিতার রক্তাক্ত শরীর দেখে বলাই কাঁদলেও অত্যন্ত প্রসন্ন দেখায় মানিকের মুখ :

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উত্তম পুরুষ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

> দু'হাত বাড়িয়ে ছেলেকে বুকে টেনে নিলে মানিক সর্দার। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, ভয় নেই – কোনো ভয় নেই। আমার জন্যেও নয় – তোর জন্যেও না।[১]

বলাই এতদিনে বধ করতে শিখেছে জঙ্গলের হিংস্র বাঘ। এবার পুত্রের তেজে পরাজিত হবে সমাজের মানুষরূপী পশুরা – এমনটি মানিক সর্দারের অভীপ্সা।

প্রতিবাদ-প্রতিরোধ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে একজন হতদরিদ্র এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিও যে সামাজিক পাপাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে – তারই ব্যতিক্রমী দৃশ্য 'আসানসোলের লোকটা'। এ গল্পের প্রধান চরিত্র কানা সিং। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে 'মার খাওয়া'। তার এক চোখ অন্ধ এবং এক পা অপেক্ষাকৃত ছোটো। শৈশবে সে পিতাকে হারায়, এরপর তার মা অন্য পুরুষের অনুগামী হয়। হাজারীবাগ জেলায় কানা সিংয়ের বিয়ে হলেও স্ত্রী তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

মধ্যবয়সী কানা সিং একটি হোটেলে বাবুর্চির কাজ করে। তার রান্নার সুনাম রয়েছে স্থানীয় বাসচালক এবং কোলিয়ারির সর্দারদের মধ্যে। কাজের অবসরে তার মনে পড়ে স্ত্রীর কথা – 'যে বউটা পালিয়ে গেল – অন্য সময় যাকে স্রেফ হারামী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না তার, তারই জন্যে বুকের ভেতর কেমন একটা যন্ত্রণা হতে থাকে।'[২] কানার সঙ্গে হোটেলে কাজ করে আরেকটি বালক। ছেলেটির প্রতি সে মায়া-মমতাশূন্য। কারণ দারিদ্র্য ব্যতীত দুজনের মধ্যে কোনো মিল নেই :

> তার কেউ ছিল না, এই ছেলেটার মা-বাপ আছে। বাপ কুলি, মা 'গেঁঠা' বিক্রি করে। সে রাত কাটাত হোটেলের মেজেতে, শীতের রাতে ঘন হয়ে বসত উনুনটার পাশে। অনেক রাত পর্যন্ত গরম থাকত সেটা – তখন মায়ের বুকে ঘুমুবার কথা ভেবে তার কান্না আসত।[৩]

সুস্থ বালকের সুখী-জীবন কানাকে বিকারগ্রস্ত করে। এজন্য সে তাকে অকারণে ব্যস্ত রাখে। একদিন হোটেলে আসে চারজন শিখ জোয়ান। কোলিয়ারি মালিকদের তারা 'পোষা গুণ্ডা'। মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে মালিকপক্ষ এদের ব্যবহার করে। তারা প্রকাশ্যে মানুষ খুন করে, ডাকাতি তাদের নিত্য ব্যবসায়। বিমা কোম্পানিকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য মালিকপক্ষ এদের দিয়ে নিজেদের টাকা লুঠ করায়। হোটেলের ছেলেটি খাবার পরিবেশনকালে একটি গ্লাস উল্টে যায় এবং সামান্য মদ পড়ে ডালকুত্তার পায়ে। এ অপরাধে ছেলেটিকে

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আসানসোলের লোকটা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

সে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে এবং পেটে সজোরে লাথি মারে। যন্ত্রণায় ছেলেটি মাটিতে পড়ে যায়, তার হাতের রুটি-মাংস ছড়িয়ে পড়ে ঘরময়।

আহারশেষে ডালকুত্তা একটি আধুলি বকশিস দিলে, বালকটি প্রত্যাখ্যান করে। এজন্য রাগান্বিত হয়ে সে ধাতব মুদ্রাটি ওর মুখে নিক্ষেপ করে এবং কানার সামনে দিয়ে সেটি গড়িয়ে পড়ে নর্দমার ভেতরে। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি পয়সার সন্ধান করলে কানা তাকে নিবৃত্ত করে। পাপের অর্থ নয়, বালককে সে উপহার দেয় তার কষ্টার্জিত উপার্জনের একটি আধুলি। প্রতিবন্ধী কানা সিং ডালকুত্তাদের প্রতিরোধে সক্ষম না হলেও, চারপাশের 'হাওয়া বদলে'র সংকেত অনুভব করে। নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে নিম্নবর্গভুক্ত মানুষেরা যে সামষ্টিক শক্তিতে জেগে উঠবে, সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা সত্ত্বেও তারা ঠিক উঠে দাঁড়াবে – লেখকের এমন প্রত্যাশায় গল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাজনীতি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন 'প্রগতি লেখক সংঘে'র অন্যতম সদস্য এবং বামপন্থি রাজনীতির প্রতি সংবেদনশীল। তাঁর রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে ছোটগল্পে। তবে নারায়ণের কাছে 'পার্টি প্রোগ্রামই রাজনীতির শেষ কথা নয়।'[১] রাজনীতির চেয়েও তাঁর গল্পে সত্য হয়ে উঠেছে মানুষ। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> মানুষের জন্যেই রাজনীতি, রাজনীতির জন্য মানুষ নয়। যেখানে দেখব দেশের কল্যাণ, দেখব শুভ-চেতনা – তাকে সানন্দে স্বীকার করব। নিছক মতবাদের রুদ্ধ প্রাচীরে শিল্প-ব্যক্তিত্বকে আমি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নই।... আজ দেখছি, কমিউনিজম চৈনিক পররাজ্য-লোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষাক্ত বীজে পরিণত হয়েছে। এই কমিউনিজম আমার শত্রু। আমার দেশের শত্রু, সমস্ত মানবতার শত্রু। আমার লেখায় তার বিরুদ্ধে ধিক্কার সহস্র কণ্ঠে ফেটে পড়ুক।[২]

দেশ-জাতির কল্যাণ-সাধনই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে রাজনীতি। জীবনের অন্তিম পর্যায়েও তাঁর এ-চিন্তার ব্যত্যয় ঘটেনি। 'অসুস্থ শরীরের ভাবনা' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি বলেছেন :

> রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচে আমি নেই। আশৈশব কুশিক্ষার ফলে নিতান্তই বিমূঢ়ের মতো নিজের দেশটাকে কিঞ্চিৎ ভালোবেসে ফেলেছি – ত্যাগে, দুঃখে, সাধনায়, মনীষায় যাঁরা আমাদের পরিচয় আর ইতিহাস গড়ে তুলেছেন, তাঁদের সম্পর্কে আমার কিছু শ্রদ্ধা আছে।[৩]

সমকালীন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন, নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি এবং রাজনীতিবিদদের স্খলনের অজস্র চিত্র রয়েছে নারায়ণের ছোটগল্পে। এছাড়া বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাজনীতির নানা অনুষঙ্গ : যেমন দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর, কালোবাজারি-মহামারি, দাঙ্গা-দেশভাগ ও উদ্বাস্তু-সমস্যা তাঁর গল্পে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শুধু বিক্ষোভ-বিদ্রোহের রূপচিত্রাঙ্কন করেননি, রাজনৈতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা।

---

[১] বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা ছোটোগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *অগ্রন্থিত রচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'অসুস্থ শরীরের ভাবনা', *সুনন্দর জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক। ভারতবর্ষের পট-পরিপ্রেক্ষিতে এ যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং জনমানসে এর ঘৃণ্য প্রতিক্রিয়া তিনি বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'নিশাচর', 'পাইপ', 'একটি শত্রুর কাহিনী', 'তিলঙ্গমা' ও 'আতিথ্য' গল্পে যুদ্ধের নানা বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির আস্ফালন, জাপানি বোমার আতঙ্ক, জার্মান-বিদ্বেষ প্রভৃতি তিনি ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করে সন্নিবেশিত করেছেন। বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন সাহিত্যিক-সত্তাকে কীরূপ প্রভাবিত করেছে, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় :

> ক) বাংলা সাহিত্যেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছোটোগল্পের অন্যতম স্বর্ণযুগ। চারিদিকে তখন মানুষের সর্বাত্মক বিকৃতি ফেটে পড়েছে – সমাজ, ধর্ম, সংস্কার এবং পারিবারিক জীবনের ভিত্তি নড়ে উঠেছে, পুঞ্জীভূত গ্লানিতে জাতি তখন পঙ্কস্নান করছে, মানুষের লোভের ষড়যন্ত্রে গড়া দুর্ভিক্ষে সমস্ত বাংলা দেশ নরকে পরিণত হয়েছে আর কালোবাজারিরা মুণ্ডশিকারীর ভূমিকা নিয়েছে। ওদিকে ইংরেজ সরকারের হৃদয়হীন উদাসীনতা, আগস্ট বিপ্লব দমন করবার জন্যে সীমাহীন নিষ্ঠুরতা – আর দেশের সম্মান-সম্ভ্রমকে ট্যাঙ্ক-জীপ-লরীর তলায় দলিত করে বিদেশী ফৌজের তাণ্ডব – ভিতরে বাইরে এই অসহ্য যন্ত্রণার চাবুকে জর্জরিত হয়ে উঠে সেদিন বাঙালি লেখকরা কলমের মুখে ক্ষিপ্ত বেদনার বজ্রদ্যুতি সঞ্চার করেছিলেন।[১]

> খ) তারপরে এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দেখা দিল মন্বন্তর। মুহূর্তে অনেক মিথ্যার আবরণ সরে গেল – হিংস্র লোভের কল্পনাতীত প্রতিযোগিতায় বেরিয়ে এল এই সমাজ – এই রাজনীতি – এই জীবনচর্যার আসল চেহারা।[২]

চল্লিশের দশকে রাজনৈতিক অঙ্গনের বাস্তবসম্মত দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে 'নিশাচর'[৩] গল্পে। এসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবল বিরোধিতা করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। এজন্য সরকার দলটিকে বে-আইনি ঘোষণা করে এবং অসংখ্য নেতাকর্মীকে বন্দি করে। পার্টির সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে নারায়ণের অগ্রজ শেখরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও গ্রেপ্তার হন।[৪] যুদ্ধকালে অত্যন্ত গোপনে পরিচালিত হয় দলের কার্যক্রম। নিশাচর' গল্পে

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্প-বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪

[৩] এ পরিচ্ছেদের আলোচনায় গল্পগ্রন্থ-অন্তর্গত গল্পসমূহের প্রকাশকালের ক্রম অনুসৃত হয়েছে।

[৪] এক চিঠিতে শেখরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার অল্পদিন পরেই আমি আবার গ্রেপ্তার হই এবং প্রায় ৬ বছর পরে ১৯৪৫ এর শেষে ছাড়া পাই। ছাড়া পাবার কয়েকদিন পরেই আমি নারায়ণের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কলকাতা চলে আসি। কারণ আমি জানতাম যে পার্টির কাজের বোঝা তুলে নিলে আবার সময় করা মুশকিল হবে।" (উদ্ধৃত : সুস্মিতা ঠাকুর, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০)

তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির এক কর্মীর রাজনৈতিক-তৎপরতা প্রদর্শিত হয়েছে। প্রশাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সে সঙ্গে রেখেছে 'একরাশ নিষিদ্ধ ইস্তাহার', যেখানে লেখা রয়েছে মার্কসবাদের দৃপ্ত অঙ্গীকার – 'জগতের বঞ্চিত জনগণ, জাগো তোমরা। হাতুড়ির মুখে পুঁজিবাদকে গুড়ো করে লুটিয়ে দাও মাটিতে। একমাত্র শৃঙ্খল ছাড়া সর্বহারাদের কিছু আর হারাবার নেই।'[১]

রাতে পুলিশ বাড়ি-ঘেরাও করলে এই বিপ্লবী প্রাচীর ডিঙিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর চারদিকে আরম্ভ হয় কড়া-পাহারা। প্রচণ্ড শীতে সে এগিয়ে চলে চিৎপুরের রাস্তায়। কলকাতার যেসব এলাকায় মানুষ সারারাত অশ্লীলতায় মেতে থাকে, জাপানি বোমাহামলার আতঙ্কে সেখানেও তখন সুনসান নিস্তব্ধতা। এসময় বিপ্লবীর চেতনালোকে যেসব অসংলগ্ন ভাবনা উদ্রিক্ত হয়, সেগুলো এরকম :

> ক) সুদুর প্রাচীতে জাপানী বোমা অবতীর্ণ হয়েছে। সাইগন রেডিওতে এশিয়ার কল্যাণে অতি-মানবদের সাশ্রু শুভেচ্ছা। পীতবর্ণ কল্‌কি অবতারের আবির্ভাব হয়েছে জাপানের সম্ভল দ্বীপে।[২]
>
> খ) জাপানী বোমার আসন্ন গর্জন কি মানুষের পশুত্বের দিকটাকেও রুদ্ধ করে দিয়েছে ? মর্ত্যে সত্যযুগের সত্যিই আবির্ভাব হল নাকি ? [৩]

এ-যুদ্ধে কলকাতাবাসী 'ব্ল্যাক আউট' শব্দবন্ধের সঙ্গে পরিচিত হয়। রাতে ঘরের আলো যেন বাইরে না আসে, এজন্য প্রত্যেকে সতর্ক থাকে। 'নিশাচর' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই প্রাসঙ্গিক চিত্র উল্লিখিত হয়েছে – 'কলকাতায় ব্ল্যাক্ আউট। আলোগুলো এখনও সম্পূর্ণ নেভেনি, কালো ঠোঙার ফাঁকে ক্ষীণ আলোক-চক্র অসহায় পদচারীদের দিক্‌ভ্রান্তি ঘটাচ্ছে মাত্র।'[৪]

পুলিশের বাঁশি ও জুতার শব্দ পেয়ে এই বিপ্লবী একটি গলিতে আত্মগোপন করে। সারাদিন অনাহারে থাকায় তাকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখায়। এদিকে অসহনীয় ঠাণ্ডার সঙ্গে আরম্ভ হয় মৃদু বৃষ্টি। উষ্ণ-আশ্রয়ের জন্য তার শরীর ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অন্ধকারে পায়ের নিচে সে অনুভব করে মানব-অস্তিত্ব। পদপিষ্ট লোকটি তাকে প্রথমে মাতাল বলে তিরস্কার করলেও পরক্ষণে সন্ধান দেয় একটি লোভনীয় আশ্রয়ের। রাস্তার পাশে বন্ধ-হোটেলের চুলার গর্তে শীত নিবারণ করছে 'বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ'। বিপ্লবী নিঃসংকোচে একটি গর্ত দখল

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নিশাচর', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] প্রাগুক্ত

করে নেয়। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডার বিপরীতে সে অনুভব করে স্বর্গীয় প্রশান্তি। পাশের লোকটি বিড়ি জ্বালালে তার বীভৎস চেহারা খানিকটা দৃষ্টিগোচর হয় – চুলগুলো জট-পাকানো, সমস্ত মুখমণ্ডলে ব্রণ-বসন্তের চিহ্ন এবং নাক-ঠোঁট ক্ষতবিক্ষত।

বৃষ্টির পানিতে ইস্তাহারগুলো ভিজে যাওয়ার উপক্রম হলে বিপ্লবী গর্তত্যাগ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। একটানা হাঁটতে থাকে সে। হঠাৎ একটি ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক বারনারী তাকে আহবান করে। দুর্যোগঘন রাতে বিপ্লবী নির্দ্বিধায় তার গৃহে প্রবেশ করে। তবে বিপ্লবীর শরীরে নোংরা ও ভেজা পোশাক দেখে মেয়েটি সংকোচবোধ করে। কারণ :

> রাত্রির আগন্তুকেরা সকলেই তার পায়ে প্রণয়-অর্ঘ্য নিবেদন করতে আসে না। মদের গ্লাসে তারা অলক্ষ্যে মিশায় স্ট্রিকনিনের গুঁড়ো; নেশা বেশি ঘন হয়ে উঠলে গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়ে নির্বিবাদে সব কিছু নিয়ে সরে পড়ে। অবিশ্বাস আর অপমৃত্যুর কেন্দ্রবিন্দুতে টলমল করছে ওদের জীবন। পদ্মপাতায় শিশির।[১]

অজ্ঞাত ব্যক্তিটির প্রকৃত পরিচয় জেনে বারাঙ্গনার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সে বলে – 'স্বদেশী ?' এই সুযোগে সেও দেশের জন্য কিছু অবদান রাখতে চায়। গভীর উদ্বেগ ও অপরিসীম স্নেহে সে অতিথিকে লেপের মধ্যে বিশ্রাম নিতে বলে। আশ্রয়দাত্রীর ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় বিপ্লবীর স্মৃতিলোকে প্রতিভাসিত হয় তার মমতাময়ী দিদির মুখশ্রী। বারনারীর মমতাময় সান্নিধ্য সত্ত্বেও বিপ্লবী তার গৃহে বেশিক্ষণ অবস্থান করে না। বণিতাগৃহে রাত্রিযাপনের অর্থ হলো – মেয়েটির মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া; একারণে দুর্বল শরীরে সে পতিতালয় ত্যাগ করে।

শোভাবাজার স্ট্রিটে কয়েকজন ভিখারিকে দেখতে পায় বিপ্লবী। এরা সেখানে আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছে। পৌষের রাতে এ অগ্নিকুণ্ড বিপ্লবীর কাছে 'গ্রেট ঈস্টার্ন হোটেলে'র মতো আরামদায়ক মনে হয়। তাই বিনাবাক্যে সে অগ্নি-আয়োজনের সঙ্গী হয়। অবশ্য তাকে নিয়ে ভিখারিদের কোনো কৌতূহল নেই। প্রতি রাতে তারা এমন অজস্র মানুষ দেখেছে, উপভোগ করেছে 'নিশীথ নগরীর রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য অভিনয়'। রাতের অবসরে ভিখারিরা গল্পে-আড্ডায় মেতে ওঠে। কেবল মধ্যবিত্তের চায়ের আসরে নয়, চলমান যুদ্ধের হালচিত্র উঠে আসে এদের আলাপচারিতায়। যদিও যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের পর্যবেক্ষণ ছিল ভিন্নরকম :

> – কলকাতায় বোমা তাহলে গির্‌বেই ?

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮

– গির্‌বে বইকি। নইলে আর এত আন্ধার কেন চারদিকে ? হাওয়াই জাহাজ এসে বোমা ফেলে দিয়ে যাবে, ঘরবাড়ি বিলকুল উড়িয়ে দেবে।

– বিলকুল উড়িয়ে দেবে ? মনুমেন্ট, চৌরঙ্গী, সরকারী দপ্তর, লাঠসাহেবের কোঠী – তামাম ?

– তামাম।

– উঃ, তবে তো ভয়ানক !

– আলিপুরের হাজতটা উড়িয়ে দেয় আগে ? আর টাঁকশাল ? আর ক্লাইভ স্ট্রীট ? এত্‌না এত্‌না রূপেয়াতে সব মরচে ধরে গেল, আর জিন্দা আদমি ভুখে মরে যাচ্ছে।[১]

যুদ্ধের কারণে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিফলিত হয়েছে ভিখারিদের উপর্যুক্ত সংলাপে। এরা মার্কসবাদের সূত্র জানে না, কিন্তু হাজারো বঞ্চনায় শিখে ফেলেছে সাম্যের মন্ত্র। একদিকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অগাধ অর্থ সঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে। রাস্তার মোড়ে 'বঁধুয়া'র (পুলিশ) উপস্থিতি টের পেয়ে বিপ্লবী একপর্যায়ে উঠে দাঁড়ায়। এরপর সে যায় গঙ্গাতীরবর্তী কাশী মিত্রের শ্মশান ঘাটে। জনমানবশূন্য এ শ্মশানের একটি চিতায় আগুন জ্বলছে; পাশে শববহনকারীর শূন্য দড়ির খাটিয়ায় সে শুয়ে পড়ে। চিতার উত্তাপে সে বেশ আরামবোধ করে এবং দগ্ধলাশের গন্ধ তার স্নায়ুতে মাদকতা সৃষ্টি করে। এমন ভয়ার্ত পরিবেশে পুলিশের পদার্পণ যে সহজে ঘটবে না, এ ব্যাপারে সে সুনিশ্চিত। শ্রান্ত বিপ্লবী তাই নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে উগ্র হরিধ্বনিতে সে জেগে ওঠে। দুটি মৃতের সৎকার উপলক্ষ্যে শ্মশানে প্রচুর মানুষ সমবেত হয়েছে। সর্বহারাদের নিষিদ্ধ ইস্তাহার নিয়ে বিপ্লবী পুনরায় যাত্রা করে মহানগরের পথে।

'নিশাচর' গল্পে একজন বিপ্লবী কীভাবে স্বভূমিতে উপদ্রুত জীবনযাপন করেছে তা নারায়ণ বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। গ্রেপ্তার এড়াতে সে ব্যক্তি-পরিচয় গোপন করেছে, প্রতিপক্ষকেও ডেকেছে ছদ্মনামে। প্রকৃতপক্ষে এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই পরিচালিত হয়েছে সে-সময়কার রাজনীতি, বিশেষত ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন। এঁদের সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের[২] কারণে তাঁর পক্ষে এ-জীবনবাস্তবতার চিত্রাঙ্কন সম্ভব হয়েছে।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১

[২] কমিউনিস্ট পার্টির গোপন কর্মসূচিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রমাণ মেলে শেখরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক স্মৃতিচারণে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

সদস্য না হয়েও নারায়ণ কেবল 'একশন' ছাড়া পার্টির অন্য সমস্ত কাজ করতে থাকে। বেআইনী কাগজপত্র, বই, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া আসা, লুকিয়ে রাখা, পলাতকদের আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া, খবর নেওয়া-দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত কাজ ও পার্টি

বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং এর কুশীলবদের পরিণতি প্রতীকীভাবে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে 'পাইপ'[১] গল্পে। যুদ্ধ কখনোই শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয় – নারায়ণের গল্পে এ কথা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। পার্টি অফিসে সুনন্দার সঙ্গে রঞ্জনের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। একপর্যায়ে সুনন্দার বাবা অধ্যাপক পি. কে. চৌধুরীর সঙ্গেও ছেলেটি পরিচিত হয়। অবসরপ্রাপ্ত এ অধ্যাপক পক্ষাঘাতগ্রস্ত। পঁচিশ বছর তিনি ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন এবং নানামাত্রিক গবেষণার পর তিনি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন – পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপকরণ হলো আগুন। ল্যাবরেটরি, ইঞ্জিন, ডাইনামো, বোমা – সর্বত্রই এর ব্যবহার। তাঁর দৃষ্টিতে আগুন হচ্ছে ভাঙাগড়ার দেবতা – রুদ্র ও শিব। আগুনের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেন প্রগতি আর মুক্তির আনন্দ। যদিও তার কন্যার কাছে অগ্নিস্পর্শ হচ্ছে 'নাৎসী জার্মানীর মতো'।

চার বছর পর সুনন্দার পত্রে রঞ্জন জানতে পারে, আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন অধ্যাপক চৌধুরী। বিছানায় শুয়ে তিনি অন্যমনস্কভাবে পাইপ টানছিলেন। হঠাৎ মশারিতে আগুন লাগলে তিনি আত্মরক্ষায় ব্যর্থ হন। আজীবন অগ্নি-উপাসনা করেও তিনি শেষপর্যন্ত অগ্নিদগ্ধ হন। এ ঘটনা রঞ্জনকে নতুন ভাবনায় তাড়িত করে – 'পৃথিবী জুড়ে আগুন জ্বালাবার স্বপ্ন যিনি দেখেছিলেন, একটা সামান্য পাইপের আগুন থেকে তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না কেন ?'[২] যুদ্ধের তাণ্ডবে যারা গুলিবর্ষণ করছে, বোমা নিক্ষেপ করছে, তাদের বিনাশও একই পন্থায় হবে – এমনটি লেখকের বিশ্বাস। বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রণোন্মত্ত এডলফ হিটলারের (১৮৮৯-১৯৪৫) উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দাম্ভিকতা এবং যুদ্ধশেষে তার করুণ মৃত্যুই[৩] যেন ইঙ্গিতায়িত হয়েছে 'পাইপ' গল্পে।

বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত শুধু নগর কিংবা গ্রামকেন্দ্রিক ছিল না, যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলেও। 'ভোগবতী' গল্পে রাঢ়বাংলার এক সাঁওতাল দম্পতির প্রাণোচ্ছল জীবনপ্রবাহ স্তব্ধ করে দিয়েছে সর্বনাশা যুদ্ধ। এখানে শুকলাল এবং তার স্ত্রী সোনা ভৈরবী পাহাড়ে কাঠসংগ্রহ করে। হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর

সদস্যদের মতই করত। পার্টির নেতারা ওকে খুব বিশ্বাস করতেন। (উদ্ধৃত : সুস্মিতা ঠাকুর, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০)

[১] 'পাইপ', *যুগান্তর* পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৩৫১) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'পাইপ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৬

[৩] পরাক্রমশালী নাৎসি বাহিনীর সাহায্যে হিটলার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখে। নীতি, আদর্শ, মানবতা বিস্মৃত হয়ে সে অক্ষশক্তিকে লিপ্ত করে নারকীয় হত্যাকাণ্ডে। তবে যুদ্ধের শেষ দিকে পরাজয় আসন্ন জেনে হিটলার ফুয়েরার বাঙ্কারে আত্মহত্যা করে (৩০ এপ্রিল ১৯৪৫)। হিটলারের শেষ নির্দেশ অনুযায়ী, তার মৃতদেহ অগ্নিদগ্ধ করা হয়। পরাজিত দেহাবশেষ সে বিশ্ববাসীকে দেখাতে চায়নি।

তারা ভোগবতীর ঠান্ডা জলে ক্লান্তি নিবারণ করে। পাহাড়িদের নিকট এ-ঝরনা দেবতার অপার করুণার আধার। একদিন বনের নীলকণ্ঠ পাখির কলতান এবং অশ্বত্থ-পলাশ পাতার কম্পন ভেদ করে শোনা যায় 'হাওয়াই জাহাজে'র গর্জন। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সোনা সেদিকে তাকিয়ে থাকে, এবং ওই আকাশযানের মধ্যে সে অলৌকিক-ভয়াল বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করে। এদিন জমিদারের গোমস্তা হরিকৃষ্ণ রায় তাদের ওই অঞ্চলে মিলিটারি আগমনের বার্তা শোনায় :

> দাঁড়া, মিলিটারী আসছে। দু'দিনেই তোদের ঠাণ্ডা করে দেব।... মিলিটারী, মিলিটারী। মানে পল্টন। মাথার ওপর দিয়ে হাওয়াই জাহাজ গেল, দেখলি না ? এখানে মাঠের মধ্যে আস্তানা গাড়বে – দেখিস তখন।[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যপর্যায়েও ব্রিটিশ বাহিনীর অবস্থা আশাব্যঞ্জক ছিল না; সীমান্ত থেকে শোনা যাচ্ছিল পর্যায়ক্রমিক দুঃসংবাদ। পশ্চাদপসরণের জন্য সেনাবাহিনী রাঢ় অঞ্চল দিয়ে ডিফেন্স লাইন প্রস্তুত করছে। বনজঙ্গল উজাড় করে আসছে জিপ, লরি, তাঁবু, যন্ত্রপাতি এবং বিচিত্র মানুষ। রাঢ়ের অনুর্বর মাটিতে স্থাপিত হয়েছে সেনাক্যাম্প। হরিকৃষ্ণ রায় ছোট্ট ঘোড়ায় চড়ে সাঁওতাল পল্লিতে কুলিসংগ্রহ করছে। এ ব্যবসায় মন্দ নয়, পরিশ্রম অল্প কিন্তু কমিশন বেশি।

বংশানুক্রমিক ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে সাঁওতালরা এসময় অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে কুলি-পেশা অবলম্বন করে। আসানসোল থেকে বড় মোটরগাড়ি যেন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে, এজন্য তারা রাস্তা প্রস্তুত করে। শুকলাল ঘর্মাক্ত দেহে মাটি কাটে এবং সোনা সেগুলো ফেলে আসে পথের ধারে। পিপাসায় ভোগবতীর স্বচ্ছ জলধারার পরিবর্তে এরা পান করে একটি বদ্ধ দিঘির দুর্গন্ধময় কাদাজল। অনতিদূরে তাঁবুর ছায়ায় বসে কাজের তদারকি করে এক ইংরেজ। তার সরবরাহকৃত মদে সাঁওতালরা ভুলে থাকে ভোগবতীকে। এসময় তাদের রক্তে জাগে আসুরিক মত্ততা, রৌদ্রদগ্ধ দুপুরেও তারা প্রবল বেগে রুক্ষ মাটিতে কোদাল চালাতে থাকে। মদের নেশা কেটে গেলে তারা অবসাদে নুয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সোনা মজুরির টাকা পাথরের ওপর নিক্ষেপ করতে চায়, শুকলাল পরদিন থেকে কাঠসংগ্রহের ভাবনায় ভাবিত হয়। অথচ রাত্রিশেষে তারা বিস্মৃত হয় সমস্ত সংকল্প।

রাস্তা তৈরি সম্পন্ন হলে তার ওপর চলাচল করতে শুরু করে ভারী যানবহন। একদিন একজন ড্রাইভারের মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে একটি গাড়ি উল্টে যায়। সাঁওতাল মেয়েরা সেখানে ঝুড়ি ভরে মাটি ফেলছিল।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভোগবতী', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

গাড়িচাপায় সোনা প্রাণ হারায় এবং গাড়ির মধ্য থেকে বের হয় এক সাহেবের রক্তাক্ত মৃতদেহ। এটিই নাকি 'যুদ্ধের ক্যাজুয়ালিটি' :

> অমন কত হয় – অমন কত হয়েছে। কে তার খবর রাখে, কে তা নিয়ে নিজেকে বিব্রত বোধ করে ? ডিফেন্স লাইন তৈরি করতেই হবে – বৃহত্তর প্রয়োজনের জন্যে, অসুরদের নিপাত করে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্যে। একটা সাঁওতাল মেয়ের মৃত্যু। তার জন্যে মাটি কাটা বন্ধ থাকবে না – মাটি ফেলাও না।[১]

স্ত্রীর মৃত্যুর পর শুকলাল কুলিপেশা ছেড়ে দেয়। তার বিশ্বাস – পাহাড়ের দেবতা ভৈরবী ঠাকুর চরম প্রতিশোধ নিয়েছেন। এজন্য সে পাহাড়কে নির্মূল করতে চায়। দানবিক শক্তিতে সে পাহাড়ের গাছ উৎপাটন করতে থাকে। তৃষ্ণার্ত শুকলাল এরপর নেমে পড়ে বহুদিনের অনাস্বাদিত সুধাস্থলে। কিন্তু তখন ভোগবতীর চিহ্নমাত্র নেই, একটি লোহার পাইপ ঝরনা থেকে উঠে গেছে ক্যাম্পের দিকে। শুকলালের ধারণা – 'লোহার সাপ'টি বিনাশ করেছে ভোগবতীকে। তাই কুড়াল দিয়ে সে প্রচণ্ড শক্তিতে সেখানে আঘাত হানে। ঝনঝন শব্দে পাহাড় প্রকম্পিত হলে তার দিকে ছুটে আসে রাইফেলের গুলি। নিজের রক্ত লেহন করতে করতে শুকলাল পাইপের ওপর লুটিয়ে পড়ে। তখনও 'মিলিটারী কলোনীতে ট্যাপের মুখে ভোগবতীর স্নিগ্ধ জল ঝরে পড়ছে শত ধারায়। সে জল তেমনি নির্মল, তেমনি স্বচ্ছ, শুকলালের রক্তের এতটুকুও লালের আভাস তাতে লাগেনি।'[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মুক্তধারা* (১৯২২) নাটকের অভিজিৎ-চরিত্রের সঙ্গে শুকলালের এই আত্মত্যাগের সাদৃশ্য পেয়েছেন জনৈক সমালোচক। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> শুকলালের ভোগবতীর ধারাকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা মনে পড়ায় আর একটি রবীন্দ্রনাটক, – 'মুক্তধারা'কে। সেখানে অভিজিৎ প্রাণের বিনিময়ে যন্ত্রাসুরের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন মুক্তধারাকে। তবে শুকলাল 'লোহার অজগর'টিকে প্রাণপণে ভাঙতে গিয়েও পারেনি, শেষ পর্যন্ত সেন্ট্রির গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে।
>
> 'ভোগবতী' নামটিও 'মুক্তধারা'র কথাই মনে পড়িয়ে দেয়, – দুই-ই এক বন্ধনপ্রাপ্ত জলধারার কাহিনী। 'মুক্তধারা' সেখানে নাটকের বিষয়কে, অভিজিৎ চরিত্রটিকে ব্যঞ্জনার অনুকরণে, প্রতীকী তাৎপর্যে উজ্জ্বল করে তুলেছে, অন্যদিকে পাতালের নদী 'ভোগবতী' মুহূর্তের জন্য উচ্ছ্বসিত হয়ে, পুনশ্চ মিলিটারী ক্যাম্পের 'পাতালে' ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। – এ যেন সোনা শুকলালের নিঃশেষ অবলুপ্তির কাহিনী।[৩]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

[৩] সুস্মিতা ঠাকুর, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

'একটি শত্রুর কাহিনী'[১] গল্পে 'ভারতের শত্রুমিত্র নিরূপণের চিরন্তন প্রশ্ন একাগ্র হয়ে উঠেছে যুদ্ধের দুর্দিনে।'[২] এ গল্পে দুর্গম অঞ্চলে তুরী, মুন্ডা ও সাঁওতালদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে চান পাদ্রি ডোনাল্ডস। কুড়ি বছরের সাধনায়ও তিনি এ-কাজে বিশেষ সাফল্য প্রদর্শন করতে পারেননি। দীক্ষাগ্রহণের পরও সাঁওতালরা প্রভু যিশুর নয়, পরমোল্লাসে বোঙ্গার পুজো দেয়। এই ব্যর্থতার পরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি ডোনাল্ডসের। কিন্তু বার্ধক্যদশায় দূর-দূরান্তে ধর্মপ্রচার তার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। শরীরে রক্তচাপের লক্ষণ পাওয়ায় সিভিল সার্জন তাঁকে সতর্ক করেছেন। ডোনাল্ডসকে সহযোগিতার জন্য গির্জায় আসেন জার্মানি ধর্মযাজক হ্যান্‌স। এই তরুণ সহকর্মীকে পেয়ে স্বভাবত আশাবাদী হয়ে ওঠেন ডোনাল্ডস।

একদিন জোসেফ ইম্যানুয়েলের সঙ্গে নতুন পাদ্রি ধর্মপ্রচারে বের হন। দুবছর পূর্বে জোসেফ এ অঞ্চলে ডোঙা সাঁওতাল নামে পরিচিত ছিল। শীতকালে রবিশস্যের মিষ্টি গন্ধে হ্যান্‌স আত্মহারা হয়ে ওঠেন। ম্যাক্সমুলারের গ্রন্থপাঠে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ সৃষ্টি হয়েছে, তার বাস্তব প্রতিফলন তিনি উপলব্ধি করতে পারেন। এসময় মাঠের পাশে কাদাজলের মধ্যে সাঁওতাল শিশুরা মাছ ধরছিল। জোসেফকে দেখে তারা 'ডোঙা', 'ঠোঙা' বলে চিৎকার করে। এরূপ ব্যঙ্গাত্মক সম্বোধনে জোসেফ হিংস্র হয়ে ওঠে এবং অশ্রাব্য গালাগালি করে। বালকদের সংস্পর্শে যাওয়ার ব্যাপারে সে হ্যান্‌সকে নানাপ্রকারে নিবৃত্ত করে। পাদ্রিকে দেখে ভীতসন্ত্রস্ত বালকদল ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যায়। ধর্মপ্রচারের শুরুতে হ্যান্‌স এদের ভয় দূর করতে চান। প্রাণপণে দৌড়ে তিনি দুজনকে ধরে ফেলেন। প্রথমে আর্তনাদ করলেও পাদ্রির আন্তরিকতায় তারা আশ্বস্তবোধ করে। জোসেফকে অবাক করে তিনি বালকদের নিয়ে মাছশিকারে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ফলে এদিন তিনি অন্য কোনো এলাকায় যেতে পারেননি।

গির্জায় ফিরে ডোনাল্ডসের কাছে জোসেফ সমুদয় ঘটনা বিবৃত করে। সাঁওতাল বালকদের প্রসঙ্গে সে 'ছোটোলোক', 'ব্ল্যাক প্যাগান' বলে কটুকাটব্য করে। ডোনাল্ডস বুঝতে পারেন – দৈহিক কাঠামো অপরিবর্তিত থাকলেও, 'ক্রিশ্চিয়ানিটি'র মহিমায় লোকটির মানসিকতায় রূপান্তর ঘটেছে। তিনি এখন স্বগোত্রীয় সাঁওতালদের তুলনায় নিজেকে অভিজাত ভাবতে শুরু করেছেন। বাক্যব্যয় না করে তিনি জোসেফকে নব উদ্যমে কাজ

---

[১] 'একটি শত্রুর কাহিনি' *বর্তমান* পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১৩৫৪) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] উদ্ধৃত : (ভূমিকা : জগদীশ ভট্টাচার্য), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

করবার তাগিদ দেন। কিন্তু হ্যান্স কাউকেই বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করতে চান না। স্বতন্ত্ররূপে প্রত্যেকের ভালো থাকবার মধ্যে তিনি ধর্মীয় মাহাত্ম্য খুঁজে পান।

এরপর জোসেফ প্রায়শ হ্যান্স সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা নানা তথ্য পরিবেশন করতে শুরু করে। ধর্মযাজক হয়ে হ্যান্স বাজারের তেলেভাজা জিলাপি খান, কড়া তামাকে টান দিয়ে কাশতে থাকেন – এসব জোসেফ মানতে পারে না। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি হ্যান্সের আকর্ষণ প্রত্যক্ষ করে জোসেফ লজ্জাবোধ করে। হ্যান্সের ভারতপ্রীতি তার কাছে মতিভ্রম বলে মনে হয়। ডোনাল্ডসের তোষামোদ করে সে ইউরোপে পাড়ি জমানোর স্বপ্ন দেখে। ইতোমধ্যে সাঁওতালরা জোসেফের পাশাপাশি ডোনাল্ডসের প্রতিও বিরূপতা প্রদর্শন করে। আদিবাসীদের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য তারা হ্যান্সকে দায়ী করে। এ-পর্যায়ে একদিন বলি-দেওয়া মুরগি নিয়ে হ্যান্স গির্জায় প্রবেশ করলে, ডোনাল্ডস ক্ষিপ্ত হন। হ্যান্স নিশ্চিত যে, এসব জোসেফের চক্রান্ত। বাদানুবাদের এক পর্যায়ে জোসেফ ভয়ঙ্কর হুঙ্কারে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; আত্মরক্ষায় হ্যান্সও পাল্টা আঘাত করেন। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় হ্যান্সকে গির্জা থেকে বহিষ্কার করেন ডোনাল্ডস ।

অতঃপর দীর্ঘ ছয় মাসের ব্যবধানে হ্যান্স ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। হাটখোলার বটগাছ তলায় তিনি শিবের গাজনে নৃত্য করছেন; আর সমবেত মানুষজন তা দেখছেন। এসময় ভারতবর্ষের অভাবী, অনাহারী মানুষের জন্য শিবসজ্জিত-হ্যান্স অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠেন। তিনি মনে করেন, এ দারিদ্র্যের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে ডোনাল্ডসদের। আচমকা জোসেফের কণ্ঠস্বরে তাঁর ঘোর কাটে। এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে সে হ্যান্সের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করে। প্রাক্তন সহকর্মীকে এ অবস্থায় দেখে ডোনাল্ডস ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে হ্যান্স বন্দি হন। এ গ্রেপ্তারের কারণ শুধু গাজন-নৃত্য নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হ্যান্সের স্বদেশ জার্মানির অবস্থান ছিল যেহেতু ইংল্যান্ডের বিপরীতে, সেহেতু তিনি ভারতের শত্রু। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ভাষ্য – 'ইন্ডিয়া ইজ নাউ অ্যাট ওয়ার উইথ্ জার্মানী।'[১]

পথিমধ্যে একটি পূজামণ্ডপের সামনে ম্যাজিস্ট্রেট ভক্তিভরে দাঁড়ান। প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে কালীপুজো হচ্ছে। হ্যান্সের ক্রিয়াকলাপ খ্রিস্টান ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট 'শেম' হলেও, যুদ্ধজয়ের বাসনায় তিনিই পূজা দিচ্ছেন। অকস্মাৎ হ্যান্স মণ্ডপের দিকে একটি পানির ফ্লাস্ক নিক্ষেপ করেন। এর ফলে কালীমূর্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। বিপুল মত্ততায় তিনি পুনরায় গাজন নৃত্য শুরু করেন এবং বলেন – 'নাউ আই অ্যাম এ ট্রু

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'একটি শত্রুর কাহিনি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮

এনিমি অ্যান্ড এ ট্রু ইয়োরোপীয়ান। অ্যাম আই নট ?'[1] জার্মানির বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত পূজা-অর্চনা নস্যাৎ করে হ্যান্স দেশপ্রেম প্রদর্শন করতে চাননি; বরং ম্যাজিস্ট্রেট, ডোনাল্ডস এবং ডোঙা সাঁওতালের বকধর্মিতার প্রতিবাদ করেছেন।

হ্যান্সের মতো কিছু বিদেশি নাগরিক ভারতবর্ষকে ভালোবাসতেন। এদেশীয়দের জন্য তাঁদের অনেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদানও রেখেছেন। এঁদের প্রতি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রদর্শন করেছেন অপরিসীম শ্রদ্ধা।[2] এ গল্পে বাংলার মাটি-মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মমতা লালন করেও হ্যান্স বন্ধুত্বের স্বীকৃতি অর্জনে ব্যর্থ হন। উপরন্তু যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে তিনি এদেশের শত্রু বলে চিহ্নিত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোমেন দে চৌধুরীর বীরত্বের কথা রয়েছে 'তিলঙ্গমা' গল্পে। ব্রিটিশ-ভারতীয় বিমানবাহিনীর চৌকস অফিসার ছিলেন তিনি। যুদ্ধকালে সোমেন ফাইটার প্লেন এবং মেশিনগান নিয়ে ছুটে গেছেন 'এনিমি এরিয়ায়'। এ অকুতোভয় সৈনিক যুদ্ধশেষে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। 'তিলঙ্গমা'য় প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতীয় জনচিত্তে বিরাজিত নানা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার দৃশ্য। কয়েকটি বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

> ক) মালয়ের যুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয়নি। কলকাতার আলো তখনও ব্ল্যাক আউটের ঠোঙা পরেনি। [3]
>
> খ) বর্মা-মণিপুরের বনেজঙ্গলে লড়াই চলছে পুরোদমে – বোমার ভয়ে অন্ধকার কলকাতা প্রায় জনশূন্য। মিত্রশক্তির অবিমিশ্র মিথ্যে প্রোপ্যাগাণ্ডা সত্ত্বেও বেশ বোঝা যাচ্ছে, বাংলা দেশের অবস্থা খুব আশ্বাস পাওয়ার মত নয়। ওদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের গর্জন উঠছে রেডিওতে। সারা ভারতবর্ষের স্নায়ু থরথর করে কাঁপছে – তখন কোথায় লীলা, কোথায় কে ?[4]
>
> গ) আর তখনই শুনলাম পাশের পানের দোকানের রেডিয়োতে উইনস্টন চার্চিলের বক্তৃতার 'রিলে' চলছে : 'দরকার হলে আমরা ইংলিশ চ্যানেলের জলে নেমে যুদ্ধ করব, তবু নাৎসীদের কোনও শর্ত গ্রহণ করব না।'

---

[1] প্রাগুক্ত

[2] 'জে বি এস হল্‌ডেন এবং – ' শীর্ষক এক লেখায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পরিষ্কার করেন –
"আমরা বাঙালীকে চিনি না, ভারতবর্ষকে চিনি না, স্বদেশকে চিনি না। চিনতে আমাদের লজ্জা হয়। অথচ আমাদের অকুণ্ঠভাবে চিনতে পারেন হ্যামারগ্রেন, নিবেদিতা, হল্‌ডেন। সেই চেনা দূর থেকে মাক্সমূলারের ভাবের চোখ দিয়ে নয়, রম্যা রলাঁর মহামানব-চর্চার মধ্য দিয়েও নয়। দুঃখ, দৈন্য, অশিক্ষা, আধি-ব্যাধি – সব-কিছুর মধ্যে ভারতবর্ষের যে প্রাণ – যে সত্য আছে, তা তাঁরা খুঁজে নিতে পারেন। আমরা পারি না – আত্মাবমাননাই আমাদের ব্যসন হয়ে দাঁড়িয়েছে !" (উদ্ধৃত : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সুনন্দর জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২)

[3] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তিলঙ্গমা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

[4] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

> আমার মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক বোমারু উড়ে গেল – খুব সম্ভব ফ্রন্টের দিকে। লীলার কথা ভাববার মত সময় কোথায় তখন ?
>
> আরও অনেক জল গড়িয়ে গেল তারপর। আরও আট বছর। যুদ্ধ শেষ; দাঙ্গা, স্বাধীনতা, পাকিস্তান, রিফিউজি সমস্যা।[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন 'তিমিরাভিসার' গল্পের ডাক্তার প্রণবেশ। আসাম-মণিপুর ফ্রন্টে তখন বর্ষিত হচ্ছে মেশিনগানের অবারিত গুলি, সারারাত বোমা পড়েছে চতুর্দিকে। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়ংকর এ-পরিবেশে প্রণবেশ পানির তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন মদের বোতলে। রণাঙ্গনে মদের কার্যকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন –

> 'মানুষের মনুষ্যত্ব মুছে ফেলতে ওর মতো উপকরণ আর দুটি নেই। বিচার-বিবেক বিসর্জন দিয়ে নিরঙ্কুশ পশুকে জাগাতে হলে ওইটিই হল তার শ্রেষ্ঠ আহুতি।... মদ না খেলে অমন সহজে সর্বনাশের রাস্তায় নেবে যাওয়া যায় না।'[২]

বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়রা কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তার বৃত্তান্ত রয়েছে 'আতিথ্য'[৩] গল্পে। গল্পের প্রারম্ভে গল্পকথক জানিয়েছেন – 'এই কাহিনী গত মহাযুদ্ধের কোনো ভারতীয় সৈনিকের কাছ থেকে শোনা। সামরিক আদালতে তার কোর্টমার্শাল হয় – কয়েক বছর জেলও খাটতে হয়েছিল তাঁকে। এখন তিনি কোনো মেশিন-টুল কোম্পানীর ট্রাভেলিং এজেন্ট।'[৪] 'আতিথ্য' গল্পের প্রধান চরিত্র আর-এন; বিশ্বযুদ্ধের কিছু দুঃখজনক স্মৃতি সে গল্পকথকের কাছে ব্যক্ত করেছে।

কাশীতে অবস্থানসূত্রে আর-এনের সঙ্গে পরিচয় হয় কে-পির। দুজনই সাধারণ কর্মচারী, ভোরবেলা তারা গঙ্গার নির্জন ঘাটে বেড়াতে যায়। স্নানশেষে কে-পি অসাবধানতাবশত নদীতে পড়ে যায় এবং সাঁতার না জানায় ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। অন্যদিকে 'লাইফ সেভিং'-এ ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী আর-এন অতি কষ্টে তাকে উদ্ধার করে। এভাবে ভারতবর্ষের দুটি ভিন্ন প্রদেশের দুই নাগরিকের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। কে-পি বন্ধুকে নিজ গ্রামে নিমন্ত্রণ করে। সন্তানের জীবনরক্ষার জন্য কে-পির মা আর-এনকে সন্তান জ্ঞান করেন, তার বোন অপেক্ষা করে ভাইফোঁটা দেওয়ার জন্য। বাবার সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে আর-এন দীর্ঘদিন ঘরছাড়া। অকৃত্রিম স্নেহ-মমতার মোহে সে-ও আতিথ্যরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তার ছুটির আবেদন না-মঞ্জুর হয়। এক সপ্তাহ পর সে জানতে পারে, ম্যালেরিয়ায় কে-পির মৃত্যু হয়েছে। শেষপর্যন্ত আর-এনের ভাইফোঁটা জোটে না।

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তিমিরাভিসার', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮৬

[৩] 'আতিথ্য' *আন্তর্জাতিক* পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১৩৬৩) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আতিথ্য', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

সময়ের ব্যবধানে বন্ধুর স্মৃতি আর-এন অনেকটা ভুলে যায়। অধিক উপার্জনের আশায় সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়, যদিও চাকরিটি ক্ষণস্থায়ী। রণাঙ্গনে আর-এনের জীবনদর্শন ক্রমশ লোপ পায়, সর্বক্ষণ তাকে অতিক্রম করতে হয় বিপৎসংকুল পথ। মণিপুরের যুদ্ধ থেকে মিত্রশক্তি যখন পিছু হটছে, তখনও সৈনিকদের পাঠানো হচ্ছে সম্মুখসমরে। রাইফেলের গুলিতে যে কোনো সময় তাদের মৃত্যু হতে পারে। আকর্ষণীয় বেতনের লোভে তারা ব্যবহৃত হচ্ছে কামানের খোরাকরূপে।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে আর-এনরা পূর্ব-ভারতে তাঁবু স্থাপন করে। সেনাক্যাম্পে খাদ্যতালিকা দুর্বল হলেও, মৃত্যুকে ভোলার জন্য মদের বন্দোবস্ত ছিল অফুরন্ত। সৈন্যেরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে নিয়ে আসে গাছের ফল, নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে মিষ্টি-মিঠাই। তাদের ভয়ে গ্রামবাসী সকলে সদা-শঙ্কিত। এরমধ্যে কয়েকজন সৈনিক একটি মেয়ের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী তাদের নিদারুণ প্রহার করে। এ ঘটনার প্রতিশোধ নিতে সেনাবাহিনী নেমে পড়ে ‘একপাল নেকড়ের মতো’। পৈশাচিক তাণ্ডবের পর তারা পুরো গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ব্যারাকে ফিরে আর-এন বুঝতে পারে, এটি তার বন্ধু কে-পির গ্রাম। এরপর কয়েকটি প্রশ্ন তাকে উপর্যুপরি বিদ্ধ ও রক্তাক্ত করতে শুরু করে :

> এতদিন পরে কি এইভাবেই কে-পির নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছি আমি ? এইভাবেই কি নিয়েছি তার মায়ের আশীর্বাদ – তার বোনের হাতের ভাইফোঁটা ? যার মেঘের মতো কালো চুল আর হরিণের মতো চোখ নিয়ে কে-পি কবিতা লিখত, এমনি করেই কি আমার পরিচয় হল তার সঙ্গে ?[১]

এ ধ্বংসযজ্ঞের পর স্তম্ভিত আর-এন নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি। রিভালবার তুলে সে বুকে গুলি চালালেও, বুলেটবিদ্ধ হয় তার কাঁধ। সুস্থ হবার পর কোর্টমার্শালে তার জেল হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাঙালি যুবাশ্রেণির অংশগ্রহণের কারণ এবং তাদের শোচনীয় পরিণতি প্রদর্শন করেছেন। ঐতিহাসিক সত্যকে তিনি উপস্থাপন করেছেন সাহিত্যিক ব্যঞ্জনায়।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

আগস্ট আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ আতঙ্কিত জীবনযাপনে বাধ্য হয়। জাপানি বোমাহামলায় একে একে বিধস্ত হতে থাকে শান্তিপূর্ণ জনপদ। এ যুদ্ধ এড়াতে মহাত্মা গান্ধী ইংরেজদের ভারত ছাড়ার জন্য দুর্বার কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তাঁর আহবানে দেশের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন দেখে প্রশাসন বিচলিত হয় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এরপরও ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি এ-আন্দোলনের বিরোধিতা করে। পার্টির প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আগস্ট বিপ্লবের উত্তাপ সাহিত্যে সঞ্চারিত করেন। তাঁর *মন্ত্রমুখর* উপন্যাসে পরিবেশিত হয়েছে এ আন্দোলনের বিশ্বস্ত চিত্র। এছাড়া তাঁর 'ইতিহাস', 'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু' 'প্র্যাকটিস্', 'কনে-দেখা আলো', 'সীমান্ত', 'বন-জ্যোৎস্না' প্রভৃতি গল্পে আগস্ট বিদ্রোহের স্বরূপ কম-বেশি উপস্থাপিত হয়েছে।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমার রক্তাক্ত সংঘাত 'ইতিহাস'[১] গল্পে ভাষারূপ পেয়েছে। ব্রিটিশ রাজশক্তির ওপর অনাস্থা দেখিয়ে সেখানে গঠিত হয়েছিল 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' (১৯৪২)। কেবল এ আন্দোলন নয়, দেশের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে মেদিনীপুরের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ছিল। জনপদটি তখন 'বাংলার বারুদখানা' নামে চিহ্নিত হতো। এ মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮) এবং মাতঙ্গিনী হাজরার (১৮৬৯-১৯৪২) মতো অকুতোভয় দেশপ্রেমিক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে এ জেলায় প্রাণ হারিয়েছেন অসংখ্য মুক্তিকামী বাঙালি।[২] কেবল 'ইতিহাস' নয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি গল্পের পট-পরিবেশ এই মেদিনীপুর। এতৎপ্রসঙ্গে 'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু', 'কনে-দেখা

---

১ 'ইতিহাস' *কথাশিল্প* গল্পসংকলনে (আশ্বিন ১৩৫৩) প্রথম সন্নিবেশিত হয়।

২ ১৯০৮-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলায় বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে শহিদদের তালিকা নিম্নরূপ :

'১৯০৮-১৯১৮	সহিংস	-	৩
১৯২২	অহিংস	-	১
১৯৩০-১৯৩৪	সহিংস	-	৬
১৯৩০-১৯৩৪	অহিংস	-	৭০
১৯৩৬	সহিংস	-	১
১৯৪২-১৯৪৪	অহিংস	-	১২৫
১৯৪৫	অহিংস	-	১
মোট আন্দোলন পর্বে শহীদ		-	২০৭'

(উদ্ধৃত : শঙ্কর কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪)

আলো', 'নেতার জন্ম', 'কালো মোটর', 'লক্ষ্মীর পা', 'ট্যাক্সিওয়ালা' প্রভৃতি গল্প স্মরণীয়। 'ইতিহাস' গল্পের অন্যতম চরিত্র অমরেশ বর্ণনা করেছেন প্রাচীন মেদিনীপুরের বিপ্লবগাঁথা :

> মহারাজ চক্রবর্তী অশোকের অজেয় বাহিনী যেদিন কলিঙ্গ জয় করিতে আসিয়াছিল, সেইদিনের সেই মৃত্যুযজ্ঞে কতজন বাঙালী রক্ত দিয়াছিল, ইতিহাস তাহার উল্লেখ করে নাই। কিন্তু সেদিন এই মেদেনীপুর কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল। সেদিন কলিঙ্গ সৈন্যের পুরোভাগে যাহারা প্রাণ দিয়াছিল, তাহারা বাংলারই সন্তান।[১]

অমরেশ তিরিশ বছর শিক্ষকতা করেছেন। দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের তিনি আত্মমগ্ন পাঠক। অবসরগ্রহণের পর তিনি পঞ্চগৌড়ের ইতিহাস লিখতে শুরু করেছেন। এ-পর্যায়ে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে সংবাদপত্রে ছাপা হতে থাকে ব্রিটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ-বিদ্রোহ ও রক্তপাতের কাহিনি। সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে স্বাধীনতার অমরমন্ত্র – বন্দে মাতরম্। এ ধ্বনিতে চারদিক প্রকম্পিত হলে অমরেশ শঙ্কিত হন। তাঁর পুত্র লোকেশ সন্ধ্যার পরও বাড়ি ফেরেনি, বাইরে সভা করছে।

লোকেশ সম্প্রতি অর্থনীতিতে এমএ পাশ করেছে, তার ছোটোবোন প্রণতি বিএ পরীক্ষার্থী। প্রণতি পড়ালেখার পাশাপাশি চিত্রাঙ্কন করে, আর লোকেশ দেশের হালচালে উত্তেজিত ও অস্থির সময়যাপন করে। স্কুলের ছাত্র থাকাকালেই লোকেশ জড়িয়ে পড়ে লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন ও সত্যাগ্রহে। জেল-জরিমানা সত্ত্বেও চলমান রাজনীতির সঙ্গে সে সর্বদা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখে। পুলিশ একাধিকবার বাড়ি তল্লাশি করলেও অমরেশ পুত্রকে কখনো শাসন করেননি। তিনি সন্তানদের চিন্তায় ও কর্মের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

অনেক রাত্রে লোকেশ বাড়ি এলে প্রণতি আতঙ্কবোধ করে। সে রয়েছে উভয় সংকটে : একদিকে পিতা ইতিহাসচর্চায় নিমজ্জিত রয়েছেন, অন্যদিকে দাদা চলেছে সংশয়াকীর্ণ বিপ্লবের পথে। লোকেশ ইতোমধ্যে প্রণতিকে জানিয়েছে – "বিছানায় শুয়ে কাশতে কাশতে 'গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম' – ও আমার পোষাবে না।"[২] সাধারণ মৃত্যু নয়, দেবদূতের মতো সে জীবনাবসান ঘটাতে চায়। অমরেশ তাকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের তাগিদ দেন। তবে লোকেশ বোঝে এটি পিতার আন্তরিক বক্তব্য নয়; তাঁর পাণ্ডুলিপিতে লেখা রয়েছে অন্য কথা – 'সেই দারুণ দুর্দিনে দেশের গণশক্তি জাগিয়া উঠিল। এই অরাজকতার অত্যাচার দূর করিবার জন্য।'[৩]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ইতিহাস', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪

এক নিঃশ্বাসে চা শেষ করে লোকেশ বেরিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর বন্দর-এলাকা শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে; সমস্ত আকাশ ধারণ করে রক্তবর্ণ, এবং মুহুর্মুহু শোনা যেতে থাকে বন্দুকের শব্দ। পরদিন ভোরে দারোগা এসে অমরেশের জবানবন্দি নেয়। তিনদিন পর বাড়িতে আসে লোকেশের বীভৎস মৃতদেহ, সঙ্গীরাও পর্যায়ক্রমে জেল থেকে ফিরতে শুরু করে। প্রণতির কাছে ভয়াল সেই রাতের বর্ণনা করে লোকেশের এক সহযোদ্ধা। সংঘর্ষকালে লোকেশের দিকে গুলি ছুঁড়েছিল থানার বেটে দারোগা। কিন্তু প্রণতি এসব আলোচনায় আগ্রহবোধ করে না। সে বরং তার দাদার স্মরণে আঁকতে থাকে 'দেবদূতের মৃত্যু' নামের একটি চিত্রকর্ম। অমরেশও ইতিহাসচর্চায় হয়ে ওঠেন নিবেদিতপ্রাণ। পৌণ্ড্রবর্ধন, মহাস্থানগড়, তাম্রলিপ্তের সমুদ্রতট এবং বিক্রমপুরের বীর সেনাদের মাঝে তিনি খুঁজে পান শহিদ সন্তানের অস্তিত্ব।

হঠাৎ মেদিনীপুরে আরম্ভ হয় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। অমরেশের বাড়ি ব্যতীত গ্রামে কোনো অট্টালিকার অস্তিত্ব নেই। প্রাকৃতিক এ-দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিপন্ন মানুষ আশ্রয় নিয়েছে এ-বাড়িতে। দুর্গতদের জন্য প্রণতি উন্মুক্ত করে দিয়েছে তাদের বাড়ি। আশ্রয়-প্রার্থনায় এক মাসের শিশুকে বুকে জড়িয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে আছে দারোগা-পত্নী, তার পেছনেই লোকেশের হত্যাকারী। সবাইকে অবাক করে প্রণতি দারোগার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে যায়। ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার মধ্যে চলতে থাকে পিতা অমরেশের কলম :

> এই হিংসা-দ্বেষ জর্জরিত বাংলাও আবার প্রাণ পাইবে, আবার জাগিয়া উঠিবে নতুন শক্তি লইয়া, নতুন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া ! অন্ধকার বাংলার আকাশে স্বাধীনতার সূর্য দেখা দিবে। চরম সর্বনাশের পটভূমিতে, চরম দুর্গতির পরমলগ্নে সমস্ত জাতি আসিয়া দাঁড়াইবে সর্বজনীন ঐক্যের বেদীতে। যাহারা পরস্পরের বুকে আঘাত হানিতেছে – মোহে অন্ধ হইয়া, স্বার্থে আত্মবিস্মৃত হইয়া – সেদিন সর্বগ্রাসী মৃত্যুর হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইতে গিয়া তাহাদের হাতে হাতে রাখী বাঁধিতে হইবে। দেশে দেশে ইতিহাসের ইহাই শিক্ষা।[১]

চরম সর্বনাশে সমগ্র জাতি যে একত্র হয়, তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। এ গল্পেও বাইরের জলগর্জন সত্ত্বেও ঘরের ভেতর প্রণতি এবং দারোগা-পত্নীর রাখী বন্ধনের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

আগস্ট আন্দোলনের প্রায় প্রতিটি বিষয় 'ইতিহাস' গল্পে প্রাসঙ্গিকভাবে স্থান পেয়েছে। গান্ধীজির 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' রণমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে লোকেশ বলেছে – "ডু অর ডাই।' আমার জন্য ভাবিসনি নতি।"[২] নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভায় 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হলে ব্রিটিশ সরকার দলটিকে নিষিদ্ধ করে। এ অন্যায়ের

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫

প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামে এবং বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় হামলা করে। বিক্ষোভকারীদের দমন করতে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। ইতিহাসের এসব তথ্য এ গল্পে সন্নিবেশিত হয়েছে :

> ক) ১৯৪২ সালের অগাস্ট মাস। আসমুদ্র হিমালয়ে আগুন জ্বলে উঠেছে। খবরের কাগজে পাতায় পাতায় বিক্ষোভ আর উত্তেজনার বিবরণ, মৃত্যু আর রক্তপাতের কাহিনী। সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়েছে এখানেও।[১]
>
> খ) উনিশশো বিয়াল্লিশের আগস্ট এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে। নেতৃহীন দেশের যা কিছু বিক্ষোভ ভেঙে পড়েছে সর্বনাশা মূর্তিতে। আগুন জ্বলেছে, রক্ত ঝরছে।[২]

কংগ্রেসের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সমর্থন করেনি সেসময়ের কমিউনিস্ট পার্টি। এ আন্দোলনের পরিণাম সম্বন্ধে তারা সংশয়াপন্ন ছিল। বাবা-ভাইকে লক্ষ করে প্রণতির দুটি প্রশ্ন এ-সত্যকেই ইঙ্গিত করে :

> ক) ট্রাম জ্বলছে, স্টেশন জ্বলছে, পুলিশের গুলি চলছে। এত রক্ত আর আগুন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে আর কখনো তো দেখা যায়নি। আমরা ভুল করিনি তো বাবা ?[৩]
>
> খ) কিন্তু দাদা, সত্যাগ্রহের দীক্ষা কি আমরা এইভাবেই নিয়েছিলাম ?[৪]

তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিপাদন করেছেন আগস্ট আন্দোলন রাজনীতিতে আকস্মিক নয়। দীর্ঘদিন ব্রিটিশ অত্যাচারে নিষ্পেষিত জনতার অগ্নিরোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ বিদ্রোহে। ১৯৪২ সালে লোকেশের মতো হাজারো বীরের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে :

> একবার হয়তো ভুল হয়েছে আমাদের, একবার হয়তো হার মেনেছি আমরা। কিন্তু সেইখানেই কি শেষ ? বারে বারে এমনি অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা পদচিহ্ন এঁকে যাই – আমাদের রক্তাক্ত পদলেখা জ্বলজ্বল করে জালিয়ানওয়ালায়, সেবাগ্রামে, কর্ণফুলীর তীরে, বুড়ী-বালামের অরণ্যে, মেদিনীপুরের রাঙা মাটিতে। ভাবীকালের পদনির্দেশ সেই রক্তলিপিতে।[৫]

মেদিনীপুরের আগস্ট আন্দোলনের খণ্ডিত চিত্র পাওয়া যায় 'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু' গল্পে। মিলিটারিরা গ্রাম জ্বালিয়ে দিলে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটতে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে এক জঙ্গলের ভেতর মধ্যরাতে স্বাধীনকুমারের জন্ম হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই সে বাবাকে হারায়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭

বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে তার বাবা ধানক্ষেতের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে। মৃত্যুকালেও সংগ্রামী লোকটি আঁকড়ে ধরে ভারতের জাতীয় পতাকা।

আগস্ট আন্দোলনের পর ভারতীয় জনমানসে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। 'প্র্যাকটিস্' গল্পে বলা হয়েছে – 'উনিশশো বিয়াল্লিশের পর থেকে কী যে হয়ে গেছে, মানুষগুলো গুলিগোলাকে ভয়ই করে না আজকাল। একবার মরলে দ্বিতীয়বার যে আর মরা যায় না এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই একবার মরাটাও যে খুব একটা কঠিন দুঃসাধ্য ব্যাপার না – কী করে লোকে এই সত্যটাকে বুঝে ফেলেছে, আশ্চর্য !'[১] একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেও জনগণকে শান্ত রাখা যাচ্ছে না। পুলিশের গুলিকে এরা অগ্রাহ্য করতে শিখেছে। এমনকি মেশিনগান-সজ্জিত ফৌজকেও তারা বিদ্রূপ করে।

কেবল ছাত্র-জনতা নয়, সেনাবাহিনীর দেশীয় সদস্যরাও এসময় আত্মগ্লানিতে ভুগতে শুরু করে। জীবিকার তাগিদে চাকরি করলেও, তারা সর্বক্ষণ মুক্তির উপায় খোঁজে। এ গল্পে ইংরেজ মেজরের পায়ের কাছে আচমকা ঢিল পড়লে সে গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেয় এবং চৌদ্দ বছরের এক কিশোর মৃত্যুবরণ করে। তার হাতের পতাকা তারই বুকের রক্তে রঙিন হয়ে ওঠে। ব্যারাকে ফিরে আর্মড কনস্টেবল অচ্ছয়লাল অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়। কারণ, কংগ্রেসের ওপর এই প্রথম সে গুলি ছুঁড়েছে। এসময় তার অন্তর্ভাবনা অনুধাবনীয় :

> এ কী হল – কাদের ওপর গুলি চালালো সে ! খদ্দরের টুপি পরা, তে-রঙা পতাকা হাতে একদল ছাত্র। তাদের চোখে মুখে আর যাই থাক, দুশমনীর কালো পঙ্কিল ছায়াটা তো চোখে পড়েনি কোথাও ! বরং একটা অদ্ভুত আলো, একটা অপরূপ শুচিতায় কচি কিশোর মুখগুলি ঝলমল করছিল।[২]

প্র্যাকটিসের সময় অচ্ছয়লাল ভেবেছে – টিনের চাকতি বিদীর্ণ করবার মধ্যে সুখ নেই, জীবন্ত মানুষের দিকে গুলি চালানোই সৈনিক জীবনের সার্থকতা। অথচ কংগ্রেস-নিধনে সে গর্বিত বোধ করে না। বরং সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। পরদিন প্র্যাকটিসের সময় অচ্ছয়লালের গুলি ছুটে যায় ইংরেজ মেজরের কানের পাশ দিয়ে। অল্পের জন্য অফিসার প্রাণে বেঁচে যায়। রাগান্বিত হয়ে সে অধীন সৈনিকের গালে চড় বসিয়ে দেয়। তবে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এটি স্রেফ দুর্ঘটনা নয়। ইংরেজের অধীনে চাকরিরত বাঙালি কনস্টেবলের আত্মদহনের প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার প্রয়াস মাত্র। গল্পের শেষ বাক্য এ সত্যই নির্ধারণ করে – 'সব গড়বড় হয়ে গেছে।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্র্যাকটিস্', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২

অচ্ছয়লালের হাত এখনো প্র্যাক্‌টিস হয়নি।'[১] এ যাত্রায় ব্যর্থ হয়ে অচ্ছয়লাল কঠিন প্রশিক্ষণের সংকল্প করে, যেন পরবর্তীকালে নিশানা ব্যর্থ না হয়। 'প্র্যাকটিস্' গল্পে আগস্ট আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ নয়, বরং এর ইতিবাচক প্রভাবকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তুলে ধরতে চেয়েছেন।

'কনে-দেখা আলো'[২] গল্পে সুকুমার আগস্ট বিপ্লবের একজন বীরযোদ্ধা। এ আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তিনি আট বছর কারাগারে ছিলেন। জেলখানায় অনশনব্রত পালন এবং নির্যাতন ভোগের ফলে তার আলসার ধরা পড়ে। পেটের যন্ত্রণায় এখনো তিনি অস্থির থাকেন। জেল থেকে মুক্তির পর সুকুমার একটি খবরের কাগজে চাকরি করেন, পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকেন। সম্প্রতি তিনি একটি আত্মজৈবনিক উপন্যাস লিখতে শুরু করেছেন।

সুকুমারের পিতা ছিলেন নিষ্ঠাবান কংগ্রেস-কর্মী। স্কুলের হেডমাস্টার হিসেবে তিনি নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব জীবনযাপন করতেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে চাকরি ছেড়ে তিনি গ্রাম-সংগঠনে জড়িয়ে পড়েন। পরিণামস্বরূপ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেন এই দেশপ্রেমিক শিক্ষক। সব পত্রিকায় তাঁর সচিত্র মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়। পিতার শোচনীয় পরিণতি দেখেও সুকুমার তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এক ইংরেজ অফিসারের স্কুল-পরিদর্শনকালে তিনি বীরদর্পে উচ্চারণ করেন – 'বন্দেমাতরম্ – ভারত মাতা কি জয়'[৩]।

সুকুমারের পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের জাঁদরেল অফিসার দিব্যেন্দু। দিল্লির অভিজাত এলাকায় তিনি বড় হয়েছেন। তার বাবাও সরকারি কর্মকর্তা, সন্তানের জন্য তিনি সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা রেখেছেন। দিব্যেন্দু পাশ্চাত্য জীবন-প্রণালিতে অভ্যস্ত। মাঝেমধ্যে তাঁর ফ্ল্যাটে আড্ডা দেয় দু-চার জন মেয়েবন্ধু। 'রক্তে রাজভক্তি' থাকলেও দিব্যেন্দু সুকুমারের একাগ্রতা ও দেশাত্মবোধকে শ্রদ্ধা করেন। এজন্য নিজের কনে দেখার দায়িত্ব তিনি এই বিপ্লবীর ওপর অর্পণ করেন।

প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সুকুমার কনে দেখতে যান। রাসবিহারী এভিনিউয়ে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছলে গৌরাঙ্গবাবু তাঁকে সম্ভাষণ জানান। আলাপকালে জানা যায়, ভদ্রলোক দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং কনে তাঁর ভাগ্নি। মেদিনীপুরের বন্যায় বাবা-মাকে হারিয়ে মেয়েটি এখন মামাবাড়ির আশ্রিতা। অভ্যাগতদের সামনে মেয়েটির জড়ীভূত অবস্থা দেখে মনে হয়, বহুবার সে এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। তাই ভাগ্যের কাছে সে নিজেকে

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

[২] 'কনে দেখা আলো' *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কনে দেখা আলো', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

অসহায়চিত্তে সমর্পণ করেছে। সুকুমার দু-একটি প্রশ্ন করলে মেয়েটি আর্তস্বরে উচ্চারণ করে – 'কুমার দা'। সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার চিনতে পারেন – এ-মেয়েটি তাঁর পূর্বপরিচিতা মিনু।

এসময় সুকুমারের স্মরণ হয় আগস্ট বিপ্লবের উত্তাল দিনগুলির কথা। মিনু তখন তেরো-চৌদ্দ বছরের কিশোরী। পুলিশ মিনুর পিতাকে গ্রেপ্তার করলে সে বলেছিল – 'ওরা বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু এটা বোঝে না যে একটা মানুষকে আটকালেই বিপ্লবকে ঠেকানো যায় না।'[১] বর্বর সেনারা পাশের গ্রামে ক্যাম্প করেছে, জ্বালিয়ে দিয়েছে মানুষের ঘরবাড়ি। সুকুমারের সন্ধানদাতার জন্য তারা ঘোষণা করেছে 'মোটা পুরস্কার'। সুকুমার যে কোনো সময় বন্দি হতে পারেন – এমন আশঙ্কায় মিনু গভীর রাতে সুকুমারকে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। সুকুমারকে সে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে চায়।

জনবিরল নির্জন রাত্রিতে মিনু নির্ভয়ে সুকুমারকে নিয়ে পথ চলতে থাকে। সুকুমারের উদ্বিগ্নভাব দেখে সে সাহস যোগায় – 'ভয় করব কাকে ? সাপ তো ? ইংরেজের চাইতে তারা খারাপ নয়।'[২] পথিমধ্যে বুটের শব্দে তারা সচকিত হয়ে ওঠে। মিলিটারির টর্চ এবং রাইফেল উপেক্ষা করে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। অগত্যা মিনু সুকুমারের হাত ধরে নেমে পড়ে পচা, দুর্গন্ধময় একটি গর্তে। বুটের শব্দ নিকটবর্তী হলে সে নিরস্ত্র সুকুমারকে ভৎর্সনা করে। নিজের কোমরে রাখা একটি ছোরা দিয়ে সে শত্রুকে মোকাবেলায় কৃতসংকল্প হয়। অন্ধকারে অগ্নিকন্যার স্পর্শে সুকুমার সম্বিৎ ফিরে পান – 'মুহূর্তের জন্যে মনে হল আমার পাশে একটি কিশোরী মেয়ে বসে নেই – খানিকটা তীব্র আগুন স্পর্শ করেছে আমাকে – সেই আগুন – যা একদিন সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একাকার করে দেবে।'[৩]

সেনাবাহিনীর বুটের শব্দ মিলিয়ে গেলে তারা পুনরায় পথে নেমে পড়ে। পনেরো দিন পর গ্রামে ফিরে সুকুমার মেয়েটির দুর্দশা জানতে পারেন। মিনুকে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছিল, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 'কতগুলো প্রমত্ত জানোয়ারের' দল। সুকুমার গোপনে 'নিত্যশুচি' মেয়েটিকে দেখতে যান। এরপর দুজনের মধ্যে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার পর এই প্রথম নাটকীয় মুখোমুখি। পূর্বস্মৃতি মনে পড়ায় মিনু অশ্রুসিক্ত নয়নে স্থানত্যাগ করে। কিন্তু গৌরাঙ্গবাবু তাঁর ভাগ্নির জন্য দিব্যেন্দুর মতো সুপাত্র হাতছাড়া করতে চান না।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

সুকুমারও তাঁকে আশ্বস্ত করেন। অবশ্য মিনুর অসহায় আত্মসমর্পণ তিনি মানতে পারেন না। জীবনবাজি রেখে যে মেয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তার সহজ পরাজয় তিনি কল্পনা করতে পারেন না :

> গৌরাঙ্গবাবুর কথা ভাবছি না কিন্তু মিনুর চোখেও কি দেখলাম এই একই আকুলতা – একই কাতরতা – না – এ হতে দেওয়া যাবে না, কিছুতেই না। ও আগুনকে নিবতে দেওয়া যায় না। দিব্যেন্দুকে আমি জানি, দুদিন পরেই দেখতে পাব গায়ে দামী গয়না আর শাড়ি পরে একটা চর্বির ঢিবি হয়ে গেছে মিনু – হয়ে গেছে একটা ছাইয়ের স্তূপ। এ হতে পারে না।[১]

আগস্ট আন্দোলনের উত্তাপ বিস্মৃত হলে মিনুর তেজস্বী আত্মার মৃত্যু ঘটবে। লজ্জার গ্লানিতে সে নিজেকে জাগ্রত করুক, 'আত্মহত্যা না করে আত্মবিদারণ করুক ও'[২] – এমনটি সুকুমারের অভীপ্সা। মিনুর সংগ্রামী জীবন অবলম্বনে তিনি রচনা করতে চান তাঁর উপন্যাসের শেষ অধ্যায়। 'কনে-দেখা আলো' কেবল নারীজীবনের দুঃখগাঁথার গল্প হতে পারতো, কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর মধ্যে রাজনীতির প্রসঙ্গ যুক্ত করে গল্পটিতে নিয়ে এসেছেন ভিন্নমাত্রিক ব্যঞ্জনা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর যে গৌরবময় অবদান, এ-গল্পে তার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি।

পূর্ববাংলায় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আংশিক চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে 'সীমান্ত'[৩] গল্পে। নওগাঁ জেলার সাপাহার অঞ্চলের এক বিপ্লবাত্মক কাহিনি অবলম্বনে এটি রচিত হয়েছে। গ্রামের দুই বন্ধু : ফজলে রাব্বি এবং দয়াল মণ্ডল একত্রে আগস্ট আন্দোলনে যোগ দেয়। পুরো মহকুমা তখন বিক্ষোভকারীদের দখলে। প্রথম দুদিন তারা উদ্‌যাপন করে বিজয়ের আনন্দ :

> আগস্ট আন্দোলন। নামটা ভোলবার কথা নয় – কলিজার ভেতর গাঁথা হয়ে আছে আগুনের হরফে।... মনে হল ইংরেজ সরকার ফৌত হয়ে গেছে, কায়েম হয়েছে গরিবের মালিকানা, দেশের মানুষ তার দেশের মাটি ফিরে পেয়েছে।[৪]

তৃতীয় দিন সড়কি-বল্লম সজ্জিত হাজার-জনতাকে কুপোকাত করে কয়েকশো বন্দুকধারী ফৌজ। পুলিশের গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দয়াল এবং হাঁটুতে গুলিবিদ্ধ হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে ফজলে রাব্বি।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

[৩] 'সীমান্ত' *লোকসেবক* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৯) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সীমান্ত', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৩

দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বাংলায় অভিশাপ হয়ে এসেছিল দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর-মহামারি। এটি আবহমান ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যন্ত শোচনীয় ও হৃদয়স্পর্শী ঘটনা। লক্ষ-লক্ষ নিরন্ন মানুষের মৃত্যুতে সমগ্র বাংলা সেদিন শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছিল। মনুষ্যসৃষ্ট এ দুর্ভিক্ষে একদিকে নির্বিচারে মানুষ মরেছে, অন্যদিকে স্বদেশী বেনিয়ারা অর্থের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। ক্ষুধা-মৃত্যু-দারিদ্র্যের হিংস্র থাবায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের চিরায়ত কাঠামো। এ উন্মত্ত কালপর্বে অসহায় মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার সমব্যথী হয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কঙ্কালের এক অপূর্ব শোভাযাত্রা। সেদিনের সেই অসহ্য আত্মগ্লানি আর যন্ত্রণার মধ্যে সমস্ত বাঙালী লেখকের সঙ্গে আমিও গর্জন করে উঠেছি, 'যুগান্তরে' লিখেছি 'নক্র-চরিত', 'আনন্দবাজারে' লিখেছি 'দুঃশাসন', 'দেশে' লিখেছি 'পুষ্করা' আর 'ভাঙা চশমা'। আরো অনেক গল্প – কিছু কিছু উপন্যাস।[১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *শ্রেষ্ঠ গল্পের* সম্পাদনা-প্রসঙ্গে সাহিত্য-সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্যও এ বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন – 'মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তরের পটভূমিকায় তাঁর বিকাশ।'[২] তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরের নিখুঁত চিত্রায়ণ রয়েছে নারায়ণের 'হাড়', 'কবর', 'ডিম', 'লুচির উপাখ্যান', 'তীর্থযাত্রা', 'নক্র-চরিত', 'দুঃশাসন', 'ইজ্জৎ', 'কালো জল', 'পুষ্করা', 'ভাঙা চশমা', 'ডিনার', 'দ্বৈত', ' শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু', 'বিসর্জন' এবং 'সেই মৃত্যুটা' গল্পে।

মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প 'হাড়'। দুর্ভিক্ষকালে একদিকে খাদ্যের জন্য তীব্র হাহাকার, অন্যদিকে ধনীদের অনিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল জীবনযাপন এ গল্পে সৃষ্টি করেছে বেদনাবিধুর আবহ। এখানে পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুর এইচ. এলের সঙ্গে দেখা করতে আসে এক বেকার-যুবক। রায়বাহাদুরের সামান্য সুপারিশে যুবকের বেকারত্ব ঘুচতে পারে, সংস্থান হতে পারে চাকরির। কিন্তু রায়বাহাদুরের নির্ধারিত ঠিকানায় পৌঁছে সে বিপত্তির সম্মুখীন হয়। ফটকের ওপারে দুটি করালদর্শন কুকুর দেখে সে থমকে দাঁড়ায়। রাসবিহারী এভিনিউয়ে রায়বাহাদুরের অভিজাত বাসভবন দেখে সে বিস্মিত হয়, হকচকিয়ে যায়। সেখানে বাসভবনের বাইরে মোটর-ট্রাম আর মানুষের অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারা; ভেতরে অ্যাসফল্টের প্রশস্ত রাস্তা, কালো মার্বেলে বাঁধানো সিঁড়ি, রঙিন কাঁচের জানালায় ঝুলছে সিল্কের পর্দা, বাগানে ফুটেছে চমৎকার গ্র্যান্ডিফ্লোরা

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শিল্পীর স্বাধীনতা', *অগ্রন্থিত রচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[২] উদ্ধৃত : (ভূমিকা : জগদীশ ভট্টাচার্য), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

এবং চীনামাটির টবে রয়েছে কম্পমান অর্কিড। অপরদিকে প্রাসাদের অনতিদূরে মনোহরপুকুর পার্ক – যেখানে তৈরি হয়েছে বুভুক্ষুদের কলোনি। এখানে কেউ কলহ-চিৎকার করছে, পরস্পরের মাথা থেকে উঁকুন খুঁজছে, কেউবা পান করছে হাইড্রেনের ময়লা জল। এসব দুর্গত মানুষদের প্রতি নগরবাসী কোনো সহানুভূতি কিংবা বেদনাবোধ করে না, বরং অহেতুক আশঙ্কায় তারা আতঙ্কিত বোধ করে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের এটিই ছিল বিশ্বস্ত চিত্র। কলকাতা শহরে ধনীদের স্বাচ্ছন্দ্যময় চলাফেরার বিপরীতে পরিলক্ষিত হয় ফুটপাতবাসীদের অমানবিক জীবনযাপন। যুবকের ভাবনালোকে এসময় যে প্রশ্নের উদ্রেক হয় তা হলো :

> দেশজোড়া ক্ষুধা যেন মা-কালীর মতো রসনা মেলে দিয়েছে – এ ক্ষুধার আগুন কবে নিভবে কে জানে। একমুঠো ভাত আর একখাবলা বাজরাই কি যথেষ্ট এর পক্ষে ? আরো বেশি – আরো বেশি – এমন কি রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের এই ছবির মতো বাড়িগুলো পর্যন্ত ![১]

এ দুর্ভিক্ষ যে যুদ্ধকালের সৃষ্টি, তারও চিহ্ন রয়েছে গল্পে। কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

> ক) মাথার ওপর এরোপ্লেনের পাখার শব্দ – জাপানি-দস্যুর আশঙ্কায় পাহারা দিচ্ছে।[২]
>
> খ) যুদ্ধকে ভয় করি আমি, সাইরেনের শব্দে আমার বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে ওঠে।[৩]
>
> গ) ব্ল্যাক-আউটের আলোহীন পথ। উপদেশের বোঝা ঘাড়ে করে ভারী পায়ে চললাম এগিয়ে।[৪]

দীর্ঘ অপেক্ষার পর আগন্তুক যুবকের সঙ্গে কথা হয় রায়বাহাদুরের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়ে সুষির। মেয়েটি যুবকটিকে তার পিতার কাছে নিয়ে যায়। অন্দরমহলে এসে যুবক উপলব্ধি করে তার জীর্ণ জুতোর তুলনায় অ্যাসফল্টের রাস্তাটি অধিকতর পরিচ্ছন্ন। রায়বাহাদুরের সঙ্গে পরিচয়পর্ব শেষে যুবকটি তাঁকে পিতার চিঠি হস্তান্তর করে। এসময় পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুরেরর শান্ত ও উদার দৃষ্টিতে সে আবিষ্কার করে ইতিবাচক প্রসন্নতা। যুবকের পিতার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন ভদ্রলোক :

> প্রমথর ছেলে তুমি ? আরে তা হলে তো তুমি আমার নিজের লোক। তোমার বাবা আর আমি – ফরিদপুরে ঈশান ইস্কুলে একসঙ্গেই পড়েছিলাম।... তোমার বাবা যখন রেজিগ্‌নেশন দেয়, সে খবর আমি পেয়েছিলাম। ছোটোবেলা থেকেই ও খুব স্পিরিটেড্, অন্যায় কখনও সইতে পারত না। নইলে অত সহজে অমন চাকরি ছেড়ে দিলে ![১]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হাড়', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

রায়বাহাদুর বন্ধুপুত্রকে কেরানির চাকরিতে নিরুৎসাহিত করেন। এমএ পাশ যুবককে তিনি নৌবাহিনীতে যোগদানের পরামর্শ দেন। ছেলেটি পারিবারিক সমস্যার কথা উত্থাপন করলেও তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয় না; বরং তিনি পরিবেশন করেন তাঁর দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণের চমকপ্রদ কাহিনি। তিনি ভ্রমণ করেছেন সিঙ্গাপুর, হাওয়াই, তাহিতি, ফিলিপাইন ও জাপানে। এসব দেশ থেকে সংগৃহীত বিচিত্র হাড়ের 'কালেকশন' তিনি যুবককে প্রদর্শন করেন। টিউশনির ব্যস্ততা থাকলেও চাকরির প্রত্যাশায় ছেলেটি বিনয়ী ভঙ্গিতে তাঁর সামনে বসে থাকে। বেকারজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাসূত্রে সে বুঝেছে চাকরির 'উমেদারী করতে হলে মোসাহেবী তো অপরিহার্য।'[২]

রায়বাহাদুর কৌতূহলী হয়ে তাকে যে হাড়গুলো প্রদর্শন করেন সেগুলোর প্রত্যেকটিতে বিস্তৃত পরিচয়লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে এবং এগুলোর অধিকাংশই মন্ত্রসিদ্ধ। হাড়গুলো সংগ্রহের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এবং পৃথিবী-পরিভ্রমণের বর্ণনাসূত্রে রায়বাহাদুর আত্মতুষ্টি অনুভব করেন। রোডেশিয়ান শ্রেণির অর্ধেক মানুষ এবং অর্ধেক গরিলার মতো প্রাণির হাড় তিনি যোগাড় করেছেন মিণ্ডানা দ্বীপাঞ্চল থেকে; যে হাড়ের দাম বাবদ তাঁকে গুনতে হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা – তাও তিনি সগর্বে উচ্চারণ করেন।

রায়বাহাদুরের বক্তব্য ক্রমাগত বাধাগ্রস্ত হয় ক্ষুধার্তদের আর্তচিৎকারে। বিরক্তির সুরে তিনি বলতে থাকেন – 'পার্কের ওই ডেস্‌টিচ্যুটগুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমানো যায় না। বোধ হয় খাবার-দাবার কিছু মিলেছে তাই এই চিৎকার। খেতে না পেলে চিৎকার করবে, খেতে পেলেও তাই।'[৩] যুবকও মনশ্চক্ষে দেখতে পায় 'ওরা গোগ্রাসে গিলছে, খিচুড়ির ড্যালা গলায় আটকে চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে, অথচ আরো পাওয়ার জন্যে অবরুদ্ধ সুরে আর্তনাদ করছে।'[৪] রায়বাহাদুর যখন বলি দেওয়া কুমারী মেয়ের হাড় থেকে বিপুল যাদুশক্তি সৃষ্টির গল্পে মগ্ন, তখন শোনা যায় এক অনাহূতের মর্মভেদী হাহাকার – 'চাট্টি ভাত দাও মা – একটুখানি ফ্যান।'[৫] রায়বাহাদুর ভ্রুকুঞ্চিত করলেও নিশ্চিন্তবোধ করেন এই ভেবে যে, বাইরের হাড়-হাভাতে মানুষগুলোর ক্ষুধা উত্তাল হলেও তাঁর পোষা কুকুরগুলোকে ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ তাদের পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য। প্রকৃতপক্ষে এটিই হচ্ছে দুর্ভিক্ষকালের প্রতীকী চিত্র। একদিকে বুভুক্ষু মানুষের অন্তর্যন্ত্রণা, তীব্র

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

আহাজারি, অন্যদিকে বিত্তবানদের নিশ্চিন্ত নিস্পৃহতা। রায়বাহাদুরের অস্থিরাজ্য থেকে যুবক নিষ্কৃতি পায় রাত নয়টায়। উপসংহারে চাকরি-প্রত্যাশীকে তিনি পরামর্শ দেন :

> ইয়াং ম্যান, কেন পঞ্চাশ-ষাট টাকার চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি করছ ? বী কারেজিয়াস্ ! ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো, নাম লেখাও অ্যাক্টিভ সার্ভিসে ! সামনে পড়ে রয়েছে সমুদ্র, পড়ে রয়েছে পৃথিবী। কেরানীগিরি করে কী হবে ?... তুমি প্রমথর ছেলে। তোমার বাবা, হোয়াট এ স্প্লেন্ডিড বয় হি ওয়াজ ! বাপের নাম রাখতে হবে তোমাকে। একটা নগণ্য কলম-পেশার চাকরির মধ্যে নিজের সমস্ত ফিউচারকে নষ্ট করে দিও না। আই উইশ ইউ অল সাক্সেস ইন্ লাইফ। আচ্ছা, গুড্ নাইট –[১]

বিত্তবান রায়বাহাদুরের অবিবেচক কার্যকলাপ ও দাম্ভিকতায় যুবক স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। 'মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণ কথককে এই প্রদর্শনী দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখা রায়বাহাদুরের সাম্রাজ্যবাদী কৌশল। উদ্দেশ্যকে গোপন রাখতেই যেন অলীক উপদেশ বার্তা শুনিয়ে দেওয়া – চাকরি করে কী করবে, বেরিয়ে পড়ো এমন কোনো বড় নেশায়।'[২] রায়বাহাদুরের অতিকথনে যুবকের টিউশনির সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ছাত্রের পিতা হিসেবি লোক, অনুপস্থিতির কারণে হয়তো তার একদিনের মাইনে কর্তিত হবে। এমন ভাবনায় যখন সে নিমগ্ন, তখন সে দেখতে পায় ডাস্টবিনে তিন-চারজন মানুষ হাত ডুবিয়ে খাবার অন্বেষণ করছে এবং একটি কঙ্কালসার কুকুর সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের পাশে কঙ্কালসার একটি ছেলে প্রাণপণে হাড় চুষছে। এ হাড়ের সঙ্গে রায়বাহাদুর-বর্ণিত মন্ত্রসিদ্ধ কুমারী মেয়ের হাড়ের সাদৃশ্য আবিষ্কার করে যুবক। যে-হাড়ের শক্তিতে তাহিতির আকাশে ঝরেছিল তাজা রক্তের বৃষ্টি, সেই পরিত্যক্ত হাড়ের মধ্যেও যুবক আবিষ্কার করে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত। জনৈক সমালোচকের মতে, এই হাড় 'এক অর্থে ধনতান্ত্রিক-বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার নগ্নতার প্রতীক।'[৩] বুর্জোয়া শ্রেণির যথার্থ প্রতিনিধি রায়বাহাদুরের আয়েশি জীবনযাপনের বিপরীতে সর্বহারাদের বিপ্লবী জাগরণ যে অমূলক নয়, তাও ইঙ্গিতায়িত হয়েছে এ-গল্পে। আর এ বিপ্লবের সূত্রধর হতে পারে কেবল মধ্যবিত্তই।[৪] তাই

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

[২] মহম্মদ সাহিন সরওয়ার মোল্লা, 'হাড় : প্রগতি-চেতনা ও মধ্যবিত্ত-শ্রেণিস্বার্থ', উত্তম পুরকাইত (সম্পাদিত), *উজাগর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

[৩] শীতল চৌধুরী, *বাংলা ছোটগল্পের তিন নক্ষত্র*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১১, পৃ. ১৪৭

[৪] 'প্রতিবিপ্লবী সাহিত্যে' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্টতই জানিয়েছেন – "আজ সর্বহারা-বিপ্লব ছাড়া মধ্যবিত্তের বাঁচবার কোনো পথ নেই। আজ এই একমাত্র আশার আলো যা তাকে বাঁচাতে পারে দুঃসহ বেকারি থেকে, ছাঁটাইয়ের বিভীষিকা থেকে, নামমাত্র মূল্য বিনিময়ে বুর্জোয়াতন্ত্রের কাছে তার সর্বাধিক শক্তি, মেধা ও প্রতিভা বিক্রয়ের মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে, তার বুদ্ধিবিচারের দেউলিয়াপনা থেকে। তাই এ বিপ্লবের সত্যরূপটি তাঁর জানা দরকার, তার মধ্যে এর সঞ্চয় দরকার। সে চেষ্টা ঐকান্তিকভাবেই করতে হবে।" [উদ্ধৃত : ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত), *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৮]

বুভুক্ষুদের হাড়প্রাপ্তির ব্যাপারে মধ্যবিত্ত যুবকের উদ্দীপ্ত মনোভাবনা – 'হাড় ওরা পেয়েছে, কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকি।'[১]

'হাড়' গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কেবল দুর্ভিক্ষ-জর্জরিত মানুষের হতদশা উন্মোচন করেননি, তাদের মুক্তির পন্থাও অনুসন্ধান করেছেন। ফুটপাতবাসীদের একসময় ছায়া-সুনিবিড় আবাস ছিল, অভাব ছিল না এক মুঠো ভাতের। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদেরই কষ্টার্জিত ফসলে উদরপূর্তি করছে শহরবাসী। অথচ যুদ্ধ-অর্থনীতিতে সব হারিয়ে তারা এখন নিঃস্ব। এ সর্বহারা জনগোষ্ঠী সামষ্টিক প্রতিরোধের মাধ্যমে অধিকার আদায়ে উজ্জীবিত হোক, এ-আকাঙ্ক্ষাই যেন গল্পটিতে শিল্পরূপ পেয়েছে।

দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর অবলম্বনে রচিত শা-নওয়াজের পরিবর্তিত জীবনাখ্যান 'কবর'[২]। এ গল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্য এবং প্রদর্শিত হয়েছে বিত্তবান একটি গ্রামীণ পরিবারের রিক্ত হওয়ার করুণ দৃশ্য। কেন্দ্রীয় চরিত্র শা-নওয়াজের জীবনের কয়েকটি স্তর প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলার আর্থ-সামাজিক রূপ-রূপান্তরের একটি চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এ গল্পে। শৈশবে পিতৃহীন শা-নওয়াজ নিদারুণ কষ্টে দিনযাপন করেছে। মোড়ল-গৃহে ঝিয়ের কাজ করেছে তার মা। সামান্য কারণে মাকে লাঞ্ছিত করেছে মোড়লের ছোটো গিন্নি। অহংকারী এ নারীর পদাঘাতে ভেঙে গেছে তার মায়ের দুটি দাঁত। চৌর্যবৃত্তির অপরাধে শা-নওয়াজের মাকেই তিনি দোষী সাব্যস্ত করেন। তার সততা সম্পর্কে সকলে অবহিত থাকলেও সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার তাগিদে তাকে শাস্তিভোগ করতে হয়। মায়ের রক্তাক্ত শরীর দেখে শা-নওয়াজ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। মোড়লপুত্রকে উপর্যুপরি প্রহার করে সে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেয়। মোড়ল ছিল স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, থানা-আদালত সবই তার করায়ত্ত। এ অপরাধে শা-নওয়াজের তিন মাসের কারাদণ্ড হয়। কারামুক্ত হয়ে সে জানতে পারে মায়ের মৃত্যুসংবাদ।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শা-নওয়াজ একটি চটকলে চাকরি নেয়। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় সে দ্রুত চাকরি হারায়। এরপর চিৎপুরের হোটেলে সে কাজ করেছে, ক্যানিং স্ট্রিটে মনোহারী দোকান দিয়েছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সে ব্যর্থ হয়েছে। হঠাৎ শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধলগ্নে এমন কোনো কাজ নেই, যা সে করেনি। সি.পি.র জঙ্গলে তাঁবু স্থাপন করে সে মিলিটারি কন্ট্রাক্টের বাঁশ কেটেছে, বাঘের ভয়ে মশাল জ্বেলে নির্ঘুম রাত্রিযাপন করেছে, আসামের দুর্গম অরণ্যে বন্য হাতির উপদ্রবের মধ্যেও কাঠ ভাসিয়েছে ডিহাং নদীর জলে।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হাড়', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

[২] 'কবর' *বর্ষশেষ* পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৩৫১) প্রথম মুদ্রিত হয়।

ঊর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটে বেড়িয়েছে বড়বাজার, ড্যালহাউসি স্কোয়ার, শেয়ালদহ-হাওড়া স্টেশন এবং মিলিটারি হেড কোয়ার্টারে। বিনিময়ে সে অর্জন করেছে গাড়ি-বাড়িসহ জীবনের নানা বিলাসী অনুষঙ্গ। শা-নওয়াজের সঙ্গে মানুষ প্রতারণা করেছে, এজন্য সে প্রতিশোধও নিয়েছে ইচ্ছেমতো। ভাতের জন্য ক্ষুধার্তরা কাতর প্রার্থনা জানালে সে চাবুক দিয়ে তাদের বিতাড়িত করেছে। চতুর্দিকে খাদ্যের হাহাকার জেনেও সে পোষা কুকুরকে খেতে দিয়েছে দামি খাবার। যুদ্ধকালে অনেক বাছবিচার করে পাঁচগুণ মূল্যে সে ক্রয় করেছে 1944 মডেলের আমেরিকান গাড়ি।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে অত্যাচারী মোড়ল-পরিবারও সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। তাদের খেতের সমুদয় ফসল এখন শা-নওয়াজেরই দখলে। এ পরিবারের করুণদশা প্রত্যক্ষ করে সে তৃপ্তিবোধ করে। পি ডব্লু ডি-র রাস্তায় সে ক্রমশ গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেয়। পথে অল্পের জন্য রক্ষা পায় একটি নেড়িকুকুর। পাশের আসনে বসে থাকা বন্ধু রঞ্জন আতঙ্কিত হলেও, ইতর প্রাণির জন্য শা-নওয়াজ কোনো দয়াবোধ করে না। দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ মৃত মানুষের তুলনায় কুকুরটি তার দৃষ্টিতে অতিশয় তুচ্ছ। মোড়লের ভগ্নগৃহে পৌঁছতেই বেরিয়ে আসে এক বৃদ্ধা। দাম্ভিক মোড়লপত্নীকে দেখে তার মনে হয় 'বুভুক্ষু বাংলার প্রতিচ্ছবি।'[১] অল্পদূর অগ্রসর হতে দেখা যায়, রাস্তা জুড়ে শুধু কবর। জীবিকার প্রয়োজনে ইতঃপূর্বে বনচারী হলেও, কবরগুলো দেখে সে ভয়চকিত হয়। গাড়ির চাকায় একরাশ ভাঁট ফুল দলিত করে সে প্রস্থান করে শহরের পথে। শা-নওয়াজের গাড়ির চাকায় পিষ্ট ফুলের মতোই কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্যে সেদিন দলিত ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে বাংলার গ্রামীণ জনপদ। 'কবর' গল্পে শা-নওয়াজ বিকারগ্রস্ত চরিত্র। দীর্ঘ বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে সে হয়ে পড়েছে মূল্যবোধশূন্য। মন্বন্তরে লক্ষ-লক্ষ মানুষের মৃত্যুতেও জাগ্রত হয়নি তার বিবেকবোধ। বন্ধু রঞ্জনকে সে বলেছে –

> পঞ্চাশ লাখ লোক মরে গেল। ভালোই হল। বেশি লোক থাকলেই অসুবিধে, সবাই পথ চলতে চায়, অনাবশ্যক ভিড় করে রাস্তায়। তার চাইতে ভিড়টা বরং কিছু পাতলা হওয়া দরকার, মোটর চালানো যায় আরামে।[২]

অন্যদিকে গল্পকথক রঞ্জন সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। বন্ধুর আচার-আচরণ-উচ্চারণ কোনোটিই তার পছন্দ নয়। তবে নতুন কন্ট্রাক্ট পেলে শা-নওয়াজ তাকে ভরপেট বিলাতি খাবার খাওয়ায়, দামি গাড়িতে নিয়ে বের হয় লম্বা ভ্রমণে। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও শা-নওয়াজকে তাই সে ভালোবাসে।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কবর', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪১

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৭

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তারই ভাষারূপ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ডিম'[১] গল্প। যুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের একটি বড় রেলজংশনের পাশে স্থাপিত হয় মিলিটারি ক্যাম্প। অতীতে স্থানটি পতিত থাকলেও যুদ্ধের কারণে এটি জমজমাট হয়ে ওঠে। রাতেও বৈদ্যুতিক বাতিতে আলোকিত থাকে ক্যাম্পের চারপাশ। সেনাবাহিনীর জন্য প্রতিদিন পাঁচশো ডিম যোগান দেয় ঠিকাদার প্যারীলাল। অর্থসংকটে গ্রামের অধিকাংশ মানুষই তাদের হাঁস-মুরগি বিক্রয় করে দিয়েছে। এজন্য সারাদিন চেষ্টা করলেও প্যারীলালের লক্ষ্য-অর্জন কঠিন হয়ে পড়ে। আসন্ন বড়দিনের ক্রিসমাস কেক তৈরির জন্য সে এক হাজার ডিমের অর্ডার পায়। ক্যাম্পের মেজর তাকে বিশ্বাস করে এ-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এজন্য অসম্ভব কাজটি সে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। হিমশীতল আবহাওয়ায় শরীরে ওভারকোট জড়িয়ে প্যারীলাল ডিম-সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ে।

ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দা রজনীর গৃহে যায় প্যারীলাল। রজনীর ছেলে নিবারণ শহরে রিক্সা চালায়, দু-মাস তার কোনো সংবাদ নেই। রজনীর ম্যালেরিয়া-জীর্ণ আট বছরের নাতির শরীর ছিন্ন চটে আবৃত। আরেকটি শিশুসন্তানকে আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে ঠাণ্ডা প্রশমনের চেষ্টা করছে পুত্রবধূ সারদা। যুদ্ধ-মন্বন্তরে রজনী সর্বস্ব হারালেও একসময় তার অবস্থা সচ্ছল ছিল। প্যারীলাল রজনীকে সুখস্বপ্নে আশ্বস্ত করে – 'যুদ্ধ থেমে যাবে, আবার ফসল উঠবে, সুখশান্তিতে ভরে যাবে দেশ।'[২] তবে বয়সজনিত অভিজ্ঞতায় রজনী জানে যে, সোনার বাংলার সে-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত :

> সোনার বাংলা ? কবে ছিল ? বুকের রক্ত জল করে আর চোখের জল না ফেলে দু'মুঠো ভাত কোনোদিন জোটেনি – দশ বছর আগেও নয়। বেগার ছিল, থানার দারোগা ছিল, উচ্ছেদের নোটিশ ছিল। বাড়তির মধ্যে এবার দুঃখের পাত্র পূর্ণ করে দিয়ে দু'মুঠো ভাতও অদৃশ্য হয়েছে। সেই লজ্জা আর অপমান মেশানো রাঙা বাগ্‌ড়া চালের ভাত আর লাফা শাকের তেতো চচ্চড়ি এই কি সোনার বংলার রূপ ?[৩]

রজনীকে তিন ডজন ডিম সংগ্রহের কাজ দেয় প্যারীলাল। প্রথমে ইতস্তত করলেও ডজন প্রতি আড়াই টাকা দর শুনে সে সম্মত হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনটি গ্রাম থেকে রজনী দুই কুড়ি ডিম সংগ্রহ করে। এজন্য সে কমিশন পাবে দশ পয়সা। যৎসামান্য এ-উপার্জনেই তিন-চারটি প্রাণির আহারের সংস্থান হবে। রজনীর হাতে ডিম দেখে তার অসুস্থ নাতি ডিম-খাওয়ার আবদার করে। দাদার শাসন আর মায়ের বারণ সত্ত্বেও সে অনবরত কাঁদতে থাকে। বাসি ভাত এবং তিক্ত শাকের পরিবর্তে রজনীও ডিমের প্রতি প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু এ ডিম তাদের জন্য নয়,

---

[১] 'ডিম' *অরণি* পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় (১৩৫১) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ডিম', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৭

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৮

সাহেবদের জন্য সংগৃহীত ডিমের দিকে তাকানোও তাদের জন্য পাপ। অবচেতন মনে ডিমের প্রতি উগ্র আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধকে অপ্রকৃতিস্থ করে। নাতি পুনরায় কান্না জুড়ে দিলে সে হিংস্র থাবায় ওর কণ্ঠরোধ করে। শিশুটির তীব্র চিৎকার এবং পুত্রবধূর করুণ মিনতিও সে গ্রাহ্য করে না। দিশেহারা সারদা লোহার শাবল তুলে শ্বশুরের মাথায় আঘাত করে। অপ্রস্তুত রজনী ছিটকে পড়ে অগ্নিকুণ্ডে এবং মৃত্যুবরণ করে।

যুদ্ধকালের প্রতিকূল জীবনবাস্তবতায় রজনী কিংবা সারদার এসব উন্মত্ত আচরণ একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। দীর্ঘদিনের ক্ষুধা ও বঞ্চনায় তারা হারিয়ে ফেলেছে ঔচিত্যবোধ, তাদের মনোলোকে তৈরি হয়েছে গভীর ক্ষত ও চূড়ান্ত বিকৃতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষুধা সম্পর্কিত এক আমেরিকান গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে 'ক্ষুধা কীভাবে খাদ্য নিয়ে আবিষ্ট অবস্থার সৃষ্টি করে, উচ্চশব্দকে অসহনীয় করে তোলে এবং হঠাৎ করে যুক্তিহীন ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটায়। একজন পিতা বা মাতা একই রকম অনটনে খাদ্যের জন্য সন্তানের বারবার বায়নার ফলে তার প্রতি হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।'[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ডিম' গল্পের বিষয়ভাবের সঙ্গে এ গবেষণার যথেষ্ট সাযুজ্য রয়েছে বলে মনে হয়।

'তীর্থযাত্রা'[২] গল্পে দুর্ভিক্ষকে পুঁজি করে নারী পাচারকারীদের অপতৎপরতা প্রদর্শিত হয়েছে। গল্পের প্রারম্ভে মেঘনা নদীর ঘূর্ণিজলে ঘুরপাক খেতে থাকে একদল নৌযাত্রী। নারী যাত্রীদের আর্তনাদে নদীর পরিবেশ ভারি হয়ে ওঠে। কালীঘাটের কালীমূর্তি দর্শনের প্রলোভন দেখিয়ে গ্রামের অসহায় নারীদের নরোত্তম ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছে অজানা গন্তব্যে। যুদ্ধের বাজারে সে নারীপাচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মড়কতাড়িত গ্রামবাংলার গৃহলক্ষ্মীদের প্রলুব্ধ করে সে বিক্রয় করে কলকাতার গণিকা পল্লিতে। আসন্ন দুর্গাপূজার প্রস্তুতিস্বরূপ আশ্বিন মাসে নৌকায় পাঁঠা পারাপারের প্রথা থাকলেও, এবারের পণ্য সরবরাহে এসেছে পরিবর্তন; পাঁঠার স্থান দখল করেছে নারী। সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের কারণে পূজার্চনাও বন্ধ –

> তেরশো পঞ্চাশ সালের আশ্বিন মাস। বাংলার সীমান্তে যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়েছে – মেঘনার উত্তর দিগন্তে মহানাগের বিষ-নিঃশ্বাসের মতো। এসেছে সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ। ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে সাপ আর শেয়াল এসে বাসা বেঁধেছে। বোধনতলায় ছড়িয়ে আছে নরমুণ্ড। দেবী এবার আদৌ মর্তে আসবেন কি না পঞ্জিকায় উল্লেখ নেই। কিন্তু তাঁর দোলা-চৌদোলা যে আগে থেকেই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সে সম্পর্কে সন্দেহ করবে কে ? শাস্ত্র বলেছে, ফল মড়কং।[৩]

---

[১] মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়, *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

[২] 'তীর্থযাত্রা' *দৈনিক বসুমতী* পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যায় (১৩৫২) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তীর্থযাত্রা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৩

দুর্ভিক্ষের সুযোগে দেবীপূজার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে নরোত্তম ঠাকুর। তেরো থেকে ত্রিশ বছর বয়সী নারীদের যোগাড় করেছে সে। এদের সঙ্গে অনাবশ্যক বোঝা হিসেবে যুক্ত হয়েছে তিন-চারটি শিশু। তাই পথিমধ্যে সরলার অসুস্থ সন্তানের মৃত্যু হলে নরোত্তম খুশি হয়। কারণ – 'চিরযৌবনের রাজ্যে সবৎসার চাইতে অবৎসার কদর বেশি।'[১] এ ঘৃণ্য অপকর্মকে হীন যুক্তি দিয়ে বৈধতাদানের প্রয়াস পায় সে। দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারানোর পরিবর্তে এরা 'ঘুঁটেকুড়ুনি থেকে রাজরাণী'তে উন্নীত হতে চলেছে। নিষিদ্ধ পল্লির অন্ধকার জীবনকে বরণ করতে এরা বাধ্য হবে; শরীরে শোভা পাবে দামি শাড়ি-জড়োয়ার গয়না। তাদের সামান্য হাসির জন্য মানুষ বাস্তুভিটে বন্ধক রাখবে, আবার তাদের অবজ্ঞার অপমানে লাখপতি আত্মহত্যা করবে। যুদ্ধকালে 'ব্ল্যাক আউটে'র রাতেও মহানগরীর পতিতালয় থেকে ভেসে আসবে ঘুঙুরের শব্দ, হারমোনিয়ামের সুর এবং মাতালের কণ্ঠস্বর। তীর্থযাত্রার অজুহাতে নরোত্তম ব্রাহ্মণ যে প্রকৃতপক্ষে অধর্মাচারে যুক্ত, তা বুঝে ফেলে ফরিদ মাঝি। কটাক্ষের সুরে সে নরোত্তমকে বলে :

> ভালো ব্যবসা তোমার ঠাকুর। ধান চাল পাটের চাইতে ঝক্কি ঢের কম, কাঁচা পয়সা অনেক বেশি। আগে জানলে কে এমন করে নৌকো ঠেলে মরত ?... তুমি তো বামুন। সমাজের ইজ্জত বজায় রাখা তোমার কাজ। ঘরের পর ঘর উজাড় করে মেয়েদের বিক্রি করে দিচ্ছ পেশাকরদের কাছে – সমাজের মুখে হাজার বাতির রোশনাই জ্বলে উঠছে নিশ্চয় ![২]

ফরিদ মাঝির বক্রোক্তির পরও নিজেকে শান্ত রাখে নরোত্তম। এ মুহূর্তে কোনো বিবাদে সে জড়াতে চায় না। কারণ নৌকোসুদ্ধ সকলকে ডুবিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে মাঝির। ওদিকে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে সুমতি ক্রন্দনরত, ক্ষুধার যন্ত্রণায় একরাশ বুনো লতা চিবিয়ে তার স্বামী ভেদবমি করেছে। মালিনী কৃষ্ণযাত্রার গান ধরেছে। অল্পবয়সী এই বিধবা মেয়েটিকে আনার জন্য নরোত্তমকে তেমন পরিশ্রম করতে হয়নি। গ্রামে মালিনীর চরিত্র সম্পর্কে নানা কলঙ্কিত জনশ্রুতি রয়েছে। ব্রাহ্মণের এককথায় সে প্রসন্নচিত্তে নৌকায় উঠেছে।

'তীর্থযাত্রা'য় নরোত্তমের সর্বাপেক্ষা দামি পণ্য সুখী। আঠারো-উনিশ বছরের সুশ্রী মেয়েটির মায়াবি সৌন্দর্য তাকেও স্পর্শ করে। সুখীর অভাবী পিতার হাতে নগদ দেড়শো টাকা দিয়ে নরোত্তম ওকে নৌকায় ওঠায়। তবু মেয়েটিকে তার বিশ্বাস নেই, যে কোনো সময় সে ঝাঁপিয়ে পড়বে মেঘনার কালো জলে। সুখীর মতো এরূপ পরিণতি মন্বন্তরকালে অনেকেই বরণ করেছে। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ বিস্মৃত হয়েছে পারিবারিক বন্ধন, ছিন্ন হয়েছে তাদের ভদ্রতার আবরণ। বেঁচে থাকবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় তারা জলাঞ্জলি দিয়েছে দীর্ঘদিনের লালিত

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৬

প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, দায়িত্ব-কর্তব্য, ধর্ম-সংস্কার প্রভৃতি মানবিক ঔচিত্যবোধ। অন্নসংস্থানের জন্য অনেকে স্ত্রী-কন্যাকে পাঠিয়ে দিয়েছে মহাজনদের লালসা নিবৃত্তিতে কিংবা স্বল্পমূল্যে তাদের বিক্রয় করেছে পাচারকারীদের কাছে। তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় এতৎসংক্রান্ত নানা করুণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।[১]

নদী শান্ত হলে অতর্কিতে তাদের কাছে আসে বারো দাঁড়ের একটি ছিপ। ভাউলি নৌকায় তারা ধানের সন্ধান করে। ডাকাতির ভয়ে নরোত্তম পুনরায় পৈতা আঁকড়ে দুর্গানাম জপতে শুরু করে। অবশ্য মেয়েদের কান্নারোল শুনে দস্যুদল দ্রুত প্রস্থান করে। এরপরেও নরোত্তমের বিপদ কাটে না। অশ্রুসজল চোখে সুখী তার দু-পা জড়িয়ে ধরে। বাবা-ভাইদের ছেড়ে তীর্থযাত্রায় তার আগ্রহ নেই। নরোত্তমও মেয়েটিকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সে মাঝিকে কাশীপাড়ার কাশবনের কাছে নৌকা ভেড়ানোর নির্দেশ দেয়। এখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে মিলিটারি কলোনির ঠিকাদার গোলাম মহম্মদ। নির্জন স্থানে সে মেয়েটিকে হস্তান্তর করে ঠিকাদারের নৌকায়।

নরোত্তমের এ ঘৃণ্য তৎপরতায় স্তম্ভিত হয়ে যায় ফরিদ। সুখীর অসহায়ত্বের মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করে নিজ স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রবধূর দুর্গতি। নরোত্তমের মতো কোনো প্রতারক হয়তো তাদেরও বিপথগামী করবে। তাই সুখীর করুণ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত হয় মুসলিম মাঝি ফরিদ। এদিকে নগদপ্রাপ্তির আনন্দে নৌকায় এসে নরোত্তম কাল্পনিক গল্প সাজায়। কাশবন থেকে একটি বিশাল কুমির এসে সুখীকে গ্রাস করেছে – এমন আতঙ্কিত সংবাদ সে ছড়িয়ে দেয় মেয়েদের মধ্যে। অবশ্য প্রকৃত কুমিরকে চিনতে কষ্ট হয় না ফরিদের। মুহূর্তে হাতের লগি দিয়ে সে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করে নরোত্তমকে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাদাবালির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে নরোত্তম। অথৈ জলে নৌকা ভাসিয়ে ফরিদ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলতে থাকে – 'এতখানি সহ্য হয় না ঠাকুরমশাই। না খেয়ে মরে তো মরুক, তবু গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।'[২] এসময় অদূরেই ভেসে ওঠে একটি প্রকাণ্ড কুমির। সুখীকে নিয়ে তৈরি বানোয়াট গল্প নরোত্তমের জীবনেই সত্য হয়। 'তীর্থযাত্রা' গল্পে

---

[১] *জনযুদ্ধ* পত্রিকার (২২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩) একটি সংবাদে উল্লেখ রয়েছে – "নেত্রকোণা রিলিফ কমিটির সেক্রেটারির নেতৃত্বে স্থানীয় বিভিন্ন দল মহাকুমা হাকিমের সাহায্যে ২৮শে অক্টোবর রাত্রিতে পতিতালয় থেকে ১২টা বালিকা উদ্ধার করিয়াছে। প্রকাশ, সকল বালিকাকে ১০ আনা হইতে দেড় টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছিল।

ফরিদপুরের চাকঠ গ্রামের রিলিফ সোসাইটির সম্পাদক জানাইতেছেন যে একটা বিধবা যুবতীকে উদ্ধার করা হইয়াছে। অন্নাভাবের দরুণ স্ত্রী লোকটিকে ২৬ টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছিল।" (উদ্ধৃত : বিজিত ঘোষ ড., *বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২)

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তীর্থযাত্রা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৬

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের অন্ধকার অধ্যায় প্রকাশ করেছেন। ধর্মের আবরণে অধর্মের বিস্তার – নারায়ণী গল্পের বিশেষ স্টাইল হলেও, এখানে তা ব্যতিক্রমীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পের সমাপ্তি হতাশাব্যঞ্জক নয়, ফরিদের শক্ত প্রতিরোধে সমূলে বিনষ্ট হয়েছে নরাধমরূপী নরোত্তমের দুরভিসন্ধি।

দুর্ভিক্ষলগ্নে সাধারণ মানুষ যখন অন্নের সংস্থানে দিশেহারা, তখন সকল আয়েশি সামগ্রী ছিল কালোবাজারিদের কব্জায়। দেশের মানুষকে ক্ষুধার সাগরে ভাসিয়ে তারা গড়ে তোলে বিত্তের পাহাড়। 'লুচির উপাখ্যানে' এক কালোবাজারির নিরুদ্বেগ জীবনযাপন এবং তার স্থূলবুদ্ধির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এ গল্পে দেখা যায়, পুত্র বিধু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেও সিদ্ধেশ্বরবাবু বেশ প্রসন্নচিত্ত। তিনি ঘোরতর বৈষয়িক ও গম্ভীর প্রকৃতির হলেও বিধুর গৃহশিক্ষক রঞ্জনকে এজন্য তিরস্কার নয়, বরং প্রশংসাই করেন। তেল-আটার কলসহ কয়েকটি শিল্পকারখানার স্বত্বাধিকারী তিনি। পুত্র বিধুকে পড়ানোর জন্য রঞ্জনকে তিনি প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা সম্মানি দিয়েছেন। বিধুর অকৃতকার্যতায় রঞ্জনের প্রতি রুষ্টভাব প্রদর্শন না করে বরং তিনি স্বগতোক্তি করেন এভাবে :

> এ ভালোই হয়েছে। পাস করলেই কলেজে পড়তে চাইত। আর কলেজে একবার ঢুকলে ছেলেকে তখন পায় কে। না হোক টাকার শ্রাদ্ধ। বাবু হয়ে যেতো, কতগুলো বখা ছেলের সঙ্গে কাপ্তেন সেজে ঘুরে বেড়াত। বাপু জাত-ব্যবসাদারের ছেলে তুই; ও সব নবাবী দিয়ে তোর হবে কী ? এখন বরং বলতে পারব, মাস মাস পঞ্চাশ টাকা দিয়ে মাস্টার রেখে দিলাম, তবু পাস করতে পারলি নে হতভাগা ![১]

সিদ্ধেশ্বরবাবু বিত্তবান হলেও কতো বেশি স্থূলরুচিসম্পন্ন তা উপর্যুক্ত বর্ণনাংশে সুস্পষ্ট। সিদ্ধেশ্বরের বিবেচনায় মাড়োয়ারিরাই অধিক বুদ্ধিমান। সন্তানকে লেখাপড়া না শিখিয়ে তারা সরাসরি ব্যবসায়ে নিযুক্ত করে। বাঙালি গ্র্যাজুয়েটরা যখন পঁচিশ টাকা বেতনে কেরানির চাকরি করে, তখন ওদের আয় অন্তত ত্রিশ হাজার টাকা। লোকটির কথা শুনে রঞ্জন দীনতায় মাথা নিচু করে থাকে।

সিদ্ধেশ্বরের আর্থিক সমৃদ্ধি ধান-চালে নয়, কাঁকরের ব্যবসায়ে। কাঁকর বিক্রয়ের অর্থে তিনি দমদমে দুটো বাড়ি ক্রয় করেছেন। দুর্ভিক্ষকালে তুচ্ছ উপকরণও অসাধারণ গুরুত্ব পায়। এ সুবাদে রপ্তানির জন্য তিনি চালের সঙ্গে হাজার-হাজার মণ কাঁকর মেশান। রঞ্জন এ-ব্যবসায়িক বুদ্ধিকে 'জোচ্চুরি' বললে সিদ্ধেশ্বর নির্লজ্জের মতো কাঁকরের উপকারিতা বর্ণনা করেন :

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'লুচির উপাখ্যান', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬১

> চাল সহজে হজম হয়ে যায়, একটু পরেই ক্ষিধে পায় আবার। কিন্তু কাঁকর সে বান্দাই নয়। একবার ঢুকল তো বসে রইল পাকাপোক্ত কায়েমি বন্দোবস্ত করে। ক্ষিধে পাবে কি, তখন পেটের ভারেই লোককে ছট্‌ফট করতে হয়।[1]

রঞ্জনকে তিনি সত্বর এ ব্যবসায়ে উদ্যোগী হবার মন্ত্রণা দেন। কাঁকর, ধুলো, চর্বি – যুদ্ধের বাজারে কোনোটিই মূল্যহীন নয়। সন্তান অনুত্তীর্ণ হলেও গৃহশিক্ষকের জন্য পরিবেশিত হয় উপাদেয় খাবার – দু থালা ধূমায়িত ফুলকো লুচি, তিন-চার প্রকার মিষ্টি, ডাল ও আলুর দম। টাটকা ঘিয়ে-ভাজা এমন সুস্বাদু লুচি রঞ্জন দীর্ঘদিন খাননি। সুতরাং ক্ষিপ্রগতিতে থালাটি নিঃশেষিত হয়। সিদ্ধেশ্বরের গৃহে প্রস্তুতকৃত লুচিতে কাঁকর নেই, ময়দায় নেই কোনো বালি। কাঁকর বিক্রয়ের অর্থে তিনি বাজারের সেরা ময়দা ক্রয় করেছেন।

স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকালে কন্ট্রোলের দোকানে কাঁকর-মিশ্রিত চালের জন্য দরিদ্র নরনারীর লম্বা সারি দেখেন রঞ্জন। ইতোমধ্যে মধ্যবিত্ত শিক্ষকের চেতনায় সংক্রামিত হয়েছে ধনী হওয়ার বাসনা। গলার মধ্যে লুচির তীব্র ঢেঁকুর তাঁকে আদর্শ-ঐতিহ্য ভুলিয়ে অধিকতর লোভী করে তোলে। তাই সম্মুখের পরেশনাথের মন্দির ভেঙে তিনি সৌভাগ্যের বীজমন্ত্র সংগ্রহের স্বপ্ন দেখেন – 'ওই মন্দিরটা ভেঙে ফেললে কত মণ কাঁকর বেরুতে পারে ?'[2] 'লুচির উপাখ্যান' চোরাবাজারের ভয়ানক বাস্তবতাই উন্মোচিত করে। বিত্তের কাছে বিদ্বৎ সমাজের সীমাহীন অসহায়ত্ব এ গল্পে প্রকাশিত হয় রঞ্জনের পরিবর্তিত জীবনাগ্রহসূত্রে। এ পর্যায়ে স্রষ্টার বন্দনার তুলনায় পেটপূজার বিষয়টি তাঁর কাছে গুরুত্ববহ মনে হয়। কাঁকর-মিশ্রিত আহারের পরিবর্তে রঞ্জনও গ্রহণ করতে চান মচমচে লুচির স্বাদ।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এবং কিছুসংখ্যক দেশীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। কালোবাজারি, মজুতদারি ও নারীনির্যাতন তখন সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়। প্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজশ করে মজুতদাররা সমাজে কীরূপ দাপুটে ছিল – তার দৃষ্টান্ত 'নক্র-চরিত'। এখানে গোলাপাড়া হাটের সবচেয়ে বড় মহাজন নিশিকান্ত কর্মকার। স্বর্ণের কারবার, ধান-চালের আড়তদারী ও কাপড়ের ব্যবসায় রয়েছে তার। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দারোগা-পুলিশের সঙ্গেও তার সদ্ভাব। এসব পরিচয়ের অন্তরালে নিশিকান্ত চোরাকারবারে লিপ্ত থাকে। গ্রামের ডাকাতদলের সঙ্গে রয়েছে তার গোপন সম্পর্ক। গভীর রাতে লুণ্ঠিত সোনা-রুপা তারা নির্ভয়ে নিশিকান্তের কাছে বিক্রয় করে। এ ডাকাতদের ঠকিয়ে সে স্বল্পমূল্যে হাতিয়ে নেয় দামি দ্রব্যসামগ্রী। এ গল্পে মদন ডাকাতের দল কলাইগঞ্জের সাহাদের গাড়ি থেকে

---

[1] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৫

[2] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৬

প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার লুট করে। লুণ্ঠিত এক জোড়া পাথর বসানো দুলের সঙ্গে আটকে থাকে একটি কোমল মাংসপিণ্ড। নিমিষে কার্যসমাধার জন্য তারা গৃহবধূর কানসহ দুলজোড়া ছিঁড়ে এনেছে। দস্যুদলের বীভৎসতাও হার মানে নিশিকান্তের কদর্য আচরণের কাছে। ধর্মের দিব্যি দিয়ে সে এদের পাপের সামগ্রী গ্রাস করে সামান্য টাকায় :

> কেন এতো অবিশ্বাস বলো তো। তোমাদের এত কষ্টের রোজগার, মিথ্যে প্রবঞ্চনা যদি করি তা হলে তা-কি ধর্মে সইবে কখনো। তাছাড়া পরলোকে জবাবদিহিও তো করতে হবে। যথা ধর্ম তথা জয় – অধর্মের রোজগার গোমাংস আর গোরক্ত।[১]

সে কিছু খোঁড়া যুক্তি দিয়ে অন্যায়কে ন্যায় এবং অধর্মকে ধর্ম বলে আত্মতৃপ্তি অর্জন করতে চায়। তার মতে – 'অধর্মের সংজ্ঞা আলাদা বই কি। চোরের উপর বাটপাড়িকে কোনো আহাম্মুখই অধর্ম বলবে না।'[২] কথায়-কথায় ধর্মের বুলি আওড়ানো নিশিকান্তের স্বভাব। উপরিতলে সে ভক্ত-বৈষ্ণব; প্রতি ভোরে জপমালা সম্পন্ন করে জুড়ে দেয় বেসুরো কীর্তন। হাড়ি সম্প্রদায়ের এক মেয়ে কষ্টবালাকে বৈষ্ণবী বানিয়ে সে নাম দিয়েছে বিশাখা। মেয়েটি তার সেবাদাসী। বিশাখাকে দিয়ে সে বশে এনেছে হবিগঞ্জ থানার দারোগা ইব্রাহিম মিঞাকে। ঘরে দুটি স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মেয়েটির সঙ্গে ইব্রাহিম ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে। দারোগার নির্বিচার ভোগমত্ততায় নিশিকান্তের ঈর্ষা দেখে বিশাখা তাকে সাবধান করে – 'এত হিংসে কেন ? এ নইলে আগেই যে হাতে দড়ি পড়ে যেত, সেটা খেয়াল নেই বুঝি।'[৩] বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে কলুষিত সমাজব্যবস্থার নগ্নচিত্র এটি।

মহাজন ও দারোগার সম্মিলিত শক্তির কাছে পুরো গ্রাম অসহায়। যুদ্ধ আরম্ভের পর 'ভারতরক্ষা আইনে'র ফলে পুলিশ বাহিনী আরো বলীয়ান হয়। ইব্রাহিমও নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে ওঠে। মহাজনকে সে অভয় দেয় – 'বিস্‌মিল্লা বলে আমার দরগাতেই মুরগী জবাই করে দিয়ো, আমি বহাল তবিয়তে থাকলে তোমাকে ছোঁয় কে !'[৪] স্বদেশীরা বিদ্রূপ করলেও নিশিকান্তের মতো দুরাত্মাদের তোষামোদে সে চাকরিতে সুখ পায়। নিশিকান্তের গুদামে পাঁচশো মণ চাল মজুত রয়েছে – এমন তথ্যপ্রাপ্ত হয়ে দারোগা তাকে সাবধান করে। অবশ্য প্রকৃত হিসাব তারও অজানা; পাঁচশো নয়, আটশো মণ চাল মজুত করে রেখেছে নিশিকান্ত। বারো টাকা মণে গুদামজাত করে বর্ষামৌসুমে সে এগুলো বিক্রয় করবে চল্লিশ টাকা দরে। মিলিটারি কন্ট্রাক্ট পেয়ে অনেকে

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নক্র-চরিত', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৫

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৭

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৮

তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। দেশবাসীকে অনাহারে রেখে কালোবাজারিরা এভাবে সংগ্রহ করে সেনাবাহিনীর জন্য বিশাল খাদ্যভাণ্ডার। এ পর্যায়ে নিশিকান্তের মনোভাবনা লক্ষণীয় :

> আটশো মণ চাল সে মজুত করে রেখেছে। বর্ষার বাজারে চল্লিশ টাকা দরে এই চালটা ছেড়ে দিলে সে শুধু লাল নয় – রক্তের মতো টকটকে লাল হয়ে যাবে। যুদ্ধের দিনকাল – মন্বন্তর যাকে বলে। কিছু যদি করে নিতে হয় তো এই-ই সুযোগ।[১]

গ্রামের হরিসভায় অষ্টপ্রহর কীর্তনের আয়োজনে নিশিকান্তকে চাঁদা দিতে হয়। তাড়ি, গাঁজা আর ব্যভিচারের অবাধ সমারোহ ঘটে সেখানে। রসের আসরে অকস্মাৎ চৌকিদারের কণ্ঠস্বরে নিশিকান্তের নেশা কাটে। মতি পাল এবং তার স্ত্রীর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। সেজন্য ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে হবে। চৌকিদার জানায় কেবল মতির পরিবার নয়, এ দুর্ভিক্ষে পুরো গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে। তবে এসব মৃত্যু নিশিকান্তের কাছে নিম্নশ্রেণির 'কৃতকর্মের ফল'। পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ঋণ পরিশোধ করছে অনাহারীর দল।

অতঃপর লেখক চরিত্রটিকে পরিচয় করিয়েছেন মর্মান্তিক একটি দৃশ্যের সঙ্গে। মতি পালের জীর্ণ কুটিরে প্রবেশ করে নিশিকান্ত বাসি মড়ার গন্ধ পায়। বারান্দায় নিথর মতির মৃতদেহ – গালের দুপাশে জমে আছে একরাশ কর্দমাক্ত বমি; ভাতের অভাব সম্ভবত সে মাটি দিয়ে পূরণ করতে চেয়েছে। ততক্ষণে ইঁদুর সাবাড় করেছে তার একটি চোখের অর্ধাংশ; অন্যদিকে ঘরের মধ্যে ছিন্ন-লজ্জাবাস দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়েছে মতির স্ত্রী। এ ধরনের বীভৎস দৃশ্য নিশিকান্তকে শিহরিত করে। ফিরতি পথে সমস্ত বাঁশবন জুড়ে সে অনুভব করে মৃতের অস্তিত্ব। এসময় তার পাপাত্মায়ও একটি জিজ্ঞাসা নাড়া দেয় – 'এই মৃত্যু – এই অপঘাত, এদের জন্য দায়ী কে ? দৈব ?'[২]

বাড়িতে প্রবেশ করেই দারোগার হার্কিউলিস সাইকেলটি তার দৃষ্টিগোচর হয়। ঘরের ভেতরে তখন চলছে ইব্রাহিম-বিশাখার গোপন অভিসার। আলো জ্বেলে নিশিকান্ত এগিয়ে যায় গোলাঘরের দিকে। আটশো মণ চালের বিশাল স্তূপ দেখে সে পরিতৃপ্ত হলেও, পরক্ষণেই ভেসে আসে তীব্র দুর্গন্ধ। বৃষ্টির পানিতে সেখানকার অন্তত পঞ্চাশ-ষাট মণ চাল পচে গেছে। একদিকে দুর্ভিক্ষে মানুষের মৃত্যু, অন্যদিকে খাদ্যশস্য বিনষ্টির অজুহাতে মানবিক উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়ার যে সুযোগ নিশিকান্তের ছিল, গল্পে শেষাবধি তা হয়ে ওঠেনি।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮১

মতিপাল এবং তার স্ত্রীর বিকৃত শবদেহও তাকে অভিশপ্ত জগৎ থেকে মুক্ত করতে পারেনি। দুষ্কৃতিই হয়ে উঠেছে তার চূড়ান্ত নিয়তি।

বিশ্বযুদ্ধকালের নির্বিচার দুর্নীতি ও অনাচারের চিত্র 'নক্র-চরিত'। এ গল্পে নিশিকান্ত কর্মকার ধর্মের উর্দি পরে পাপাচারে ব্যাপ্ত থাকে। এ ধরনের কপট ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে বাংলায় দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হয়। 'মানুষের খাদ্য – মর্ত্য জননীর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ'কে জোরপূর্বক আটকে রেখে তারা কৃত্রিম খাদ্যসংকট সৃষ্টি করে। পরিণামস্বরূপ প্রতিদিন অসংখ্য নিম্নজীবী নরনারীর মৃত্যু ঘটে। মজুতদারদের অপকর্ম নির্বিঘ্ন করেছে ইব্রাহিম দারোগার মতো প্রশাসনের অসৎ ব্যক্তিবর্গ। এজন্য মহাজনদের লাভের অংশ তারাও পেয়েছে। কারণ জনসাধারণের তুলনায় এরাই নিশিকান্তদের নক্রচরিত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এ গল্পে নিশিকান্তকে দারোগা প্রকাশ্যে বলেছে – 'তুমি বাবা একটা সাক্ষাৎ ঘোড়েল – ভঁড়ো কুমীর।'[১]

আড়িয়াল খাঁ নদের মাঝি শীতলের দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের দুটি ভিন্নরূপ পরিস্ফুটিত হয়েছে 'কালো জল'[২] গল্পে। প্রথম পর্বে তার নৌকার যাত্রী হয় তারাপদ। সন্ধ্যার পূর্বে গন্তব্যস্থল মধু গাঁয়ে পৌঁছার জন্য সে মাঝিকে উপর্যুপরি তাগিদ দেয়। একসময় তাস খেলে এবং আড্ডা দিয়ে সময় কাটিয়েছে ঘরজামাই তারাপদ। স্ত্রী অরুণা তার উচ্ছৃঙ্খল আচরণের প্রতিবাদ করেনি, বরং স্বামীর পরাশ্রয়ী জীবনের গ্লানিকে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করেছে। তারপরও অজানা আক্রোশে তারাপদ স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত দুর্ব্যবহার করে এবং একদিন সে দেশান্তরী হয়। বিদায়বেলায় বৃদ্ধ শ্বশুর জানকী চক্রবর্তীকেও সে তির্যক বাক্যবাণে আহত করে।

প্রায় পাঁচ বছর তারাপদ ঘুরে বেড়ায় দিল্লি, লাহোর ও লয়ালপুরে। আত্মীয়-স্বজনহীন প্রবাসজীবনে সে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনযাপন করে। সৌভাগ্যক্রমে একটি পশমের কারখানায় সে চাকরি পায়। দীর্ঘদিন স্ত্রীর সঙ্গে সে যোগাযোগ করেনি, একটি চিঠি লিখেও জানায়নি তার অবস্থান কিংবা কুশলবার্তা। বেতন দেড়শো টাকায় উন্নীত হলে তারাপদের স্মরণ হয় স্বদেশ-সংসারের কথা। এক মাসের ছুটি নিয়ে সে গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করে। দূরপ্রবাসে থাকাকালে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সে জানতে পেরেছে বাংলার মন্বন্তরের কথা। মাঝির কাছে উৎকণ্ঠিত চিত্তে সে মধু গাঁয়ের সমাচার জিজ্ঞেস করে। শীতল মাঝি জানে, এ দুর্ভিক্ষ কেবল মানুষকে নিঃস্ব করেনি, অনেককে বিত্তশালীও করেছে। তারাপদকে শেষোক্ত শ্রেণির প্রতিনিধি ভেবে শীতল নিরুত্তর

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৮

[২] 'কালোজল' *আনন্দবাজার* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫১) প্রথম প্রকাশিত হয়।

থাকে। দিনশেষে নৌকা ভিড়ে মধু গাঁয়ের চক্কোত্তি বাড়ির ঘাটে। তড়িৎগতিতে নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে তারাপদ। হাঁটু পর্যন্ত কর্দমাক্ত হলেও অসীম উৎসাহে সে এগিয়ে চলে।

সন্ধ্যাবেলায় চক্রবর্তী বাড়ি নিথর, কোথাও সাড়া-শব্দ নেই। অনেকক্ষণ পর বেরিয়ে আসে সম্বন্ধী অনন্তের স্ত্রী প্রতিমা। তারাপদকে দেখে সে বিলাপ আরম্ভ করে। অতিথিকে সে শোনায় পর্যায়ক্রমিক দুঃসংবাদ – কলেরায় জানকী চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়েছে, ভুনিকে কলকাতায় বিক্রয় করেছে পাচারকারী, অন্নাভাবে নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করেছে অরুণা। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করে তারাপদ দিশেহারা হয়ে পড়ে। তার অবস্থা দেখে শীতল মাঝিও তার পরিবারের জন্য উদ্বিগ্নবোধ করে। জীবিকার তাগিদে সে নিজেও এক মাস আগে ঘর ছেড়েছে। সে জানে না কী ঘটেছে তাদের জীবনে।

শীতলের অবচেতন সত্তায় বারবার তারাপদের মর্মন্তুদ জীবনপরিণাম ভেসে উঠলেও সে আবার মাঝিবৃত্তিতে বেরিয়ে পড়ে।। এসময় সে শুনতে পায় *মনসামঙ্গল* কাব্যপাঠ। এ সুর তাকে অধিকতর উদাস করে। গভীর রাতে অনুচ্চস্বরে এক ব্যক্তি তার ঘুম ভাঙায় এবং নিজেকে মথুরা দাস বলে পরিচয় দেয়। সে বুঝতে পারে, লোকটি এতদঞ্চলের প্রসিদ্ধ মহাজন। শীতলের নৌকাযোগে বল্লভপুর বাজারে সে দশ বস্তা পণ্য চালান করতে চায়। শীতল মাঝি অনিচ্ছা প্রদর্শন করলে মথুরা তিনগুণ ভাড়ার প্রস্তাব দেয়। এ জঘন্য অপকর্মের সঙ্গী হতে মন সায় দেয় না শীতলের। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে একসময় সম্মতি প্রকাশ করে এবং নদীপথে যাত্রা করে। এক পর্যায়ে জলদস্যুরা তাদের গতিরোধের চেষ্টা করে। এসময় শরীরে চাদর জড়িয়ে মথুরা দাস নৌকার মধ্যে লম্বিত হয়ে শুয়ে পড়ে। জলদস্যুরা মাঝিকে নানা প্রশ্ন করে। কলেরা-আক্রান্ত রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেবার কথা শুনে তারা স্থানত্যাগ করে। নৌকায় চালের অস্তিত্ব সন্দেহ করলেও বায়ান্ন বছর বয়সী মাঝিকে তারা অবিশ্বাস করেনি। নিরাপদ স্থানে পৌঁছার পর মথুরার অট্টহাসিতে শীতলের চমক কাটে। কলেরা নিয়ে যে অসত্য বাক্য সে উচ্চারণ করেছে, তা ফিরে আসুক মথুরার শরীরে – এরূপ জিঘাংসায় আচ্ছন্ন হয় তার মনোজগৎ। দুর্ভিক্ষের হাহাকার এবং এর কারণ একইসঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে ‘কালো জল’ গল্পে। শীতল মাঝি একটি সমৃদ্ধ পরিবারকে নিঃশেষ হতে দেখেছে, আবার পরক্ষণেই পাচার হতে দেখেছে মানুষের মুখের গ্রাস। মহাজনের অপকর্মের প্রতিরোধ করতে পারেনি দুর্বল মাঝি। তবে এ শ্রেণির প্রতি তার ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে ব্যাপকভাবে।

‘পুষ্করা’[১] গল্পে পরিবেশিত হয়েছে দুর্ভিক্ষকালের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা। তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর মহামারি প্রকট আকার ধারণ করে। ঘোষপাড়াসহ বিভিন্ন গ্রামে কলেরায় অগুনতি মানুষের মৃত্যু হয়। প্রাণভয়ে অনেকে শহরে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। কুপিতা দেবীকে শান্ত করবার উদ্যোগ নেয় সমৃদ্ধ মহাজন বলাই ঘোষ। তিনশো টাকা দক্ষিণায় সে আমন্ত্রণ জানায় বিখ্যাত তান্ত্রিক তর্করত্নকে। শুক্লা চতুর্দশীর রাতে গ্রামের শ্মশানে অনুষ্ঠিত হয় কালীপূজা। যজ্ঞস্থলে একটি কলাপাতায় স্তূপাকারে সাজিয়ে রাখা হয় লুচির সঙ্গে পোয়াখানেক মাংস, তার ওপরে শোভা পায় একটি রক্তজবা। কোনো শেয়াল এসে ভোগ সাবাড় করলে যজ্ঞ সার্থক হবে। কিন্তু চতুর্দিকে মানুষের তাজা রক্ত খেয়ে সামান্য পাঁঠার মাংসে শেয়ালের বিন্দুমাত্র লোভ নেই। যজ্ঞস্থলে পুরোহিতের পাশে একটি পেট্রোম্যাক্সের নিচে গাঁজা সেবন করছে কালীমূর্তির কারিগর কাশী কুমোর। অন্যদিকে ঢোলের ওপর মাথা রেখে ঘুমে বিভোর হয়ে আছে কেশব ঢুলী। মধ্যরাত অতিক্রান্ত হলেও দেবীর প্রসাদ অভুক্ত থাকে। ভয়ার্তকণ্ঠে তর্করত্ন ক্রমাগত কালীকে আহবান করে। কিন্তু শেয়ালের ডাকের পরিবর্তে গ্রামের দিক থেকে ভেসে আসে মরাকান্না। সর্বনাশের ভয়ে তর্করত্ন কাঁপতে থাকে, পৈতা ছিঁড়ে বলাই ঘোষকে সে অভিশাপ দিতে চায়। পূজার গুরুত্ব সম্পর্কে কাশী কুমোরকে পুরোহিত সচেতন করলেও সে নির্বিকার থাকে। ওলা বিবির প্রকোপে নিশ্চিহ্ন হয়েছে তার স্ত্রী-সন্তান-সংসার, নতুন কিছু হারানোর ভয়ে সে তাই শঙ্কিত নয়। পক্ষান্তরে পরিবার-পরিজনের প্রতি মমতা তর্করত্নকে আকুল করে তোলে।

সাধারণ পূজারি যেখানে দায়িত্বপালনে অপারগ, সেখানেই পূজাপ্রদানের জন্য তর্করত্নের ডাক পড়ে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তার নিমন্ত্রণ আসে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি তার অনুকূলে নয়। রাত তিনটার সময় সে প্রত্যক্ষ করে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। আকস্মিক উগ্র দীপ্তিতে শিখায়িত হয়ে নিভে যায় পেট্রোম্যাক্স এবং ক্ষিপ্রগতিতে চারদিক তিমিরাচ্ছন্ন হয়। ধ্যানমগ্ন তর্করত্ন মনে করে শেয়াল নয়, স্বয়ং দেবীই গ্রহণ করছেন তার ভোগ। অন্ধকারেও সে প্রমাণ পায় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের এক অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল তার। রোমাঞ্চিত দৃষ্টিতে পুরোহিত দেখতে পায় কালীর জ্বলন্ত চক্ষু, শুনতে পায় তার লুচি-মাংস ভক্ষণের হিংস্র শব্দ। কাশী কুমোর এবং কেশব ঢুলী তখনও ঘুমে অচেতন। তর্করত্নের ধারণা দেবীকে স্বচক্ষে দেখবার পুণ্য এরা অর্জন করেনি। প্রচণ্ড হাসিতে কালী শ্মশানত্যাগ করলে জেগে ওঠে পুরোহিতের সঙ্গীদ্বয়। পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বললে দেখা যায়, শিবভোগ সত্যিই নিঃশেষিত। এমন অলৌকিক ঘটনা তর্করত্নের পূজারি-জীবনে এই প্রথম। সে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় আস্থাশীল নয়, শাস্ত্রকথায় আর দেবীর মাহাত্ম্যে তার প্রবল বিশ্বাস। এজন্য উচ্চৈঃস্বরে

[১] ‘পুষ্করা’ *দেশ* পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৩৫১) প্রথম প্রকাশিত হয়।

সে ঘোষণা করে শ্মশানকালীর শ্রেষ্ঠত্ব – 'ওরে বাজা, বাজা। আর ভয় নেই, দেবী নিজে এসেছিলেন, তাঁর ভোগ নিজেই গ্রহণ করে গেছেন। বাজা – বাজা। জয় মা শ্মশানকালী, জয় মা মহাকালী।'[১]

ভোরের পূর্বেই ঘোষপাড়ার প্রত্যেকে বিষয়টি অবগত হয়। সমবেত জনতার উদ্দেশে রাতের ঘটনা সত্য-মিথ্যার নানা রঙে প্রচার করে কাশী কুমোর। কলিযুগেও দেবীর প্রত্যক্ষ আবির্ভাবে মহামারি-মন্বন্তরের আশঙ্কা থেকে মুক্তি পায় জনপদবাসী। দিনের বেলা পুরোহিতের স্টেশনে যাওয়ার কথা থাকলেও সম্ভব হয় না। বলাই ঘোষ পরম ভক্তিতে গলায় কাপড় জড়িয়ে সারাদিন বসে থাকে তার পদতলে। গ্রামবাসীও তার প্রতি সশ্রদ্ধ ভক্তি নিবেদন করে। ঘোষপাড়ায় অসংখ্য তালুকদার-মহাজনের আবাস। যুদ্ধকালে মজুতদারি ব্যবসায় এরা অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে। দক্ষিণার অঙ্ক তিনশো টাকার পরিবর্তে তারা উত্তোলন করে পাঁচশো টাকা। তবে অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তি সত্ত্বেও তর্করত্ন নিজেকে বঞ্চিত মনে করে। এদের আতিথ্যে শহরে তার কয়েকটি লক্ষ্মীপূজার সময় নষ্ট হয়েছে – একথা সে সরবে ঘোষণা করে। সন্ধ্যার পর পুরোহিতের গাড়ির অর্ধেকাংশ ভরে যায় কলা, মূলা, নারিকেল, কাপড়সহ নানা দান-দক্ষিণায়। মন্বন্তরের পটভূমিকায় বলাই ঘোষের মতো অসাধু ব্যবসায়ীরা যেমন বিত্তবান হয়েছে, তেমনি তর্করত্নরাও ধর্মকে ব্যবহার করে অর্থ-আনুগত্য আদায় করছে। পুরোহিততন্ত্রের সূক্ষ্ম প্রতারণার দিকটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ গল্পে অসাধারণভাবে চিত্রিত করেছেন।

স্টেশনে যাত্রাকালে তর্করত্নের চোখে পড়ে এক বৃদ্ধা পাগলি। পথের ধুলোয় একাকার হয়ে সে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। গাড়োয়ান বৃদ্ধার পরিচয় দিয়ে বলে – 'আকালে ওর তিনটে বেটা আর সোয়ামী না খেয়ে মরে গেছে বাবু। তাই পাগল হয়ে গেছে। রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে, যমে ধরেছে বোধ হয়।'[২] বিস্তর পণ্যসামগ্রী এবং নগদপ্রাপ্তির আনন্দে জরামৃত্যুর সংবাদ তর্করত্নের ভালো লাগে না। গাড়োয়ানকে সে দ্রুত পথচলার নির্দেশ দেয়। ততক্ষণেও পূজারি বোঝেনি, এই বৃদ্ধা পাগলি গতরাতে পূজামণ্ডপে এসেছিল শ্মশানকালীর রূপে। দীর্ঘদিন উপবাসের পর শিবভোগ বৃদ্ধার সহ্য হয়নি। তাই কালীর মতো জিহবা প্রসারিত করে এক ফোঁটা জলের জন্য সে আর্তনাদ করছে। বিষয়টি নাটকীয় হলেও, গল্পকারের দৃষ্টিতে এরাই প্রকৃত কালীদেবী – 'মারী আর মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই নীলকণ্ঠের মতো নিঃশেষে পান করে নেয়।'[৩] বৃদ্ধার মৃত্যুতে হয়তো ঘোষপাড়ার আকাল দূর হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে কালীর কৃতিত্ব। তর্করত্নরাও যুগ যুগ ধরে প্রচার করবে দেবীর

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'পুষ্করা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১১

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১২

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৩

মাহাত্ম্য। অথচ সারাজীবন অপ্রকাশিত থাকবে ডোমপাড়ার পাগলির করুণ উপাখ্যান। এভাবেই যুগে যুগে মিথ্যা পেয়েছে খাঁটি সত্যের মর্যাদা; অনাচার পেয়েছে অলৌকিকতার ভিত্তি, আর তাতে ভর করে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত কিংবা সমাজপতিরা বিস্তার করেছেন তাদের আধিপত্য – এটিই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিপাদন করেছেন এ-গল্পে।

দুর্ভিক্ষকালীন বস্ত্রসংকটের বাস্তবতা প্রদর্শিত হয়েছে 'দুঃশাসন'[১] গল্পে। এসময় মজুতদারদের প্রতি কোনো রাষ্ট্রীয় নজরদারি ছিল না। সরকারি কর্মচারীদের উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে তারা পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে রাখে। অধিক মুনাফার আশায় খাদ্যদ্রব্যের পাশাপাশি তারা কৃত্রিম বস্ত্রসংকট সৃষ্টি করে। মজুতদারদের এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে "বাংলায় ১৯৪৪-এর ১০ই মার্চ 'বস্ত্র সংকট দিন' রূপে পালন করা হয়।"[২] জলপাইগুড়িতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যখন গল্পটি লিখছিলেন, তখন তিনিও বস্ত্রসংকটে বিব্রত ছিলেন। স্ত্রীর কাছে প্রেরিত তাঁর একটি পত্রের (১২/০৪/১৯৪৫) অংশবিশেষ স্মর্তব্য – 'কাপড়ের কথা লিখিয়াছ, কিন্তু কাপড়ের ব্যাপারে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আমার নিজেরও কাপড় জামা নাই, দোকানেও কিনিতে পাইতেছি না। দেখি কলকাতা হইতে কিছু যোগাড় করতে পারি কি না।'[৩]

'দুঃশাসন' গল্পের দেবীদাস বস্ত্রের বড় আড়তদার। পার্শ্ববর্তী আট-দশটি হাটের বস্ত্র বিক্রেতারা তার ওপরই নির্ভরশীল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভের পর সে খোলাবাজারে বস্ত্রব্যবসায় বন্ধ রাখে। বস্ত্রের জন্য ভুক্তভোগীরা কাতর অনুরোধ করলেও সে অনড় থাকে। কারণ সরকারি মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় লাভজনক নয়। অথচ তিন বছর পূর্বে এক জোড়া বস্ত্রের স্থলে সে ক্রেতাকে দশ জোড়া বস্ত্রও দেখিয়েছে। ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরদাস বস্ত্রপ্রার্থীদের ব্যাপারে নমনীয়তা প্রদর্শন করলে সে বিরক্ত হয়। নিশিকান্তের মতো এ গল্পেও দেবীদাস বিতরণ করে ধর্মীয় বাণী :

> কী করবি বল্ – সবই ভগবানের মার। কেন যে এই যুদ্ধ বাধল আর আকাল দেখা দিল এক ভগবানই বলতে পারেন সে কথা। কাপড় থাকলে কি আর তোকে দিতাম না ? আমার কাজই তো ব্যবসা করা – ঘরে মাল পচালে আমার কোনো লাভ আছে বলতে পারিস ? [৪]

---

[১] 'দুঃশাসন' *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৫১) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] বিজিত ঘোষ ড., *বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

[৩] উদ্ধৃত : সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দুঃশাসন', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯১

একদিন কনস্টেবল কানাই দে আসে দেবীদাসের বাড়িতে। দারোগা শচীকান্ত একটি যাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। নির্ধারিত দিনে যাত্রার নিপুণ আয়োজনে দেবীদাস আশ্চর্য হয়। পাঁচটি ডে-লাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে অনুষ্ঠানস্থল। অথচ কেরোসিনের অভাবে সমস্ত গ্রাম তিমিরাবগুণ্ঠিত[১], সেই সুযোগে গ্রামে বৃদ্ধি পেয়েছে শেয়াল-সাপের উপদ্রব। প্রতিদিন দু-তিনটি সাপে কাটার অভিযোগ আসে থানায়। মানুষের অসহায়তার সুযোগে পশুরাও নির্মম হয়ে উঠেছে। মুচিপাড়ার একটি ছেলে সম্প্রতি শেয়ালের হিংস্রতার শিকার হয়েছে। ঘর থেকে ত্রিশ হাত দূরে শিশুটির ছিন্ন মস্তক পাওয়া গেছে। অন্ধকারে তার উদ্দেশ পাওয়া যায়নি। অথচ যাত্রামঞ্চের আলোকরশ্মি বিস্তৃত হয়েছে প্রায় অর্ধ-মাইল পর্যন্ত।

যাত্রামঞ্চের চারপাশে জড়ো হয়েছে অনাহারীর দল। এমন প্রখর আলো তাদের কল্পনাতীত। দারোগার অমায়িক ব্যবহার ও সৌজন্যে তারা আত্মহারা। তাদের বিনোদনের জন্যই দেড়শো টাকা ব্যয়ে আমন্ত্রিত হয়েছে বৈকুণ্ঠ অধিকারীর দল। তবে আনন্দ-অনুষ্ঠানের অন্তরালে তাদের প্রতিবাদস্পৃহাকে যে হনন করা হচ্ছে – এ চতুরতা নিপীড়িত জনতা বুঝতে পারে না। দেবীদাসকেও সাদরে অভ্যর্থনা জানায় শচীকান্ত। দুমূর্ল্যের বাজারে দারোগা পরিধান করেছে আদ্দিরের পাঞ্জাবি, তার শরীর থেকে নিঃসরিত হচ্ছে মদ-সিগারেটের উৎকট গন্ধ। তবে এ পোশাকের রহস্য জানে দেবীদাস। একটি প্রফিটিয়ারিংয়ের মামলা থেকে নিষ্কৃতি পেতে সে দারোগাকে এক থান আদ্দি ঘুষ দিয়েছে। এভাবেই দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে বিস্তৃত হয়েছে সে-সময়ের শোষণতন্ত্র।

কিছুক্ষণ পর মঞ্চস্থ হয় যাত্রাপালা – 'দুঃশাসনের রক্তপান'। যাত্রাদলের শিল্পনৈপুণ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাংলার মাটিতে প্রত্যক্ষ করে গ্রামবাসী। কর্ণের অভিনয়ে প্রীত হয়ে দারোগা সোনার মেডেল উপহারের ঘোষণা দেয়। তারপর কাহিনি প্রবেশ করে মহামুহূর্তে, যেখানে অযত্নবিন্যস্ত রুক্ষ চুলে দ্রৌপদী রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। পাঞ্চালীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে দিগ্বিজয়ী অর্জুন পর্যন্ত লজ্জায় মাথা নত করে। প্রচণ্ড দৃঢ়তায় দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবদের কর্তব্যসচেতন করে :

---

[১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে শুরু হয় তীব্র কেরোসিন সংকট। বাংলার অধিকাংশ গ্রামই ছিল সেদিন অন্ধকারে নিমজ্জিত। কেরোসিনের দাবিতে অনেক অঞ্চলে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। *জনযুদ্ধ* পত্রিকার এক প্রতিবেদনে (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩) বলা হয় – "কেরোসিন তেলের অভাব এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, প্রায় শতকরা ৯০ জনের ঘরে সন্ধ্যার পর আলো জ্বলে না, অথচ স্বার্থপরায়ণ লোকের সহযোগিতায় মহাজনেরা গোপনে বেশি দামে এদিকে ওদিকে তেল চালান দিতেছে। কমিউনিস্ট কর্মীদের চেষ্টায়, বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টায় ৪৮ টিন তেল ধরা পড়িল।" (উদ্ধৃত : বিজিত ঘোষ ড., *বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮)

> শোন কেশব, শোন ভীমসেন – শোন ধনঞ্জয় ! প্রকাশ্যে রাজসভায় সেই মর্মান্তিক অপমানের পরে শুধু তোমাদের মুখ চেয়েই পাঞ্চালী আত্মহত্যা করেনি। কিন্তু আর নয়। দুঃশাসনের রক্তরঞ্জিত হাতে যদি বেণীবন্ধন না করতে পারি, তাহলে জেনে রেখো, সতীর অভিশাপে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সমস্ত ভস্মীভূত হয়ে যাবে।[১]

অতঃপর ভীমের ভীষণ আঘাতে দুঃশাসন ধরাশায়ী হয়। দুঃশাসনের রক্তে মুখমণ্ডল রঞ্জিত করে সে প্রতিজ্ঞাপূরণের আনন্দে বিহবল হয়। একটানা দশ মিনিট করতালির মাধ্যমে শিল্পীরা অভিনন্দিত হয়। নিরন্ন দর্শকদের অশিক্ষিত চোখে ধরা না পড়লেও গৌরদাস ঠিকই উপলব্ধি করে – 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ফিরে এসেছে বাংলাদেশে।... সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠছে আজকে।'[২]

যাত্রাশেষে ভোরের আলোয় দেবীদাস মুচিপাড়ায় প্রবেশ করে। লক্ষ্মণ মুচিকে মেরামতের জন্য সে দুজোড়া জুতা পাঠিয়েছে। লক্ষ্মণকে ডাকতেই একটি ষোড়শী মেয়ে আত্মগোপন করে। মেয়েটির শরীরে দৃষ্টি পড়তেই দেবীদাসরা বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এর কারণ :

> মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে একফালি কাপড় নেই – কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।[৩]

নিঃশব্দে মুচিগৃহ ত্যাগ করে দুজন হাঁটতে থাকে। রাস্তার পাশে ফসলহীন মাঠে তখন কৃষকরা কাজ করছিল। তাদের হাতের ধারালো কাস্তেগুলোয় প্রতিফলিত হচ্ছিল সূর্যরশ্মি। সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর এদের সাধারণ অস্ত্রগুলোকে অকারণে ভয় পায় গৌরদাস। কৃষকশ্রেণির মধ্যে সে খুঁজে পায় ভীমসেনের প্রত্যয়। তাছাড়া 'অমন ঝক্‌ঝক্ করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা ?'[৪]

গৌরদাস এ গল্পে মানবিক গুণমানে উজ্জ্বল চরিত্র। কালোবাজারির রীতিপদ্ধতি সে আয়ত্ত করতে পারেনি। দেবীদাসের কার্যকলাপে আত্মদগ্ধ হলেও সে নিরুপায়। কেননা পিতৃব্যের আশ্রয়ে সে কলেজে পড়ালেখা করে। তার বিবেচনায় দারোগা শচীকান্ত ও দেবীদাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই। উভয়ে দুর্ভিক্ষের সুযোগে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে ব্যস্ত। গল্পকারের অনেক ইতিচেতনার বাহক হয়েছে গৌরদাস। তার চেতনালোকে যে প্রশ্ন উদিত হয়েছে, তা লেখকেরই ভাষ্য – 'যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্রা করেছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দুঃশাসন', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৫

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৭

[৪] প্রাগুক্ত

হবে একদিন ? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে ?'[১] 'দুঃশাসন' গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় *মহাভারত*তের দ্রৌপদীর প্রতীকে সর্বহারা শ্রেণিকে বিপ্লবী মন্ত্রে উদ্বোধিত করেছেন। দুঃশাসনরূপী দেবীদাসরা ধরাশায়ী হবে, তাদের বিনাশে সমাজদেহে সঞ্চারিত হবে সুস্থধারা – এমনটিই তাঁর অন্বিষ্ট।

'ইজ্জৎ' গল্পেও দেবীদাসের আদলে নির্মিত চরিত্র হাবিব মিঞা। সে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য এবং গ্রামের ফুড কমিটির সভাপতি। দিল্লি থেকে প্রতি সপ্তাহে তার জন্য সুরমা আসে। পঞ্চাশ বছর বয়সেও লোকটির যৌবন অক্ষুণ্ন। হাবিব চিরনতুনের ধ্বজাধারী; এ পর্যন্ত বারো জন স্ত্রী তার সংসার করেছে। তার আয়েশি জীবনযাপনের যথেষ্ট কারণও রয়েছে। হাবিবের বিশাল ভূসম্পত্তিতে ফসলের মৌসুমে বারোটি লাঙল খাটে। সন্ধ্যাবেলা হাবিব মিঞা আফিং খায়, এসময় রসভঙ্গকারী কাউকে সে ক্ষমা করে না। তবে দুর্ধষ-দাগি ধলা মন্তাই‌কে সে প্রশ্রয় দেয়। ব্যক্তিস্বার্থে ধলাকে সে গ্রামের হিন্দুদের বিরুদ্ধে উসকে দেয়। অথচ ধলা মন্তাই তার স্ত্রী-কন্যার জন্য দু-একটি কাপড় প্রার্থনা করলে হাবিব চমকে ওঠে :

> তুমি ক্ষেপে গেলে মন্তাই ?... সরকারী চালান যা এসেছিল সে তো ছ' মাস আগে লোপাট, একফালি কানি অবধি তার পড়ে নেই। আশমানের চাঁদ যদি চাও তাও টেনে নামিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কাপড় নয়।[২]

কাপড়ের বিস্তর মজুত থাকলেও হাবিব বিতরণে অনিচ্ছুক। কেননা কালোবাজারে এক জোড়া কাপড় বিক্রয় হয় বত্রিশ টাকায়। সাহায্যের পরিবর্তে সে দেবীদাসের সুরে বলতে থাকে – 'শালার কন্ট্রোল হয়ে সব সর্বনাশ করে দিয়েছে রে। সব গুণাহ্ আর সব না-পাক, দেশটা জাহান্নামে যাবে, বুঝলি ?'[৩] পরিবারের দুর্দশায় প্রতিপক্ষ জগন্নাথ ঠাকুরও হাবিবের শরণাপন্ন হয়। যদিও পথিমধ্যে ধলা মন্তাই ব্রাহ্মণকে বাস্তবসচেতন করে – 'কাপড় পাবে না ভাই, তার চেয়ে বউকে গলায় দড়ি দিতে বলো। আমাকেও তাই করতে হবে।'[৪] 'দুঃশাসনে' সর্বহারাদের জেগে ওঠার ইঙ্গিত থাকলেও, 'ইজ্জৎ' গল্পে রয়েছে তার স্পষ্ট প্রতিফলন। গল্পশেষে বঞ্চিত শ্রেণি হাবিব মিঞার আপ্তবাক্যে দিশেহারা হয়নি, তার ষড়যন্ত্রের জালেও এরা ধরা দেয়নি। বরং ধলা মন্তাই ও জগন্নাথের যৌথ কর্মপ্রয়াসে প্রকম্পিত হয় হাবিব মিঞার অন্তরাত্মা। হাবিবের প্রিয় লালবিবি হঠাৎ মারা গেলে, তারই কাফনের কাপড় দিয়ে এরা পরিবারের ইজ্জত-রক্ষায় উদ্যোগী হয়।

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৬

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৭

দুর্ভিক্ষের সময় সরকারের ত্রাণ ব্যবস্থাপনার বাস্তবধর্মী বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে 'ভাঙা চশমা'[১] গল্পে। মহাজন-মজুতদারদের সমান্তরালে শিক্ষিতমহলের একটি অংশও আকালের দিনে সুযোগসন্ধানী হয়ে ওঠে। ত্রাণ কর্মকর্তার পরিচয়ে এরা দুর্গতদের মাঝে প্রভুত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। ত্রাণ বিতরণের পরিবর্তে তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে। জনসেবার তুলনায় ব্যক্তিস্বার্থই তাদের নিকট প্রাধান্য পায়। এছাড়া মন্বন্তরকালের ভঙ্গুর শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষকতা জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার দিকটিও এখানে করুণ রসাত্মকভঙ্গিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'ভাঙা চশমা'র এমএ-পাশ গল্পকথক মফস্বলের একটি স্কুলের শিক্ষক। ষাট টাকা বেতনের সঙ্গে কুড়ি টাকার দুটি টিউশনি যোগাড় করেও যুদ্ধ-অর্থনীতিতে তিনি পিছিয়ে থাকেন। ফলে তাঁর সংসারে বিরাজ করে নিত্য অভাব-অনটন। একসময় শিক্ষকতা পেশার প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন। ভবিষ্যতের দেশনায়ক ও সমাজনেতারা তাঁর বক্তব্যে উদ্দীপ্ত হবে – এরকম প্রত্যাশা ছিল চাকরির প্রথমাবস্থায়। তাঁর স্ত্রী অণু সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। গ্র্যাজুয়েট স্বামীর দুরবস্থা তিনি কল্পনাও করেননি। স্ত্রীর আশাহত মুখাবয়ব লক্ষ করে গল্পকথক আত্মগ্লানিতে ভোগেন।

একদিন এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকের মৃত্যুতে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই স্কুল ছুটি হয়ে যায়। আকস্মিক ছুটি পেয়ে গল্পকথক সহকর্মীদের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নিয়ে গল্পে মেতে ওঠেন। হঠাৎ প্রধান শিক্ষক তাঁদের একটি বিশেষ বার্তা শোনান – গ্রামাঞ্চলে ত্রাণ-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাব-ডেপুটি গ্রেডের কয়েকজন কর্মকর্তা নিয়োগ দেবেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। চাকরি অস্থায়ী হলেও প্রতিষ্ঠান-প্রধানের মনোনয়ন এবং আইনজীবী বন্ধুর বিলাতি পোশাক পরিধান করে গল্পকথক যথাস্থানে উপস্থিত হন। সৌভাগ্যবশত তিনি চাকরিটি পেয়েও যান। অতঃপর সাইকেল-যোগে তিনি ঘুরে বেড়ান গ্রামের পর গ্রাম। সাহায্যপ্রার্থীরা তাঁকে দেখে ডাকবাংলোর সামনে ভিড় করে। নানা স্তুতিবাক্য বর্ষিত হয় তাঁর প্রতি, আবেগে অনেকে 'মনিব', 'মা-বাপ', 'জেলার কর্তা' প্রভৃতি অভিধায় তাঁকে সম্বোধন করে। গল্পকথক ভাবেন, এমএ-তে প্রথম শ্রেণি প্রাপ্তির যথার্থ সম্মান তিনি এতদিনে অর্জন করতে চলেছেন।

সারাদিন ঔষধ-কম্বল ও রেশন বিতরণে গল্পকথক ব্যস্ত থাকেন। সন্ধ্যায় ম্যালেরিয়ার ভয়ে তিনি মশারির মধ্যে আশ্রয় নেন। পিয়ন হৃদয় প্রামাণিক তাঁর আহার পরিবেশন করে খাটের ওপরেই। রাতে দূর থেকে শোনা যায় শেয়াল-শকুনের চিৎকার। মহামারিতে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হলেও, অনাহারে তাদের স্বজনরা কান্নার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ভোরে ডাকবাংলোর বারান্দায় গল্পকথক আয়েশি ভঙ্গিতে চা-সিগারেট খান। দুমাস

[১] 'ভাঙা চশমা' *দেশ* পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় (১৩৫১) প্রথম প্রকাশিত হয়।

পূর্বেও তিনি এসময় পরিশ্রান্ত থাকতেন টিউশনির ব্যস্ততায়। দুর্ভিক্ষের আবির্ভাবে গল্পকথক নিজেকে বিজয়ী ভাবেন। তাঁর স্বগতোক্তি ছিল এরকম – 'দুর্ভিক্ষের জয় হোক – রিলিফের জন্যেই তো এমন চাকরিটা আমি পেয়ে গেলাম। মড়ক বিশেষ না হলে জীব বিশেষের পার্বণ হয় না, আমাদের দিকটাও তো দেখতে হবে।'[১] মন্বন্তরকালে মধ্যবিত্ত চরিত্রের নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত রূপ এটি।

সকাল থেকে ডাকবাংলোর নিচে ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড় জমে উঠেছে। কম্বল বণ্টনকালে পিয়ন হৃদয়ের কার্যকলাপে গল্পকথক আঁতকে ওঠেন। উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ের দিকে সে নির্লজ্জভাবে তাকিয়ে থাকে। অনাহারে শীর্ণ হলেও তরুণীর যৌবনশ্রী প্রকট। এতদিনেও মেয়েটি যে দালালচক্রের লোভীদৃষ্টিতে পড়েনি, এটি ভেবে কথক বিস্মিতবোধ করেন। মেয়েটিকে শীঘ্রই কম্বল দেওয়ার জন্য তিনি পিয়নকে নির্দেশ দেন। এ পর্যায়ে অধীন কর্মচারীর কাতারে গল্পকথক নিজেকে আবিষ্কার করেন। তাঁর মনে হয়, তারা দুজনেই মানুষের চরম দুর্গতির সুযোগ নিচ্ছেন। কম্বল বিতরণসূত্রে দরিদ্র মেয়েটিকে লোভীদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে হৃদয় প্রামাণিক। অপরদিকে রিলিফের কল্যাণে গল্পকথক ডাকবাংলোয় উপভোগ করছেন আরামপ্রিয় জীবন। সহসা তাঁর ভাবনালোকে ছেদ পড়ে। ভাঙা চশমা এবং ধূলিধূসর কাপড় পরিহিত এক বৃদ্ধ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকটি নিজেকে মাইনর স্কুলের হেডমাস্টার বলে পরিচয় দেন, যদিও এলাকাবাসী তাঁকে পাগল বলেই জানে। তিনি এখানে কম্বলের জন্য আসেননি, রিলিফ-কর্মকর্তার কাছে তাঁর ছোট্ট জিজ্ঞাসা – 'শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে। আচ্ছা বলুন তো, প্রিপোজিশন না পড়লে কি ইংরেজি শেখা যায় কখনো?'[২]

সন্ধ্যায় স্ত্রী অণুর চিঠিতে গল্পকথক কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। একটানা পনেরো দিন তিনি স্ত্রীসঙ্গ-বর্জিত। শিক্ষকতা পেশায় অতৃপ্তি থাকলেও তাঁর দাম্পত্যজীবন অসুখী ছিল না। শরীরে ওভারকোট জড়িয়ে তিনি বিষণ্নচিত্তে বেরিয়ে পড়েন। জ্যোৎস্নারাতে নদীর ধারে উন্মাদ হেডমাস্টারের সঙ্গে তাঁর পুনরায় দেখা হয়। লোকটি তাঁকে স্কুল ঘরে নিতে চান। গল্পকথক কৌশলে এড়িয়ে যেতে চাইলে, তিনি হাত চেপে ধরেন। অগত্যা রহস্যময় লোকটিকে অনুসরণ করতে তিনি বাধ্য হন। শিশিরভেজা মাঠ এবং আমবাগান পেরিয়ে একটি আটচালা বাড়ি, যার অর্ধেকটা ধসে গেছে – এটিই হেডমাস্টারের স্কুল। রিলিফ কর্মকর্তার নিকট তিনি বর্ণনা করেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের অতীত-বর্তমান :

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভাঙা চশমা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৬

> এই আমার স্কুল স্যার। সারাজীবন তিল তিল করে গায়ের রক্ত দিয়ে একে গড়ে তুলেছিলাম। বৌয়ের হার বিক্রি করে চালা উঠিয়েছি, মনে আশা ছিল দেশের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাব, হেডমাস্টার হবো। কিন্তু স্যার, কেন এল দুর্ভিক্ষ ? কোথায় গেল আমার ছাত্রেরা ? না খেয়ে মরে গেল, পালিয়ে গেল শহরে। আমার সারাজীবনের সব কিছু স্বপ্ন এমন করে কে শেষ করে দিলে বলতে পারেন ![১]

গল্পকথক নির্বাক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। অতঃপর হেডমাস্টারের চিৎকারে বাড়িটি প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। শূন্য স্কুল তিনি ভরিয়ে তোলেন কাল্পনিক অনুষঙ্গে। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি শুরু করেন 'প্রিপোজিশনে'র পাঠদান। অতিথির উপস্থিতি ভুলে হেডমাস্টার তাঁর বক্তৃতার মধ্যে নিমগ্ন হন। আর এই অবসরে অলীক স্কুলগৃহ থেকে গল্পকথক নিঃশব্দে পালিয়ে আসেন। হেডমাস্টারের পবিত্র অনুভূতির স্পর্শে নব্য অফিসারের মধ্যে যে ভাবান্তর তৈরি হয়, তা এরকম :

> যেন চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছি আমি। মনে হল, বিদ্যার এই তীর্থে আমার থাকবার অধিকার নেই – আমার ছোঁয়াতেও এখানকার সব কিছু শুচিতা মলিন হয়ে যাবে। আমি ব্রতচ্যুত, লোভী, স্বার্থপর।[২]

এসময় নদীর ওপার থেকে ভেসে আসে শেয়ালের ডাক, যা গল্পকথকের শৃগাল-প্রবৃত্তিকেই চিহ্নিত করে। বিদ্যার্জন করে তিনি কেবল স্বার্থচিন্তায় ব্যস্ত থেকেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের নিষ্পাপ সাহচর্যের পরিবর্তে তিনি লালন করেছেন ক্ষমতার মোহ। পক্ষান্তরে ভাঙা চশমার ফাঁকে হেডমাস্টার খুঁজে বেড়ান তাঁর হারানো ছাত্রদের। ত্রাণের আশায় তিনি গল্পকথকের কাছে হাত বাড়াননি, হাত ধরেছেন ভাঙা স্কুল পরিদর্শনের জন্য। মধ্যবিত্তের আদর্শচ্যুতি এ-গল্পে প্রকট হয়ে উঠেছে। সেজন্য গল্পশেষে সরকারের রিলিফ কার্যক্রম নয়, বড় হয়ে উঠেছে হেডমাস্টারের ভাঙা চশমাই।

দুর্ভিক্ষদশায় দরিদ্র নারীর সম্ভ্রমহানির গল্প 'খড়ুগ'[৩]। এ গল্পে গাড়োয়ান খেতুর স্ত্রী ভোমরার প্রতি হরিলাল তালুকদারের অনৈতিক আকর্ষণ প্রবল। হরিলালকে তাই ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে চলে ভোমরা। খেতুর নগদ অর্থসম্পদ নেই। গাড়িভাড়া দ্বিগুণ হলেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে পাঁচগুণ। উপার্জনের জন্য সে ছুটে চলে দূর-দূরান্তে। সাংসারিক টানাপড়েনে গ্রামের অন্য ভুঁইমালী মেয়েদের মতো ভোমরা চুন প্রস্তুত করে; কিন্তু খেতু তাকে বাজারজাতের অনুমতি দেয় না। হাটভর্তি মানুষের বিকৃত দৃষ্টির সম্মুখে স্ত্রীর চুনফেরি তার অপছন্দ। ভোমরার নিটোল সৌন্দর্যই তার ভয়ের কারণ। একদিন খেতুর অনুপস্থিতিতে হরিলাল গাড়োয়ান-পত্নীর কাছে

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৯

[২] প্রাগুক্ত

[৩] 'খড়ুগ' *যুগান্তর* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫১) প্রথম প্রকাশিত হয়।

আসে। পাঁচ সের চুনের বায়না বাবদ সে ভোমরার হাতে এক টাকা ধরিয়ে দেয়। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে সে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। চালের দুর্মূল্য তার জন্য দুশ্চিন্তার নয় – 'জমি আছে, পয়সা আছে। কারবার তো আছেই। যুদ্ধের বাজারে আরো কতদূর কী করেছে ভগবানই জানেন।'[১]

অন্যদিকে জীবনযুদ্ধে খেতু অবসন্ন, ক্লান্ত। দ্বিপ্রহরে যাত্রী নামিয়ে সে গ্রামের কাছাকাছি আসে। ক্ষুৎপিপাসায় তার বেহালদশা, গরু দুটির অবস্থাও মুনিবের অনুরূপ। পূর্বে একটানা পনেরো ক্রোশ পথ চললেও, এখন তিন ক্রোশ যেতেই পশু দুটি দুর্বল হয়ে পড়ে। পথিমধ্যে তালদিঘির স্বচ্ছ জল গাড়োয়ানকে আকৃষ্ট করে। এক বালতি জলের সঙ্গে সে গরু দুটির সামনে রাখে কয়েক গোছা শুকনো খড়। খাদ্যাভাবে যেখানে অগণিত মানবসন্তানের মৃত্যু হচ্ছে, সেখানে গোখাদ্য স্বপ্নবিলাস মাত্র। অনতিদূরে খেতুর বন্ধু নীলাই মুচির আবাস। অন্যদিনের চেয়ে আজ নীলাইকে বেশ নিরুত্তাপ দেখাচ্ছে। তার ঘরে বিক্রয়-উপযোগী সামান্য চামড়াও নেই, পরিবারের সকলে উপবাসী। নীলাই তার স্ত্রীকে গ্রামে পাঠিয়েছে চাল সংগ্রহের জন্য। বন্ধুর দুরবস্থার মধ্যে খেতু নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখে। এজন্য নীলাই দুটাকা কর্জ চাইলে সে বিনাবাক্যে সম্মত হয়। এসময় খেতুর শীর্ণ গরুদুটিকে চর্মকারের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে নীলাই – 'ওরা তো আর বেশিদিন বাঁচবে না। যদি মরে যায়, চামড়া দুটো আমাকে দিস তাহলে। ভুলে যাসনি যেন।'[২] এ মন্তব্যে খেতুর মন বিষিয়ে ওঠে। যে কোনো পন্থায় এক মণ খৈল যোগাড় করে সে অবলাদের প্রাণরক্ষার সংকল্প করে।

বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে না পেয়ে খেতু বিরক্ত হয়। হরিলালের চাহিদানুযায়ী চুনের যোগান দিতে ঝিনুক সংগ্রহে গেছে ভোমরা। ঘরে এসে ক্ষুধার্ত স্বামীর সম্মুখে সে মাটির ঘটিতে জল এবং কচু পাতায় খানিকটা লবণ রাখে। অর্থাভাবে কাঁসা-পিতলের তৈজসপত্রগুলো খেতু পূর্বেই বন্ধক রেখেছে। রান্নাঘরের দরজা খুলতেই ভোমরা স্তম্ভিত হয়। পেছনের বেষ্টনী ভেদ করে একটি কুকুর হাড়ি-কলসি ভেঙে ফেলেছে, ভাত-ডাল ছড়িয়ে রয়েছে ঘরময়। খাবারের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার করে খেতু। তিনটি টাকা তখনও অবশিষ্ট রয়েছে তার তহবিলে। তাড়ির দোকানে গিয়ে সে হতাশার অবসান ঘটায়। অন্যদিকে ঘরের খুঁটি ধরে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে অভুক্ত ভোমরা।

রাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়। ভালোবাসার পূর্ণ চাঁদ জ্যোৎস্না ছড়ায় এদের জীর্ণ কুটিরে। পরদিন রোহনপুর হাটে পণ্য সরবরাহে যায় খেতু। মণ প্রতি বারো আনা ভাড়া দিয়েছে মহাজন। স্ত্রীর জন্য হাট থেকে

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'খড়্গ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩১

সে নতুন শাড়ি ক্রয়ের স্বপ্ন দেখে। খেতু বেরিয়ে গেলে হরিলাল পুনরায় ভোমরার কাছে আসে এবং পান খাওয়ার বাসনা প্রকাশ করে। ভোমরা অস্বীকৃতি জানালে হরিলাল কঠোর হয়। প্রবল আক্রোশে সে খেতুকে ঋণ-সালিশীর মামলায় ফাঁসাতে চায়। উল্লেখ্য যে, হরিলাল গ্রামের রামসই ঋণ সালিশী বোর্ডের প্রভাবশালী সদস্য ও মোড়ল। অন্যের ক্ষতি করতে তার জুড়ি নেই। গরু ক্রয়ের সময় ইদ্রিস মিঞার কাছে খেতু যে বায়ান্ন টাকা কর্জ করেছে, তা এখনও বকেয়া। হরিলালের সামান্য ইশারায় খেতু পরদিনই বলদ-দুটি বিক্রয়ে উদ্যোগী হবে। আরেকটু কঠোর হলে সে নিজেই স্ত্রীকে পৌঁছে দেবে হরিলালের ঘরে। সুতরাং আত্মসমর্পণ ব্যতীত মেয়েটির দ্বিতীয় উপায় নেই।

এদিকে রোহনপুর যাত্রাকালে খেতু মুচিপাড়ায় বিরতি দেয়। নীলাইয়ের কাছে তার দুটাকা পাওনা রয়েছে। গতদিনের গুমোট পরিবেশ মুচিগৃহে নেই। নীলাই হৃষ্টচিত্তে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। চামড়ার অভাবে ঢোল বাজিয়ে সে রোজগারের চেষ্টা করছে। বন্ধুর কাছে তার আকুল জিজ্ঞাসা – 'আচ্ছা, যুদ্ধ কবে থামবে বলতে পারিস ?'[১] এ প্রশ্নের উত্তর খেতুরও অজানা। গাড়িতে বহু মালামাল থাকায় সে দ্রুত প্রস্থান করতে চায়। রাতে সাঁওতাল-পাড়ার রাস্তাও বিপৎসঙ্কুল। ক্ষুধার্ত মানুষগুলো ক্ষেপে উঠেছে, যে কোনোসময় হামলা করতে পারে। দুর্ভিক্ষে চোরাচালান প্রতিহত করবার এমন নানা দৃষ্টান্ত রয়েছে।[২] নীলাইয়ের রোগা স্ত্রী খেতুকে তামাক পরিবেশন করে। এরপর বন্ধুর পুনঃপুন অনুরোধে সে তাড়ির নেশায় আক্রান্ত হয়। বেলা অতিক্রান্ত হলে খেতুর ঘুম ভাঙে। দূরের পথ দুঃসময়ে পাড়ি দেওয়ার চিন্তায় সে তটস্থ হয়ে ওঠে। সহসা বলদ-দুটির মধ্যেও নীলাই অস্বাভাবিকতা লক্ষ করে। খেতুর গরু দুটির মুমূর্ষু দশাকে নীলাই সর্দি-গর্মি বললেও খেতু নিশ্চিত যে, চামড়ার লোভে এদের বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে সে। অতঃপর গো-হত্যাকারী বন্ধুর রক্তে খেতু যখন রঞ্জিত, সে-মুহূর্তে

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৬

[২] মন্বন্তরকালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 'ধনী জোতদারদের চোরাইচালানি বন্ধ করবার জন্য ইউনিয়নে-ইউনিয়নে গড়ে তোলা হয় লাঠিধারী ভলান্টিয়ারের দল। জোতদারেরা বহু গোরুগাড়িতে ধান বোঝাই করে রাত্রির অন্ধকারে অন্য জেলায় চালান দিত। তারা ধান চালান দিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা লুটত।... অনেক সময় চোরাকারবারিদের সঙ্গে সমিতির ভলান্টিয়ারদের সংঘর্ষ হত। কিন্তু ভলান্টিয়ারদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও চোরাকারবারিরা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হত। ভলান্টিয়ারেরা গোরুগাড়ির চোরাই ধান কৃষকদের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করে লিখিত রসিদ নিয়ে টাকা দিয়ে দিত জোতদারের লোকদের।' [উদ্ধৃত : ধনঞ্জয় রায় (সম্পাদিত), *তেভাগা আন্দোলন*, আনন্দ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ : নভেম্বর ২০১৫, পৃ. ৪৪] গল্পে খেতুর উদ্বেগের সঙ্গে এ বিষয়ের যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হয়।

ভোমরার দরজায় দাঁড়িয়ে হরিলাল। সে জানে, ভোমরা তার সম্পূর্ণ হস্তগত। কারণ – 'তার হাতে যে খড়ুগ উদ্যত হয়ে আছে, খেতুকে বধ করতে তার একটি মাত্র আঘাতই যথেষ্ট।'[১]

মন্বন্তরকালে জমিদার, মহাজন ও ক্ষমতাবানদের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে গ্রামাঞ্চলের জনজীবন। এ গল্পে খেতুর দুর্বলতার সুযোগে হরিলাল লুট করেছে ভোমরার সম্ভ্রম। এছাড়া নিম্নবর্গের মানষগুলোর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কীভাবে বিশ্বাসঘাতকতায় রূপ নেয় – তারও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন 'খড়্গ'। নীলাই-খেতু পরস্পরের সমব্যথী হলেও, খেতুর চরম সর্বনাশ করে তার বন্ধু নীলাই। হরিলালের তুলনায় নীলাইয়ের খড়ুগের ধারও কম নয়। জিঘাংসারূপ এ-খড়ুগই প্রতীকী-পরমার্থে খেতুর জীবন-দুর্গতির কারণ হয়েছে। দুর্ভিক্ষকালীন সমাজদেহের এ সকল অরাজক পরিস্থিতি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নির্মোহভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁর গল্পে।

চল্লিশের দশকে ধান-চালের মতোই নারী ছিল ব্যবসায়িক পণ্য। 'তীর্থযাত্রা'য় নারীপাচারের দৃশ্য থাকলেও 'ডিনার'[২] গল্পে রয়েছে এ ব্যবসায়ের স্বরূপ। পতিতাপল্লি ছাড়াও ইংরেজ অফিসারদের মনোরঞ্জনে ব্যবহৃত হয়েছে নারী। সাহেবদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অনেকে উপহার দিয়েছে 'ইন্ডিয়ান বিউটি'। 'ডিনার' গল্পে এ সত্য প্রকাশিত হয়েছে। আইএ পরীক্ষায় তিনবার ফেল করে রমাপতি ফিল্মের 'এক্সট্রা' সরবরাহের কাজ নেয়। 'সোনাগাছি'র পতিতাদের সে কলকাতার তিন-চারটি স্টুডিওতে যুক্ত করে। এ কাজের যৎসামান্য আয়ে তার দেশি মদের সংস্থান হয়। হঠাৎ তার জীবনে সৌভাগ্য বয়ে আনে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ :

> দেখতে দেখতে দেশ জুড়ে ভানুমতীর কুহক লেগেছে। কাঁকর হয়ে গেল ভিটামিন 'বি', স্ট্যান্ডার্ড কাপড় হয়ে গেল বেনারসী; মানুষের জীবন হয়ে গেল রাস্তার কাঁকর আর মেয়েদের ইজ্জৎ হয়ে গেল ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরো! নিরামিষাশী গণেশ রক্ষাকালী হয়ে নববলি নিতে লাগলেন। যুদ্ধের ধোঁয়ায় বিষণ্ন বাংলার আকাশে রক্তের অক্ষরে স্বাক্ষর দিয়ে গেল – সাল তেরশো পঞ্চাশ।[৩]

রমাপতি 'জয় সিদ্ধিদাতা' বলে নতুন ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছাত্রজীবনে বারবার ব্যর্থ হলেও, যুদ্ধের বাজারে তার মেধাশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। 'ডিনারে' যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনীতির দু-একটি প্রবণতার উল্লেখ রয়েছে। যেমন :

> ক) রমাপতি স্পেকুলেশন করে। যুদ্ধের বাজারে এ সম্পর্কে তার ভূয়োদর্শন এবং ভবিষ্যৎদৃষ্টি তাকে প্রচুরভাবে পুরস্কৃত

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'খড়ুগ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৮

[২] 'ডিনার' *পরিচয়* পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৫৩) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ডিনার', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮

করেছে।[1]

খ) যুদ্ধ থেমে গেছে, সে মার্কেট আর নেই। কন্ট্রোল ব্যবসার গলা টিপে ধরেছে।[2]

রমাপতির দাদা রঘুপতি পক্ষাঘাতগ্রস্ত। একসময় ভালো চাকরি করলেও শারীরিক দুরবস্থায় সে এখন ছোটো ভাইয়ের ওপর নির্ভরশীল। ঘরে রয়েছে তার কিশোরী কন্যা চম্পা। তাকে পাত্রস্থ করবার জন্য সে রমাপতিকে উপর্যুপরি তাগিদ দেয়। অথচ এ-ব্যাপারে রমাপতির তেমন আগ্রহ নেই। কিন্তু স্বার্থোদ্ধারের প্রয়োজনে সে এক নারীলোভী ইংরেজ অফিসারকে বশ করার জন্য নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রীকেই ব্যবহার করে। অর্থ-প্রতিপত্তির মোহে এভাবে ভেঙে পড়ে রক্তের বন্ধন। অপমানের যন্ত্রণায় রাতেই গলায় দড়ি দেয় চম্পা এবং তারই আত্মবলিদানের মাধ্যমে প্রসারিত হয় রমাপতির প্রতিষ্ঠার সোপান। কলকাতার নিকটবর্তী একটি যুদ্ধের কারখানায় সে তিনশো টাকা বেতনে চাকরি পায়। এমারজেন্সি ফায়ার ব্রিগেডকে মাঝেমধ্যে প্যারেড করানো এবং সাহেবদের সঙ্গে মদ্যপান করাই তার কাজ। একদিন শহরের অভিজাত রেস্টুরেন্টে রমাপতি তিন বন্ধুকে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানায়। এ ধরনের দামি রেস্তোরাঁয় বন্ধুরা ইতঃপূর্বে আসেনি। দুর্ভিক্ষের সময় কাটলেট, স্যুপের মতো উপাদেয় খাবার তারা কল্পনাও করেনি। তাই এ সুবাদে তারা 'রাক্ষসের মতো' খাবার গলাধঃকরণ করতে থাকে :

> দাঁত দিয়ে প্রাণপণে একটা মোটা হাড় চিবুচ্ছিল পট্‌লা – তার চোখ দুটো জ্বলছিল একটা জৈবিক হিংস্রতায়। যেন ভবিষ্যতে মানুষ-খাওয়ার মহড়া দিয়ে নিচ্ছে। বড় একটা চামচেতে নাক পর্যন্ত ডুবিয়ে চক চক করে সুপ খাচ্ছিল হরেন। আমি একটা কাটলেটকে কায়দা করবার চেষ্টা করছিলাম।[3]

ফিরতিপথে রমাপতির পকেট থেকে একটি রঙিন খাম পড়ে যায়। তার বন্ধু রঞ্জন দেখতে পায় খামের মধ্যে সংবাদপত্রের কয়েকটি খণ্ডিত অংশ। এগুলোর মধ্যে একটি সংবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য – 'বড়লাট বলেছেন : দেশে দুর্ভিক্ষ আসবে।'[4] তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তর যে শাসকগোষ্ঠীর পূর্বপরিকল্পিত – তা বড়লাটের অগ্রিম বক্তব্যসূত্রে অনুমেয়। দুর্ভিক্ষ আসন্ন জেনেও প্রশাসন কোনো প্রতিকার গ্রহণ করেনি, বরং 'আসন্ন রাষ্ট্রবিপ্লবের আশংকা'য় তারা ভারতবর্ষে সৈন্য ও অস্ত্রের মহড়ায় ব্যস্ত থাকে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বল্প পরিসরে দুর্ভিক্ষের কার্যকারণ নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ মদদেই যে তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তর – তারই ইঙ্গিত রয়েছে 'ডিনারে'।

---

[1] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬

[2] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

[3] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০

[4] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১

চম্পার মতো 'দ্বৈত' গল্পের সাবিত্রীও যুদ্ধ ও মন্বন্তরের বলি হয়েছে। গল্পে দেখা যায়, দুই বন্ধু প্রশান্ত ও অবিনাশ শোভাবাজারের মেসে দুঃসহ জীবন কাটায়। মেসের লম্বা ঘরে পাতানো রয়েছে সারি সারি মাদুরের বিছানা, আর সেখানে অবস্থান করে হারাণবাবু-যতীন চক্রবর্তীর মতো কিছু হতদরিদ্র। অর্থাভাবে প্রশান্ত ও অবিনাশ ঘুরে বেড়ায় কলকাতার পথে-প্রান্তরে। হঠাৎ যুদ্ধের বাজারে 'ধুলোমুঠিকে সোনামুঠি' বানিয়ে তারা সভ্যসমাজের প্রতিভূরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মেসজীবন থেকে তারা সত্বর গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়। অসৎ উপার্জন এবং অপকর্মের জন্য অবিনাশ অনুশোচনায় দগ্ধ হলেও প্রশান্তের কছে এসব চিন্তা 'বাজে ভাববিলাস' মাত্র। শুধু তারা নয়, যুদ্ধকালে অনেকেই হীনপন্থায় বিত্তাঢ্য হয়েছে। পুলিশ-কোর্টের সাধারণ উকিল বিরাজ মিত্রও একটি চমৎকার বাড়ি বাগিয়ে নিয়েছে। বিরাজের কন্যা সাবিত্রী ম্যাট্রিকে প্রশান্তের ছাত্রী ছিল। জনশ্রুতি রয়েছে, সুন্দরী মেয়েটিই পিতার ভাগ্য ফিরিয়েছে। সাবিত্রী প্রসঙ্গে অবিনাশ তার বন্ধুকে ফোনে বলেছে – 'She did her business without capital – আরও বলব, তার দেহের বিনিময়ে।'[১] শুধু বোম্বে-পাঞ্জাব-গুজরাট-মারাঠা নয়, আমেরিকান পুরুষরাও তার সঙ্গ প্রত্যাশা করে। অল্পদিনের মধ্যে মেয়েটি হয়ে ওঠে বিশ্বরঞ্জিনী। প্রশান্তের সঙ্গেও মাঝে-মধ্যে সাবিত্রীকে দেখেছে অবিনাশ। এমনকি 'ম্যাক্‌ফার্সনের বার' থেকে দুজনকে মদ্যপ অবস্থায় বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে।

মেয়ের উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ডে বিরাজ মিত্রের জীবনানুভূতি পাল্টে যায়। অপার ঐশ্বর্যের হাতছানিতে সে হারিয়ে ফেলে জীবনের মূল্যবান সম্পদ। তার কাছে বালীগঞ্জের অট্টালিকার তুলনায় বেনেটোলার পুরনো বাড়িই সুখের মনে হয়। সাবিত্রীও আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং আত্মহননের মধ্য দিয়ে মুক্তির অন্বেষণ করে। শেষ পত্রে সে যা লিখেছে, তাতে প্রতিফলিত হয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজের কদর্য রূপ :

> জীবনে যাকে প্রথম ভালোবেসেছিল, সে ওর ভালবাসার সুযোগ নিয়ে ওর মর্যাদার মূল্যে গড়েছে তার নিজের ভাগ্য। ওর রক্তে অধঃপতনের বীজ ছড়িয়ে সে শয়তানের মতো টেনে নিয়েছে ওকে নরকের দিকে, কুড়ি লক্ষ টাকা লাভ করে তিন লাখ টাকা ঘুষ দিয়েছে ও বাবাকে। কিন্তু এ নরকযন্ত্রণা আর ও সইতে পারছে না, এখন মৃত্যু ছাড়া আর ওর পথ নেই।
>
> মিষ্টিরিযাস না ? কী বলো ? জবাব দিচ্ছ না যে ? ছেড়ে দিয়েছ নাকি ? প্রশান্ত, প্রশান্ত –[২]

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দ্বৈত', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

এটি স্পষ্ট যে, সাবিত্রীর চরম সর্বনাশ করেছে তারই প্রিয়তম প্রশান্ত। এ গল্পে তার সর্বনাশের কারণ দ্বিবিধ : প্রথমত তার ভালোবাসার সঙ্গে প্রতারণা করে প্রশান্ত নিত্যনতুন 'কন্ট্রাক্ট' জুটিয়েছে, অন্যদিকে বিরাজ মিত্রও মেয়ের কারণে বৈষয়িক সমৃদ্ধি পেয়েছে।

'শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু' গল্পে দুর্ভিক্ষ নয়, বরং যুদ্ধ-মন্বন্তরের পটভূমিতে বিত্তবান হওয়ার পন্থা চিহ্নিত হয়েছে। এ-গল্পে কথিত 'স্বর্গীয় মহাপুরুষের অমর কীর্তিকলাপ' বর্ণনাসূত্রে কপট, স্বার্থান্ধ ও বকধার্মিক ব্যবসায়ীর মুখোশ উন্মোচন করেছেন লেখক। তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরে চাল মজুতের মাধ্যমে গোপীবল্লভ তিন লক্ষ টাকা সঞ্চয় করে। তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে জনৈক বক্তা তার প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির সমুদয় বৃত্তান্ত পরিবেশন করে। ১২৯২ বঙ্গাব্দে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরাগণায় গোপীবল্লভের জন্ম হয়। পিতা রাধাবল্লভ কুণ্ডু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বজ্রযোগিনীর বাজারে তার ছোট্ট কাপড়ের দোকান ছিল। বাল্যকালে পাঠশালায় ভর্তি হলেও গোপীবল্লভ ছিল লেখাপড়ায় ভীষণ অমনোযোগী। পণ্ডিত মশাইয়ের কঠিন শাসনেও তার বিশেষ উন্নতি হয়নি। এ কারণে রাধাবল্লভ তার পুত্রকে ব্যবসায়ে নিযুক্ত করে। শুরুতেই গোপীবল্লভ ব্যবসায়িক বুদ্ধির পরিচয় প্রদানে সক্ষম হয়। যে সকল ক্রেতা বকেয়া পরিশোধে বিলম্ব করছিল, গোপীবল্লভের বাকচাতুর্যে সেসব বকেয়া আদায় হতে থাকে। অল্পবয়সে প্রতাপপুর গ্রামের রাজীবলোচন কুণ্ডুর দ্বিতীয়া কন্যা তারাসুন্দরীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। পিতার মৃত্যুর পর ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও অনুজ রামবল্লভের সঙ্গে গোপীবল্লভের মতান্তর হয় এবং ঘটনা আদালত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

অধিকারবঞ্চিত গোপীবল্লভ প্রচণ্ড মনঃকষ্টে কলকাতায় পাড়ি জমায়। তার যৎসামান্য মূলধন পাটের ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে তা ক্ষণিকেই নিঃশেষিত হয়। এরপর সে মহানগরের পতিতা পল্লিকেন্দ্রিক এক অদ্ভুত ব্যবসায়ের প্রচলন করে। মদ্যপ ধনীপুত্ররা অর্থের অভাবে শখ মেটাতে ব্যর্থ হলে, সে দস্তখতসহ ঋণ দেয়। তাদের বিনষ্টি ও মাতলামির সুযোগে সে শতমুদ্রা দিয়ে দশসহস্র মুদ্রা আদায় করে। এরূপ শঠপন্থায় সে বিপুল অর্থের মালিক হয়। তার এ হীনকর্মের মধ্যে গল্পকথক প্রত্যক্ষ করে সমাজের মঙ্গলবার্তা। গোপীবল্লভের উদ্ধৃতি দিয়ে সে বলে :

> এই উপায়ে ক্রমে তিনি বহু চরিত্রহীন ধনী সন্তানকে অবিদ্যা গমনজনিত পাপ থেকে মুক্ত করেন। গোপীবল্লভ বলতেন, "অর্থ ঈশ্বরের দান। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পুণ্যকর্ম, দেবালয় ও অতিথিশালা প্রভৃতি সৎকার্য অর্থের ওপরেই নির্ভর

> করে। সুতরাং এই ঐশ্বরিক বস্তুকে যারা কদাচারে অপব্যয় করে, তাদের কাছ থেকে একে রক্ষা করাই ধর্মনিষ্ঠ মনুষ্যের কর্তব্য। বস্তুত গোপীবল্লভ এই কর্তব্যপালনে সদা সজাগ ছিলেন।[১]

অবৈধ উপার্জনে গোপীবল্লভ কলকাতার বড়বাজারে কাপড়ের দোকান দেয়। অল্পদিনে সে পোশাক ও চিনিকলের স্বত্বাধিকারী হয়। প্রতিষ্ঠান দুটি সে নিয়মমাফিক পরিচালনার অঙ্গীকার করে। একদল শ্রমিক কটনমিলে ধর্মঘট করলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে এবং তিনজন শ্রমিক প্রাণ হারায়। তীব্র শ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গোপীবল্লভ তাদের কয়েকটি দাবি মানতে বাধ্য হয়। এভাবে চিনিকলের শ্রমিক অসন্তোষও সে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে সরকারি দমননীতির সে ঘোর বিরোধী। একজন বাঙালি সাপ্লাই-ইন্সপেক্টর তিনটি মালবোঝাই নৌকা আটক করলে তার প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ও অর্থদণ্ড হয়। এজন্য আক্ষেপের সুরে সে বলে – 'বাঙালিকে বাঙালি না রাখিলে কে রাখিবে একথা সম্পূর্ণ মিথ্যে। বাঙালি সব সময় বাঙালির সর্বনাশের চেষ্টা করে।'[২] পরাধীন ভারতবর্ষের জন্য গোপীবল্লভ অনুভব করে মর্মবেদনা। তবে তার দেশপ্রেমের স্বরূপ ভিন্নতর। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা তার পছন্দ হয়নি। এ বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র :

> আন্দোলন করে বা বিপ্লব করে স্বাধীনতা আসে না। ইংরেজ আমাদের শত্রু নয়। তা ছাড়া তারা রাজা – আমাদের শাস্ত্রে রাজদ্রোহিতা মহাপাতক।... বরং ইংরেজ ভারত শাসন করলে একদিক দিয়ে সুবিধে আছে – পাকিস্তান আর হিন্দুস্তানের জটিল সমস্যাটার উদ্ভবই হবে না। তা ছাড়া নিজেদের দেশ স্বাধীন করবার যোগ্যতাও এ পর্যন্ত আমাদের আসেনি, কারণ দেশীয় শিল্পপতিদের অনিষ্ট কামনা ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে রাজী নই।[৩]

আধুনিক যুগের প্রগতিশীলতা গোপীবল্লভকে পীড়িত করে। নারীশিক্ষার প্রতি সে পোষণ করে তীব্র বিদ্বেষ। নিজ কন্যা ও পৌত্রীদের সে ইংরেজি শিক্ষা থেকে বিরত রাখে। পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হিসেবেও পরিচিত মহলে সে প্রশংসিত হয়। জন্মস্থান কুণ্ডুগ্রামে 'বৈষ্ণবতোষিণী সভা'র সে প্রতিষ্ঠাতা এবং স্থায়ী সভাপতি। শ্রী শ্রী বৃন্দাবনধামে সে স্থাপন করে নিজ-মূর্তি ও মন্দির। গোপীবল্লভের দানশীলতার সম্যক পরিচয় রয়েছে এ ভাষণে। মজুতদারির কালো টাকায় সে কুণ্ডুগ্রামের লঙ্গরখানায় এক সহস্র মুদ্রা চাঁদা দেয়।

তৎকালীন ভারতবর্ষে অনেকের সামাজিক ভিত্তিভূমি নির্মিত হয়েছে গোপীবল্লভের প্রক্রিয়ায়। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষের অর্থনীতিতে তারা হঠাৎ ফুলে-ফেঁপে ওঠে। এই নব্য বুর্জোয়ারা শীঘ্র বিস্মৃত হয় তাদের অতীত অবস্থান। এজন্য নিজগোত্রের ওপর তারা শোষণ-নিপীড়নে লিপ্ত থাকে। সামাজিক শ্রেণি পরিবর্তিত হলেও এরা সুসংস্কৃত

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২২-৭২৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৫

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৪

হতে পারেনি। শ্রাদ্ধকৃত্যে গল্পকথক পূর্বাপর গোপীবল্লভের গুণকীর্তন করলেও, অব্যক্ত থাকেনি তার দুরাচারের চিত্র।

দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের নৈতিক স্খলনের চূড়ান্ত রূপ 'বিসর্জন'[১]। এ গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে এক আশ্রিতা বৃদ্ধাকে কেন্দ্র করে। সুদামের মা মানবিক বিবেচনায় এই অনাথা বৃদ্ধাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর সংসারে। বৃদ্ধাও তাদের সংসারে নানা কাজ করতেন। এক পর্যায়ে সুদামের পিতামাতার মৃত্যু হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে সুদাম যতটুকু জমি পায়, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কখনো সবজি বিক্রয় করে, কখনো দিনমজুর খেটে সে জীবিকা নির্বাহ করে। দুর্ভিক্ষের বাজারে চালের মূল্য বৃদ্ধি পেলে পরিবারের সবার গ্রাসাচ্ছাদন তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ-নিয়ে যখন সুদাম দুশ্চিন্তায় কাতর, তখন সে লক্ষ করে – বৃদ্ধার পেটে জড়ো হয়েছে রাক্ষুসে ক্ষুধা। অসুস্থ এ নারী ঘুমায় না, চেতন কিংবা অবচেতন মনে সে সর্বক্ষণ অতীত-স্মৃতি রোমন্থন করে। তিরিশ বছর পূর্বের মৃত স্বামী, তার আলতা রাঙানো পা কিংবা দশ সেরি রুই মাছের ছবি তাকে তাড়িত করে। তখনই বিকট কণ্ঠে সে চিৎকার করে – 'এ বাড়িতে সব মরে-হেজে শেষ হয়ে গেল নাকি গো ? আমাকে কেউ চাট্টিখানি খেতেও দেবে না ?'[২]

বৃদ্ধার হা-ভাতে স্বভাবে ক্ষিপ্ত হয় তুলসী। কিন্তু সুদাম জানে, এ ক্ষিপ্তভাব ক্ষণিকের। আশ্রিতার প্রতি তার স্ত্রীর মমতা অফুরন্ত। নতুন বধূরূপে এ-বাড়িতে আসার পর তুলসী যখন তার মায়ের জন্য কান্না করতো, বৃদ্ধা সেসময় তাকে মাতৃস্নেহে আগলে রাখতো। তবে এই আশ্রিতার প্রতি সুদামের বিন্দুমাত্র দয়া নেই। একদিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুলসী বোনের বাড়িতে গেলে, সুদাম হিংস্র হয়ে ওঠে। শিমুলতলীর মন্দিরদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে বৃদ্ধাকে বিসর্জনের পরিকল্পনা করে। অন্ধকার রাতে কাজটি অন্যায় ভাবলেও তার অন্তরাত্মা বলে ওঠে :

> কেন অন্যায় ? মরবার সময় হলেও যে মরে না – সম্পূর্ণ অকারণে যে জ্যান্ত মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে খায় – এ ছাড়া আর কী করা যেতে পারে তার জন্যে ? সুদাম জানে, সরকারী চাকরিরও একটা মেয়াদ আছে; সময় হলেই তোমাকে ছাড়িয়ে দেবে – সে তুমি হাকিমই হও আর পেয়াদাই হও। তেমনি বেঁচে থাকারও একটা সীমা থাকা দরকার – তারপরে তুমি আর কেউ নও, কোথাও তোমার দরকার নেই।[৩]

---

[১] 'বিসর্জন' *আনন্দবাজার* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৭৪) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিসর্জন', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫১

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৫

নদীর শীতল হাওয়ায় বৃদ্ধার কষ্ট দেখে সুদাম তাকে ছিন্ন আঁচলে জড়িয়ে রাখে। তবে শাড়িটি পচে যাওয়ায় তা মুহূর্তে ছিঁড়ে যায়। সুদামের মনে পড়ে, দীর্ঘদিন সে আশ্রিতাকে শাড়ি কিনে দেয়নি। অপরাধবোধে কোমরে বাঁধা নতুন গামছা দিয়ে সে বৃদ্ধার শরীর আবৃত করে। ভাটার টানে নৌকাটি তখন নিঃশব্দে ছুটছে। সুদাম সামান্য কাশি দিলে বৃদ্ধা স্নেহবশত ওর বুকে হাত বুলাতে চায়। মন্দিরদর্শনের প্রতিদানস্বরূপ সুদামের নিকট সে প্রকাশ করে গুপ্তধনের তথ্য – বালিশের মধ্যে সে দুকুড়ি রৌপ্যমুদ্রা সঞ্চিত রেখেছে। অবশেষে নিকটবর্তী একটি চরে সুদাম নৌকা ভেড়ায়, এখানে বৃদ্ধাকে অপেক্ষা করতে হবে অন্তত দুঘণ্টা। এরপর জোয়ার এলে সে ভেসে যাবে অথৈ জলে। এসময় শায়িতা বৃদ্ধাকে দেখে একটি কুমির সেদিকে ধাবিত হয়। চোখের সম্মুখে মানবদেহ নিয়ে কুমিরের উল্লাস সুদাম কল্পনাও করতে পারে না। ক্লান্তি, বিরক্তি এবং নির্ঘুম রাতের অবসাদে সে বৃদ্ধাকে নিয়ে যাত্রা করে বাড়ির পথে। দুর্ভিক্ষের যাঁতাকলে স্বভাব নষ্ট হলেও, শেষপর্যন্ত সুদামের মানবিক সত্তাই জয়ী হয়। অবশ্য এ ধরনের ইতিবাচক উত্তরণ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দুর্লক্ষ্য নয়।

তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরে মানুষ ভাতের অভাব পূরণ করেছে ফ্যান, বুনো শাক, মাটি কিংবা ফলের শুকনো বীজ দিয়ে। সাময়িক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তারা এগুলো আহার্য হিসেবে গ্রহণ করলেও শেষপর্যন্ত তা মৃত্যুর কারণ হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়', 'ডিম', 'তীর্থযাত্রা' এবং 'নক্রচরিত' গল্পে এমন উদাহরণ রয়েছে। তবে 'সেই মৃত্যুটা'[১] গল্পে জানা যায় এর বিস্তারিত বিবরণ। এ গল্পের চরিত্রগুলো ক্ষুধার যন্ত্রণায় নানা অসংলগ্ন আচরণ করেছে, তাদের বক্তব্যও হয়েছে অ্যাবসার্ডধর্মী। এখানে দুর্ভিক্ষের দাপটে পিষ্ট গ্রামের দুই ক্ষেতমজুর : মোনা মিঞা ও চিন্তাহরণ। অর্থসংকটে মোনা শৈশবে মাদ্রাসা থেকে বিতাড়িত হয়। অন্যদিকে জন্মলগ্নে চিন্তাহরণকে তার ঠাকুরমা আশীর্বাদ করে – শিশুটির নিজস্ব হাল-গরু থাকবে, দশ-বিশ বিঘা জমির সে মালিক হবে। তার বাবা একথা বিশ্বাস করে সন্তানের হাতে দু-চারটি তাবিজ বেঁধে দেয়। পরবর্তীকালে বোঝা যায়, বৃদ্ধা তার নাতিকে নিয়ে ঠাট্টা করেছে।

চিন্তাহরণ বন্ধুর কাছে বিড়ি চাইলে মোনা অসন্তুষ্ট হয়। সবকিছুর মতো বিড়ির দামও তখন ঊর্ধ্বমুখী। অর্ধেক বিড়ি টেনে চিন্তাহরণ বাকিটা কানের সঙ্গে গুঁজে রাখে। এসময় ছোটো কালভার্টের পাশে একটি মরণাপন্ন গরু তাদের দৃষ্টিগোচর হয়। গরুটির ছাই রঙের চোখে জলের রেখা স্পষ্ট। চিন্তাহরণের মনে হয় – 'মরবার আগে গোরুটা কেঁদেছে। কে কাঁদে না ?'[২] মানুষ আর গরুর পরিণতি এখানে অভিন্নভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। গরুটি

---

[১] 'সেই মৃত্যুটা' *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৭৪) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সেই মৃত্যুটা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৩

মারা গেলে চামড়া সংগ্রহের জন্য মুচির আসবার সম্ভাবনা নেই। দুর্ভিক্ষে মুচিপাড়ার সকলে মৃত্যুবরণ করেছে। লজ্জায়-কষ্টে বৃদ্ধ কিষ্টদাসও সম্প্রতি গলায় ফাঁস দিয়েছে। বৃদ্ধ ইচ্ছে করলে কিছুদিন বাঁচতে পারতো, তার ঘরের বারান্দায় একরাশ শুকনো জামের আঁটি দেখেছে চিন্তাহরণ। সেগুলো সিদ্ধ করলে কিষ্টদাসের আহারের সংস্থান হতো। তবে এমন রসিকতায় মোনা যুক্ত হতে পারে না। কারণ তাদের অদৃষ্টে হয়তো জামের বিচিও মিলবে না। এসময় তারকানাথের পূজা দিয়ে তিন ব্যক্তি ক্ষিপ্রবেগে পথ অতিক্রম করে। দুর্ভিক্ষ নিরাময়ে এ ধরনের আচার-অনুষ্ঠান যে অর্থহীন, মোনাও তা বোঝে –

> ক) পুণ্যিতে পেট ভরে নাকি ? বাবা তারকানাথ চালের কিলো নামিয়ে দিতে পারে বারো আনায় ? ছটা বিড়ি দিতে পারে পয়সায় ?[১]

> খ) ঘোড়াড্ডিম ধম্মো-কম্মো। আমি কাউকে ডরাই নে। পীর নবী আল্লা–সকলকে হক কথা শুনিয়ে দিতে পারি। জমিরুদ্দিন মোল্লা তো জমি বলদ বেচে হাজী হয়ে ফিরে এসেছিল। কী হল শেষটায় ? পোকা-মারা বিষ খেয়ে মরে বাঁচল।[২]

দিনকয়েক মোনা অভুক্ত; ভাত খায়নি। তৎসত্ত্বেও সে বেসুরো কণ্ঠে গায় – 'রমজানেরই রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ।'[৩] ঈদের গানের মধ্যে সে অনুভব করে 'গোস্ত, পোলাও, বিরিয়ানি'র গন্ধ। চিন্তাহরণ খেয়েছে কলমি শাক, যদিও দুদিন পর তাও ফুরিয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ পেছনের রাস্তা দিয়ে বিকট শব্দ এবং ধূলি উড়িয়ে বেরিয়ে যায় একটি জিপগাড়ি। ভোটের মৌসুমে এরকম বহু গাড়ি এসেছে তাদের গ্রামে। কৃষকদের প্রত্যেককে পাঁচ কাঠা জমি বণ্টনের প্রতিশ্রুতি দিলেও নেতারা এখন নিশ্চুপ। দুর্ভিক্ষে মোনার মেয়ের নিশ্চিত মৃত্যু ঘটবে, চিন্তাহরণের স্ত্রীর পরিণতিও হবে একইরকম। অনাহারে মুমূর্ষু গরুটির মতো তারাও ধাবিত হচ্ছে অনিবার্য মৃত্যুর পথে। 'সেই মৃত্যুটা' গল্পে নিম্নশ্রেণিও মন্বন্তরের নানা সমীকরণ মিলিয়ে দেখেছে। এরা দৈবশক্তি কিংবা রাজনৈতিক বোলচালে প্রলুব্ধ হয়নি, নিজেদের সাধ্যানুযায়ী বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৬

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তরের পরই বাংলাজুড়ে আরম্ভ হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কলকাতায় মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়, তা ছড়িয়ে পড়ে দেশময়। হিন্দু-মুসলমান দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করলেও, তারা পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়। দাঙ্গাকালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতায় আতঙ্কিত জীবনযাপন করেছেন। তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় এক স্মতিকথায় জানিয়েছেন :

> ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বঙ্গবিভাগ, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তুর অবিশ্রান্ত তরঙ্গমালা, বিশেষ ক'রে কলকাতার প্রতিটি মানুষ এই অস্বাভাবিক বিপর্যয়ে বিপন্ন হয়ে পড়ল।... দাঙ্গার সময় নারায়ণবাবু পটলডাঙ্গা স্ট্রীটে দিনকয়েক প্রায় অবরুদ্ধ জীবন কাটিয়েছেন। যোগাযোগ চলত একমাত্র টেলিফোনে।[১]

ছেচল্লিশের দাঙ্গা নারায়ণকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। তখনকার অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তিনি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন। "১৯৪৬-১৯৪৭-এর সাম্প্রদায়িক কলুষ কলংকিত দিনগুলিতে দেশের মুক্তিপ্রয়াসী জনতার পক্ষ থেকেই ভারতীয় গণনাট্যসংঘের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয় 'শহীদের ডাক'... অসম্ভব সাড়া পেয়েছিল এই নাটিকা, যার মূল পাণ্ডুলিপি রচনা করেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।"[২] এছাড়া ছেচল্লিশের দাঙ্গার নৃশংসতা চিত্রিত হয়েছে তাঁর 'অপঘাত', 'উস্তাদ মেহের খাঁ', 'সঞ্চার' প্রভৃতি গল্পে।

১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যয়ের 'অপঘাত'[৩] গল্প। দাঙ্গার ভয়ে আদর্শনিষ্ঠ রাজনীতিবিদের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ এ-গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়। কংগ্রেস-নেতা সত্যশরণ চ্যাটার্জির কন্যা নমিতাকে পছন্দ করে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর সঞ্জীব। নমিতার কলেজযাত্রার সময় সে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এই দুই-আড়াই মিনিটকে তার সারাদিনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত বলেই মনে হয়। অথচ নমিতার কাছে এর কোনো মূল্যই নেই। স্বদেশের জন্য তার তিনপুরুষ জেল খেটেছেন, বড়দা মারা গেছেন আন্দামানে। সেও তৈরি হচ্ছে জেল-জুলুমের জন্য, রঙিন শাড়ি ছেড়ে তাই সে পরিধান করছে খদ্দরের কাপড়। অন্যদিকে দেশদ্রোহীদের রক্তে রঞ্জিত রাজপথ মাড়িয়ে সঞ্জীবকে চলতে হয়, রিভলবারের ইশারায় তাকে রোধ করতে হয় ছাত্রদের বজ্রমিছিল। অবশ্য চাকরি ছেড়ে এ পুলিশ অফিসারও দাঁড়াতে চায় জনতার কাতারে। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের অন্নসংস্থানের প্রশ্নে তাকে প্রতিনিয়ত আপস করতে হয় :

---

[১] উদ্ধৃত : সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

[২] সুপ্রিয় সেন, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্য', তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বর্মণ (সম্পাদিত), *কোরক* (দ্বিতীয় পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩

[৩] 'অপঘাত' *পূর্বাশা* পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় (১৩৫৩) প্রথম প্রকাশিত হয়।

> চাকরি ছাড়তে পারবে না সঞ্জীব। বাপ-মা, ভাই-বোনের মুখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে। তার রোজগারের ওপরেই নির্ভর করছে সংসার। হাতে তার যত রক্ত মাখাই থাক – সেই রক্তমাখা টাকাতেই চলবে দিনগত পাপক্ষয়ের শোচনীয় আত্ম-অবক্ষয়। কিন্তু ওই রক্তাক্ত হাতে নমিতার শুভ্র খদ্দরের শাড়িকে সে কখনো স্পর্শ করতে পারবে না, শুধু সে মুঠোয় তার রিভাল্‌বারটাকেই নিষ্ঠাভরে আঁকড়ে রাখতে পারবে।[১]

গ্লানিময় জীবন থেকে উদ্ধার পেতে সঞ্জীব আত্মহত্যার চিন্তা করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দি সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে এবং ক্যাপ্টেন রশিদ আলির কারাদণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় পালিত হয় দুর্বার ছাত্র ধর্মঘট। সঞ্জীবের রিভলবার উপেক্ষা করে এগিয়ে চলে বিক্ষোভকারীরা। কলেজ স্কোয়ারে ছাত্রদের শোভাযাত্রায় নমিতা বহন করে ভারতের পতাকা। মিছিলের পাশে ইউনিফর্ম-পরিহিত সঞ্জীবকে ছাত্ররা তাচ্ছিল্য করে – 'শেম, শেম।' সঙ্গত কারণে নমিতার সঙ্গে তার দূরত্ব আরো বৃদ্ধি পায় :

> তাকে বাদ দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীটা, তার রিভালবারকে উপেক্ষা করেই আসছে আন্দোলনের পরে আন্দোলন। ২১শে নভেম্বর চলে গেল, চলে গেল আই-এন-এ ডে, তারপরে স্ট্রাইক। সত্যশরণবাবুর সঙ্গে ব্যবধানের সীমারেখাটা আরো বেশি বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে সঞ্জীবের।[২]

রশিদ আলি দিবসে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একত্রে স্লোগান দেয় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাই। অথচ কিছুদিনের ব্যবধানে তারা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ২৪ আগস্ট ১৯৪৬, সঞ্জীবের দীর্ঘদিনের লালিত বিশ্বাসে চিড় ধরে। কলকাতার দাঙ্গা নিরসনে উদ্যোগী না হয়ে, সত্যশরণ তার শরণাপন্ন হন – 'এখন আপনারাই ভরসা, যদি মুসলমানেরা অ্যাটাক-ফ্যাটাক করে।'[৩] আতঙ্কিত কংগ্রেস নেতাকে আশ্বস্ত করে দায়িত্বসচেতন পুলিশ অফিসার। তাদের আলাপকালে নমিতা বিনয়ী ভঙ্গিতে চা-পরিবেশন করে। তবে সঞ্জীবের কাছে এ নারী অপরিচিতা – 'নমিতা কখনো এত কুৎসিত হতে পারে এটা স্বপ্নের অতীত ছিল সঞ্জীবের।'[৪]

'অপঘাত' গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকায় দুটি বিপ্লবী আত্মার অপমৃত্যু হয়েছে। ব্রিটিশ প্রশাসনের আজ্ঞাবহ হয়েও সঞ্জীব দেশের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতি ছিল শ্রদ্ধাশীল। নমিতার প্রতি তার আকর্ষণ কেবল রূপজ মোহ নয়, তার বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ভূমিকাকে সে অবচেতন স্তরে ভালোবেসেছে। এজন্য দীর্ঘদিন

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'অপঘাত', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৪

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৬

[৪] প্রাগুক্ত

পর নমিতা ও তার পিতা যখন সংগ্রামের পরিবর্তে আপসকামিতাকে বেছে নিয়েছে তখনই সঞ্জীবের মধ্যে তৈরি হয়েছে প্রবল নৈরাশ্য।

'সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং সংঘাত মানুষের মানবিকতা ও মানবপ্রীতিকে যে ধ্বংস করে'[১] তা প্রদর্শিত হয়েছে 'উস্তাদ মেহের খাঁ'[২] গল্পে। চার পুরুষ ধরে মেহের খাঁ সংগীতাঙ্গনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন। শৈশবে তিনি দিল্লির উস্তাদ আল্লাবক্সের সান্নিধ্য পান এবং পঁচিশ বছর বয়সে সিদ্ধিলাভ করেন। দীর্ঘদিন পর একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে বেসুরো সানাই শুনে মেহের খাঁ হতাশ হয়ে পড়েন। এই হতাশার পরিপ্রেক্ষিতে শঙ্কর নামের এক যুবক তাঁর ভ্রম সংশোধন করে বলে – 'ও লোকটা বেহাগ বাজাচ্ছে না, বাজাচ্ছে আধুনিক একটা গান'।[৩] তখন তিনি সম্বিৎ ফিরে পান এবং বুঝতে পারেন এটি দিল্লি নয়, বাংলার ছোটো একটি গ্রাম – নরোত্তমপুর।

উস্তাদ মেহের খাঁর শিষ্যপুত্র এই শঙ্কর। পনেরো বছর পূর্বে মেহের খাঁ এদের গৃহে আশ্রিত ছিলেন। শঙ্করের বাবা জগন্নাথ চৌধুরী তাঁকে গুরুদেব হিসেবে সমীহ করতেন। বাল্যকালে শঙ্কর তাঁর নিকট সেতারের প্রশিক্ষণ নেয়। পরবর্তীকালে কলকাতায় অবস্থানসূত্রে ছেলেটি রপ্ত করে গিটার বাজানোর কৌশল। শঙ্করের ধারণা – উস্তাদ গান জানেন না, আয়ত্ত করেছেন শুধু সংগীতের প্রাচীন ব্যাকরণ। এমনকি আড়ালে-আবডালে সে মেহের খাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করে। তার স্ত্রী রমা এসবের প্রতিবাদ করলে সে 'ইডিয়ট' বলে ভর্ৎসনা করে।

মূলত উস্তাদের প্রতি রমার শ্রদ্ধা অকৃত্রিম। তাদের বিবাহে শঙ্কর কলকাতার বহু শিল্পীকে আমন্ত্রণ করেছিল। এ আসরে মেহের খাঁর সংগীত-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তবলাবাদক তাঁর পায়ের ধূলি গ্রহণ করেন। ঘোমটার অন্তরালে রমা সেদিন বুঝেছিল উস্তাদজির শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর হৃদয়ের একাকীত্ব। বিয়ের পর গুরুদেবের গৃহে সে মাঝেমধ্যে যাতায়াত করেছে। ব্যক্তিজীবনে আশিক বাঈকে হারিয়ে মেহের খাঁ তার মধ্যে সন্ধান পেয়েছেন এক নিষ্ঠাবতী সাধিকাকে। কন্যার স্নেহে তিনি রমাকে বিতরণ করেন সুরের ঐশ্বর্য – 'পিয়ারীকে যা দিতে পারেননি, বেটীকেই তা দিয়ে যাবেন।'[৪]

ইতোমধ্যে কলকাতায় আরম্ভ হয় সর্বনাশা দাঙ্গা। নগরীর রাস্তায় কেবল মানুষরূপী 'হিংস্র জানোয়ারের ক্ষুধিত পদসঞ্চার'। দু-একদিনের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী শহর পরিণত হয় 'সুন্দরবনে'। এসব তথ্য মেহের খাঁ রাখেন না।

---

[১] অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ড., *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : ছোটগল্পের রূপকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

[২] 'উস্তাদ মেহের খাঁ' *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫৪) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উস্তাদ মেহের খাঁ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৬

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৪

এদিকে চার-পাঁচজন ছেলে শঙ্করকে সতর্ক করে। বাইরের বিস্তর লোক গ্রামে জড়ো হয়েছে, খালপাড়ের মসজিদে তারা গোপন-বৈঠক করে এবং গভীর রাতে মশাল জ্বেলে লাঠি খেলে। প্রতিবেশীদের দৃষ্টিতে, মেহের খাঁ হচ্ছেন ঘরের শত্রু 'বিভীষণ'। শঙ্কর হাসিমুখে বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও ক্রমশ তার বিশ্বাস হয় – 'উস্তাদজী গুণী নন, উস্তাদজী আর কিছু নন, তিনি মুসলমান। এবং ফলে তাঁকে বিশ্বাস করা চলে না।'[১]

এ-রাতে শঙ্কর উস্তাদের ঘরের পেছন দিয়ে একজনকে বেরিয়ে যেতে দেখে। এ আগন্তুক অন্য কেউ নয়, উস্তাদের একান্ত ভক্ত রমা। সত্যসন্ধ মেহের খাঁ শঙ্করের নিকট অভ্যাগতের পরিচয় প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত শিষ্যপুত্র এসময় যে আচরণ করে, তা শিষ্টাচার বহির্ভূত। উস্তাদকে সে সত্বর গৃহত্যাগের নির্দেশ দেয়। কোনো কৈফিয়ত ছাড়া মেহের খাঁ পরদিন নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান। গল্পের শেষে দেখা যায়, দাঙ্গা-কবলিত কলকাতার পথে পথে তিনি অনাহারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এসময় তাঁর মুখে শঙ্কর চৌধুরীর নাম শুনে মুসলিম সন্ত্রাসীরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। প্রাসঙ্গিক বর্ণনা উদ্ধৃতিযোগ্য :

> নির্জন পথ – অন্ধকার। হঠাৎ দুদিক থেকে দুজন গুণ্ডা চেহারার লোক এসে তাঁর হাত ধরল।
>
> – এই মিঞা সাহেব, যাবে কোথায় ?
>
> অদ্ভুত আবিষ্ট চোখে উস্তাদজী তাকালেন।
>
> – বলতে পারো ভাই, এখানে শঙ্কর চৌধুরীর বাড়ি কোথায় ?
>
> – শঙ্কর চৌধুরীর বাড়ি – লোক দুটো হিংস্র জন্তুর মতো হেসে উঠল শব্দ করে : খুব কাছেই। পাশের এই অন্ধকার কানা গলিটার ভেতরে। সদর রাস্তাতেই পৌঁছে দিতে পারতাম, কিন্তু কানা গলিই সুবিধে – শর্ট কাট্। চলে এসো।
>
> নির্জন পথ। শ্রাবণের অশ্রুধারার মতো অশ্রান্ত বৃষ্টি। উস্তাদ মেহের খাঁর শেষ অর্ঘ্য আর পৌঁছাল না।[২]

ছেচল্লিশের দাঙ্গায় এভাবে নিরীহ সুরসাধক প্রাণ হারান। উস্তাদ মেহের খাঁর পরিণাম সম্পর্কে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন – 'মানুষের পশু-হাতে শিল্পীর মৃত্যুতে কলিকাতা দাঙ্গা অধিকতর কলঙ্কিত হয়েছে। বিশেষত সাধকশিল্পী তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধের ধনকে তার যোগ্যশিষ্যার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার মহৎ প্রেরণাতে কলিকাতায় এসে প্রাণ দিল বলেই তা আরো শোচনীয়।'[৩]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৬

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৮-৭৩৯

[৩] উদ্ধৃত : (ভূমিকা : জগদীশ ভট্টাচার্য), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম দিনাজপুর জেলার বালিয়াডিঙ্গিতে; পৈতৃক নিবাস বরিশাল জেলার বাসুদেবপুরে। তাঁর শিক্ষাজীবনের অনেকটাই সম্পন্ন হয় পূর্ববাংলায়। সঙ্গতকারণে বাংলাদেশের জীবন ও জনপদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। অধ্যাপনাসূত্রে কলকাতায় অবস্থান সত্ত্বেও পূর্ববাংলার প্রতি নারায়ণের আকর্ষণ ও মুগ্ধতা কখনোই কমেনি। 'আলেয়ার রাত' গল্পের কথক-চরিত্রের মাধ্যমে তিনি তাই বলেন – 'সাঁতার আমি মন্দ জানি না – পূর্ববাংলার জলের দেশে আমার বাড়ি – হাঁসের মতো সে সংস্কার আমার রক্তে রক্তে।'[১] এজন্য ১৯৪৭ সালের বৃহৎ-বঙ্গের বিভাজন প্রক্রিয়াকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মেনে নিতে পারেননি। তিনি বরাবরই বিশ্বাস করেছেন – 'বাংলাদেশ এবং বাঙালী। পূর্ব আর পশ্চিম। দাগটা বাইরেই, ভেতরে পড়েনি।'[২] প্রজন্ম পরম্পরায় জন্মভূমির প্রতি রক্তের বন্ধন অটুট থাকুক, এটিই তিনি মনেপ্রাণে প্রত্যাশা করেছেন। দেশবিভাগের কারণে তাঁর অন্তর্লোকে যে বেদনা ও দাহ তা তিনি প্রকাশ করেছেন 'স্বদেশ' শিরোনামের একটি রচনায় :

> 'পাসপোর্ট' নিয়ে গেছি ইস্টবেঙ্গলে। স্টিমারের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখছি – সেই ধানের ক্ষেত, সেই গাছপালার সবুজ, সেই ছোটো ছোটো গ্রাম। হঠাৎ পাশ থেকে এক পাঞ্জাবী মুসলিম ভদ্রলোক আমায় কী জিজ্ঞেস করলেন, জানেন? বললেন, হাউ ডু ইয়ু লাইক মাই কানট্রি ? বুঝুন একবার। আমি এই দেশের ছেলে মশাই, আর একজন পাঞ্জাবী আমাকে – '...
>
> আমাদের এখনো ব্যথা বাজে – তা ঠিক। হয়তো মৃত্যুর আগেও ভাবব, এখানকার কোনো শ্মশানে ছাই হয়ে মিলিয়ে না গিয়ে – দেশের 'ভিটে বাড়ি'র সেই পুকুরের পাড়ে যেখানে পূর্বপুরুষদের চিতার ওপর সারি সারি মাঠ, সেখানে যদি কেউ আমার শেষ স্মৃতিটুকু রেখে দিত! কিন্তু এ তো সেন্টিমেন্ট! আমাদেরই শুধু এক একটা দিন-রাত্রি বেদনায় ম্লান হয়ে যায়, আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে তো পূর্ব বাংলার সঙ্গে নাইজেরিয়া কিংবা আলাস্কার ভূগোলে কোনো তফাত নেই। পূর্ব পাকিস্তানকে তারা পোলিটিক্যালি জানে, ইমোশন্যালি আর অনুভব করে না – করবার কোনো কারণই নেই।
>
> কারণ নেই – তা ঠিক। তবু আমাদের এই চেতনার স্পন্দন কি আমরা নিঃশব্দে রেখে যাই না উত্তরাধিকারীর রক্তে ?[৩]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হৃদয়মথিত এই আকাঙ্ক্ষা এবং বেদনা-বিষণ্নতার কার্যকারণ-উৎস মূলত দেশভাগ। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত ছোবলে ভারতভূমি কীভাবে আক্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়েছে তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর সাহিত্যে শিল্পরসে জারিত করে উপস্থাপন করেছেন। সাতচল্লিশ-পরবর্তী

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আলেয়ার রাত', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'খাজুর গুড় কত কইর‍্যা ?', *সুনন্দর জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

সময়ে শরণার্থীদের উপদ্রুত ও অনিশ্চিত জীবনচিত্র ভাষারূপ পেয়েছে তাঁর *বিদিশা* (১৯৬৫) উপন্যাসে। এছাড়া তাঁর 'বাইশে শ্রাবণ', 'শ্বেতকমল', 'কেয়া', 'রাঙা মাসিমা', 'তিতির', 'সীমান্ত', 'দরজা', 'শুভক্ষণ', উদ্বোধন', 'হলদে চিঠি' প্রভৃতি ছোটগল্পও দেশভাগের কথকতায় সমৃদ্ধ। এসব গল্পের চরিত্রপাত্র কলকাতায় সামান্য আশ্রয় পেলেও, তাদের জীবনযাত্রা ছিল মানবেতর। অচেনা শহরে তারা প্রতিনিয়ত মাতৃভূমির জন্য ব্যাকুল থেকেছে। অথচ সেখানকার পরিস্থিতিও তাদের অনুকূল ছিল না।

'বাইশে শ্রাবণ'[১] গল্পটি প্রধানত দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। তবে এ-গল্পের আরেক প্রান্ত হলো রবীন্দ্র-শরণ। যে-কোনো প্রতিকূল জীবনবাস্তবতায় রবীন্দ্রনাথই যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্রয়-প্রশ্রয়, তা এ-গল্পের সীমিত পরিসরে সুপ্রত্যক্ষ। *সুনন্দর জার্নালে*ও তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন :

> দুর্দিন এলেই রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। সীমান্তে যখন মেঘাড়ম্বর, যখন আসন্ন আকালের পদধ্বনি, যখন বৃষ্টি-বিহীন বৈশাখ দিনের দুর্দহন আমাদের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা-তৃষ্ণা-তিক্ততার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় তখন মনে আসে : "অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু"; তখন সারা অন্তর প্রার্থনা করে : "জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো।"
>
> আমরা যারা বাঙালী, আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের মতো পরমাশ্বাস আর কোথাও নেই; এমন অভয়ঙ্কর কণ্ঠ বুঝি আর কখনো আমরা শুনিনি। আমরা সমাজে বিপ্লবীকে পেয়েছি, রাষ্ট্রনেতাকে পেয়েছি, এই বাংলাদেশের মাটিতেই অনেক স্মরণীয় বরণীয় ঊর্ধ্বশিখায় জ্বলে উঠেছেন। তবু মহাকবির সুরেই যেন আমাদের সমস্ত জীবন ঝংকৃত হয়েছে, তাঁর স্বরেই যেন বেজে উঠেছে আমাদের হৃদয়ের স্বরলিপি।[২]

'বাইশে শ্রাবণ' গল্পে দেশভাগে বিপর্যস্ত নারীচরিত্র শকুন্তলা। পূর্ববাংলার সুনন্দা নদী-তীরবর্তী একটি ছায়াঢাকা গ্রামে বসবাস করতো সে। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রী শকুন্তলার সকল আনন্দ-বেদনার উৎস ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বকবির গীত-গানের প্রতি ছিল তার অপরূপ মুগ্ধতা। কিন্তু নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে শকুন্তলাদের পারিবারিক জীবন হয়ে ওঠে অনিরাপদ ও কষ্টের। নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে সীমান্ত পেরিয়ে তারা চলে আসে পশ্চিমবঙ্গে। বরিশালের নিজস্ব বসতভিটা ফেলে তারা ঠাঁই নেয় কলকাতার একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে। বর্ষাকালে এ বাড়ির বিদ্যুৎহীন রুদ্ধ ঘরে অবাধে প্রবেশ করে বৃষ্টির জল। কেরোসিনের পোড়া গ্যাসের সঙ্গে পচা চুন-বালির দুর্গন্ধে সেখানে নিঃশ্বাস-বন্ধের উপক্রম হয়। এরকম পুঁতিগন্ধময় নোংরা

---

[১] 'বাইশে শ্রাবণ' *যুগান্তর* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫৮) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রোত্তর', *সুনন্দর জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে শকুন্তলার অচেনা মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' কবিতার হরিপদ কেরানির চেয়েও যেন তুচ্ছ তার নাগরিক জীবনযাপন। কিনু গোয়ালার গলির তুলনায় বরানগরের গলিটি আরও অস্বস্তিকর :

> আচ্ছা, সত্যিই কি কিনু গোয়ালার গলির কোনো একতলা ঘরে কখনো বাস করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে ? তাঁর হরিপদ কেরানীর ভাগ্য ভালো বলতে হবে – অন্তত কখনো কখনো কান্তিবাবুর বাঁশির সুরে সে তমালের ছায়াঘেরা ধলেশ্বরী নদীর ধারে ঢাকাই শাড়ি পরা মেয়েটির কাছে ফিরে যেতে পেরেছে। কিন্তু মশার গুঞ্জন থেমে গেলে শকুন্তলা বাঁশির সুর শুনতে পায় না – কানে আসে কাছের কোনো একটা মদের দোকান থেকে মাতালের চিৎকার; শুনতে পায় বাবার গোঙানি – ছোটো বোনটার ঘুংরি কাশির বুকফাটা যন্ত্রণা।[১]

মাতৃহীন সংসারে অসুস্থ পিতা, বড়দা রণজিৎ, অনুজ অজিত এবং দুই বোন টুনু ও শান্তির সঙ্গে শকুন্তলার বসবাস। অভাব-অনটন, রোগ-শোক, দুশ্চিন্তা তাদের নিত্যসঙ্গী। দাদার স্বল্পবেতন এবং শকুন্তলার বৃত্তির উদ্বৃত্ত অর্থে কোনোভাবে টিকে থাকে তারা। ছোটোবোন টুনু হুপিং কাশিতে সারারাত ছটফট করলেও তার চিকিৎসা হয় না। এই অনিশ্চিত জীবনপরিবেশে একটি পানের দোকানে কয়েকজন বখাটের সঙ্গে ছোটোভাই অজিতকে দেখে আতঙ্কবোধ করে শকুন্তলা। কারণ এই বখাটেরা তাকে প্রায়ই পথেঘাটে উত্ত্যক্ত করে। দেশভাগের পূর্বে যেই অজিত তার কোলে বসে রূপকথার গল্প শুনতো, উদ্বাস্তু জীবনে এসে সেও আমূল পাল্টে যায়। কলকাতার রুক্ষ ও প্রতিকূল পরিবেশে ক্রমশ নষ্ট হতে থাকে তার সুকুমারবৃত্তি।

শকুন্তলার আশ্রয়স্থল থেকে তার কলেজের দূরত্ব কম নয়। আসা-যাওয়ায় প্রতিদিন তার দুঘণ্টা ব্যয় হয়। ক্লাসশেষে সে বাড়ি ফিরলে দরজা খুলে দেয় ছোটোবোন শান্তি। আহারের সময় অজিতের বিষয়ে স্পর্শকাতর তথ্য দেয় শান্তি : অজিত প্রায়ই বড়দার পকেটের টাকা চুরি করে, এবং লীলাদের বাড়ির দেয়ালে লেখে আপত্তিকর শব্দাবলি। কেবল অজিতের নয়, শকুন্তলার বাবার স্বভাবেও লক্ষিত হয় নেতিবাচক রূপান্তর। বাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিনি কদর্য ভাষায় মেয়েকে ভর্ৎসনা করেন। একসময় যিনি শকুন্তলাকে 'মা' ছাড়া অন্য নামে সম্বোধন করেননি, মেয়েকে যিনি মনে করতেন 'সাক্ষাৎ সরস্বতী', দেশভাগজনিত প্রতিকূল পরিস্থিতি তাকেও বদলে দেয়।

উদ্বাস্তুজীবনে মানবমনের সুকোমল বৃত্তিগুলো কীভাবে বিনষ্ট হতে শুরু করে – তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে রণজিতের পরিবর্তিত জীবনাচরণসূত্রে। অজিতের মাধ্যমে শকুন্তলা জানতে পারে – রণজিৎ মদ ও জুয়ায় আসক্ত হয়ে

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বাইশে শ্রাবণ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৯

পড়েছে। জীবনের প্রতি সেও হয়ে উঠেছে বীতশ্রদ্ধ। অফিস-ছুটির পর অনেক রাতে সে মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফেরে। বাবার শাসন ও গালমন্দকে সে আমলে নেয় না। কারণ সে জানে, তার উপার্জিত অর্থে সবাই প্রতিপালিত। তার সঙ্গে পরিবারের সম্পর্ক কেবল অর্থের। এজন্য পকেট থেকে সে একরাশ দশ টাকার নোট উড়িয়ে দেয় এবং আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, অক্ষম পিতা সেগুলো অসঙ্কোচে কুড়িয়ে নেন। এভাবে কলকাতার উদ্বাস্তু জীবনে প্রত্যেকে তলিয়ে যেতে থাকে পঙ্কিল জীবনাবর্তে।

পরদিন কলেজের ছাত্রীসংসদের উদ্যোগে পালিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণতিথি বাইশে শ্রাবণ। বক্তৃতা, আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য, নাটকসহ নানা আয়োজনে দিবসটি রঙিন হয়ে ওঠে। এরকম পরিবেশে শকুন্তলা বিস্মৃত হয় বরানগরের গলির নরকতুল্য স্মৃতি। তার রচিত 'রবীন্দ্র কাব্যে মৃত্যুকল্পনা' প্রবন্ধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন কলেজের অধ্যক্ষ এবং নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। কিছুক্ষণের মধ্যে আনন্দের পরিবর্তে সে বিষাদে সমর্পিত হয়। কারণ তার নিকট রক্ষিত অনুষ্ঠানের চাঁদার অবশিষ্ট কুড়ি টাকা ব্যাগ থেকে উধাও হয়ে গেছে। সে নিশ্চিত যে, অজিতই এ টাকা আত্মসাৎ করেছে। এমতাবস্থায় শকুন্তলা যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তা অকল্পনীয়। হিমানীর নৃত্য উপভোগ করতে সকলে ভিড় জমায় হলরুমে। এ সুযোগে কমনরুমে রাখা বেণু বোসের ব্যাগ থেকে সে কুড়ি টাকা সরিয়ে ফেলে। ধনীর ঘরের মেয়ে বেণু, তিন রকমের গাড়িতে সে কলেজে আসে। সামান্য অর্থঘাটতি তার বোঝার কথা নয়। অনুষ্ঠানশেষে সে দর্শকশূন্য অডিটেরিয়ামে প্রবেশ করে বেদির ওপর স্থাপিত রবীন্দ্রনাথের মালা-চন্দন ভূষিত চিত্রমূর্তির সামনে কান্নায় লুটিয়ে পড়ে। কবিকে উদ্দেশ্য করে অসহায় শকুন্তলা অনুযোগ করে বলে :

> তুমি দেবতা, তুমি মহাকবি। মানুষের প্রেমে তোমার চোখের জল ঢেলে পৃথিবীকে তুমি ধন্য করে গেছ। তুমিই বলো আমার কতখানি অপরাধ ? বাবা-দাদা-অজিত-আমি – আজ তোমার মৃত্যুতিথিতেও কেন এমন করে পাপের অন্ধকারে তলিয়ে চলেছি – তুমিই তার জবাব দাও।[১]

মানুষের সুবুদ্ধি, সুচিন্তা ও সুকুমারবৃত্তি দেশভাগের ফলে কীভাবে বিপর্যস্ত এবং সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে, তা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'বাইশে শ্রাবণ' গল্পে এভাবেই বিন্যস্ত করেছেন।

শকুন্তলার মতো কলকাতার জীবনযুদ্ধে পরাজিত আরেকটি চরিত্র 'শ্বেতকমল'[২] গল্পের সিদ্ধার্থ। তার বাবা ছিলেন পূর্ববাংলার একটি স্কুলের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। পিতার অকালমৃত্যু এবং দেশভাগের বিরূপ

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭০

[২] 'শ্বেতকমল' *যুগান্তর* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫৯) প্রথম প্রকাশিত হয়।

পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তু জীবনযাপনে বাধ্য হয় সিদ্ধার্থের পরিবার। কলকাতার একটি কলোনিই হয়ে ওঠে তাদের আশ্রয়স্থল। অনন্যোপায় সিদ্ধার্থ টিউশনির মাধ্যমে লেখাপড়ার ব্যয়নির্বাহ করে। তার বড় ভাই রেলওয়েতে ফোরম্যানের চাকরি করে। অহোরাত্রি পরিশ্রম করে সে যে অর্থ পায়, তাতে সংসার চলে না। অবিরাম হতাশায় সিদ্ধার্থের ভাই বিনষ্টির মধ্যে জীবনের নির্বাণ সন্ধান করে। পিতার আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে সে হয়ে ওঠে মদ্যপ। লক্ষণীয় যে, 'বাইশে শ্রাবণ' গল্পের রণজিৎ এবং 'শ্বেতকমল' গল্পে সিদ্ধার্থের বড় ভাইয়ের পরিণতি একই।

সিদ্ধার্থের মা নিত্য অসুস্থতায় ভোগেন। কিন্তু তাঁর চিকিৎসার জন্য অর্থের সংস্থান হয় না। অসুস্থ মা ঘটি-বাটি বন্ধক রেখে সন্তানদের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। সন্তানের পরীক্ষার ফি যোগানের জন্য তিনি বন্ধক রাখেন গলার হার। পরিবারে অভাব আছে, দারিদ্র্য আছে, বাস্তুহারানোর বেদনা আছে, তবুও মাতৃ-দায়িত্ব পালন থেকে বিচ্যুত হননি তিনি। অবিরাম জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়েও এই মা সন্তানকে আগলে রাখার চেষ্টা করেন। সিদ্ধার্থের আপত্তিকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন – 'বন্ধক দিয়েছি – বেশ করেছি। তুই পাস করে চাকরিটা পেয়ে গেলে বন্ধক ছাড়িয়ে আনতে কতক্ষণ ?'[১]

মায়ের স্বপ্নপূরণে সিদ্ধার্থও মরিয়া হয়ে ওঠে – 'সরস্বতীর শ্বেত-কমলের পাপড়ি নয়, লক্ষ্মীর আঁচলঝাড়া এককণা ক্ষুধার অন্ন'[২] সংগ্রহের জন্য সে হন্যে হয়ে ফেরে। উদ্বাস্তুজীবনে নিরাপদ আশ্রয় এবং মায়ের চিকিৎসার জন্যে একটি চাকরি তার চাই। পরিচিত এক কাকা সিদ্ধার্থকে কাজের নিশ্চয়তা দিলেও শেষপর্যন্ত তা হয়নি। এতৎসত্ত্বেও সিদ্ধার্থ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। কারণ তার জীবন পূর্ববাংলা থেকে আসা সতেরো-আঠারো বছরের সেই লজেন্স বিক্রেতার মতো নয়; যার সঙ্গে সিদ্ধার্থের দেখা হয় ট্রেনে। ছেলেটি তার মতোই বাস্তুহারা, কথাবার্তায় পূর্ববাংলার টান। নিজ বাসভূমে ছেলেটি হয়তো স্কুলের সেরা ছাত্র ছিল, দেশভাগ তাকে পরিণত করেছে ফেরিওয়ালায়। কলকাতার অধিকাংশ উদ্বাস্তু তরুণেরই এই দশা। সিদ্ধার্থের বন্ধু সলিল কলেজে সর্বদা ভালো ফল করলেও, তা বজায় রাখতে পারেনি। মানিকতলা বস্তির এক ঘরে তারা মোট বারো জন বাস করে। কেবল বইয়ের অভাব নয়, এই ঘিঞ্জি পরিবেশে লেখাপড়া করাও দুরূহ। সিদ্ধার্থের মায়ের মতো সলিলের অসুস্থ বোনও বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পায়। যেখানে খাদ্যের জন্য নিত্য হাহাকার, সেখানে চিকিৎসার প্রসঙ্গ অবান্তর কিংবা হাস্যকর। কলকাতার উদ্বাস্তু শ্রেণির যখন এই অবস্থা, তখন সেখানকার শৌখিন রেস্তোরাঁগুলোতে অভিনীত হয় আরেক বিপরীত দৃশ্য। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরা চায়ের কাপে ঝড় তোলে। তাদের হাতে শোভা পায়

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শ্বেতকমল', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২৪

জ্বলন্ত সিগারেট। মধুবালা কিংবা এস্‌থার উইলিয়ামসে তারা সিনেমা উপভোগ করে। সলিলদের তুলনায় তাদের জীবন অনেক বর্ণিল ও উৎসবমুখর।

কলেজের পরীক্ষায় একই কক্ষে দুই বন্ধুর আসন বরাদ্দ হয়। সলিলকে এদিন বেশ অসুস্থ দেখায়। সিদ্ধার্থ যখন পরীক্ষার খাতায় নিবিষ্ট, তখন এক বখাটে ছাত্র তাকে শাসিয়ে বলে – 'একটু চেপে বসুন দাদা – হাঁ আমাকে একটু কভার করুন।' আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সে শহুরে-ছেলেটির আদেশ পালনে বাধ্য হয়। অতঃপর আড়াই মাস পর পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা যায় – 'সেই গগ্‌লস্‌-পরা ছেলেটি বেরিয়ে গেছে ডিস্টিংশনে আর মাত্র দু নম্বরের জন্যে ইংরেজিতে ফেল করেছে সিদ্ধার্থ।'[১]

উদ্বাস্তুদের কোনো স্বপ্ন যেন পূরণ হওয়ার নয়। তবু সিদ্ধার্থ ও সলিলরা বুকভরা আশা নিয়ে কলেজে যায়, অনাহারে-অর্ধাহারে থেকেও চালিয়ে যায় লেখাপড়া। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা, হতশ্রী জীবনবাস্তবতা, নগরবাসীদের অবজ্ঞা এবং দারিদ্র্যের কারণে তারা উপর্যুপরি ব্যর্থ হয়। মায়ের মিষ্টি হাসির পরিবর্তে তারা দেখে রুদ্ধবাক চেহারা। শত প্রতিকূলতার মধ্যে সরস্বতীর বন্দনা করলেও উদ্বাস্তু ছাত্ররা দেবীর আশীর্বাদ লাভে পূর্বাপর বঞ্চিত হয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কেবল পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থীদের দুঃখগাঁথা রচনা করেননি। পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু শ্রেণির করুণ পরিণতিও তিনি ভাষারূপ দিয়েছেন। 'নতুন গান' গল্পে নিজের বাস্তুভিটে আঁকড়ে বাঁচতে চেয়েছেন রায়মশায়। সাতচল্লিশের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে দেশত্যাগ করলেও তিনি স্বদেশের বন্ধন ছিন্ন করেননি। পূর্ববাংলার মাটি, আকাশ আর কীর্তনখোলার মায়ায় তিনি কোথাও যেতে চাননি – 'যেমন করে জলের মাছ ডাঙায় উঠে ছটফটিয়ে মরে যায়, ঠিক সেই দশাই যে হবে রায়মশায়ের ! তাই সাতপাঁচ ভেবে থেকেই যেতে হল এ দেশে।'[২]

চল্লিশ বছর পূর্বে ব্যাকরণতীর্থ উপাধি পান রায়মশায়। গ্রামের একটি স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন। তবে এ পেশায় তিনি স্থায়ী হতে পারেননি। সেক্রেটারির বখাটে ছেলেকে ইচ্ছেমতো বেত্রাঘাত করে তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দেন। এরপর তিনি হয়ে ওঠেন কীর্তনখোলা নদীর মাঝি। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে রায়মশায় সম্মুখীন হন বিব্রতকর পরিস্থিতির। ইতঃপূর্বে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যে অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল,

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২৭

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নতুন গান', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৮

দেশবিভাগের পর তাতেও বাধা আসে। দু-একজন রসিক যাত্রীর অনুরোধে রায়মশায় যখন 'গাহা সতসই', 'অমরু-শতক' প্রভৃতি সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করে যাত্রীদের মনোরঞ্জনের প্রয়াস পেতেন, তখনই একদিন জনৈক মৌলবি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন – 'ওসব চলবে না, রায়মশায়, সেদিন আর নেই। উর্দু কিংবা ফার্সী গজল জানা থাকে তো শোনাও, নইলে চুপ করে থাকো।'[১] এরূপ পটভূমিতে গ্রামের অন্য মৌলবি বন্ধুর কাছে তিনি শিখতে শুরু করেন উর্দু-ফারসি। গভীর রাতে ঘুমন্ত যাত্রীদের অবাক করে তিনি উচ্চৈঃস্বরে গেয়ে ওঠেন – 'কদরে গোল বুল্‌বুল্‌ বেদানম্‌ ইয়া চাম্বেরী।' যাত্রীরা এজন্য ঠাট্টা করে তার নাম দেয় 'রায় মৌলানা'। শুধু রায়মশায় নয়, পূর্ব পাকিস্তানে এসময় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আতঙ্কিত জীবনযাপনে বাধ্য হয়। গল্পটিতে পাকিস্তান-পন্থিদের ভয়ে কেদার ঘোষ নামের এক হিন্দু তার দোকানের নাম পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। 'স্বরাজ ভাণ্ডারে'র বদলে সে তার দোকানের নামকরণ করে 'পাকিস্তান স্টোর্স'।

এক উদ্বাস্তু তরুণীর সম্ভ্রমহানির গল্প 'দরজা'। দেশভাগের পর মেয়েটি তার বোনের সংসারে আশ্রয় নেয়। মধ্যবয়সী ভগিনীপতি তাদের বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করে। মুখে ধর্মভক্তির গুঞ্জরণ তুললেও স্ত্রীর অগোচরে সে শ্যালিকার দেহভোগ করে। প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও মেয়েটি ব্যর্থ হয় এবং একাধিকবার আত্মহননের চেষ্টা করে। অবশেষে তার গর্ভে বেড়ে-ওঠা সন্তানের প্রতি সে দুর্বল হয়ে ওঠে এবং বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। এমতাবস্থায় তার বোন তাকেই দায়ী করে এবং তাকে আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করে।

নিরুপায় উদ্বাস্তু তরুণী অবশেষে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এখানেও এ-বাড়ির জ্যেষ্ঠসন্তান তাকে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করে। ততদিনে তার মাতৃত্বের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গৃহকর্ত্রী তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় – 'এ কেলেঙ্কারি আমার বাড়িতে সইবে না বাছা। তুমি পথ দেখ।'[২] রূপমুগ্ধ ছেলেটিও তার প্রতি তীব্র বিরূপতা প্রদর্শন করে এবং তাকে ভ্রষ্ট ও কলঙ্কিত নারীরূপে চিহ্নিত করে। এমতাবস্থায় গলার সরু হারছড়া বিক্রয়ের অর্থে মেয়েটি পরবর্তী এক মাস কাটায় রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম কিংবা ওয়েটিং রুমে। সন্তান জন্মদানের প্রাক-পর্যায়ে মেয়েটি বিভিন্ন হাসপাতালে ছুটোছুটি করে। কিন্তু কোথাও তার জায়গা হয় না। শরীরে এয়োতির চিহ্ন কিংবা বৈধব্যের স্বাক্ষর না দেখে চিকিৎসকরা তাকে এড়িয়ে যায়। হাউস সার্জন তাকে বলেন – হাসপাতালের বিছানা কেবল সতী স্ত্রীদের জন্য। এমনকি বারান্দা অথবা মেঝেতেও তারা সন্তানসম্ভবা মেয়েটিকে স্থান দিতে আপত্তি জানায়। নির্ভরতার সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও মেয়েটি কারো প্রতি কোনো ক্ষোভ প্রকাশ

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৩

করেনি। সমস্ত অবিচার সে অবলীলায় সহ্য করেছে। কারণ ইতঃপূর্বে তার জীবনে আরও করুণ ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মারা গেছে তার বাবা-ভাই। তাদের করুণ মৃত্যু এবং জীবনযুদ্ধের একটানা ব্যর্থতা তাকে করে তুলেছে সহিষ্ণু।

দেশবিভাগের প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে বীভৎসতা ছিল, তা প্রদর্শিত হয়েছে 'সঞ্চার'[১] গল্পেও। এ গল্পে দাঙ্গার বলি হয়েছে শঙ্করীর পরিবার। পূর্ববাংলায় হিন্দুনিধন আরম্ভ হলে এরা গ্রামের বন্ধন ছিন্ন করে কলকাতার উদ্দেশে পাড়ি জমায়। এক পর্যায়ে একদল দুষ্কৃতকারী তাদের ওপর হামলা করে। শঙ্করীকে তারা ছুঁড়ে ফেলে কাঁটাবনের মধ্যে, তার পিতা-মাতাকেও নিষ্ঠুর কায়দায় হত্যা করে। এরপর থেকে মেয়েটির আশ্রয় হয় শরণার্থী শিবিরে। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর শঙ্করীও হয়ে পড়ে বাকরুদ্ধ :

> হয়তো মানুষের কাছে – ভগবানের কাছে ওর সব প্রতিবাদ শেষ হয়ে গেছে – যেদিন শেষরাত্রির চাঁদের আলোয় দেখেছিল পথের ধুলোর ভেতর ওর বাবা নিজের জমাট রক্তের মধ্যে নিশ্চল হয়ে আছে; হয়তো সেদিন থেকেই ভাগ্যকে নালিশ জানাতে ভুলে গেছে – যেদিন জেনেছে ওর মা-র শেয়ালে-শকুনে অর্ধেক ছিঁড়ে খাওয়া শরীরটাকে পাওয়া গেছে একটা ধানক্ষেতের ভেতরে।[২]

দেশভাগের পর যেসব কুলনারী ভারতে আশ্রয় নেয়, তাদের অনেকে ভ্রষ্টজীবনকে বেছে নিতে বাধ্য হয়। নারীপাচারকারীদের অপতৎপরতায় কিংবা অর্থের প্রলোভনে তারা নিক্ষিপ্ত হয় নষ্টজীবন-পরিবেশে। 'শুভক্ষণ'[৩] গল্পে কলকাতা মহানগরে গণিকাবৃত্তির অপরাধে গ্রেপ্তার হয় পূর্ববাংলার এক সাধারণ নারী। মেয়েটি গল্পকথকের প্রাক্তন প্রেমিকা। স্বভাব-চরিত্রে অনন্যা হলেও প্রতিকূল জীবনবাস্তবতায় সে ঘৃণ্য পেশা অবলম্বন করে। এর কার্যকারণও গল্পকথকের কথায় স্পষ্ট – 'পাকিস্তান হওয়ার পর সব অন্যরকম হয়েছে। চোখের সামনে এখন অনেক কিছুই তো দিনের পর দিন দেখছি যা কোনোদিন কল্পনাও করা যেত না।'[৪] আদালতে মেয়েটির জবানবন্দি থেকে গল্পকথক জানতে পারে তার পতিতা হয়ে ওঠার মর্মন্তুদ কাহিনি। এতৎপ্রসঙ্গে গল্পকথকের অবচেতন-উৎসজাত ভাষ্য লক্ষণীয় :

---

[১] 'সঞ্চার' *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৬) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সঞ্চার', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

[৩] 'শুভক্ষণ' *বসুধারা* পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় (১৩৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শুভক্ষণ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

> পার্টিশনের পর স্বামী নিয়ে এসেছিল কলকাতায়। তারপর স্রোতের শ্যাওলা। এ ঘাট থেকে ও-ঘাটে। দুটো বাচ্চা ক্যাম্পে কলেরায় মরে গেল। শেষকালে যদি কলোনির খড়ের ছাউনিতে মাথা গোঁজবার ঠাঁই হল তো পেটের খাওয়া জোটে না।
>
> ... স্বামী সামান্যই লেখাপড়া জানত। দেশে অল্প-স্বল্প যা ছিল তাই নাড়াচাড়া করে খেত, বাকী সময় কাটাত বখামো করে। কলকাতায় এসেও কিছু কাজ জোটাতে পারল না – কিন্তু শয়তানের দলে জুটে গেল ঠিক।
>
> তারপর একদিন কালীঘাট নিয়ে যাওয়ার নাম করে ... একখানা বড় নীলরঙের মোটরে তুলে দিলে। সেইদিন ... পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে – মাথার উপর থেকে মুছে গেছে আকাশ।
>
> পাতালের সিঁড়ির নিয়ম আছে। এক ধাপ পা দিয়েই আর পরিত্রাণ নেই। একটু একটু করে একেবারেই তলায় নামিয়ে নেবে। আলো আর মাটির জীবন থেকে বিদায় নিলে শেষ পর্যন্ত।... আর স্বামী ? যাদবপুরের ওদিকে কোথায় একটা ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে তিন বছর জেল খাটছে।[১]

উদ্বাস্তুজীবনে কঠিন সংকটে নিপতিত হয়েছে 'উদ্বোধন'[২] গল্পের জ্যোৎস্না। মেয়েটি ছিল কুষ্টিয়া অঞ্চলের। পার্টিশনের পর বৃদ্ধ কাকার সঙ্গে সে কলকাতায় আসে। অপরিচিত শহরে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিয়ে অখিল ঘোষ ভাড়া বাড়িতে দিনযাপন করেন। সরকারি চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের পর তিনি কলকাতায় স্থায়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। এ কাজে তাকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেয় নিরাপদ কাঞ্জিলাল। শুধু তাই নয়, গ্র্যাজুয়েট পরিচয়ে সে সুন্দরী জ্যোৎস্নার গৃহশিক্ষক হয়। অতঃপর এক বন্ধুকে দালাল সাজিয়ে সে বৃদ্ধকে কিছু ভুয়া জমির সন্ধান দেয়। ইতোমধ্যে জ্যোৎস্নার সঙ্গেও কাঞ্জিলাল ঘনিষ্ঠ হয়, পড়ানোর নামে সে খাতায় লেখে প্রেমপত্র।

কাঞ্জিলালের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হলে অখিল তাকে তিরস্কার করেন। জ্যোৎস্নাও এ ঠগবাজের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে। কিন্তু কাঞ্জিলাল জানে, কলকাতা শহরে এ পরিবারের কোনো শেকড় নেই। বিপদে তাদের পাশে অবলম্বনরূপে দাঁড়ানোরও কেউ নেই। তাই অকারণে উদ্বাস্তু পরিবারকে সে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। অখিল পুলিশের শরণাপন্ন হতে চাইলে, সে জ্যোৎস্নার চিঠিগুলো আদালতে ওঠাতে চায়। এতে প্রমাণিত হবে, দোষ কেবল কাঞ্জিলালের একার নয়। এরপর শুরু হয় তার নানামাত্রিক অপতৎপরতা। এমতাবস্থায় অখিল ঘোষ জ্যোৎস্নাকে অন্যত্র পাত্রস্থ করতে চাইলে কাঞ্জিলাল পাত্রপক্ষকে বিভ্রান্ত করে, প্রাণনাশের হুমকি দেয়। সমুদয় বৃত্তান্ত জেনেও জ্যোৎস্নাকে জীবনসঙ্গী করে জ্যোতির্ময়। বিবাহের অব্যবহিত পরবর্তী পর্যায়ে

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

[২] 'উদ্বোধন' *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

সার্কুলার রোডের ট্রাফিকের ভিড়ে নবদম্পতি এসিডদগ্ধ হয়। এভাবে মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত মানুষগুলো কলকাতা শহরে নিক্ষিপ্ত হয় প্রবল অসহায়তায়।

দেশভাগের ফলে কলকাতায় বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনে বাধ্য হয় 'কেয়া'[১] গল্পের নায়ক জয়ন্ত। তার মা-বাবা থেকে যান পাকিস্তানে। একদিকে মা-বাবা, অন্যদিকে ফেলে আসা জীবনস্মৃতি জয়ন্তকে কাতর করে তোলে। এক ধরনের নস্টালজিক অনুভূতিতে তার দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। প্রেমিকা কেয়ার সঙ্গে তার সংলাপে এটি পরিদৃষ্ট হয় :

> কেয়া ছোট্ট একট নিশ্বাস ফেলল।
>
> 'সত্যি, দেশে আর ফেরা যাবে না – না ?'
>
> জয়ন্ত জবাব দিল না। জবাব তার জানা নেই।
>
> চায়ে একটা চুমুক দিয়ে আর একটু পরে জয়ন্ত বললে, 'ভাবছিলুম দেশে এখন কেয়াফুল ফুটেছে –'[২]

জয়ন্তের মতোই পিতামাতার স্নেহচ্ছায়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে 'হলদে চিঠি'[৩] গল্পের নমিতা ও শমিতা। কলকাতা শহরে দুবোন অতিবাহিত করে সংগ্রামশীল জীবন। দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে তারা ভাড়া থাকে। তাদের আবাসস্থলের বর্ণনা 'পার্টিশনে'র প্রতীকতায় গল্পকার উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> একটি ঘরেই দুখানা তক্তপোশ, দুটি চেয়ার, শমিতার পড়ার টেবিল। ঘরের কোণায় একটুখানি কাঠের পার্টিশন, দুই বোনের রান্নাঘর। পার্টিশনের ওপার থেকে চা নিয়ে বেরিয়ে আসত নমিতা।[৪]

দেশভাগের পশ্চাতে রাজনীতিবিদদের হীন স্বার্থচিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'তিতির'[৫] গল্পে। নব্য প্রতিষ্ঠিত ভারত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই প্রতিহারী : সুখলাল ও জুলফিকার। সীমান্ত যখন শান্ত ও স্বাভাবিক থাকে তখন তারা নো-ম্যানস ল্যান্ডে বসে আলাপ করে। কিন্তু সীমান্তে যখন উত্তেজনা বিরাজ করে, নেতারা উত্তপ্ত বক্তৃতা করে, সার্জেন্ট-মেজরের আসা-যাওয়া বৃদ্ধি পায়, তখন পঞ্চাশ গজের দূরত্ব তিন-চারশো গজে রূপ নেয়। কোনো এক বিকেলে দুই প্রতিহারী পরস্পরের সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন হয়।

---

[১] 'কেয়া' *আনন্দবাজার* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৪) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কেয়া', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬

[৩] 'হলদে চিঠি' *দেশ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৯) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হলদে চিঠি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭

[৫] 'তিতির' *পরিচয়* পত্রিকার ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৬৬) প্রথম প্রকাশিত হয়।

বাল্যকালে সুখলাল ও জুলফিকার ছিল একই গ্রামের অধিবাসী। সেখানে হিন্দু-মুসলমানের বসবাস ছিল নিরুদ্বিগ্ন ও শান্তিপূর্ণ। গ্রামে ছিল মসজিদ, শিবমন্দির, পিরের দরগা এবং মহাবীরজির ধ্বজা। গ্রামের পাশ দিয়ে বহমান ছিল ঝুমঝুমিয়া নদী। এ নদীর বানের মতো তাদের জীবনেও আসতো খুশির বন্যা : ইদ-দেওয়ালি-হোলি-মহরম। কখনো কখনো তারা সম্মুখীন হতো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের। শীতের মৌসুমে তাদের সর্ষে ক্ষেতে আগুন জ্বলে, প্লেগের ভয়ে মানুষ গ্রাম ছাড়ে, বিশাল আকৃতির সুচ নিয়ে তেড়ে আসেন ডাক্তাররা। অকস্মাৎ এসব পরিচিত বান-বন্যা-মহামারির সঙ্গে যুক্ত হয় আরেক দুর্যোগ। তবে এ দুর্যোগ –

> ঝুমঝুমিয়া থেকে নয় – এল কলকাতা থেকে, এল লাহোর থেকে। দেখতে দেখতে মানুষ 'জানবর' হল। গোরুর মাথা পড়ল শিবমন্দিরে, ভাঙল মসজিদ, আগুন জ্বলল বাজারে, ঝুমঝুমিয়ার তিরতিরে নদীর জল দিয়ে ভেসে চলল লাশের পর লাশ। বগুলারা উড়ে পালাল, ঘাসবনের মধ্যে আর তিতির ডাকল না – শেখ ফরিদের দোয়া চাইবার মতো জোর পেল না গলায়। তখন কোথায় জুলফিকার – কোথায় সুখলাল ![১]

দাঙ্গায় সুখলালের ভাই নিহত হয়। সুখলালের পৈতৃক সম্পত্তি কামতাপরসাদের অধিকারে যায়, যিনি পরবর্তীকালে ভারতের অ্যাসেম্বলি সভার সদস্য হন। জুলফিকারের জীবনও অতিষ্ঠ করে তোলে কামতাপরসাদের মতো একজন – রজ্জব আলী। এ নরপিশাচ জুলফিকারের বোনের সম্ভ্রমহানি করলেও বিচার হয় না। লজ্জায়-অপমানে বোনটি আত্মহত্যা করে। দাঙ্গাকালে কামতাপরসাদ এবং রজ্জব আলী স্ব-স্ব জাতির নিরীহ লোকদের উত্তেজিত করে তোলে। ফলে এক সম্প্রদায়ের মানুষ আরেক সম্প্রদায়ের মানুষকে আক্রমণ করে, হত্যা, লুণ্ঠন এবং অগ্নিসংযোগে লিপ্ত হয়। দেশবিভাগের পর এসব মানুষ তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে, অনুধাবন করেছে নিজেদের নির্বুদ্ধিতা। ক্ষমতাবানরা তাদের অনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করেছে। দাঙ্গায় তারা শুধু ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ এর সুফল পেয়েছে ক্ষমতাবানরা। প্রাসঙ্গিক সংলাপ উদ্ধৃতিযোগ্য :

> এক হাতে গোঁফের একটা প্রান্ত নিয়ে পাকাতে লাগল : হ্যাঁ, ওরা আরামেই থাকে।
>
> – বে আইনি কারবার চালায় হরবখৎ।
>
> – ওদের বদন ছোঁবে কে ? – তিক্তভাবে জুলফিকার হাসল : হিন্দোস্থান হো – পাকিস্তান হো – ওদেরই তো মওকা। যত হয়রানি সব গরীবের বেলায়।
>
> আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সমর্থন করল সুখলাল।

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তিতির', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

– গরীবের ওয়াস্তে দুসরা কানুন। আধা সের সুপারি ইয়া সেরভর কড়ুয়া তেল নিয়ে বর্ডার পার হতে গেলে গোলী খেয়ে মরবে।

– আর গোলী মারব আমরাই! – চাপা বিস্বাদ গলা জুলফিকারের।[১]

তারা দুজনেই যখন স্মৃতিচারণে মগ্ন, তখনই একটি গোখরো সাপ ফণা তুলে এগিয়ে আসে সুখলালের দিকে। জুলফিকারের তাৎক্ষণিক তৎপরতায় মৃত্যু ঘটে হিংস্র সরীসৃপের। কিন্তু তারা জানে, সাপ একটি নয়, মানুষরূপী অসংখ্য সাপের বিস্তার দুরাজ্যে। এজন্য 'দুই সীমানার ফারাক'। দেশভাগের প্রতিক্রিয়া কেবল বিবেকবান নেতৃবৃন্দকেই নয়, আলোড়িত করে সাধারণ মানুষদেরও। কলকাতা-লাহোরের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত জুলফিকার-সুখলালকে পৃথক করলেও, এখন উভয়ের প্রতীক্ষা 'একটাই, ঝুমঝুমিয়ায় আবার কি বান ডাকবে কখনো ? কোনো নতুন বান ?'[২] তাদের বিশ্বাস, এ-বানে সীমান্তরেখা মুছে একাকার হবে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র। দুই প্রতিহারির এ-স্বপ্ন যেন অবিনাশী। প্রকৃতপক্ষে দেশভাগ ও দাঙ্গা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যমানসকে যে তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী কথামালায় প্রতিফলিত হয়েছে 'তিতির' গল্পে।

দেশভাগের প্রভাবে একটি সচ্ছল পরিবারের সর্বস্বান্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত 'রাঙা মাসিমা'। এ গল্পের কথক একজন স্কুলশিক্ষক। টানাপড়েনের সংসারে তাঁর আয়ের উৎস টিউশনি। অথচ ছাত্রের বাবা দুহাজার টাকা মাইনে পেলেও, গৃহশিক্ষকের ত্রিশ টাকা বেতন পরিশোধে গড়িমসি করেন। ছাত্রের বাড়িতে অভিজাত পেয়ালায় দামি চা পান করেও তাই স্কুলশিক্ষক তৃপ্ত হতে পারেন না। এমনকি একটি নৃত্যানুষ্ঠানে ছাত্রের বোনের স্বর্ণের মেডেল-প্রাপ্তির সংবাদেও তিনি আনন্দবোধ করেন না। বিচলিত চিত্তে বাড়ি ফিরে তিনি দেখতে পান সতেরো-আঠারো বছরের একটি ছেলে তার জন্য অপেক্ষা করছে। তার পরনে ময়লা শার্ট, রুক্ষ চেহারা এবং তার ঘোলাটে চোখ প্রমাণ করে – সে 'পার্টিশনের শিকার'; যাদের 'কেউ থাকে বস্তিতে, কেউ কলোনীতে, কেউ বা জোর করে অন্যের ঘাড়ে চেপে বসে আছে।'[৩] 'এক্সারসাইজ বুকের' ছেঁড়া পাতায় পেন্সিলে লেখা একটি চিঠি ছেলেটি স্কুলশিক্ষকের হাতে তুলে দেয়; তাতে লেখা :

স্নেহের মনু, আশীর্বাদ জানিবা। তোমার রাঙা মাসিমাকে নিশ্চয় ভুলিয়া যাও নাই। পাকিস্তান হইতে প্রায় দু'বছর হইল আসিয়াছি। তোমার ঠিকানা জানি না বলিয়া এতদিন –[৪]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'রাঙা মাসিমা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

[৪] প্রাগুক্ত

চিঠির সূত্রে জানা যায়, রাঙা মাসিমার ছোটো ছেলে বিনয়ের স্কুল ফাইনাল অত্যাসন্ন। বেতন দিতে না পারলে তার ছাত্রত্ব চলে যাবে। এ অবস্থায় মাসিমা স্কুলশিক্ষকের নিকট সামান্য অর্থ প্রার্থনা করেন। কিন্তু সহায়তার পরিবর্তে তিনি বিনয়কে তিরস্কার করে বলেন –

> কলকাতার রাস্তায় টাকা ছড়ানো থাকে না – তোমার মাকে বলে দিয়ো। গায়ের রক্ত জল করে পয়সার উপায় করতে হয় এখানে।... স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেই বা এমন কি চতুর্ভুজ হবে তুমি ? এম. এ. পাশ করে করেও তো আমার এই দশা। বরং সরকারী লোনের চেষ্টা করো – একটা দোকান-টোকান যদি করতে পারো।[১]

তিরস্কৃত বিনয় প্রস্থান করলে শিক্ষক-পত্নী হিংস্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ভেবেছেন টিউশনির সমস্ত টাকা ছেলেটিকে দান করা হয়েছে। পরিবারের দৈন্যদশায় তিনি অন্যকে সহযোগিতা করবার পক্ষে নন। এজন্য স্বামীর সঙ্গে তিনি লিপ্ত হন বাগ্‌বিতণ্ডায়। তবে মধ্যবিত্ত এই শিক্ষক দাম্পত্যকলহে জড়িয়ে এলাকায় তাঁর সুনাম ক্ষুণ্ন করতে না চাইলেও স্ত্রীর একটি কঠিন প্রশ্নে তিনি সংবিৎ ফিরে পান –'কাল সকালে বাজারের কী ব্যবস্থা করবে ? চলবে কী করে ?'[২]

অতঃপর দুঃখদৈন্যভরা সংসার জীবনের একপর্যায়ে স্কুলশিক্ষকের অবচেতন সত্তায় আত্মপ্রকাশ করেন তাঁর রাঙা মাসিমা। পূর্ববাংলায় বসবাসকালে বছরের প্রথম দিন মাসিমা তাঁকে নিমন্ত্রণ করতেন। বড় থালায় তিনি সাজিয়ে দিতেন ঘিয়ে ভাজা সুগন্ধি চালের গরম ভাত, পাঁচরকম ভাজা, আট-দশটা বাটিতে মাছ-তরকারি-মিষ্টি-পায়েস ইত্যাদি। শৈশবে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে স্কুলশিক্ষক যখন মরণাপন্ন, তখন বুকের রক্ত দিয়ে মাসিমা কালীবাড়িতে অঞ্জলি নিবেদন করেন। স্কুলশিক্ষক এখনও বিশ্বাস করেন – 'রাঙা মাসিমার চোখের জল আমার জন্যেই। দুঃখ, দুর্গতি আর গ্লানির জন্যেই আজও বুকের রক্তে বেলপাতা রাঙিয়ে পুজো দিচ্ছেন আমার ভিক্ষে-মা।'[৩] মাসির বর্তমান ঠিকানা তিনি জানেন না, অবশ্য জানলেও তার করবার কিছুই নেই। কারণ বিভাগোত্তর অর্থনৈতিক মন্দার কাছে এ স্কুলশিক্ষক পরাভূত, তাঁর চরিত্রের শুভবোধও উধাও।

দেশভাগ অবলম্বনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গল্প 'সীমান্ত'[৪]। মুসলমানদের স্বপ্নভূমি পাকিস্তান রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করলে ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠী পালাক্রমে পূর্ববাংলায় এসে বসতি স্থাপন করতে শুরু

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] 'সীমান্ত' *লোকসেবক* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৯) প্রথম প্রকাশিত হয়।

করে। পূর্ববাংলার হিন্দুরাও সদলে সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে স্থায়ী হওয়ার চেষ্টা করে। মানুষের জন্মভিটে পরিবর্তনের এ-দৃশ্য আগস্ট আন্দোলনের বীরসেনা ফজলে রাব্বিকে অবাক করে। 'আজাদী'র জন্য যে ভূমিতে প্রাণ দিয়েছে তার বন্ধু দয়াল মণ্ডল, সেই আকাঙ্ক্ষিত ভূমিতে তার পরিবারও উপদ্রুত জীবনযাপনে বাধ্য হয়। কলকাতার মুসলমানদের দুর্দশাও চরমে ওঠে, তারাও 'ধন-প্রাণ-ইজ্জত' হারাতে থাকে। গল্পের মূলসংকট দয়ালের মেয়ে ফুলমণিকে কেন্দ্র করে। মৃত্যুলগ্নে দয়াল তার কন্যার সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন সহযোদ্ধা ফজলে রাব্বির ওপর। পিতার অনুপস্থিতিতে ফুলমণির পরিচর্যার জন্য এগিয়ে আসে এক বিধবা পিসি। কলেরায় পিসির মৃত্যু হলে মেয়েটি নিদারুণ অসহায়তায় নিক্ষিপ্ত হয়। সতেরো বছরের যুবতী ফুলমণি একাকী ঘরে দিন কাটায়; প্রয়োজনে ঘাটে যায় জল আনতে। এই সুযোগে বাড়ির আশেপাশে বৃদ্ধি পায় বখাটেদের উপদ্রব। এদের মধ্যে পানু মোল্লার বড় ছেলে জ্যাকেরিয়ার দাপটই সবচেয়ে বেশি। নারীপাচারের মামলায় সে দু-বছর জেলে ছিল। কিছুদিন গা-ঢাকা দিলেও সম্প্রতি সে দয়ালের পুকুরে মাছ ধরে, ফুলমণিকে অশালীন ইঙ্গিত করে। মেয়েটির হয়ে ফজলে রাব্বি প্রতিবাদ করলে সে সোজাসাপটা উত্তর দেয় – 'পাকিস্তানে হিন্দুর কোনো সম্পত্তি নেই। সব মুসলমানের।'[১]

শুধু জ্যাকেরিয়া নয়, পুত্র তাহেরের দৃষ্টিভঙ্গিও ফজলে রাব্বিকে ব্যথিত করে। ফুলমণির বিয়ের পাত্ররূপে মুসলমান যুবক মকবুলকে নির্বাচন করে তাহের। কিন্তু ধর্মরক্ষার তাগিদ থেকে ফজলে রাব্বি মেয়েটির বিয়ে দিতে চান কান্তরামের সঙ্গে। হিন্দুস্তানে পালানোর চেষ্টা করছে ছেলেটি। সগোত্রীয় পাত্রের সঙ্গে ফুলমণি নিশ্চিত জীবনযাপন করবে – এমনটি তাঁর প্রত্যাশা। এ-বিষয়ে কান্তের মতামত চাইলে সে আড়ষ্টভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু কান্তরাম নয়, দেশভাগের পর পূর্ববাংলার অধিকাংশ হিন্দুই হারিয়ে ফেলে চারিত্রিক দৃঢ়তা। কান্তরাম তাই নিম্নবর্ণের ফুলমণির সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এ ঘটনায় ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ ফজলে রাব্বি কান্তকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

> আজ যদি গুণ্ডারা এসে মেয়েটাকে লোপাট করে নিয়ে যায়, জাতের মান বাড়বে তোমার ? যদি জোর করে মুসলমানদের সঙ্গে ওর বিয়ে দিই, হিঁদুর মুখ উজ্জ্বল হবে ? ডরপোক জানোয়ারের দল ! একটা মেয়ের ইজ্জত বাঁচাবার সাহস নেই, জাতের বড়াই ! সাধে কি তোমাদের ঠেঙিয়ে দূর করে দিতে চায় পাকিস্তান থেকে।[২]

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সীমান্ত', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৮

অবশেষে কান্তরামের সঙ্গে ফুলমণির বিয়ে হয় এবং তারা ভারতভূমিতে পাড়ি জমায়। বিয়ের এক বছর অতিক্রান্ত হলেও নবদম্পতির কোনো কুশলাদি পান না ফজলে রাব্বি। অবশেষে একদিন মকবুলের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, খুনের অপরাধে কান্ত নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। সীমান্তের ওপারে তখন চালের আকাল। অনাহারে-অর্ধাহারে ফুলমণি সেখানে কষ্টকর দিনযাপন করছে। এ পরিস্থিতিতে ফজলে রাব্বির মনে হয় – ফুলমণির বিবাহপ্রসঙ্গে পুত্র তাহেরের সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। মকবুলই ছিল ফুলমণির যোগ্য পাত্র; কারণ সে সচ্চরিত্র ও সচ্ছল। ধর্মরক্ষার অজুহাতে ফজলে রাব্বি নষ্ট করেছেন মেয়েটির নিষ্পাপ জীবন। ফুলমণিকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে আনতে তাই তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তিনি আধমণ চাল নিয়ে তাহেরকে যেতে বলেন ফুলমণির ঠিকানায়। প্রত্যুত্তরে করুণার হাসি হেসে তাহের পিতাকে জানায় :

> দিনরাত তো ঘরেই বসে আছ আব্বাজান, দুনিয়ার হালচালের কোনো খবর রাখো না। আনসার আর ফৌজের ঘাঁটি বসেছে খেয়াঘাটের ধারে। এক দানা ধানচাল নিতে দেবে না ওপারে।[১]

অনন্যোপায় ফজলে রাব্বি মধ্যরাত্রির নিঃসঙ্গ প্রহরে নিজেই ছুটে চলেন উপোসি ফুলমণির সন্ধানে। খেয়াঘাট থেকে অর্ধমাইল দূরে নদী অতিক্রমকালে তিনি চালসহ ধরা পড়েন। 'শালা বদমাস' বলে একজন গর্জন করে, অন্যজন তাঁর মাথায় লাঠির আঘাত করে। মুহূর্তে চালের বস্তাসমেত তিনি লুটিয়ে পড়ে কাঞ্চন নদীতে। গল্পের শেষাংশে দেখা যায় ফজলে রাব্বিকে হত্যা করে ইয়ার মহম্মদ, যার পূর্ব পরিচয় ছিল কান্তরাম। আট মাস পূর্বে পাকিস্তানে পালিয়ে সে সাচ্চা মুসলমান হয়েছে। স্পষ্টত দেশভাগের যন্ত্রণা, ধর্মের অপব্যবহার এবং মানুষের পাশবিক সত্তার প্রকাশ ঘটেছে 'সীমান্ত' গল্পে। নব্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র দুটিতে ধর্মই হয়ে ওঠে মানুষের মূল পরিচয়। মানবতার বাণী সেখানে মূল্য পায় না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অপরিসীম দক্ষতায় দেশভাগোত্তরকালে মনুষ্যত্বের বিড়ম্বনার একটি চিত্র অত্যন্ত বাস্তবমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন এ-গল্পে।

দুই

দেশভাগের পর সামাজিক অবস্থান এবং আত্মীয়তাসূত্রে শকুন্তলা (বাইশে শ্রাবণ), সিদ্ধার্থ (শ্বেতকমল), জয়ন্ত (কেয়া) কিংবা নমিতারা (হলদে চিঠি) কলকাতায় ন্যূনতম আশ্রয় পেলেও বাস্তুচ্যুত বিপুল মানুষের ঠাঁই হয়েছে শরণার্থী ক্যাম্পে। অসহায় এসব মানুষের দুর্ভোগ-দুর্দশা শিল্পরূপ পেয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অধিকার',

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯০

'মধুবন্তী', 'একটি কৌতুকনাট্য', 'দোসর' এবং 'গাছের সারি' গল্পে। উদ্বাস্তু জনশ্রেণির কঠিন জীবনসংগ্রামের গল্প 'অধিকার'। দেশভাগের ফলে পূর্ববাংলার লক্ষ-লক্ষ মানুষ জড়ো হয় কলকাতার প্লাটফর্ম, পাথুরে রাস্তা, গাছতলা অথবা রিলিফ ক্যাম্পে। শরণার্থীদের কষ্টে বিচলিত বোধ করে বেতারে বক্তৃতা দেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। পত্রিকায় প্রতিনিয়ত মুদ্রিত হয় তাদের শোকান্বিত বিবৃতি। এসব আনুষ্ঠানিকতার ভিড়ে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে শিয়ালদহর প্লাটফর্ম থেকে যুবতী পঞ্চুবালার নিখোঁজ হওয়া কিংবা বাস্তুত্যাগী বৃদ্ধ নিবারণ দাসের মৃত্যুসংবাদ। শরণার্থীদের কল্যাণের নামে পুনর্বাসন দপ্তরে অনেকে ভালো চাকরি পায়। শহরজুড়ে শোভা পায় 'আরো খাদ্য ফলাও' শ্লোগানের পোস্টার। মদ্যপানের আসরে নেতারা এদের জীবনযন্ত্রণার প্রসঙ্গ তুলে হা-পিত্যেশ করেন এবং মনঃকষ্ট প্রশমিত করতে রেসকোর্সের দিকে এগিয়ে যান।

সরকারি পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেড় হাজার উদ্বাস্তুকে পাঠানো হয় উত্তরবাংলার এক মরুপ্রান্তরে। ইতঃপূর্বে এলাকাটি ছিল বুনো শুয়োর, সজারু, চিতাবাঘ এবং মেটে খরগোশের বিচরণভূমি। গভীর রাতে চলন্ত গাড়ির ফ্লাডলাইটে এখানে দৃষ্টিগোচর হতো ক্ষুধার্ত বাঘের আরক্ত চোখ। এরূপ আরণ্যক পরিবেশে কতগুলো ক্ষুদ্র চালাঘরের সমন্বয়ে স্থাপিত হয় শরণার্থী শিবির। উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে অনুর্বর ভূমি আবাদের জন্য বরাদ্দ হয় দুটি ট্রাক্টর ও একটি ট্রাক। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এর বেশি সাহায্য আসেনি। বেসরকারিভাবে দু-চারজন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেও অল্পদিনে তারা দমে যায়। অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যেও বাস্তুহারাদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেন হিমাংশু সোম। বন্যা, মহামারি ও দুর্ভিক্ষকালে দুর্গত মানুষের সহায় হয়ে তিনি পার করেছেন জীবনের পঞ্চাশটি বছর। তিনি ব্রহ্মচারী; কঠোপনিষদ থেকে কংগ্রেস – প্রতিটি বিষয়ে তাঁর অবিচল ভক্তি। রাজনীতি-সচেতন হলেও তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মী নন। শরণার্থীদের সেবায় তিনি ব্যক্তিগত সমস্ত জমি বিলিয়ে দিয়েছেন। ইতোমধ্যে অতিরিক্ত পঞ্চাশ ঘর উদ্বাস্তুকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। সমবায়-গোলা থেকে চলছে তাদের আহারের আয়োজন।

ত্রাণ কার্যক্রমে সরকারের নিস্পৃহতায় হিমাংশু সন্তুষ্ট নন। তিনশো ক্যাম্পের বিপুল শরণার্থীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রুক্ষমাটিতে উৎপাদিত হয় সোনালি শস্য। ফসল তোলার দিন ঢাকা ক্যাম্পে ভাঙা হারমোনিয়াম বাজিয়ে একজন কীর্তন গায়, গাইবান্ধা ক্যাম্পে শুরু হয় কবিগানের মহড়া, নেত্রকোণা ক্যাম্প আয়োজন করে ভোজসভার। কিন্তু ফসল মজুতের জন্য একটি টিনের ছাউনি দেওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নানা প্রক্রিয়ায় কিছু ফসল রক্ষা পেলেও, অধিকাংশ বৃষ্টিতে পচে যায়। নবান্নের মিষ্টি গন্ধের পরিবর্তে ক্যাম্পে বিরাজ করে দুর্গন্ধময় পরিবেশ।

সরকারের ‘খাদ্য বাড়াও’ কর্মসূচি সফল করতে হিমাংশু উচ্চপর্যায়ে একাধিকবার আবেদন জানান। যদিও ফিরতি চিঠিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয় – ‘ওটা এখনো পাবলিসিটি ক্যাম্পেন – তোমাদের ধান চুলোয় যাক, পোস্টারের খরচা থেকে আমরা একটা আধলাও দিতে পারব না।’[১] সাহায্যের পরিবর্তে ট্রাক্টরের ভাড়া বাবদ তারা ধার্য করে ছত্রিশ হাজার টাকা, যদিও এ অঙ্কে দুটি ট্রাক্টর কেনা সম্ভব। বিপন্ন মানুষের অন্ন বিক্রয়ের অর্থে হিমাংশুকে মেটাতে হয় কর্মকর্তাদের ডিনারের ব্যয়। উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকারের প্রহসনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এটি।

প্রশাসনের পাশাপাশি অব্যাহত থাকে জোতদারদের[২] আস্ফালন। তাদের সবাই বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা। পতিত জমিতে ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের ‘বাম্পার ক্রপে’র প্রতি তাদের লোভী দৃষ্টি। এদের গুপ্তবাহিনী রাতে গাইবান্ধা ক্যাম্পে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে। ক্যাম্প উচ্ছেদের জন্য পাহাড়িদের মধ্যে তারা উসকে দেয় ভাটিয়া[৩] বিদ্বেষ। হাজার-হাজার বিঘা জমি একত্রে চাষ হচ্ছে, অসংখ্য মানুষ একসঙ্গে কাজ করছে – এসব যতীন-অনুকূল বাবুদের পছন্দ নয়। জোতদারদের পক্ষ নিয়ে জনৈক অফিসার জমিগুলো বিভক্ত করবার পরামর্শ দেয়। এসব চক্রান্ত সুদূরপ্রসারী। কারণ, ভূমি খণ্ডিত হলে ট্রাক্টরের ব্যবহার কমে আসবে। হাল-বলদের ব্যয়নির্বাহের জন্য কৃষকরা জোতদারদের সঙ্গে যুক্ত হবে ‘আধিচাষে’ এবং দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে এরা পরিণত হবে ক্ষেতমজুরে। এদিকে শরণার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে হিমাংশু পার্শ্ববর্তী সাতশো একর পতিত-জমির চাহিদাপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু এর মধ্যে যতীনবাবুর দশ বিঘা ধানি জমি থাকায় তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হয়। উদ্বাস্তুদের ক্ষুধার অন্নের পরিবর্তে যতীনের ইচ্ছার গুরুত্ব সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে ঢের বেশি।

ক্যাম্পের ডাক্তারের সঙ্গে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করেন হিমাংশু। তাদের আলোচনার ধারা কমিউনিস্টদের চিন্তা-চেতনার কাছাকাছি; যদিও তাদের কেউই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত নন।

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘অধিকার’, *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৪

[২] “জোতদার কথাটি ব্যবহার করা হয় উত্তর বাঙলার অবস্থাপন্ন চাষিদের বোঝাবার ক্ষেত্রে। অন্যান্য এলাকায় ব্যবহার করা হয় অন্য শব্দ, যেমন যশোরে ‘গাঁতিদার’, বাকেরগঞ্জে ‘হাওলাদার’ এবং দক্ষিণ মেদিনীপুরে ‘চাকদার’।” [দ্রষ্টব্য : জয়া চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হল* (আবু জাফর অনূদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১০৯]

[৩] ভাটিয়াদের পরিচয় প্রসঙ্গে গল্পের তারকা (*) চিহ্নিত অংশে লেখক বলেছেন – ‘দার্জিলিং ভুটান ইত্যাদি অঞ্চলে সমতলবাসী মাত্রকেই ‘ভাটিয়া’ বলা হয়ে থাকে। [উদ্ধৃত : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘অধিকার’, *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৬]

সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা পার্টি-সদস্যের সঙ্গে পরিচয়ও ছিল বিপজ্জনক ও অস্বস্তিকর।[১] অবশ্য পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থেকেও ডাক্তার বোঝেন – 'সোস্যালিজ্‌ম না থাকলে সোস্যাল ওয়ার্ক সম্ভব'[২] নয়। এ পর্যায়ে পারিপার্শ্বিক চাপে পড়ে হিমাংশু ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে চান। তিনি জানেন, যতীন-অনুকূলদের চক্রান্তে ক্যাম্পের সমুদয় জমি বিভক্ত হবে। এরপর আরম্ভ হবে আল-ভাঙা, মারামারি ও ফৌজদারি। উর্বর ভূমি হয়তো পূর্বের ন্যায় জঙ্গলাকীর্ণ হবে; শহুরে বাবুরা এখানে শিকার করবে হরিণ, সজারু, খরগোশ কিংবা বনমুরগি। তবে হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও ডাক্তার হতাশ হন না। তাঁর কেবলই মনে হয় – 'নতুন মাটিতে নতুন ধানের স্বাদ যারা পেয়েছে, এত সহজে তাদের হটানো যাবে তো ?'[৩] তাঁর এ-অনুমান অতি দ্রুত সত্য প্রমাণিত হয়। সে-রাতেই বিপুল মানুষের একটানা কোলাহল, ট্রাক্টরের বিকট শব্দ এবং মাঠজুড়ে লণ্ঠনের আলোয় ডাক্তার ও হিমাংশু হকচকিয়ে যান। ঢাকা, নেত্রকোণা, রংপুর, পাবনা ক্যাম্প থেকে বানের মতো মানুষ ছুটে এসেছে সাতশো একর ভূমি দখল করতে। ট্রাক্টর দিয়ে তারা রাতের অন্ধকারে চাষ করতে চায়। যতীনবাবুর দশ বিঘা জমি, লাঠিয়ালদের নির্যাতন, পুলিশের গুলি – সবকিছু তাদের সংঘশক্তির কাছে নিতান্ত তুচ্ছ ও নগন্য। এসময় হিমাংশুর অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর আসে ডাক্তারের জবানিতে :

– আর যতীনবাবুর জমি ? – অবরুদ্ধ আওয়াজ বেরুল হিমাংশু সোমের।

– ট্রাক্টরের মুখে কি আর ও দু-দশ বিঘের চিহ্ন থাকবে ?

– যদি জোতদারের লোকদের সঙ্গে গোলমাল লাগে ?

– ওদের হাতে লাঠি আছে, কাস্তে আছে। হাসুয়াও নিয়েছে কেউ কেউ। ভয় নেই দাদা, আর এক দফা সোনার ফসলের সূচনা হতে চলল।

– কিন্তু এর পর পুলিস আসতে পারে, গুলি চলতে পারে –

– অনেক কিছুই পারে। কিন্তু ওরাও কম পারে না। নবান্নের গন্ধে মাতাল হয়ে ওরা নেমে পড়েছে – পৃথিবীর কেউ ওদের ঠেকাতে পারবে না।

– আর আমি ? – ডুবে যাওয়া মানুষের মতো শেষবার বলল হিমাংশু সোম।

---

[১] ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তী বছর (১৯৪৮) কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল পুলিশের গুলিতে চার কমিউনিস্ট কর্মী প্রাণ হারায়। এছাড়া অনেক নেতা-কর্মী প্রতিনিয়ত পুলিশি হয়রানির শিকার হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ বিষয় গল্পে ইঙ্গিত করেছেন।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'অধিকার', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৭

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৮

– আপনার কাজ আপনি শেষ করেছেন, এবার ওদের কাজ শুরু। আপনি যেখানে থেমেছেন, ওরা সেখান থেকেই সামনে পা বাড়িয়েছে। আপনি গিয়ে স্বচ্ছন্দে শুয়ে পড়তে পারেন – অন্ধকারে আবার ডাক্তারের মিষ্টি হাসির আওয়াজ ভেসে এল।

লণ্ঠনের আলো আর ট্রাক্টরের গর্জন সামনে এগিয়ে চলল উত্তরের তমসা-দিগন্তের দিকে।[১]

সংঘশক্তির মূলসুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে উপর্যুক্ত সংলাপে। 'ওদের হাতে লাঠি আছে, কাস্তে আছে। হাসুয়াও নিয়েছে কেউ কেউ' – এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সর্বহারা উদ্বাস্তুদের জাগ্রতচেতনাকে লেখক প্রতীকময় করেছেন। নির্যাতিত শ্রেণির সামষ্টিক শক্তির কাছে অপশক্তি যে নিমিষেই কুপোকাত হবে, গল্পের শেষাংশে তা প্রতিপাদিত হয়েছে। বক্তৃতাসর্বস্ব নেতা এবং মাঠপর্যায়ের কর্মীদের চিন্তা ও কর্মের বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় 'অধিকারে'। অসুস্থ রাজনীতিচর্চার বিপরীতে হিমাংশুর মতো নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক ভারতবর্ষে বরাবরই ছিল। এঁরা সাম্যবাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রপ্ত করেননি, কিন্তু তাঁরা সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ছিলেন বরাবরই নিবেদিতপ্রাণ।

কলকাতার উদ্বাস্তু কলোনির করুণ চিত্র উঠে এসেছে 'মধুবন্তী'[২] গল্পে। ইনসিয়োরেন্সের এক ভদ্রলোক নতুন বাড়ি নির্মাণ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করে পরিচিত চিত্ত দত্তকে। ভদ্রলোকের বিদুষী স্ত্রী তাকে সেতার শোনায়, পাঁচ বছরের ছেলে নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করে শোনায় ইংরেজি কবিতা। ফেরার পথে চিত্ত যেখানে বাসের জন্য অপেক্ষা করে, তার পাশেই তালডাঙা কলোনি। দেশভাগের পর প্রতিবেশী নীরদের পরিবার এখানে আশ্রয় পেয়েছে। এ কলোনির প্রতি চিত্তের আকর্ষণের অন্যতম কারণ নীরদের দিদি জয়া। মেয়েটির হাত ধরে একদিন চিত্ত অনুরোধ করেছিল – 'পাশ করে চাকরি-বাকরি জোটাতে আমার আরো তিন-চার বছর লাগবে, এর মধ্যে তুমি ফস্ করে আর কাউকে বিয়ে করে ফেলবে না তো ?'[৩] কিশোরী জয়া সেদিন প্রতীক্ষা করতে সম্মত হয়। কিন্তু দেশত্যাগের পর এসব প্রতিজ্ঞা হয়ে ওঠে মূল্যহীন।

জয়ার পিতা যতীন মিত্র কবিতা লেখেন। একসময় 'মানসী' এবং 'মর্মবাণী' পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতো। গ্রামবাসীর দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। গ্রামের যে কোনো অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন মধ্যমণি। পক্ষান্তরে তালডাঙা কলোনির সকলে তাঁর কবিসত্তা নিয়ে আড়ালে-আবডালে কৌতুক করে। যেখানে উদ্বাস্তুজীবনে টিকে থাকার জন্য বাঘ-শেয়াল-সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, সেখানে কাব্যচর্চা কলোনিবাসীর

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৯

[২] 'মধুবন্তী' *পরিচয়* পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় (১৩৬৪) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মধুবন্তী', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

কাছে হাস্যকর। চিত্তকে যে-ব্যক্তি যতীন মিত্রের বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়, গল্পচ্ছলে সে এ-স্থানের বীভৎসতা বর্ণনা করে :

> আমরা অদের জায়গা দখল কইর‍্যা লইছি – অরা যাইবো কই – কন ? সাপ আছিল, শীতকালে চিতাবাঘ আসত, বুনা শূয়ারও দেখছি এইখানে। এখন আমাগো পাল্লায় পইরা অরাও আমাগো মতো বাস্তুহারা হইছে।... তার থিক্যাও ভালো জিনিস পাইছি আমরা। মড়ার হাড় – মাথার খুলি। যে রাস্তা দিয়া আসলেন – ওইখানে আগে কত যে খুন আর ডাকাতি হইত ঠিক নাই। খুন কইর‍্যা এইখানে পুইত্যা রাখত – শিয়াল-শকুনেও ট্যার পাইত না। এই হোগলাবন হাতাইলেই মানুষের মাথা পাইবেন।[১]

এতৎসত্ত্বেও শিয়ালদহ স্টেশন কিংবা ট্রানজিট ক্যাম্পের তুলনায় তালডাঙা কলোনি বাস্তুহারাদের কাছে স্বর্গতুল্য। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে জয়াদের বাড়িতে আসলেও চিত্তকে ঠিকই চিনতে পারেন যতীন মিত্র। চারশো টাকা বেতনপ্রাপ্ত চিত্তের সঙ্গে তাদের যে বিশাল সামাজিক ব্যবধান – এ বিষয়টিও তিনি তাকে দেখে উপলব্ধি করেন। এজন্য চিত্তের সঙ্গে কাব্য-বিষয়ক কোনো আলোচনায় তাঁর স্পৃহা জাগে না। এ-পর্যায়ে জয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় চিত্ত দত্তের। জয়া যে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়নি, তার প্রমাণ তার সিঁদুরবিহীন সিঁথি। সে কলোনির একটি স্কুলে শিক্ষকতা করে। এজন্য সে যে আট-দশ টাকা বেতন পায়, তাতে পরিবারের আধমণ চালের সংস্থান হয়। চিত্তকে আপ্যায়নের জন্য জয়াকে তাগিদ দেন যতীন। কিন্তু এরূপ জীর্ণ পরিবেশ থেকে মুক্তিপ্রাপ্তির জন্য চিত্ত অস্থির হয়ে ওঠে।

বারো বছর পূর্বে লণ্ঠনের আলোয় যে প্রেমিকাকে গ্রামের খাল পার করে দিয়েছিল চিত্ত, এদিন জয়া-ই তাকে বাঁশের সাঁকো অতিক্রমে সহায়তা করে। বিদায়বেলায় মেয়েটি ভালোবাসার প্রতিদান চায়নি, বরং চিত্তকে সে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। চিত্ত দত্ত এসময় হয়ে পড়ে আবেগপ্রবণ। তারও ফিরে যেতে ইচ্ছে করে জয়ার কাছে :

> কিন্তু হঠাৎ এমন অস্বাভাবিক ভাবে কেন চলে গেল জয়া ? ও কি আমাকে সময় দিয়েছিল ? বারো বছর আগেকার মতো একটুখানি আকস্মিক সময় – যাকে চকিতের মধ্যে পেয়েও আমি হারিয়ে ফেললুম ? আর সেই দুর্বলতার লজ্জাতেই এমন করে চলে গেল – ফিরে আর চাইল না আমার দিকে ?[২]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

শেষপর্যন্ত কলোনির ভাঙা পুল পেরিয়ে চিত্ত দত্ত তালডাঙা কলোনিতে প্রত্যাবর্তন করতে চায়নি। বাস্তবতার সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়াকে জয় করবার ধৈর্য বা রুচি তার নেই। রিফিউজি ক্যাম্পের রূপহীন প্রেয়সী নয়, পূর্ববাংলার হিজল গাছের ছায়ায় যে তরুণীকে সে পেয়েছিল, তারই কল্পনায় মধ্যবিত্ত যুবক আত্মমগ্ন হয়ে ওঠে।

বাস্তুহারাদের শোচনীয় ভাগ্যলিপি প্রদর্শিত হয়েছে 'একটি কৌতুকনাট্য'[১] গল্পে। মামাতো ভাই টোকেনের পুত্রের অন্নপ্রাশনে এসে সুকুমার বিরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। অনুষ্ঠানের পরদিন খোকার গলার হার চুরির ঘটনায় আমন্ত্রিত অতিথিরা বিব্রতবোধ করে। সমস্ত বাড়িতে বিরাজ করে বিরূপ আবহাওয়া। যে-অতিথিরা আরও কয়েকদিন এ-বাড়িতে অবস্থান করতে চেয়েছিল, তারাও ঘরে ফেরার তাগিদ অনুভব করে। সুকুমারের মামাতো ভাই পোকনের সন্দেহ বাইরের দিকে, খোলা জানালা দিয়ে কোনো চোর হয়তো হারটি আত্মসাৎ করেছে। বাড়ির পরিবেশ স্বাভাবিক করতে যখন গানের আসর বসে, তখনই ধরা পড়ে চোর। এক্ষেত্রে একক কৃতিত্ব পোকনের। চেহারা বিচারে লোকটিকে কেবল চোর নয়, ফাঁসির আসামী বলেও সাব্যস্ত করা যায়। সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা লোকটির গায়ের রঙ কালো, মাথায় পাকধরা ছাঁটা চুল। তার কঙ্কালসার দেহে নেংটির মতো এক টুকরো কাপড় ভিন্ন আর কিছু নেই। প্রচণ্ড প্রহারের পর সে জানায় তার নাম কালীচরণ। সে ঠিকানাহীন উদ্বাস্তু। বাড়ির আশেপাশে কলাপাতা দেখে সে খাবারের সন্ধান করছিল। কয়েক মিনিট ধরে লোকটির ওপর যে অমানবিক নির্যাতন চলে, তা অবর্ণনীয়।

এসময় ডিসপেন্সারি থেকে বাড়ি ফেরেন সুকুমারের ডাক্তার-মামা। বাবাকে পেয়ে পোকন তার বীরত্ব প্রকাশ করতে শুরু করে। সকলকে অবাক করে মামা অপরাধীকে এক সের সন্দেশ খেতে দেন। প্রথমে আপত্তি করলেও মামার ধমকে সে সন্দেশগুলো সাবাড় করে। ক্ষুধা ও লোভের অদ্ভুত স্বরূপ সুকুমার ইতঃপূর্বে দেখেনি। সন্দেশের থালা নিঃশেষিত হলে স্পষ্ট হয় মামার পরিকল্পনা। হারের সন্ধান না জেনে তিনি চোরকে জলদানে অস্বীকৃতি জানান। মৃতপ্রায় লোকটি উদ্ভ্রান্তের ন্যায় সমস্ত দোষ স্বীকার করে নেয় এবং বলে :

> বাজারে একজনরে বেইচ্যা দিছি। তারে চিনি না। একশো টাকা পাইছিলাম – হারাইয়া গেছে ! – লোকটা গোঙানির মতো সুর তুলে বলে যেতে লাগল : হইল তো ? এ্যাখন আমারে থানা পুলিস যেখানে খুশি দ্যান – তার আগে এট্টু জল দ্যান।[২]

---

[১] 'একটি কৌতুকনাট্য' *আনন্দবাজার* পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় (১৩৬৯) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'একটি কৌতুকনাট্য', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২

মামা স্বয়ং কালীচরণকে জলের ঘটি এগিয়ে দেন এবং বিনা শর্তে নিষ্কৃতি দেন। পিতার উদারতায় পোকন অত্যন্ত বিরক্ত হয়। এরপর মামা পকেট থেকে বের করেন চুরি যাওয়া সোনার হার। কালীচরণ বাজারে বিক্রয় করলেও পরিচিত স্যাকরা এটি তাঁর কাছে নিয়ে আসে। গল্পটি এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু রাত এগারোটায় গম্ভীর স্বরে সুকুমারকে মামা যা বলেন, তা অবিশ্বাস্য। হারটি চুরি করেছিল তারই পুত্র পোকন। তিনবার আইএসসি ফেল করে ছেলেটি জুয়া এবং মদে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বাড়ি-ভর্তি অতিথির মধ্যে মামা পুত্রের এ-কেলেঙ্কারির কথা প্রকাশ করতে চাননি। কালীচরণের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তিনি বিষয়টির সাময়িক নিষ্পত্তি চেয়েছেন। অকারণে প্রহৃত হয়েছে জেনেই তিনি লোকটিকে পেটভরে সন্দেশ খাওয়ান এবং কৌশলে বিদায় দেন। এভাবে উদ্বাস্তু জনসম্প্রদায় কলকাতায় অকারণে প্রহৃত, লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়। তাদের দুঃখ-দৈন্য-ক্ষুধার তাড়না শহরবাসীর কাছে কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জলের জন্য তারাও নির্দ্বিধায় সমস্ত দায় নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। কারণ তাদের প্রতিবাদ করবার শক্তি নেই, তাদের পাশে দাঁড়ানোরও কেউ নেই। কলকাতার জনজীবনে তারা ছিল সবদিক থেকেই অসহায়।

খুলনার এক কৃষকের বিড়ম্বনার গল্প 'দোসর'[১]। দেশভাগের পর স্ত্রী-সন্তানসহ সে আশ্রয় নেয় শিয়ালদহ স্টেশনে। এরপর তাদের ঠাঁই হয় শরণার্থী ক্যাম্পে। কলেরায় কৃষক-পত্নীর মৃত্যু হয়, ছেলেটি ভিক্ষুকের দলে ভিড়ে যায় এবং মেয়েটি অন্ধকার গলিপথ বেছে নেয়। অতঃপর নিঃসঙ্গ-কৃষক শহরের বাইরে পাহাড়ি নদীর তীরে কিছু খাসজমিতে চাষাবাদ শুরু করে। এমতাবস্থায় ভূত-প্রেতের প্রসঙ্গ তুলে তাকে ভীতি প্রদর্শন করলে সে উত্তর দেয় – 'দেশ ছাড়বার পরে মরে তো ভূত হয়ে আছি। পেত্নীতে আমার কী করবে।'[২] একসময় ঘরের সম্মুখে প্রকাণ্ড বুনো শুয়োর দেখে সে চমকে ওঠে। সংবিৎ ফিরে এলে বাস্তুচ্যুত কৃষক বুনো শুয়োরের সঙ্গে নিজের সাযুজ্য কল্পনা করে – 'তা হলে ওর দশা আমারই মতো। ওরও আলাদা জঙ্গল ছিল, বুনো ওল ছিল। হয়তো শুয়োরদেরও দেশ আলাদা হয়ে গেছে, তাড়া খেয়েছে সেখান থেকে। ও ব্যাটাচ্ছেলেও আমারই দলের – বাস্তুহারা।'[৩]

খাসমহলের জমি ভোগদখলের অপরাধে এক পর্যায়ে কৃষক আইনি জটিলতায় পড়ে। পশুটির সঙ্গে তুলনা করে সে মনে করে তার দশা পশুর চেয়েও হীন। কারণ – 'ওকে খাজনা দিতে হয় না, পত্তনি দিতে হয় না, ওর

---

[১] 'দোসর' *দেশ* পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৩৭৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দোসর', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৩

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৬

উচ্ছেদের ভয় নেই।'[১] এক রাতে বানের শব্দে কৃষকের ঘুম ভাঙে, জলপ্রবাহে ভেঙে যায় তার জীর্ণ কুটির। নদীবক্ষে ভাসমান অবস্থায় শুয়োরটি ছিল তার বিপদের সঙ্গী। দুহাতে জন্তুটিকে জাপটে ধরে সে সাঁতরে চলে পাহাড়ি নদী। উত্তাল স্রোতের প্রবল আঘাতে একসময় কৃষক অচেতন হয়ে পড়ে। কয়েকজন মানুষের সেবা শুশ্রূষায় প্রত্যূষে জ্ঞান ফিরলে সে দেখে শুয়োরটি নেই। বাস্তুহারা জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে কৃষক অবশেষে উপলব্ধি করে – 'কখনো শুয়োর মানুষ হয়, বুঝেছ – কখনো আবার মানুষ –।'[২]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গাছের সারি'[৩] গল্পেও ঘটেছে উদ্বাস্তু-সমাবেশ। পূর্ববাংলাত্যাগী গল্পকথক ক্যান্টিলেভার ব্রিজের তলায় প্রত্যক্ষ করেন ছিন্নমূল শ্রেণির অভিশপ্ত জীবনযাত্রা : পরিত্যক্ত বিছানা, মাটি অথবা অ্যালুমিনিয়ামের পুরাতন তৈজসপত্র এবং উনুনে ফুটন্ত রান্না। তাদের চেহারাও বিশেষ প্রকৃতির – শীর্ণ, রোগা, কালো ও উদ্ভ্রান্ত। কলকাতা মহানগরে এদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। শহরের রাস্তা, পানের দোকান, ট্রাম-বাসস্টপ – সর্বত্র তাদের একটি আবদার – 'পাকিস্তান থিকা আসছি – আপনারা দয়া না করলে আমরা যামু কই ?'[৪] চায়ের স্টল থেকে অভিজাত শ্রেণির ড্রয়িংরুমের আলোচিত বিষয় এরাই। কেউ মন্তব্য করে – 'একদল অপজাত বাঙালী তৈরী হচ্ছে মশাই – নতুন একদল প্রোফেশন্যাল বেগার কতগুলো হোপলেস ক্রিমিন্যাল।'[৫] তবে এ ধরনের তাত্ত্বিক আলাপে গল্পকথক আগ্রহবোধ করেন না। কারণ তিনি জানেন, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি ঘটলে উদ্বাস্তুপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। এ-সমস্যা একান্তই রাজনৈতিক। রাজনীতির মারপ্যাঁচে পরাভূত এসব বিপন্ন মানুষের হতশ্রী জীবন প্রত্যক্ষ করে গল্পকথক অনুভব করেন তীব্র 'ক্লীব-যন্ত্রণা' :

> কিছুদিন থেকেই খবরের কাগজে চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে। নতুন করে কীসব গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে, তাই উদ্বাস্তুরা আবার ভিড় করে ছুটে আসছে সেখান থেকে। এই খবরগুলো আমি পড়তে পারি না, ছবিগুলোকে আরো অসহ্য বোধ হয়, একটা ক্লীব-যন্ত্রণা যেন আমাকে চাবুক মারতে থাকে। আমি শেয়ালদা স্টেশনটাকে সাধ্যমতো এড়িয়ে চলি, নিতান্তই যাওয়ার দরকার পড়লে যতদূর সম্ভব চোখদুটোকে বন্ধ করে রাখি। কোথা থেকে একটা কটু কুটিল কণ্ঠ আমার কানের কাছে ক্রমাগত ফিস ফিস করে বলতে থাকে : 'এর জন্যে তুমিও দায়ী – তুমিও !'[৬]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫০

[৩] 'গাছের সারি' *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৭২) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গাছের সারি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[৫] প্রাগুক্ত

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

১৯৪৭ সালে দেশভাগকে কেন্দ্র করে বাংলা ভূখণ্ডে যে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘট তৈরি হয়, তা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। দেশভাগের ফলে বাংলার মানচিত্রেই কেবল পরিবর্তন আসেনি, মানব-মনস্তত্ত্বেও এসেছে অনাহুত পরিবর্তন। এই পরিবর্তনে মনেপ্রাণে পীড়িত বোধ করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সমবায়ে আবহমান বাংলার নিস্তরঙ্গ ভূগোলে যে অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ বিরাজ করছিল, তার অব্যাহত ব্যত্যয়ে প্রতিদিনের জীবন কীরকম নরকে পরিণত হয়েছিল, শরণার্থীদের জীবনে নেমে এসেছিল দুরতিক্রম্য দুর্ভোগ, তারই ভাষারূপ এসব গল্প। এই গল্পসমূহ বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশ্বস্ত দলিলও বটে।

তেভাগা আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে কৃষকদের মধ্যে অভাবনীয় জাগরণ সঞ্চারিত হয়। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত, বিশেষত উত্তরবঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে বর্গাচাষিরা তেভাগা[১] আন্দোলন (১৯৪৫-১৯৪৬) আরম্ভ করে। জোতদাররা সেসময় কৃষিকাজে বিনিয়োগ করতো না। বীজক্রয় থেকে খোলানে ফসল পৌঁছে দেওয়া – সবই ছিল কৃষকদের দায়িত্বে। ভূমির মালিক হিসেবে তারা বিনা পরিশ্রমে অর্ধেক শস্য ঘরে পেতো। উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের দাবিতে দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদহ – এই পাঁচ জেলায় কৃষকরা বিক্ষোভ করে। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কৃষক সভা তাদের সংগঠিত করে।

তেভাগা আন্দোলনের কারণে মুসলিম লীগ সরকার 'বর্গাদার বিল' (২২ জানুয়ারি ১৯৪৬) পাশ করলেও, আইনসভায় উত্থাপন করে না। উপরন্তু বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রশাসন তৎপর হয়। জোতদারদের পক্ষ নিয়ে পুলিশ কৃষকদের গ্রেপ্তার, বাড়িঘর লুঠ এবং তাদের পরিবারবর্গের ওপর অত্যাচার চালায়। এ বিদ্রোহে আনুমানিক পাঁচ হাজার কৃষক গ্রেপ্তার এবং পঞ্চাশ জন নিহত হয়।[২] পরবর্তীকালে দেশভাগ এবং পুলিশি নির্যাতনে সংগ্রাম স্তিমিত হলেও এ কথা নিদ্বির্ধায় স্বীকার্য যে, 'তেভাগা আন্দোলন সমগ্র দেশের সামনে কৃষি

[১] "*তেভাগার* আক্ষরিক অর্থ হলো তিন ভাগে বিভক্ত। তেভাগা আন্দোলনের সময় ভাগচাষীরা উৎপাদিত শস্যের তিন ভাগের দু'ভাগ দাবি করে– আগে তারা পেত অর্ধেক এবং অবশিষ্ট অর্ধেক পেত জমির মালিক।" [উদ্ধৃত : জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন* (আবু জাফর অনূদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১]

[২] নরহরি কবিরাজ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

সংস্কারকে তুলে ধরেছিল। কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা যে কত উন্নত তেভাগা আন্দোলন তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর।'[১]

তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বন্দুক' গল্প। 'বুদ্ধি ও কৌতুকে দীপ্ত গল্পটি তেভাগা আন্দোলন নিয়ে লেখা অনেক বাংলা গল্পের মধ্যে একটি স্মরণীয় গল্প।'[২] করতোয়া নদীর তীরে কৃষকশ্রেণির জাগরণে উদ্বিগ্ন জীবনযাপন করছে সুবিধাভোগী জোতদার লোকনাথ সাহা। দেশের স্বাধীনতা, গরিব-দুঃখীদের ভাগ্যপরিবর্তন সে-ও প্রত্যাশা করে, অথচ অধীন বর্গাচাষিদের দুভাগ ধানের দাবি সে মানতে পারছে না। তদুপরি পাওনা ফসলের এক ভাগ কৃষকরা তার বাড়িতে পৌঁছে দেবে না, ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাকে সংগ্রহ করতে হবে।[৩]

লোকনাথ সাহার মতো ফজল আলী, নূর মামুদ ও বৃন্দাবন পাল চাষিদের সঙ্গে মীমাংসার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় কৃষকশ্রেণি বুঝে ফেলেছে শোষণের গতিপ্রকৃতি। ধর্মীয় বিভেদের মাধ্যমে জোতদাররা বারবার বিনষ্ট করেছে তাদের সংহতি। কৃষকদের পক্ষ নিয়ে রহমান তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দেয় :

> মোছলমান গরীব হিঁদু গরীবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পেটের ভাতের জন্যে লড়াই করলে গুণাহ্ হয় আর হিঁদু জোতদারদের সঙ্গে দোস্তি করে মোছলমানের ভাত মারলে সেটাই বুঝি বড় ভালো কাজ হল ? বোকা বুঝিয়ো না সাহেব, যাও, যাও – নিজের কাজে যাও –[৪]

কৃষকদের মধ্যে ধীরগতিতে হলেও সঞ্চারিত হয়েছে অধিকার-সচেতনতা। তারাও বুঝতে পেরেছে 'যুগ পাল্টাচ্ছে – দেশ স্বাধীন হচ্ছে।'[৫] এমতাবস্থায় প্রাণের বিনিময়ে তারা ফসলের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই ঘোর বিপদে জোতদাররা স্মরণ করে তাড়ি-বিক্রেতা রঘুরামকে। শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে

---

[১] ধনঞ্জয় রায় (সম্পাদিত), *তেভাগা আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

[২] উদ্ধৃত : (ভূমিকা, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৩] 'তেভাগার লড়াই' শীর্ষক প্রবন্ধে বিভূতি গুহ লেখেন –

'তখনকার দিনে অনেক অঞ্চলে নিয়ম ছিল, আধিয়ার যে ফসল বুনেছে সেই ফসল কেটে দিয়ে আসবে জোতদারের গোলায় বা খোলানে। ভাগচাষি নির্মম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জানে, জোতদারের কব্জায় একবার ধান চলে গেলে তার কপালে আধি তো জুটবেই না, নানা অজুহাতে, নানা পাওনার নাম করে সেই আধি থেকে মোটা অংশ কেটে নেবে জোতদার। শেষ পর্যন্ত তাকে শূন্য হাতে ফিরতে হবে।

তাই আওয়াজ উঠল, আর জোতদারের খোলানে ধান নয়, নিজ খোলানে ধান তোলো। সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল এই আওয়াজ।' [উদ্ধৃত : ধনঞ্জয় রায় (সম্পাদিত), *তেভাগা আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩]

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বন্দুক', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৭

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৬

লোকটি দুবছর কারাবাসে ছিল। তবু তার স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি। সারাক্ষণ সে গাঁজায় আসক্ত থাকে, ডোমপাড়ায় এক মেয়ের সঙ্গে রাত কাটায়। তার আরেকটি পরিচয় আছে – সে দুর্দান্ত শিকারি; তবে এবারের নিশানা পাখি নয় – মানুষ। কৃষক-নেতা রহমানকে হত্যার জন্য লোকনাথ তার হাতে নিজের বন্দুক তুলে দেয়। কিন্তু সে জানে না, একইপন্থায় রঘুরাম সংগ্রহ করেছে ফজল আলী, বৃন্দাবন এবং নূর মামুদের অস্ত্র।

তেভাগা আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল – 'জান দিব, তবু ধান দিব না'।[১] এ বিপ্লবী প্রতিজ্ঞাই অনুরণিত হয়েছে 'বন্দুক' গল্পে। দিঘির পাড়ে কৃষকরা তেভাগার অঙ্গীকারে ঐক্যবদ্ধ হয়। মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলন করে রহমান দৃপ্ত শপথে সোচ্চার হয় – 'ভাই সব, জান কবুল, আমরা ধান দেব না। আমরা না খেয়ে কুত্তার মতো মরব আর মহাজনের গোলা ভরে উঠবে আমাদের খুন-মাখানো ধানে, এ আমরা হতে দেব না।'[২] জনতার গগনভেদী সমর্থনে তার কণ্ঠস্বর আরও উচ্চকিত হয়ে ওঠে। এদিকে বাঁশঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রঘুরামের গুলিতে রহমান ধরাশায়ী হবে – এমন শুভক্ষণের স্বপ্ন দেখে লোকনাথরা। কিন্তু কোনো খুনখারাবি ছাড়াই সমাবেশ সমাপ্ত হয়।

আশাহত হয়ে জোতদাররা রঘুরামের সন্ধানে চণ্ডাল-পল্লিতে আসে। গাঁজা আর তাড়ির নেশায় তখন তার বেহাল অবস্থা। একদল উন্মত্ত নারীপুরুষের বৈঠকে সে অশ্লীল গান ধরেছে। ক্রুদ্ধ ফজল আলী বন্দুক ফেরত চাইলে সে জানায় – অস্ত্রগুলো রহমানের কাছে। 'পাকা' ব্যবসায়ীর মতো গম্ভীর স্বরে সে যুক্তি দেখায় – 'ওরা বেশি ধান পেলে আমার তাড়িও বেশি বিক্রি হবে এটা কেন বুঝতে পারছ না ?'[৩] 'বন্দুক' গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শেষপর্যন্ত নেশাগ্রস্ত রঘুরামের ওপরই সর্বাপেক্ষা আলোকসম্পাত করেছেন। রহমানদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে বেগবান করেছে তার ব্যতিক্রমী চিন্তাধারা। মাতাল হয়েও রঘুরাম তার বাস্তববুদ্ধি বিসর্জন দেয়নি। জোতদারদের প্রলোভন অগ্রাহ্য করে সে সর্বহারাদের পক্ষ নিয়েছে। সাধারণ কৃষকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে লেখক এভাবে সম্প্রসারিত করেছেন ব্রাত্যশ্রেণির মধ্যে।

---

[১] নরহরি কবিরাজ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বন্দুক', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১০

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১২

ভাষা-আন্দোলন

ভারত-বিভাগের অব্যবহিত পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন (১৯৫২) একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। 'বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), বঙ্গভঙ্গরদ (১৯১১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৯২১), মুসলিম সাহিত্য সমাজ (১৯২৬), শিখা পত্রিকা (১৯২৭) প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মোদ্যোগকে কেন্দ্র করে যে মুসলিম মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানস গড়ে উঠেছিল, ১৯৪৭ সালে ভারতবিভক্তির পর ক্রমবিকশিত সেই মধ্যশ্রেণিটিই হয়ে ওঠে বাংলাভাষী পূর্বাঞ্চলের মনন ও সৃজনক্রিয়ার নিয়ামক শক্তি।'[১] ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহর রাষ্ট্রভাষাবিষয়ক দম্ভোক্তিকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করে এতদঞ্চলের প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ঢাকাকেন্দ্রিক এই প্রতিবাদ খুব বলিষ্ঠ না হলেও এর মধ্য দিয়েই সূত্রপাত হয় মধ্যবিত্তের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এ-আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে। ভাষার প্রশ্নে এসময় পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেকে।

ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি-চিত্তে উপ্ত হয় অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ; কবিতা-সংগীত-নাটক হয়ে ওঠে তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বাহন। সাতচল্লিশের পর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতায় স্থায়ী হলেও, পূর্ববাংলার প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রাম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার রাজপথে যে রক্তাক্ত আন্দোলন, তা তিনি প্রত্যাশা করেছেন কলকাতার মাটিতেও। 'মাতৃভাষা' শীর্ষক এক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> একুশে ফেব্রুয়ারী !
>
> রক্ত ঝনঝন করে উঠল। হঠাৎ মনে হল প্রলাপ বকে যাচ্ছি এতক্ষণ। এসব কিছুই লেখার দরকার ছিল না। ওই তারিখটা আমার সব চিন্তার জবাব দিয়েছে।
>
> একুশে ফেব্রুয়ারী – পূর্ব বাংলা ! ঢাকা-বরিশাল-ফরিদপুর-রাজশাহী ! মাতৃভাষার সম্মান রাখবার জন্যে সর্বাত্মক হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল, ছাত্র-শোভাযাত্রা, লাঠি, গুলি, রক্তস্নান। কিন্তু কোনো শক্তিই তো বাঙালীর মাতৃভাষাকে কেড়ে নিতে পারল না। আমরা অহোরাত্রি রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করছি, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বই লিখছি, অথচ

[১] গিয়াস শামীম, *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

> রবীন্দ্রনাথের সম্মান তো ওরাই রাখল। বাঙালীর প্রয়োজনে একখানা বাংলা চিঠিও যাদের সরকার লিখতে পারে না – তাদের ডি-ল্যুক্স 'রবীন্দ্র-সদনে'র চাইতে পূর্ববাংলার অস্থায়ী ওই শহীদ স্তম্ভগুলো অনেক বেশি মূল্যবান।[১]

পূর্ববাংলার ভাষা-আন্দোলন অবলম্বনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প 'নতুন গান'। এখানে দেখা যায়, শহরে জোরালোভাবে পালিত হচ্ছে 'আম হরতাল'। একটি মানুষও বাজারে যাচ্ছে না, বন্ধ রয়েছে পানের দোকান পর্যন্ত। এমন দিনে গঞ্জে এসে বিপত্তিতে পড়ে গয়না নৌকার মাঝি রায়মশায়। ষাট বছর বয়সে লোকটি দেখেছে স্বদেশী আন্দোলন, অশ্বিনীকুমার হলে পুলিশের লাঠিচার্জ ও চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরের রক্তাক্ত দেহ, শুনেছে মুকুন্দরামের স্বদেশী গান। তবে রাজনীতি নিয়ে রায়মশায় কোনোকালে চিন্তিত নয়। সে 'সোজা মানুষ'; নদী, নৌকা এবং সোয়ারী নিয়ে তার ভাবনাজগত।

এ হরতাল রায়মশায়ের কাছে অভিনব মনে হয়। এতকাল শত ঝঞ্ঝার মধ্যেও মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সচল ছিল। অথচ আজ তারাই দোকান বন্ধ রেখেছে সর্বাগ্রে। কলেজের একটি শোভাযাত্রা থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে – 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করো/ বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ।'[২] ব্যবসায়ী কেদার ঘোষের মাধ্যমে রায়মশায় জানতে পারে, শহরে গোলাগুলির খবর। মুসলমানের ওপর পাকিস্তানি পুলিশের গুলিবর্ষণে সে আশ্চর্য হয়। এরা সন্ত্রাসী নয়, কলেজের ছাত্র কিংবা পথচারী। এদের আন্দোলন-সংগ্রামের ফলে অর্জিত হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্র। স্বদেশী আন্দোলনে সাড়া না দিলেও, তারা মাতৃভাষাকে ভালোবাসতে শিখেছে। অন্য নৌকার মাঝিরাও কেদার ঘোষের অনুরূপ সংবাদ দেয় – 'ঢাকায় হুলুস্থুলু কাণ্ড হচ্ছে। বিস্তর খুনোখুনি চলছে। এখানে মিছিল ভেঙে দিয়েছে – অনেক ধরপাকড় করেছে। কী যে হবে শেষতক্ – কেউ বলতে পারে না।'[৩]

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রায়মশায় অবিলম্বে গন্তব্যে পৌঁছতে চায়। ডঙ্কা বাজিয়ে সে যাত্রীদের সাহেবের হাটে আহবান করে। যাত্রীরা ইতঃপূর্বে খোশগল্পে মগ্ন থাকলেও, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিশ্চুপ থাকে। এরমধ্যে মিঞাবাড়ির ছোটো ছেলে আবু এবং তার বন্ধুরা গান শুরু করে :

> ও আমার বাংলা ভাষা গো –
> তুমিই আমার মনের আলো,

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সুনন্দর জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নতুন গান', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৯

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২২

তুমিই আমার প্রাণের আশা গো।[১]

এদের গানে রায়মশায় কণ্ঠ মেলায়। কুদ্ঘাটা নামক স্থানে দারোগা তার নৌকার গতিরোধ করে। বাংলা গান গাওয়ার অপরাধে সে মাঝিকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হয়। তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্ত ছাত্ররা দারোগার সঙ্গে বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং আট-দশ জন নিরীহ যাত্রী এদের সমর্থন করে। সমবেত যাত্রীর ক্রোধ ও ঘৃণায় দারোগা বিপন্নবোধ করে। পরবর্তী যাত্রায় আবু কিংবা রায়মশায় নয়, নৌকার সকল যাত্রী সমস্বরে গায় নতুন গান– 'এতগুলো মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে রায়মশায়ের গলাকে আর আলাদা করে খুঁজে পাওয়া গেল না।'[২]

এভাবে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বিস্তৃত হয়েছে নৌকার নিষ্ক্রিয় যাত্রীদের চেতনায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ গল্পে একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথার্থভাবে চিত্রায়ণ করেছেন। 'নতুন গান' কেবল ভাষা আন্দোলনের ছোটগাল্পিক শিল্পরূপ নয়, বাংলাদেশের প্রতি লেখকের অপরিসীম ভালোবাসার স্মারক।

অপরাজনীতি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে রাজনীতি ও দেশপ্রেম অভিন্ন। তিনি বিশ্বাস করেন 'রাজনীতি আছে, রাজনীতি থাকবে। কিন্তু সেই রাজনীতির কূটচক্র যদি স্বদেশকে হত্যা করে – সেই অপরাধকে ইতিহাস কোনো দিন মার্জনা করবে না।'[৩] 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধেও তাঁর একই মনোভাব প্রতিবিম্বিত হয়েছে – 'আমার যদি কোনো দল থাকে – সে আমার স্বদেশ; আমার যদি কোনো রাজনীতি থাকে সে আমার ভারতবর্ষ এবং মানবতা; আমার যদি কোনো বক্তব্য থাকে তা হলে এদের জন্যই নিবেদিত।'[৪] এ-কারণে দেশবিরোধী যে কোনো কার্যক্রমে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমকালীন রাজনৈতিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে সদা-সোচ্চার ছিলেন। এমনকি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়েও, তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি-নির্ধারকদের অদূরদর্শী কর্মসূচির নির্মোহ সমালোচনা করেছেন। তাঁর এ-শ্রেণির গল্পের মধ্যে 'নেতার জন্ম' এবং 'খুনী' অত্যন্ত তাৎপর্যবহ।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৬

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ক্ষত' *সুনন্দর জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *অগ্রন্থিত রচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে এবং তাদের বঞ্চিত করেই যে অসৎ রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্থান ঘটে, এ বিষয় প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে 'নেতার জন্ম' গল্পে। এ গল্পের কথক ডাক্তার বটব্যাল এম.ডি, এফ.আর.সি.এস। ছাত্রাবস্থায় তিনি যে মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন, সেই কলেজেরই একজন শিক্ষকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বিপিনচন্দ্র পালের[১]। চিকিৎসা বিদ্যার পাশাপাশি তিনি ছাত্রদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতেন। ভবিষ্যৎ ডাক্তারদের তিনি স্বপ্ন দেখাতেন এবং দীক্ষিত করতেন এই মন্ত্রে :

> মাই ইয়ং ফ্রেন্ডস – তোমাদের শিক্ষাকে তোমরা প্রোফেশন করে নিয়ো না, মেক্ ইট্ এ মিশন্। আমাদের এই দুর্ভাগা দেশকে যারা শুধু শুষতেই এসেছে তাদের ওপরেই কোটি কোটি মানুষের ভার ছেড়ে দিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ো না। তোমরা গ্রামে গ্রামে যাও – যে অস্ত্র আজ হাতে পেয়েছ তা নিয়ে লড়াই করো আধি-ব্যাধি-মৃত্যুর সঙ্গে। সেবকের ব্রত গ্রহণ করো। সার্ভ অ্যান্ড সেভ্ ইয়োর কান্ট্রি।[২]

তাঁর বক্তৃতা তরুণ ছাত্রদের ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করে। ডাক্তার বটব্যালও পাশ করে জনসেবার নিমিত্তে সরাসরি গ্রামে আসেন। দু-একজন শুভানুধ্যায়ী শহরে থাকবার পরামর্শ দিলেও তিনি গ্রাহ্য করেননি। গ্রামাঞ্চলে তখন হাতুড়ে ডাক্তার আর কবিরাজদের আধিপত্য। চিকিৎসার পরিবর্তে এরা রোগীর সংকট আরও জটিল করে তোলে। এমতাবস্থায় গ্রামে এসে বটব্যাল রোগীদের আন্তরিক সেবাদানের প্রয়াস পেলেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে তা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। সামান্য ইনজেকশনের জন্য তাঁকে ত্রিশ মাইল দূরে লোক পাঠাতে হয়। চিকিৎসার গুরুত্ব অনুধাবন করে কয়েকজন অবস্থাসম্পন্ন রোগী তাঁকে পরামর্শ-ফি প্রদান করে। চিকিৎসাক্ষেত্রে সাম্যবাদ তাঁদের পছন্দ নয়। গরিব চাষিদের মতো বিনামূল্যে সেবাগ্রহণ তারা অমর্যাদাকর মনে করে। অবস্থাসূত্রে ডাক্তার বটব্যালের কাছে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, 'কলকাতা শহরেই আট টাকা আর চৌষট্টি টাকার ব্যবধানটা সৃষ্টি হয়েছে ডাক্তারের প্রয়োজনের জন্যে নয়, রোগীর প্রেস্টিজের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে !'[৩]

---

[১] বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা। "১৯০৭ সনে তিনি *'বন্দে মাতরম্ বিদ্রোহ মামলা'*য় অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করতে অস্বীকার করায় ছয় মাস কারাভোগ করেন।... অদম্য উৎসাহী বিপিনচন্দ্র পাল বিশ্বাস ও বিবেকের প্রশ্নে রাজনীতির ক্ষেত্রে কখনই আপস করেননি। জীবনের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই তিনি হিন্দু সমাজের কুসংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। নারীশিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বসহ ভারতীয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অগ্রদূত এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকারের একজন প্রবক্তা। বিখ্যাত বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় শ্রোতাদের উজ্জীবিত করতে পারতেন।" [উদ্ধৃত : সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া* খণ্ড ৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১]

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নেতার জন্ম', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৪

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৫

এ গ্রামের একজন প্রভাবশালী ভূস্বামী রামদাস মুখুজ্যে। হাতির পিঠে চড়ে তিনি জমিদারি তদারকি করেন। রামদাসের সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য বটব্যালকে জমিদার-বাড়ি যেতে হয়। এজন্য সম্মানি হিসেবে তিনি ডাক্তারকে একশো টাকার নোট ধরিয়ে দেন এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আরও একশো টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। অল্পসময়ে এত টাকা পেয়ে ডাক্তার কলকাতার সঙ্গে গ্রামের পার্থক্য অনুধাবন করেন।

তিনদিন পর মুকুন্দপুরের এক দরিদ্র ব্যক্তি বটব্যালের শরণাপন্ন হয়। তাদের গ্রামে এক অনাথা নারী সন্তানসম্ভবা। ছয় মাস পূর্বে তার স্বামী মারা গেছে; এখন সে ঝিয়ের কাজ করে গ্রাসাচ্ছাদন করছে। যন্ত্রণায় মেয়েটির অস্থির অবস্থা। অন্ধকার রাতে দুর্গম পথ পেরিয়ে ডাক্তার রোগীর বাড়িতে উপস্থিত হন। প্রাথমিক পরীক্ষাশেষে ডাক্তার বুঝতে পারেন, প্রসূতির অবস্থা সংকটাপন্ন; সিজারিয়ান অপারেশন ছাড়া তার পক্ষে সন্তান জন্মদান অসম্ভব। কিন্তু পল্লিগ্রামে এর কোনোটিই তার পক্ষে সম্ভব নয়। মধ্যরাতে দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে একটি মরচে পড়া ফরসেপ সংগ্রহ করে ডাক্তার প্রসূতির চিকিৎসায় বৃত হলে জানা যায়, তাঁর সন্ধানে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে জমিদার রামদাসের বার্তাবাহক। জমিদার-পত্নীরও প্রসববেদনা উঠেছে, তাই ডাক্তারকে সে দ্রুত নিয়ে যেতে চায়। ডাক্তারকে সে তাগিদ দিয়ে বলে – 'ছোটোলোকের ব্যাপার বাবু, চটপট সেরে নিন। আমি বসছি।'[১]

দরিদ্র নারীর উদরের সন্তান অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান। শিশুটির মধ্যে ডাক্তার খুঁজে পান গ্রাম-আন্দোলনের বলিষ্ঠ নেতার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু অঙ্কুরেই এ 'বিষাক্ত সম্ভাবনা' বিনষ্ট করেন তিনি। একটু যত্নবান হলে নবজাতকটিকে তিনি বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু রামদাসের একশো টাকার লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেননি। শেষ রাতে তাঁর আন্তরিক চেষ্টায় রামদাস পুত্রসন্তান লাভ করেন। মাত্র পাঁচ পাউন্ড ওজনের রুগ্ন শিশুর জন্মের জন্য তাঁকে পরিশ্রম করতে হয়নি।

ডাক্তার বটব্যালের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সাঁইত্রিশ বছর পূর্বে জন্ম নেওয়া ছেলেটি এখন ভারতবর্ষের 'গ্রেট লীডার'। দরিদ্র বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তানের প্রাণের বিনিময়ে ডাক্তার তার কপালে এঁকে দিয়েছেন নেতৃত্বের রাজটিকা। এরূপ কাজে তিনি গর্ববোধ করেন, তাই গল্পের শুরুতে জানিয়েছেন –

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৮

রক্তপদ্মের আসনে নেতার অধিষ্ঠান হয় না। তার সাধনা সহস্র মানুষের শবশয্যায়, তার প্রতিষ্ঠা লক্ষ ছিন্নমুণ্ডের তান্ত্রিক আসনে। একালের নেতার জীবনে জীবন লাভ করে সমগ্র দেশ জেগে ওঠে না, সমস্ত দেশের জীবন তিলে তিলে হরণ করে অধিনায়কের জীবন দীর্ঘরচিত হয়।[১]

'নেতার জন্ম' গল্পে রাজনীতির অশুভ চক্রের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। মধ্যবিত্তের স্বার্থপর আচরণ ও বিসর্জিত নীতির সূত্রে নেতাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার গতি ত্বরান্বিত হয়। বটব্যালের মতো অবিবেচকদের সঙ্গী করে তারা এগিয়ে চলে বীরদর্পে।

খুনী'[২] গল্পে কতিপয় রাজনৈতিক নেতার উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ডের প্রতি ধিক্কার জানানো হয়েছে। এ গল্পে গভীর রাতে রেলগেট বন্ধ করে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে প্রতিহারী হাজারী সিং। রাত চারটায় এ পথে একটি মেল ট্রেন যাতায়াত করে। অকস্মাৎ মোটরের ক্রমাগত হর্নে তার ঘুম ভাঙে। রেলগটের বাইরে সে দেখতে পায় প্রভাবশালী নেতাদের একটি ল্যান্ডরোভার গাড়ি। এদের মধ্যে চ্যাটার্জি তাকে 'উল্লুক', 'রাস্কেল', 'ইডিয়ট' বলে তিরস্কার করেন এবং চাকরিনাশের হুমকি দেন – 'ভেবেছো ইংরেজের আমল আছে এখনো ? মনে রেখো, জমানা বদলে গেছে। এখন চাকরি রাখা নয় – দেশের সেবা করাই তোমাদের কাজ।'[৩] অন্যজন এরূপ অবহেলাকে দুর্নীতি বলে চিহ্নিত করেন। দেশসেবায় ব্যস্ত নেতারা তার এই বিচ্যুতিতে বেদনা বোধ করেন – 'কিচ্ছু হবে না দেশের। আমরা মিথ্যেই খেটে মরছি।'[৪]

লেভেল ক্রসিং থেকে ডাকবাংলোর দূরত্ব প্রায় পনেরো মাইল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে আত্মরক্ষার জন্য নেতারা গেটম্যানের ছোট্ট ঘরে অবশিষ্ট রাত কাটাতে চান। এটিকে তাঁরা ব্যাখ্যা করেন 'ম্যাস কন্টাক্ট' হিসেবে – 'ম্যাস কন্টাক্ট আমাদের কাজের একটা বড় অঙ্গ। আর এ-ও ম্যাসের একজন। না হয় একটু কন্টাক্ট এর সঙ্গে করা যাক।'[৫] এ প্রস্তাব শুনে হাজারী ভীতসন্ত্রস্ত হয়। কারণ তার কুঁড়েঘরে দড়ির খাটিয়া ছাড়া কিছু নেই। চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে চ্যাটার্জি বক্তৃতা আরম্ভ করেন :

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৩

[২] 'খুনী' *স্বাধীনতা* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'খুনী', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

[৪] প্রাগুক্ত

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

> সারা ভারতবর্ষই গরীবের দেশ, বুঝেছ হাজারী ?... সেই কোটি কোটি গরীবই হচ্ছে দেশের শক্তি, তার প্রাণ, তার আত্মা। সেই আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন করাই আমাদের কর্তব্য – আমাদের মিশন – অর্থাৎ ব্রত। চলো আজ আমরা তোমারই অতিথি।[১]

হাজারীর দীনদশা দেখে তিনি দিল্লিতে চিঠি পাঠাতে চান, আরেকজন বিষয়টিকে মনে করেন সরকারের 'সুইসাইডাল পলিসি'। মিস্টার মাইতি যুক্ত করেন আসামের রেলক্রসিং-এর প্রতিহারীকে বাঘে খাওয়ার গল্প। নেতারা খাটিয়ার ওপর বসলেও, হাজারী দাঁড়িয়ে থাকে। তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে চ্যাটার্জি বলেন :

> বসে পড়ো। নাউ উই আর ফ্রেন্ড্‌স্। এ যুগে সবাই সমান।... রেলওয়েতে মাইনে সত্যিই বড্ড কম দিচ্ছে। আমি ভাবছি এ নিয়ে মুভ করব। বিশেষ করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ওয়ার্কিং ক্লাসকে নেগলেক্ট করবার আর কোন মানেই হয় না।[২]

পরক্ষণে তিনি আবিষ্কার করেন গেটম্যানের সুখী জীবনের চিত্র। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে চালের মূল্য চড়া হলেও এরা পায় ক্ষেতের চাল, টাটকা শাকসবজি। হাজারীর দরিদ্র দশা পরিশেষে তার কাছে গুরুত্বই পায় না। তার তুলনায় বরং সরকারি আমলাদের জীবনে চ্যাটার্জি অপূর্ণতা লক্ষ করেন। মি. ঘোষকে তিনি বলেন :

> এই টাকাতে চালিয়েও দশ-পনেরো টাকা দেশে পাঠাতে পারছে – তার মানে, যা পায়, তাতে প্রয়োজন মিটিয়েও ওর বাড়তি থাকছে। তা থেকে বোঝা যায়, এর বেশি নীড্‌ ওর নেই। হোয়ারঅ্যাজ একটু উঁচুদরের গভর্ণমেন্ট সার্ভেন্টকে মাসের শেষের দিকে টানাটানিতে পড়তে হয় – গাড়ীর তেলে ঘাটতি পড়ে।[৩]

এরপর নেতারা মদ্যপানে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং এজন্যে তারা গেটম্যানকেও মদ্যপানে প্রলুব্ধ করেন। কিন্তু সাঁওতালি হাঁড়িয়া-পানে অভ্যস্ত হাজারী দামি স্কচের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারেনি। ফলে অল্পক্ষণে সে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। হঠাৎ বিকট শব্দে গেটম্যানের ঘোর কাটে। সে দেখতে পায় মেল-ট্রেন রেলগেট অতিক্রম করছে; এবং রেললাইনের পাশে পড়ে আছে দুর্ঘটনা-কবলিত একটি গরুর গাড়ি। আহত বলদ-দুটি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে এবং গাড়োয়ানের খণ্ডিত দেহ ছড়িয়ে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। এমতাবস্থায় 'চাকরি যাবেই' – এ ভাবনায় নয়, নিজেকে হত্যাকারী ভেবে হাজারী অস্থির হয়ে ওঠে। 'খুনী' গল্পে নিম্নশ্রেণির গেটম্যান অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হলেও, চ্যাটার্জির মতো বক্তৃতাসর্বস্ব, ভণ্ড ও খুনি নেতাদের মানবিকবোধে উদ্বোধনের কথা নেই। প্রকৃতপক্ষে এটিই প্রচলিত সমাজব্যবস্থার দুরতিক্রম্য নিয়তি।

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছোটগল্প। বীরেন্দ্র দত্ত এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন – "নারায়ণবাবুকে যখন জিজ্ঞেস করেছি, তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্প – কোন্‌টা লিখতে বেশী ভালোবাসেন ? তিনি জোর গলায় বলে ওঠেন 'নিশ্চয়ই ছোটগল্প। উপন্যাস তো দায়ে পড়ে লেখা। ছোটগল্প লিখে অনেক বেশি তৃপ্তি পাই'।"[১] তাঁর উচ্চতর-গবেষণার বিষয়ও ছোটগল্প; এবং এ নিয়ে তিনি নানা সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন। গল্পকে শিল্পসৌকর্যে মণ্ডিত করার জন্য তিনি বিচিত্রমাত্রিক টেকনিক অবলম্বন করেছেন। বর্ণনরীতির অভিনবত্ব, দৃষ্টিকোণ ব্যবহার, প্রসাধন ও পরিচর্যার বিন্যাসকলায় তিনি তাঁর গল্পগুলোতে নিয়ে এসেছেন ভিন্নমাত্রিক স্বাদ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গল্প সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হলেও কখনো কখনো তিনি ব্যবহার করেছেন কেন্দ্রীয় চরিত্রের দৃষ্টিকোণ কিংবা পার্শ্ব চরিত্রের দৃষ্টিকোণ। এক্ষেত্রে তাঁর নিরীক্ষা বিচিত্রধর্মী। যেমন, 'দ্বৈত' গল্পের ঘটনাংশ বিবৃত হয়েছে টেলিফোনের মাধ্যমে। দুই বন্ধু প্রশান্ত ও অবিনাশের কয়েকটি ফোনালাপে পরিবেশিত হয়েছে এ-গল্পের কাহিনি। লক্ষণীয় যে, পুরো গল্পে প্রশান্তের বক্তব্য নেই, তার কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছে অবিনাশের জবানিতে – 'হ্যালো কে, প্রশান্ত নাকি ?... ওঃ তোমারও ঘুম আসছিল না ? পড়ছিলে ? পড়া থাক, খানিকটা গল্প করা যাক।'[২] অতঃপর প্রশান্তকে সাবিত্রী নামের এক মেয়ের গল্প শোনাচ্ছে অবিনাশ; যে ছিল প্রশান্তের প্রাক্তন ছাত্রী। ভালোবাসার ছলে সাবিত্রীকে অধঃপতনের চূড়ান্ত স্তরে নামিয়ে এনেছে প্রশান্ত; এতোদিনকার এসব অজানা তথ্যই বেরিয়ে এসেছে গল্পের কাহিনিতে। দুই বন্ধুর কথোপকথনে প্রশান্ত নিশ্চুপ থাকলেও অবিনাশের সংলাপের মধ্য দিয়ে গল্পটি এগিয়ে গেছে চূড়ান্ত পর্যায়ে। নারায়ণের দক্ষ হাতে গল্পটি শেষপর্যন্ত হয়ে উঠেছে অনন্যস্বাদী।

'একটি চিঠি' এবং 'শুভক্ষণ' গল্পের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে পত্রের আঙ্গিকে। 'একটি চিঠি'র কাঠামো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মতো। এখানে পত্রলেখক একজন নারী, যিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মুখোশ উন্মোচন করেছেন। 'স্ত্রীর পত্রে'র মেজো বউয়ের সুরে তিনি প্রাক্তন প্রেমিককে পত্রমাধ্যমে লিখেছেন :

---

[১] বীরেন্দ্র দত্ত, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়', তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বর্মণ (সম্পাদিত), *কোরক* (প্রথম পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দ্বৈত', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

তোমাকে 'আপনি' বললুম, অথচ কিছু মনে করলে না তুমি।... আমাদের মফঃস্বল শহরের পথে ধুলোর ঝড় তুলে তোমার জীপ চলে গেল। মা চেয়ে রইলেন সেদিকে।[১]

'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু' গল্পও বর্ণিত হয়েছে পত্রের আঙ্গিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতায় শিক্ষকের উদ্দেশে পত্রটি লিখেছে স্বাধীনকুমার। পত্রসূত্রে সে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির অন্তঃসারশূন্যতা, ফাঁক ও ফাঁকি, দুর্নীতি প্রভৃতির স্বরূপ চিহ্নিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে পত্রাশ্রয়ে গল্পবুননের প্রচলন থাকলেও, বক্তৃতার আকারে গল্পরচনায় নারায়ণ সার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু' এ ধরনের শিল্পপ্রয়াস। গোপীবল্লভের শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানে জনৈক বক্তার স্মৃতিচারণই এ গল্পের প্লট।

'কালপুরুষ' গল্পটি মঞ্চনাটকের প্রক্রিয়ায় নির্মাণ করেছেন গল্পকার। মঞ্চনাটকের শুরুতে সূত্রধারের যে ভূমিকা থাকে, এ-নাটকে তা অনুসৃত হয়েছে। পুরো গল্পটি বিবৃত হয়েছে সূত্রধারের দৃষ্টিকোণ অবলম্বনে। 'সেই মৃত্যুটা' সংলাপনির্ভর গল্প; এ গল্পের দুটি চরিত্র : মোনা মিঞা এবং চিন্তাহরণ। অ্যাবসার্ড নাটকের ধরনে আসন্ন মৃত্যুচিন্তায় এদের কথোপকথন হয়েছে অসংলগ্ন ও উদ্ভট। 'কল্পপুরুষ' গল্পের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে যাত্রাপথে – 'ট্যাক্সি চলতে থাকুক। সেই ফাঁকে, ওরা বিয়েবাড়ি না পৌঁছানো পর্যন্ত, দিনকয়েক পেছনে ফেরা যাক। শোনা যাক একটা পুরনো গল্প।'[২] এছাড়া রেলপথ (দক্ষিণান্ত), নৌপথ (কালাবদর, তীর্থযাত্রা, কালো জল) এবং আকাশযানের (মাধ্যাকার্ষণ) পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশিত হয়েছে নারায়ণের কয়েকটি গল্প ।

'ইতিহাস' গল্পে দুই ভিন্ন কাহিনি স্রোত মিলিত হয়েছে একটি মোহনায়। এ গল্পের একাংশ অমরেশের ইতিহাস-রচনাকেন্দ্রিক, যা সপ্তম শতাব্দীর শশাঙ্ক নরেন্দ্রাদিত্যের শাসনামল থেকে পাল রাজত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত; অন্যটির প্রেক্ষাপট ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন। লেখক বাংলার গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সমকালীন ঘটনাবলির অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন। সমালোচক রথীন্দ্রনাথ রায়ের মন্তব্য এতৎপ্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য – 'অতীতকে বর্তমানের মতো প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত করে তুলতে হলে যে দুর্লভ সৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তার অভাব নেই। প্রমথনাথ বিশী ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও এই শ্রেণীর গল্পরচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।'[৩] 'বাইশে শ্রাবণে'ও দুটি পৃথক গল্পস্রোত একক ধারায় যুক্ত হয়েছে। দেশভাগের ফলে

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'একটি চিঠি', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কল্পপুরুষ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৮

[৩] রথীন্দ্রনাথ রায়, *ছোটগল্পের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

শকুন্তলার পারিবারিক বিপর্যয় এবং তাদের কলেজে বাইশে শ্রাবণ উদ্‌যাপনের পটভূমি অভিন্নরূপে প্রদর্শিত হয়েছে।

'চারতলা' গল্পে নিরঞ্জনের চারতলা অফিসের মতো তার জীবনের চারটি অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের মেসে জীবনের প্রথম পর্ব, 'অগ্নিহোত্রী' পত্রিকার পুনর্জাগরণের মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্ব, জনৈক ধনাঢ্যের সঙ্গে আপসকামিতায় তৃতীয় পর্ব এবং তাঁকে বিপদে ফেলে শেষ পর্যায়ে নিরঞ্জন কীভাবে তার ব্যক্তি-অবস্থান সুদৃঢ় করেছে তা-ই শিল্পরূপ পেয়েছে এ গল্পের চতুর্থ পর্বে। 'সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে' গল্পে লেখক অভিনব পন্থায় চরিত্রগুলোর সামাজিক মর্যাদা সুনির্দিষ্ট করেছেন। এখানে অংশুমান রায় এবং হিমানী নিয়োগী পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ে করে। পরিবার-বিচ্ছিন্ন এ বিবাহ-আয়োজন অনুষ্ঠিত হয় ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে। এদিন অংশুমান নিঃসংকোচে নিবন্ধন ফর্মে দস্তখত করলেও হিমানী মানসিক দ্বিধাগ্রস্ততায় আক্রান্ত হয়। সাক্ষী হিসেবে স্যুট-টাই পরিহিত নিশীথ স্বাক্ষর করে ইংরেজিতে, সুধাকান্ত নামের পাশে জুড়ে দেয় এম.কম. এবং বাংলার ছাত্র সুমন্ত মুখোপাধ্যায় তার নামের 'য়' বর্ণকে বাঁকিয়ে বিশেষ ব্যক্তিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করে। স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াগত এ-তারতম্যের কারণ গল্পে উল্লেখ রয়েছে। নিশীথ উদীয়মান ব্যবসায়ী, কিছুক্ষণ পর এক পার্টি তাকে 'ইনসিয়োর' করবে বিশ হাজার টাকা; সুধাকান্ত যাবে নৈশ-কলেজে কমার্স পড়াতে; কেবল সুমন্তের ব্যস্ততা নেই, সে কবিতা লেখে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক গল্প উত্তম-পুরুষের জবানিতে বিধৃত হয়েছে; এক্ষেত্রে কয়েকটি গল্পের কথক-চরিত্র রঞ্জন। স্মরণীয় যে, এ নামেই নারায়ণকে সম্বোধন করতেন প্রথম স্ত্রী রেণু দেবী। তাঁর 'প্রদীপ ও প্রজাপতি', 'বনতুলসী', 'বন-বিড়াল', 'পাইপ', 'কবর', 'লুচির উপাখ্যান' এবং 'ডিনার' গল্পের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে রঞ্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে। অন্যদিকে 'কনে-দেখা আলো', 'কলঙ্ক', 'একটি কৌতুকনাট্য', 'দাম', 'সুখ' ও 'যাচাই' গল্পের কথক হচ্ছে সুকুমার।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে চরিত্রগুলোর নামকরণে বিশেষ ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয়। 'মাধ্যাকর্ষণ' গল্পে প্রেমিকাকে হারিয়ে এক নিরানন্দ-যুবকের নাম হয়েছে আনন্দ। আমৃত্যু অন্যের অনুগ্রহে যে জীবন কাটিয়েছে, তার নাম স্বাধীনকুমার (মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু)। মানুষ ঠকানো যার পেশা, সেই 'নামজাদা জুয়োচোরে'র নাম মানব চক্রবর্তী (সঞ্চার)। একইভাবে এক কুখ্যাত এসিড-সন্ত্রাসী, যার দাপটে মেয়েরা তটস্থ থাকে – সে হচ্ছে নিরাপদ কাঞ্জিলাল (উদ্বোধন)। এছাড়া নারায়ণের গল্পে এক নারী পাচারকারী নরাধমের নাম

নরোত্তম ঠাকুর (তীর্থযাত্রা) এবং গৃহলক্ষ্মীদের পরিধেয় বস্ত্র অবৈধ উপায়ে যে মজুত করেছে, তার নাম দেবীদাস (দুঃশাসন)।

প্রকৃতিচেতনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে বারবার অঙ্কিত হয়েছে প্রকৃতি ও নিসর্গের চিত্র। লেখকের শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনকাল অতিবাহিত হয়েছে বাংলাদেশের দিনাজপুর এবং বরিশাল অঞ্চলে। এ সূত্রে বাংলার নদনদী, অরণ্য এবং পার্বত্য ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। *উপনিবেশ* উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

> আমার মন দিয়ে প্রকৃতিকে আমি দেখিনি, প্রকৃতিই আমার মননকে গড়ে তুলেছে। কিন্তু জীবনের কাছ থেকে একেবারে সরে গিয়ে বিশুদ্ধ নিসর্গরসে তন্ময় হয়ে থাকা যাবে – এমন সুযোগ এ যুগে কে পায় ? আমিও পাইনি। অহিংসার রাজনীতি থেকে বিপ্লববাদের পথেও পদক্ষেপ করতে হল একদিন। আমার প্রকৃতির মধ্যে মানুষ এসে দাঁড়াল। আকাশ, জল, মাটি পেল একটা নতুন তাৎপর্য।[১]

কেবল উপন্যাস নয়, প্রকৃতি ও নিসর্গের মনোহারী বর্ণনায় নারায়ণের গল্প ভিন্নস্বাদী। বাংলার মাঠভরা সোনালি ফসল, পথে-ঘাটে বুনো ফুল-ফল তাঁর গল্পে সঞ্চারিত করেছে অসাধারণ ব্যঞ্জনা :

> পথের দুপাশে সোনার ধান আর আখের ক্ষেতে অনাবিল শরৎ। একদিকে রেললাইনের বাঁধ, তার তলায় ছোট ছোট ডোবাতে কলমী ফুল, সাদা আর রাঙা শালুকের মেলা বসেছে। কাশ দুলছে এখানে ওখানে, উড়ন্ত নীলকণ্ঠ পাখীর পাখার সঙ্গে আকাশের নীল রঙ যেন একছন্দে মিলে গেছে। ফুলগাছগুলোর মাথায় স্বর্ণলতার জল ছড়ানো, যেন সোনার ওড়না জড়িয়েছে তারা।[২]

নারায়ণের গল্পে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে মানব-মনস্তত্ত্বের উদ্বোধক। তাঁর কয়েকটি গল্পের নামও প্রকৃতির উপাদানে কল্পিত – ‘বনতুলসী’, ‘বন-জ্যোৎস্না’, ‘বন-বিড়াল’, ‘ঘাসবন’, ‘গাছের সারি’, ‘তৃণ’, ‘তিতির’ প্রভৃতি। তাঁর গল্পের প্রকৃতি মনোহারী, চিত্তাকর্ষক। ‘মাধ্যাকর্ষণ’ গল্পে প্লেনের ওপর থেকে লেখক প্রকৃতিকে দেখবার প্রয়াস করেছেন। এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিটের এ আকাশভ্রমণ হয়েছে পূর্ববাংলার ওপর দিয়ে – ‘ততক্ষণে প্লেন পাহাড় পেরিয়ে ধানক্ষেতের ছককাটা বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ছুটছে। নীচে একটা নদীর সরীসৃপ রেখা – খুব সম্ভব

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *উপনিবেশ*, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘নীলা’, *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

মেঘনা।'[1] এ গল্পে রয়েছে পদ্মাবক্ষে স্টিমার চলার দৃশ্য, গারো পাহাড় এবং নিবিড় সবুজবনের সমারোহ। অরণ্যের ছায়া-শীতল পরিবেশে নারায়ণ যে শান্তির বারতা প্রত্যক্ষ করেন, তা সন্নিবেশিত হয়েছে 'বন-জ্যোৎস্না' গল্পে :

> ডালে ডালে পাখি। চেনা-অচেনা, নানা জাতের, নানা রঙের। ময়ূর আর বন-মুরগীর ছুটোছুটি। চকিতের জন্যে দেখা দিয়েই বিদ্যুতের মতো মিলিয়ে যায় হরিণের পাল। এখান ওখান দিয়ে ঝোরার জল। দুপাশে সবুজ ঘন-বিন্যস্ত ঝোপ, বড় বড় ঘাস, অসংখ্য বুনো ফুল। পায়ে পায়ে ভুঁইচাঁপার নীল-বেগুনী মঞ্জরী।
>
> কাঠ আর শুকনো পাতা কুড়িয়ে চলেছে দুজনে। বেশ লাগছে মহীতোষের। জীবনের রূপটা যে এত বিচিত্র, এমন মনোরম, এ কথা কি কখনো কল্পনা করতে পারতো মহীতোষ ?[2]

ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে গল্পে রূপময় করে তুলেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রত্যেকটি ঋতুর সৌন্দর্যই মনকাড়া; রূপৈশ্বর্যে অসাধারণ :

> **গ্রীষ্ম :** হালকা একটুকরো মেঘে নদীর একদিকটায় ছায়া পড়েছে, বাঁকের ওপারে খররৌদ্রে ঝলমল করছে জল, খালের মুখে কচুরিপানার সবুজ ছোপ – নদীটা যেন বহুরূপী। পলি মাটির জমিতে বৈশাখী মেঘের রঙধরা পরিপুষ্ট ধানের ক্ষেতে জোয়ারের জল খেলা করে বেড়াচ্ছে।[3]
>
> **বর্ষা :** সারাটা দিনই অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। মেঘে অন্ধকার আকাশ। সন্ধ্যাটা বৃষ্টি আর এলোমেলো হাওয়ায় আরও বিষণ্ন হয়ে উঠেছিল, রসা রোডের এই ফাঁকা অঞ্চলটা আরও বেশি নির্জন হয়ে গিয়েছিল।... এমনি বর্ষার দিনেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গোপন কথাটি বলতে চেয়েছিলেন।[4]
>
> **শরৎ :** ভাদ্রের ভরা গাঙ। আকাশে শরতের নীলাঞ্চল মায়া ছড়িয়েছে। দূরে আধডুবো চরের উপরে চিক্‌চিক্ করছে সোনা-মাখানো বালি, স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠেছে কাশের ফুল। পাড়ের কাছে গাংশালিকের ঝাঁক উড়ছে। আশ্বিন আসন্ন।[5]
>
> **হেমন্ত :** হেমন্তের শিশিরস্নাত আকাশ থেকে বেশ শীতের আমেজ নেমেছে। তা ছাড়া ওপারেই দিগন্ত প্রসারিত শূন্য মাঠ – সেখান থেকে হু হু বাতাস আসছিল।[6]

---

[1] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মাধ্যাকর্ষণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

[2] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বন-জ্যোৎস্না', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮-৬১৯

[3] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালো জল', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৭

[4] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কলঙ্ক', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৬-১০৪৭

[5] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তীর্থযাত্রা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৩

[6] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বন-বিড়াল', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২৭

শীত : শীতের মাঝামাঝি। মাঠের যে অংশটুকুতে ফসল ধরে তা রবিশস্যে আকীর্ণ হয়ে গেছে – সোনালি উজ্জ্বল পুষ্পস্তবকে আলো করে দিয়েছে চারদিক – শীতের রোদের মতোই তার রঙ।... এই ঢেউ খেলানো জমি, এই অবিচ্ছিন্ন নির্জনতা আর ঠাণ্ডা বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ – এর সঙ্গে কোথায় যেন ইউরোপের সমুদ্রের একটা সংযোগ রয়েছে।[১]

বসন্ত : বিকেলের সোনাঝুরি রোদে ঝিকমিক ঝিলমিল করছিল চারদিক। হাওয়াটা এখনও সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়নি – নিভে আসা হাপরের বাতাসের মতো গরম। ওপারে সারবাঁধা কয়েকটা পলাশ গাছ – কালো কালো কুঁড়ি ধরেছে তাতে, দিন কয়েক বাদেই ফুলের আগুন জ্বলবে। একটা পাপিয়া ডাকছে কোথাও। বসন্ত আসছে।[২]

নারায়ণী গল্পে মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সঙ্গী হয়েছে প্রকৃতি। 'শুভক্ষণ' গল্পে নিশীথ পারিবারিক সম্মতিতে প্রেমিকাকে বিয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এদিন সে দেখতে পায় প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপ :

যেদিন তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে নৌকোয় উঠলুম – সেদিন আকাশ আলো করে দ্বাদশীর চাঁদ। খাল বেয়ে নৌকো চলেছে, দু পাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চাঁদও এগিয়ে চলেছে সঙ্গে। জলটা কখনো দুধের মতো ধবধব করছে, কখনো বা হিজলপাতার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নার আলোটা চিংড়ি-ধরা জালের মতো জলের উপর দোল খাচ্ছে।[৩]

বরযাত্রার রাতে মাঝিরা ভুলক্রমে উল্টোপথে নৌকা চালায়। ফলে নির্ধারিত সময়ে কনেগৃহে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। লগ্নভ্রষ্টের আশঙ্কায় মেয়েপক্ষ অস্থির হয়ে ওঠে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর তারা এক বেকার ছেলেকে বিয়ের পিঁড়িতে বসায়। পরদিন নিশীথ যখন ভগ্নহৃদয়ে গ্রামে ফেরে, তখন প্রকৃতিও বিরূপতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে :

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম আজ আর চাঁদ নেই – খানিকটা মেঘ উঠে এসে তাকে আড়াল করে রেখেছে। খালের জল কালির মতো কালো। দু'ধারের বেতবনে বাতসের শব্দ কর্কশ হাসির মতো শোনা যাচ্ছে।[৪]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কেবল প্রকৃতির নন্দিত রূপই অঙ্কন করেননি, কখনো কখনো এর ভয়াল অনুষঙ্গও চিত্রিত করেছেন। বিশেষত দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের বর্ণনানুষঙ্গে তিনি প্রকৃতির রুক্ষ ও অমার্জিত রূপই ব্যবহার করেছেন। দুটি দৃষ্টান্ত :

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'একটি শত্রুর কাহিনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উত্তম পুরুষ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শুভক্ষণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

ক) সামনে বিলের কালো জল। আকাশ-ভরা তারায় সে জল ঝলমল করছে। অন্ধকারে উড়ছে ঘরে ফেরা গাংশালিক। একটু দূরেই বানের জলে একটি মরা ঘোড়া ভেসে এসেছে, দুগর্ন্ধে বাতাস বিষাক্ত। সেটাকে নিয়ে কুকুরের কোলাহল।[১]

খ) শুক্লা চতুর্দশীর রাত। আশ্বিনের জ্যোৎস্নাশুভ্র আকাশ, কোথাও থেকে রাশি রাশি কালো মেঘ এসে সে শুভ্রতাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সন্ধ্যায় নদীর যে জল গলানো রূপোর মতো ঝলমল করছিল, তার রঙ এখন কালো আর পিঙ্গলে মিশে যেন হিংস্রতার রূপ নিয়েছে। আর একবার খানিকটা কারণ গলাধঃকরণ করে তর্করত্ন ভয়ার্ত বিহ্বল চোখে তাকালেন। ওপারের বনজঙ্গলগুলো রাশি রাশি বিচ্ছিন্ন আর আকারহীন বিভীষিকার মতো জেগে রয়েছে।[২]

প্রতীকী-পরিচর্যা

প্রতীকী ও সাংকেতিক আবহ নির্মাণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দক্ষতা অতুলনীয়। তাঁর ‘গাছের সারি’, ‘রাণীর গল্প’, ‘প্রদীপ ও প্রজাপতি’, ‘ইদু মিঞার মোরগ’ – প্রতীকধর্মী গল্প। এছাড়া ‘বনতুলসী রূপকধর্মী গল্প। এখানে প্রকৃতি ও নারী পরস্পর পরস্পরের রূপক।’[৩] প্রতীকী বর্ণনাংশে নারায়ণের দৃষ্টি ছিল চারপাশের সহজ-সরল উপকরণের দিকে। ‘সাহিত্যে ছোটগল্প’ গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ে বলেছেন :

> গল্প-লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের প্রতীক নির্বাচন করে নেবেন। শিল্প-রচনায় সরলতা ও ব্যঞ্জনামুখ্যতার এই যুগে পূর্বসংস্কারাশ্রয়ী (con-ventional) বা কষ্টকল্পিত কোনো প্রতীক আর প্রশংসার্হ নয়। এযুগে স্বল্পশক্তিমান লেখকই বিশেষ ধরনের চমকপ্রদ ও পরম্পরাগত প্রতীককে গ্রহণ করে। তারাই প্রেমের গল্প লিখতে গিয়ে চাঁদের আলো, পাখির গান, টিউলিপ-কার্নেশান ফুলের পরিবেশ আর অপূর্ব রূপবতী নায়িকা ছাড়া ভাবতে পারে না।...
>
> অথচ গুণীর হাতে ভাঙা টালিতেও ‘জলতরঙ্গে’র ঝংকার বাজে; কারাগারের দেওয়ালে পোড়া কাঠকয়লা দিয়েই মাস্টারপিস্ ছবির জন্ম হয়; গ্রাম পোড়াবার দরকার হয় না – একটা রুমাল ফেলে দিয়েই শিল্পী তাঁর কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করেন। সিদ্ধ রূপকারের ছোঁয়ায় যে-কোনো বিষয়বস্তুই ভাবে আর ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে।[৪]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রকৃতি ব্যবহৃত হয়েছে প্রতীকী অনুষঙ্গে। ‘গাছের সারি’ গল্পে শহুরে পরিবেশে অযত্নে বেড়ে-ওঠা বৃক্ষের শ্রীহীনতার মাধ্যমে তিনি উদ্বাস্তুদের উন্মূলিত ও অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা প্রতীকায়িত করেছেন এভাবে :

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘তৃণ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘পুষ্করা’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৬

[৩] উদ্ধৃত : (ভূমিকা : জগদীশ ভট্টাচার্য), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প* – দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৭

> এই গাছপালাগুলো আমাকে বিষণ্ন করছিল। এই গঙ্গা – এই হাওয়ার সঙ্গে ওদের মিল ছিল না। ওদের যেন কোথাও কোনো শেকড় নেই, কোনো এক দূরের সুন্দরবন থেকে, কোনো এক অরণ্য থেকে, কোনো এক গ্রামের রাঙা ধুলোর পথের পাশে যেখানে ওরা নিজেদের ছায়া নিয়ে খেলা করত – সেখান থেকে, কেউ ওদের এখানে উপড়ে এনেছে।[১]

'প্রপাত' গল্পে কনে দেখার আসরে বন্দনা তার ছোটো বোনের ভূমিকায় অভিনয় করে। প্রাথমিকভাবে বিষয়টি পাত্রপক্ষের বোঝার কথা নয়। তারপরও এক বেনামী ভাবনায় আচ্ছন্ন হয় চিন্ময়ের চেতনালোক। তার মনোজাগতিক এ-ভাবনা ইউক্যালিপটাস গাছের প্রতীকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এ বর্ণনাংশে – 'ওই গাছটার কী যেন একটা মানে আছে। কিছু বোঝা যাচ্ছে, কিছুটা বোঝা যাচ্ছে না।'[২]

ভাগ্যবিড়ম্বিত বেকার যুবকের নিয়তি প্রতীকী তাৎপর্যে উপস্থাপিত হয়েছে 'কেয়া' গল্পে। দেশভাগের পর জয়ন্ত কাকার সংসারে অবস্থান করে চাকরির চেষ্টা করে। এ-বাড়ির একমাত্র মেয়ে কেয়াকে সে ভালোবাসে। কেয়াকে সে সুন্দর আগামীর স্বপ্ন দেখায়। অথচ তার জীবনও ধোঁয়াশাময়; অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আবৃত :

> জয়ন্ত চেয়ে রইল বাইরের দিকে। দুর্গন্ধ ঘোলাজলের স্রোত বয়ে চলেছে। কোন একটা জীবনের সঙ্কেত। খাটালের আলো-অন্ধকারে মোষগুলোকে দেখাচ্ছে কয়েকটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত। আর-একটা দুর্বোধ্য প্রতীক। কোন অর্থ কোথাও আছে, অথচ স্পষ্ট করে ধরা যায় না।[৩]

'প্রদীপ ও প্রজাপতি' গল্পে টুনু পূর্ববাংলার সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্রবধূ। তার স্বামী বঙ্কু কলকাতায় ছোটোখাটো চাকরি করেন। গ্রামে ঘরবাড়ি, জমিজমা থাকলেও টুনু শহরকেন্দ্রিক রঙিন-স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়। নগরজীবনের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে সে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে। কিন্তু এ দম্পতির সংসার সুখের হয়নি। গ্রামের উন্মুক্ত পরিবেশ নয়, শহরের নোংরা বস্তি হয়ে ওঠে তাদের আবাসস্থল। রক্ত আমাশয়ে মৃত্যুবরণ করে তাদের একমাত্র সন্তান, প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে চাকরি হারান বঙ্কু। গল্পশেষে টুনুর করুণ পরিণতি চিত্রিত হয়েছে প্রদীপ ও প্রজাপতির রূপকল্পে :

> কলমে কালি ফুরিয়ে এসেছে। চোখ তুলে তাকাতেই দেখলাম, জ্বলতে জ্বলতে মোমবাতিটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে, আর ক্যান্ড্‌ল-স্ট্যান্ডের নিচের প্লেটখানার ওপর পড়ে আছে সেই প্রজাপতিটা, – মৃত্যুর স্পর্শে তার প্রসারিত ডানা দুটি নিশ্চল।[৪]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গাছের সারি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্রপাত', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কেয়া', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্রদীপ ও প্রজাপতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

অন্যদিকে প্রদীপ এবং পতঙ্গের প্রতীকে প্রদর্শিত হয়েছে সুনন্দা নদী-তীরবর্তী যুবশ্রেণির অবক্ষয়চিত্র। বারাঙ্গনা মালতীকে কেন্দ্র করে তাদের অতি-উচ্ছ্বাস নায়েব শ্রীধর মিত্তিরের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এভাবে – 'প্রদীপের চারপাশে যেন পুড়ে মরবার জন্যেই উড়ে বেড়াচ্ছে পতঙ্গের দল।'[১] 'বীতংস' গল্পে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রাণোচ্ছল জীবনপ্রবাহ কৃষ্ণচূড়ার প্রতীকে আভাসিত হয়েছে। সুন্দরলালের চক্রান্তে সাঁওতালরা বনভূমি ছেড়ে সমতলে যেতে বাধ্য হয়। এদের অবস্থা হয়ে উঠেছে কৃষ্ণচূড়া গাছ থেকে ঝরে পড়া পাপড়ির মতো। গল্পের শেষাংশ লক্ষণীয় –

> সাঁওতাল পরগণার বিমুক্ত প্রকৃতিকে পরিপ্লাবিত ক'রে দিয়েছে বসন্তের অকৃপণ আনন্দধারা। সকালের হাওয়া লেগে পাহাড়ী পথের ওপর কৃষ্ণচূড়ার একরাশ রাঙা পাপড়ি ঝুর ঝুর ক'রে ঝরে পড়ল।[২]

'মধুবন্তী' গল্পে প্রকটিত হয়েছে চিত্ত দত্তের শিয়ালস্বভাব। প্রেমিকা জয়ার কাছ থেকে চিত্ত বিয়ের জন্য কিছুটা সময় চেয়ে নেয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির পর সে এ-প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়। অন্যদিকে জয়া তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে অক্ষরে-অক্ষরে। দেশভাগের পর জয়ার পরিবার আশ্রয় নেয় কলকাতার তালডাঙা কলোনিতে। একদিন চিত্তের সঙ্গে দেখা হলে মেয়েটি স্বামীজ্ঞানে তাকে প্রণাম করে। কিন্তু জয়াদের আর্থিক দুরবস্থার চিত্র দেখে চিত্ত দ্রুত স্থানত্যাগ করে। এসময় শিয়ালরূপী চিত্তের পাশ দিয়ে চলে যায় আরেকটি শিয়াল :

> সামনে দিয়ে একটা <u>শেয়াল</u> চলে গেল পথ পেরিয়ে – একবার তাকিয়ে গেল আমাদের দিকে। দুটো চোখ একজোড়া সবুজ প্রদীপের মতো দপদপ করে উঠল। আমি অস্বস্তি বোধ করলুম।[৩]

মধ্যবিত্তের পলায়নপর মনোবৃত্তি প্রতীকায়িত হয়েছে 'ভাঙা চশমা' গল্পে। মফস্বলের এক স্কুলশিক্ষক সৌভাগ্যক্রমে সাব-ডেপুটি গ্রেডের কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। গ্রামাঞ্চলে ত্রাণ-কার্যক্রম পরিচালনা করাই তার কাজ। লক্ষণীয় যে, শিক্ষকতার পরিবর্তে ক্ষমতার চর্চা তিনি দারুণ উপভোগ করেন। কাজের অবসরে ত্রাণ-কর্মকর্তার আলাপ হয় গ্রামের মাইনর-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে। স্ত্রীর গয়না বিক্রয়ের অর্থে তিনি স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুর্ভিক্ষে তাঁর অধিকাংশ ছাত্রের মৃত্যু হয়, অন্যেরা শহরমুখী হয়। ছাত্র হারানোর শোকে হেডমাস্টার উন্মাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ ত্যাগী শিক্ষকের পাশে ত্রাণ-কর্মকর্তা বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেননি। তাঁর বিদায়কালে 'হেড্‌মাস্টারের মন্ত্র উচ্চারণের মতো টানা কণ্ঠস্বর দূরে অস্পষ্ট হয়ে এল আর নদীর ওপারে কাশবনের মধ্যে

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভাঙা বন্দর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩১

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বীতংস', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০-২৯১

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মধুবন্তী' প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

তারস্বরে চিৎকার করে উঠল শেয়াল।'[১] এ শিয়ালের ডাক যেন আত্মকেন্দ্রিক রিলিফ অফিসারের আত্মার প্রতিধ্বনি।

'খড়ুগ' গল্পে শিয়ালের প্রতীকে গ্রাম্যমোড়ল লুট করেছে অসহায় নারী ভোমরার সম্ভ্রম। গাড়োয়ান-পত্নী ভোমরার প্রতি হরিলাল তালুকদারের লালসা দীর্ঘদিনের। স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে ভোমরার সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়াতে চায়; কিন্তু দুশ্চরিত্র মোড়লকে ভোমরা প্রশ্রয় দেয় না। একদিন স্বামী খেতু পণ্য সরবরাহের জন্য রোহনপুর গেলে, হরিলাল জোরপূর্বক ভোমরাকে নিয়ে তার আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করে। দূর-পথে অবস্থান করেও স্ত্রীর দুরবস্থা খেতু তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করে এভাবে :

> কেমন একটা অশুভ আশঙ্কায় মনটা ভারী হয়ে উঠল খেতুর। পথের পাশে আলোর ওপর সাদা ধবধবে একটা নরকপাল; দৃষ্টিহীন চোখের কালো গহ্বরের ভেতর দিয়ে ওর দিকে যেন প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে। কোনো গোরস্থান থেকে শেয়াল টেনে এনেছে নিশ্চয়ই।[২]

নারায়ণের গল্পে যারা জীবনযুদ্ধে পরাজিত, তাদের অনেকের মানসিক অবস্থা কুকুরের প্রতীকে রূপান্বিত হয়েছে। 'সেই পাখীটা'য় সুনন্দার জীবদ্দশায় সঞ্জীব দ্বিতীয় বিবাহ করে। এ তথ্য অবগত হয়ে নববধূ আত্মহত্যা করে, সুনন্দাও স্বামীকে ত্যাগ করে। এদিকে চাকরিচ্যুত-সঞ্জীব শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। চার বছর পর সঞ্জীব ক্ষমা প্রার্থনা করলেও সুনন্দা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। প্রাক্তন স্ত্রীর কাছে অপমানিত সঞ্জীবের পরিস্থিতি দাঁড়ায় এরকম :

> বাইরের কুকুরটা একটা তারস্বর আর্তনাদ তুলে ছুটে পালাচ্ছে মনে হল, খুব সম্ভব বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে কেউ এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিয়েছে তাকে। অনেক দূর পর্যন্ত একটা করুণ কান্নার রেশ এগিয়ে চলেছে – এইবারে কোথাও গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।[৩]

'দিনান্ত' গল্পে গোকুল মল্লিক বৃদ্ধবয়সে আরেকটি বিয়ে করে। নব-পরিণীতা স্ত্রী সংসারে এসেই আগ্রাসী-মূর্তি ধারণ করে। এদিকে পণ-প্রদানের ভয়ে গোকুল তার মেয়ে অমিতাকে বিয়ে দিতে চায় না, যদিও সারা গ্রামে অমিতার রূপ-গুণের সুখ্যাতি ছিল। পিতার কুকীর্তি এবং বিমাতার নিত্য-নির্যাতনে মেয়েটি অবশেষে আত্মহত্যার প্রয়াস পায়। মুমূর্ষু কন্যার পাশে পাষণ্ড পিতার যে অবয়ব গল্পকার কল্পনা করেছেন তা এরকম :

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভাঙা চশমা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৯

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'খড়ুগ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৫

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সেই পাখীটা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫

> বারান্দার নীচে, উঠোনে বসে ছিল আর একজন। বসে ছিল নিজের ভেতরে মাথা মুখ গুঁজে কুণ্ডলি-পাকানো একটা কুকুরের মতো। ওপরের সারি সারি লণ্ঠনের আলো হিংস্রভাবে তার ছাঁটা ছাঁটা চুলগুলোর ডগায় ডগায় জ্বলছিল – যেন একটা জানোয়ারের গায়ের রোঁয়ার মতোই দেখাচ্ছিল সেগুলোকে।[১]

'মমি' গল্পে জমিদার রত্নেশ্বরের পরাজিত সত্তার প্রতীক হয়েছে কুকুর। তার উগ্র সামন্ততান্ত্রিক কর্মধারা যখন পুত্র মণীন্দ্রের প্রগতিশীল কর্মসূচির কাছে স্তব্ধ হয়ে পড়ে, তখন – 'বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে একটানা, দেউড়িতে একটা নেড়ী কুকুর চিৎকার করছে নিতান্ত অকারণে – হয়তো বাদুরের ছায়া দেখেছে।'[২]

'ধানশ্রী' গল্পে নদী-সংলগ্ন মানুষের জীবনসংগ্রামকে লেখক প্রতীকায়িত করেছেন খরশুলা মাছের সঙ্গে। এ গল্পে দেখা যায়, সারাদিন নৌ-পারাপারের পর মকবুল যে-অর্থ আয় করতে সক্ষম হয় তার প্রায় পুরোটাই চলে যায় নৌকার মালিক ইদ্‌রিশ মিঞার তহবিলে। ঘোর সংকটে পড়েও মকবুল মুনিবের সহযোগিতা লাভে ব্যর্থ হয়। একটানা পরাজয়ের পরও মকবুল জীবনযুদ্ধে ইস্তফা দেয় না। যেমন করেই হোক সে বাঁচতে চায়। তার মতো পরাজিত মানুষদের বেঁচে থাকবার কৌশল নারায়ণ নিম্নোক্ত বর্ণনাংশের মাধ্যমে প্রতীকায়িত করেছেন :

> কতকগুলো কুমীরের ছানার মতো একঝাঁক খরশুলা মাছের পোনা জলের ওপর বড় বড় চোখ তুলে ভেসে বেড়াচ্ছে। উড়ন্ত মাছরাঙার লোলুপ দৃষ্টি আছে ওদের ওপর, কিন্তু সহজে ধরা দেবার পাত্র নয় ওরা। ছোঁ মেরে ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই টুপ্ করে ডুবে যাবে জলের মধ্যে।[৩]

পুরাণের ব্যবহার

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের শিরোনাম ব্যবহার, ঘটনা-সংস্থান, চরিত্র-চিত্রায়ণ, রসপ্রতিপত্তি কিংবা ভাষাবিন্যাসে পুরাণের ব্যাপক ও বহুল ব্যবহার রয়েছে। তাঁর 'লক্ষ্মীর পা', 'ধন্বন্তরী', 'শৈব্যা', 'দুঃশাসন', 'কালনেমি', 'ঊর্বশী' – গল্পের নাম সরাসরি পুরাণ-উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে। 'লক্ষ্মীর পা' গল্পে বলাইয়ের স্ত্রীকে লক্ষ্মীর স্বরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। লক্ষ্মী হচ্ছেন শ্রী-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এ গল্পে বলাইয়ের স্ত্রী শুরু থেকে স্বামীকে সোনালি ধানের স্বপ্ন দেখিয়ে বলেছে – 'মা বলত ধানেই লক্ষ্মী। কেন তুমি ধান ছেড়ে চলে গেলে কয়লা কাটতে ?'[৪] এক পর্যায়ে স্ত্রীর উপদেশ ও উৎসাহে বলাই কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ হয়। কয়লাশ্রমিক নয়,

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দিনান্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৩

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মমি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৩

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ধানশ্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৪

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'লক্ষ্মীর পা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

চাষি পরিচয়ে সে গৌরববোধ করে। এ গল্পে বলাইয়ের সংসারে শ্রী ও সম্পদের উৎস হয়ে উঠেছে তার লক্ষ্মী-পয়মন্ত স্ত্রী।

'আরো একজন' একজন গল্পে দরিদ্র-দম্পতি সংসারে পঞ্চম সন্তানের আগমনকে স্বাগত জানাতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। নতুন শিশুর অনাকাঙ্ক্ষিত আবির্ভাবকে তারা তুলনা করে সূর্য এবং ছায়ার অভিশপ্ত-পুত্র শনির সঙ্গে – 'বললুম আবার আসছে। আর একটা শনি।'[১] এই শনি যখন মহাদেব-পার্বতীর সন্তান গণেশকে দেখতে আসেন, তখন ওর অভিশপ্ত দৃষ্টিতে নবজাতকের শিরশ্ছেদ ঘটে। সেই থেকে শনি দেবতা হয়ে উঠেছেন অপদেবতার প্রতীক, অশুভের ইঙ্গিতবাহী।

ভারতীয় পুরাণ অনুয়ায়ী গণেশ হচ্ছেন সিদ্ধিদাতা, এজন্য সকল কাজের পূর্বে তাঁর পূজা করা হয়। 'কমিশন' গল্পে অমৃতলাল মজুমদার মানসপ্রিয়াকে হারিয়ে সাহিত্যচর্চা ছেড়ে দেন। এ পর্যায়ে তিনি গ্রন্থ-ব্যবসায়ের ভাবনায় আন্দোলিত হন। নতুন পেশায় আত্মনিয়োগের পূর্বে তাঁর কল্পলোকে ভেসে ওঠে – 'সেই নদীটি নেই, সেই বাসন্তী রঙের শাড়ী-পরা মেয়েটিও নেই। আছে সিদ্ধিদাতা গণেশ।'[২] 'ডিনার' গল্পে রমাপতি কালোবাজারে জড়িয়ে পড়ে। এ অপকর্মেও সে গণেশের নাম স্মরণ করে :

> জয় সিদ্ধিদাতা – বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল রমাপতি। লেগে গেল বিনায়কের বলি সংগ্রহ করতে। গজমুণ্ড হেরম্বচন্দ্র ভক্তকে কৃপাবর্ষণ করলেন। পাঁচ আনার ধেনো একশো টাকার হোয়াইট লেবেলে রূপান্তরিত হয়ে গেল।[৩]

'লুচির উপাখ্যানে' সিদ্ধেশ্বরবাবু কাঁকরের ব্যবসায়ী। দুর্ভিক্ষকালে অধিক লাভের আশায় কেউ-কেউ চালের সঙ্গে কাঁকর মেশাতে শুরু করে। জনগণের সঙ্গে প্রতারণায় লিপ্ত থাকলেও, সিদ্ধেশ্বরের প্রাত্যহিক কর্ম ছিল গণেশ-পূজা। কারণ – 'সিদ্ধিদাতা গণেশের আশীর্বাদে খেরো খাতার কালো কালো অক্ষরগুলো ব্যাঙ্ক নোট হয়ে যাচ্ছে।'[৪] 'তীর্থযাত্রা' গল্পের নারীপাচারকারী নরোত্তম ঠাকুরও দুর্গাপূজার পরিবর্তে কুবেরের আরাধনা করে। দরিদ্র নারীদের প্রলোভন দেখিয়ে সে কলকাতার গণিকা পল্লিতে বিক্রয় করে। ব্রাহ্মণ নরোত্তমের পরিবর্তিত বৃত্তি প্রসঙ্গে গল্পে বলা হয়েছে :

---

১ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আরো একজন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

২ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কমিশন', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৩ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ডিনার', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮

৪ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'লুচির উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬১

> নতুন পূজোর নতুন ব্যবস্থা। দেবী আর ভোলা মহেশ্বরের ভিখারিণী গৃহিণী নন – কুলত্যাগ করে তিনি কুবেরের অঙ্কলক্ষ্মী হয়েছেন। বাংলার নারীত্বও তাই আজ বিশ্বমাতার দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করছে। যাজন-যজন নরোত্তমের পৈতৃক ব্যবসা, নতুন কালের হাওয়ায় তার রূপান্তর ঘটেছে।[১]

পঞ্চাশের মন্বন্তরে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুদ করে এবং খোলাবাজারে পণ্য-সরবরাহ বন্ধ রাখে। সাধারণ মানুষ কালোবাজারে এগুলো কয়েকগুণ মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য হয়। দেশের এই অরাজক পরিস্থিতিতে নিরুপায়-জনতা কল্কি অবতারের প্রতীক্ষা করে। কল্কি হচ্ছেন 'বিষ্ণুর দশ অবতারের শেষ অবতার। বর্তমান কলিযুগের শেষে বিষ্ণু কল্কীরূপে জন্মগ্রহণ করে কলিকে বিনাশ করলে আবার সত্যযুগের আবির্ভাব হবে।'[২] 'নক্র-চরিত' গল্পে সত্যযুগের সন্ধানে গ্রামবাসী তাই কীর্তনের আয়োজন করে :

> ব্যাপার আর কিছু নয় দাদা, হরিসভায় একটা অষ্টপ্রহরের বন্দোবস্ত করছি। শুনছি সত্যযুগ আসছে, কল্কি অবতার নামবেন মর্ত্যে মহাপাপীদের বিনাশ করতে। দেশের যা অবস্থা হচ্ছে, তাতে নামকেত্তনটা –[৩]

অন্যদিকে গঙ্গা নদী জহ্নুমুণির কন্যাস্থানীয়া বা জাহ্নবী নামে আরাধ্য হলেও 'নিশাচর' গল্পের ফেরারি বিপ্লবীর দৃষ্টিতে এ নদী চিহ্নিত হয়েছে বিরূপতার প্রতীকরূপে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তার মনে হয়েছে :

> শীতার্ত জানুয়ারীর রাত্রি। আহিরীটোলা পেরিয়ে হু-হু করে গঙ্গার হাওয়া আসছে। সে হাওয়াতে আর যাই থাক, জননী জাহ্নবীর করুণার আভাস নেই এতটুকুও। ঠাণ্ডায় হাত মুখ যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।[৪]

শম্বুক নামক এক শূদ্রের সশরীরে স্বর্গবাসের দৃঢ় সাধনা এবং নিষাদপুত্র একলব্যের কঠোর তপস্যার প্রসঙ্গ রয়েছে 'ইজ্জৎ' গল্পে। গ্রামে দাঙ্গাকালে পুরোহিত জগন্নাথ সরকার নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন নমঃশূদ্রদের ওপর। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে এদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হলেও বিপদে তাদেরই শরণ নেন তিনি। কেননা – তাদের 'যুগ-প্রবাহিত রক্তধারায় শম্বুকের নিষ্ঠা, একলব্যের দৃঢ়তা। সমাজের ওপরতলার মানুষদের মতো ধর্মটা ওদের অলঙ্কারমাত্র নয়, একেবারে নিচের তলায় থেকেও ধর্মকে ওরা অহঙ্কার বলে আঁকড়ে রেখেছে।'[৫] অন্যদিকে প্রজাদের অকালমৃত্যু থেকে বাঁচাতে রামচন্দ্র কর্তৃক শম্বুকবধের উল্লেখ আছে 'তরফদার' গল্পে।

ভারতীয় পুরাণের বিভিন্ন দেব-দেবী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপিত হয়েছে :

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তীর্থযাত্রা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৩-৮৪৪

[২] সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নক্র-চরিত', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৮

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নিশাচর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ইজ্জৎ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৩

১. আমার পরিবার গেছেন প্রায় দু'বছর হল। সতী-লক্ষ্মী ছিলেন।[১]

২. ইনভিজিলেটরকে ছোরা দেখিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়েছে নিরাপদ।[২]

৩. আর দেওয়ালে সরস্বতীর ছবিওলা স্টুডেন্ট্স্ বুক হাউসের ক্যালেণ্ডার আছে।[৩]

৪. পাকা ফসলের গন্ধ – পরিপুষ্ট সোনালি ধানের গন্ধ। অন্ধ চোখ দুটো মেলতেই সে দেখল, সামনেই বিলের ধার দিয়ে বোরোর ধানে লক্ষ্মীর অজস্র করুণা।[৪]

৫. চিত্রগুপ্তের সঙ্গে ধন্বন্তরির বেশ বন্ধুত্ব দেখা যাচ্ছে। তা বেশ, তা বেশ।[৫]

৬. ভিখারী বিশ্বনাথের ক্ষুধার্ত করপুটে অমৃত ঢেলে দিচ্ছেন অন্নপূর্ণা।[৬]

৭. ব্রজধামই বটে, তবে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার পরে।[৭]

৮. সেই মাঠ। বিশ্বকর্মার হাতুড়ির ঘা পড়েছে।[৮]

৯. সত্যি যত দিন যাচ্ছে বৌদির রূপ তত বেশি খুলছে, যেন তপঃকৃশা পার্বতী।[৯]

মানব-চরিত্রের আগ্রাসী স্বভাব কিংবা প্রকৃতির সর্বনাশা রূপচিত্রাঙ্কনে লেখক পুরাণ প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে কালভৈরব এবং কালীদেবীর কথা প্রায়শ উত্থাপিত হয়েছে। যেমন :

১. রামদা যার হাতে ছিল, কালভৈরবের মতো তার চেহারা।[১০]

২. শ্মশানে শ্মশানে জেগে আছেন ত্রিশূলপাণি ভয়ালমূর্তি কালভৈরব।[১১]

৩. শান্তশিষ্ট ভোলানাথ মানুষকে ক্ষেপিয়ে দিলে সে কালভৈরবের মূর্তি গ্রহণ করতে পারে।[১২]

৪. রক্ষাচণ্ডীর মত চুলগুলো খুলে পড়েছে – ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে কাকিমাকে।[১৩]

৫. মা কালীর মতো রসনা মেলে দিয়েছে – এ ক্ষুধার আগুন কবে নিভবে কে জানে ।[১৪]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মোহীনের কাকা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উদ্বোধন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আলেয়ার রাত', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সৈনিক', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২-৩৪৩

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ধন্বন্তরি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শৈব্যা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৪

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গন্ধরাজ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৩

[৮] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ডিম', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৫

[৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দুর্ঘটনা', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ঘূর্ণি', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৪

[১১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শৈব্যা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৫

[১২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শিল্পী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৮

[১৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কেয়া', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

[১৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হাড়', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

৬. মেয়েটির জামার এখানে ওখানে সে রক্তের ছোপ লেগেছে – যেন ভৈরবীর মূর্তি।[১]

৭. দিন কয়েক স্ত্রী গুঞ্জন করে অসন্তোষ প্রকাশ করলে, তার পরে নিজমূর্তি ধরলে রক্ষাচণ্ডীর মতো।[২]

৮. দুজনকে যখন ছাড়িয়ে দেওয়া হল, তখন স্ত্রীর উলঙ্গিনী কালীমূর্তি।[৩]

৯. মাথার রুক্ষ চুলগুলো ঘাড়ের দু'পাশে গোছায় গোছায় ভেঙে পড়েছে – যেন রক্ষাচণ্ডীর মূর্তি।[৪]

১০. নিরামিষাশী গণেশ রক্ষাকালী হয়ে নববলি নিতে লাগলেন। যুদ্ধের ধোঁয়ায় বিষণ্ন বাংলার আকাশে রক্তের অক্ষরে স্বাক্ষর দিয়ে গেল – সাল তেরশো পঞ্চাশ।[৫]

*মহাভারতে*র যুধিষ্ঠির-কর্ণ-ভীষ্ম চরিত্র এবং জতুগৃহের মতো পৌরাণিক প্রসঙ্গের যথাযথ প্রকাশ ঘটেছে নারায়ণের গল্পে :

১. মহাভারতের পাতা খোলা, ব্যাসদেব বলছেন, হে ভীষ্ম, যে পুরুষ ইন্দ্রিয়জয়ে সক্ষম –[৬]

২. ব্যবসা – ব্যবসাই। ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির সেজে কোন্ ব্যাটা বসে আছে ?[৭]

৩. ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলে কোনো ব্যাটাই ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হতে পারে না। তুমি যদি পরকে না ঠকাও, তাহলে পরে তোমার মাথায় আছড়ে কাঁঠাল ভাঙবে এই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম।[৮]

৪. সেই দেড়শো টাকা সুদে-আসলে একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে! যতই ধর্মে মতি থাকুক না, নরোত্তম দাতাকর্ণের পোষ্যপুত্র নয়।[৯]

৫. সাধু সাধু। তবে তোমার মতো ভীষ্মের কাছ থেকে ওটা আশা করা যায় না – এই আর কি! যুদ্ধ থেকে ফিরেও যেমন কামিনীকাঞ্চন বর্জিত দিন কাটাচ্ছিলে, তাতে তুমি হঠাৎ –[১০]

৬. ও-বাড়িতে আর যাওয়া সম্ভব নয় শিবেনের পক্ষে। একটা জ্বলন্ত জতুগৃহের মতো ওই বাড়ি।[১১]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উন্মেষ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৩

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শিল্পী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৭

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তীর্থযাত্রা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৪

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ডিনার', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শৈব্যা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৮

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'লুচির উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৪

[৮] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নক্র-চরিত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৮

[৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তীর্থযাত্রা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৮

[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তিমিরাভিসার', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮৬

[১১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কল্প-পুরুষ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬২

'দুঃশাসন' গল্পে পাণ্ডবদের সঙ্গে কৌরবদের লড়াই এবং ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের শোচনীয় পরাজয় প্রসঙ্গ চিত্রিত হয়েছে। এ ধর্মযুদ্ধের প্রাক্কালে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বস্ত্রসংকট অভিন্ন তাৎপর্যে গ্রন্থিত হয়েছে গল্পে। দুটি এলাকা উল্লেখযোগ্য :

> ক) আলো আর গানে বাংলা দেশের ছোট এই গ্রামটা হাজার হাজার বছর আগেকার কুরুক্ষেত্রে ফিরে চলে গেছে। অর্জুনের কপিধ্বজ রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে কৌরব সৈন্য – পাঞ্চজন্যের শব্দে দূর রাজপ্রাসাদে বসে থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠছেন ধৃতরাষ্ট্র। কর্ণ এসে বললেন : ভয় নেই। সূতকূলে আমার জন্ম – সেজন্য দায়ী দৈব। কিন্তু আমার পৌরুষ – সে আমার নিজস্ব গৌরব।[১]
>
> খ) দুঃশাসনের বুকে বিঁধেছে ভীমের খর-নখর। আর কী আশ্চর্য – ভীমের নখের মুখে উছলে উঠেছে রক্ত – হাঁ – রক্তই তো !... একটা প্রচণ্ড অট্টহাসি করে ভীম বললে, এই রক্তাক্ত হাতে দ্রুপদ-নন্দিনীর বেণী বেঁধে দেব। প্রতিশোধ যজ্ঞের প্রথম আহুতি দেওয়া হল আজকে।[২]

ভারতীয় পুরাণের পাশাপাশি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রিক মিথোলজির উপযুক্ত ব্যবহার করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্মর্তব্য :

১. – প্রমিথিয়ুস কে জানো ?
   – জানি। প্রথম বিদ্রোহী মানুষ, যে পৃথিবীতে আগুন নিয়ে এসেছিল।[৩]
২. বিদ্রোহী প্রমিথিউসের যজ্ঞকুণ্ডে জ্বলছে আগুন।[৪]
৩. আবার তোমার সবল শরীরে শক্তিমান তারুণ্যের অসীম সম্ভাবনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, তোমার গ্রীক-শৌর্যের ওপরে অ্যাপোলোর আশীর্বাদ সৌর কণায় ঝরে পড়ুক।[৫]

হাস্যরস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সমাজ-রাজনীতি মুখ্য হলেও, গল্পের পরিচর্যায় তিনি কখনো কখনো সূক্ষ্ম হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। ফলে গল্প-কাহিনির ঘনায়মান বিষাদ-বেদনার মধ্যেও পাঠক খানিকটা স্বস্তিবোধ করতে সক্ষম হয়। 'দাম' গল্পে সুকুমার গণিতশাস্ত্রে অত্যন্ত দুর্বল। এজন্য তার শিক্ষক তাকে

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দুঃশাসন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৬

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'পাইপ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৪

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নীলা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দায়মোচন', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৬-১০৯৭

প্রতিনিয়ত তিরস্কার করেন। ছাত্রদের উৎসাহিত করবার জন্য শিক্ষকও নানা কৌশলের আশ্রয় নেন। একদিন তিনি বলেন – 'প্লেটোর দোরগোড়ায় কী লেখা ছিল, জানিস ? যে অঙ্ক জানে না – এখানে তার প্রবেশ নিষেধ।' এমনকি স্বর্গলোকেও যে গণিতের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে তা তিনি বেশ উৎসাহের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কাছে বিবৃত করেন। মাস্টারমশাইয়ের বক্তব্যে সুকুমারের মনোরাজ্যে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, তা বেশ হাস্যরসাত্মক :

> স্বর্গের খবরটা মাস্টার মশাই কোত্থেকে যোগাড় করলেন তিনিই জানেন। প্লেটো কে, তার দরজা দিয়ে ঢুকতে না পারলে কী ক্ষতি হবে, এ নিয়ে আমরা কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। তাছাড়া যে স্বর্গে পা দিয়েই জ্যামিতির একস্ট্রা কষতে হবে কিংবা স্কোয়ার মেজারের অঙ্ক নিয়ে বসতে হবে, সে স্বর্গের চাইতে লক্ষ যোজন দূরে থাকাই আমরা নিরাপদ বোধ করতুম।[১]

'কুয়াশা' গল্পে ডাক্তার অমূল্য দাশগুপ্ত শীতের রাতে আরাম করছিলেন। এসময় পার্শ্ববর্তী বাংলোর এক অতিথির পায়ে ভাঙা-কাচ বিদ্ধ হলে, তিনি শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁর ব্যথা নিরাময়ের উদ্যোগ নেন। আহত-ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এক সুন্দরী তরুণী। চিকিৎসা সেবায় ব্যস্ত ডাক্তারের ওই সময় কেবলই মনে হচ্ছিল – 'কাচে মেয়েটিরই পা কাটল না কেন ? তাহলে এ সময়ের এই বিরক্তিকর পরিশ্রম খানিকটা সার্থক হত অন্তত।'[২] 'ভাঙা চশমা' গল্পে এক হেডমাস্টার পরম বৈষ্ণবভক্ত। তিনি গলায় কণ্ঠী ধারণ করেন এবং খোল বাজিয়ে সেক্রেটারির বাড়িতে নামকীর্তন করেন। অত্যন্ত বিনয়ী এ শিক্ষক 'ছেলেদের বেত মারবার আগে সনিশ্বাসে বলেন, কৃষ্ণের জীবের ওপর কৃষ্ণের কাজ করতে হবে – কৃষ্ণের ইচ্ছা। দপ্তরী বলে, ওঁর বেতের সঙ্গে নাকি সুতো দিয়ে তুলসীপাতা বাঁধা আছে।'[৩]

বীভৎস রস

হাস্যরসের সমান্তরালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে পাওয়া যায় বীভৎস সব বর্ণনা। 'তমস্বিনী' গল্পে তারা-মাসি খুন হলে পুলিশ মৃতদেহ নিয়ে যায় গৌরনদী থানায়। নদীপথে তখন দেখা যায় 'কলাপাতা আর কয়লার গুঁড়ো দিয়ে জড়ানো একটা অদ্ভুত জিনিস – শুধু কলাপাতার ফাঁক দিয়ে তা থেকে খানিকটা জট বাঁধা এলোচুল বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে।'[৪] 'ভাঙা বন্দর' গল্পেও আরেকটি ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ রয়েছে :

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দাম', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কুয়াশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভাঙা চশমা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৪

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তমস্বিনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮

> রক্তনদীর মাঝখানে পড়ে রয়েছে কালীমোহনের পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড শরীরটা। পেটের ঠিক মাঝখান দিয়ে রক্তের ছিটে দেওয়া হলদে একটা চর্বির পিণ্ড বাইরে ঝুলে পড়েছে, অর্ধাচ্ছন্ন শ্বাসনালীটা রাক্ষুসে ধরনে হাঁ করে রয়েছে, আর তাই থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত তখনো কাঁধের দু'পাশ বয়ে মাটিতে চুঁইয়ে পড়ছে।[১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত গল্পের বর্ণনা সাধারণত ভয়াল-প্রকৃতির। এসব গল্পের চরিত্র উচ্ছিষ্ট খাবারের জন্য কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করেছে, অনেকে পাশবিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। আবার ক্ষুধার যন্ত্রণায় কেউ-কেউ আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। 'নক্র-চরিত' গল্পের দুটি নির্বাচিত এলাকা উদ্ধৃতিযোগ্য :

> ক) পাথর বসানো কানের দুল একজোড়া, সেটা স্পর্শ করেই নিশি চমকে হাত সরিয়ে নিলে। নরম একটা মাংসের টুকরো এখনো লেগে রয়েছে তাতে, আর সেই সঙ্গে আঠার মতো রক্ত। সময় সংক্ষেপ করবার জন্য কানসুদ্ধই দুল জোড়াকে ছিঁড়ে এনেছে ওরা।[২]
>
> খ) শিবপুরের হাট থেকে সে ফিরছিল। চোখে পড়েছিল – মাঠের মাঝখানে একটা গলিত গোরুর দেহ আগলে বসে আছে একটা ঘেয়ো কুকুর; চারিদিক থেকে শকুনেরা উড়ে উড়ে সেই মড়াটাকে ঠোকর মারবার চেষ্টা করছে, আর কুকুরটা অস্বাভাবিক প্রচণ্ড চিৎকার করে ক্ষুধার্ত শকুনগুলোকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।[৩]

ভাষারীতি ও শব্দপ্রয়োগ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাধারণত চলিত ভাষারীতিতে গল্প লিখেছেন। কেবল 'আত্মহত্যা' গল্পে তিনি সাধু ভাষারীতি অবলম্বন করেছেন। আবার একই গল্পে সাধু-চলিত দু ধরনের ভাষা ব্যবহারের নমুনা রয়েছে। 'ইতিহাস' গল্পটি চলিত ভাষারীতিতে রচিত হলেও অমরেশ ইতিহাসগ্রন্থ লিখেছেন সাধুভাষায়। 'মমি' গল্পে লেখকের বর্ণনা চলিত রীতির, অথচ মণীন্দ্রের ডায়েরি সাধুভাষা-আশ্রয়ী :

> মণীন্দ্রের আত্মমুখী মনটা নিজের মধ্যেই কখন তলিয়ে গেল সেটা টেরও পেল না সে। কলমের মুখে আশা আর আনন্দের অক্ষর মূর্তি নিয়ে লেখা ফুটতে লাগল :
>
> > "যাহারা বাধা দিতেছিল, তাহারা আজ একে একে জনতার দাবি মানিয়া লইতেছে। তাহারা একথা নিঃসংশয়ভাবে বুঝিতে পারিতেছে যে যতদিন তাহারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবে, ততদিনই –[১]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভাঙা বন্দর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৮

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নক্র-চরিত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭২

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮২

অপরদিকে 'ছলনাময়ী' গল্পে লেখকের বর্ণনাংশ সাধুরীতির হলেও, ভৈরবানন্দ এবং ভূমানন্দ মতবিনিময় করেছে কথ্যভঙ্গিতে :

> ভৈরবানন্দ কাশিয়া কহিল, আহা-হা, সে কি কথা, রাগ করছ কেন ? এসেছ, বেশ, থাকবে। সে তো ভালো কথাই। আমাদের তাতে আপত্তির কি আছে ?
>
> ভূমানন্দ সঙ্গে সঙ্গে খেই ধরিয়া কহিল, ওটা – ওটা তোমাকে একটু ঠাট্টা, তা বুঝতে পারছ না ?
>
> ভৈরবী বুঝিল এবং বুঝিল বলিয়াই রাগ করিল না। নিরুত্তরে খানিকটা হাসিল শুধু।[২]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিষয়ানুসারী ভাষা ব্যবহার করেছেন। গল্পের পট-পরিবেশ এবং জীবনানুষঙ্গের সাথে এ ভাষা সঙ্গতিপূর্ণ। পূর্ববাংলার জনজীবনের বিশ্বাসযোগ্য রূপায়ণে তিনি এতদঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষারীতি অনুসরণ করেছেন। দুটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

> ক) কইল্‌কাতার থিক্যা আসছেন ?... আরে কষ্টডা কী ? নতুন লোক আসছেন – অন্ধকারে পোল থিক্যা পইড়্যা হাত-পা ভাঙবেন নাকি শ্যাষে ? লন্– হাটেন।[৩]
>
> খ) বাজারে একজনরে বেইচ্যা দিছি। তারে চিনি না। একশো টাকা পাইছিলাম – হারাইয়া গেছে ! – লোকটা গোঙানির মতো সুর তুলে বলে যেতে লাগল : হইল তো ? এ্যাখন আমারে থানা পুলিস যেখানে খুশি দ্যান – তার আগে এট্টু জল দ্যান।[৪]

'জন্মভূমিশ্চ' গল্পে চরিত্রপাত্রের সংলাপে বরেন্দ্রভূমির লোকভাষা হুবহু উচ্চারিত হয়েছে। এ গল্পে রমন্দ হাড়ীর সংলাপ লক্ষণীয় – 'হামাদের দ্যাশ্ আছিল্ মহানন্দার উই ওপারত্। ক্ষ্যাত আছিল্, হাল-হালট্ আছিল্। ছোট কাম করি নাই হামরা কুনোদিন।'[৫] রংপুরের গাড়োয়ানদের আঞ্চলিক উচ্চারণ প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'তরফদার' গল্পে – 'ডাহিন বাঃ ডাহিন ! কুন্‌ঠি যাইছে হে ভৈসা – ডাহিন –।'[৬]
গাইবান্ধা জেলার কবিগান পরিবেশিত হয়েছে 'অধিকার' গল্পে :

> গোমস্তা নাই, তশীলদার নাই,
> মহাজনও নাই রে –
> হামাঘরের ক্ষ্যাতের ফলন
> হামরা সুখে খাই রে।[৭]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মমি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৩
[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ছলনাময়ী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৮
[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মধুবন্তী', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩
[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'একটি কৌতুকনাট্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২
[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'জন্মভূমিশ্চ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৯
[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তরফদার', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪
[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'অধিকার', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৪

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কাহিনি ও চরিত্রপাত্রের পট-পরিবেশের অনুকূল আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করলেও, সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে সেই শব্দের প্রচলিত রূপটিও তার পাশেই ব্র্যাকেটবন্দি করেছেন। এ-প্রসঙ্গে দুটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

ক) – লও, আর আষ্ট আনা দিমু, হোন্‌ছো (শুনছো) ? কথা কও না দেহি ?

– কমু আর কি ? পাঁচ-ছয় টাকার কাম না কত্তা – দউশগার কোমে কথা নাই।

– ওরেঃ, ডাহাইত (ডাকাত) ! মাথায় বাড়ি দিতে চাওনি ?

অবজ্ঞাভরে খালের জলে থুথু ফেললে কফিলদ্দি : চাউলের মোন হইছে কুড়ি টাহা – হেয়্যা দ্যাহেন না ?[১]

খ) ভাত চাপাইলেন কি আধা কোশ 'ঘাটা (পথ) থাকি তার সুবাস পায় মানসিলা (মানুষগুলো) – বলতে বলতে অন্ধকারে নক্ষত্রের মতো চোখ দুটো জ্বলে ওঠে রমন্দের।[২]

ভাষা-ব্যবহারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন পট-পরিবেশের অনুগামী। চরিত্র এবং পরিস্থিতির প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করেছেন ইংরেজি ভাষা। তাঁর কয়েকটি গল্পের শিরোনামও ইংরেজিতে লিখিত – 'কমিশন', 'রেকর্ড', 'একজিবিশন', 'গিলটি', 'ডিনার', 'প্র্যাকটিস' এবং 'পাইপ'।

নাগরিক জীবনধারার রূপায়ণে নারায়ণের গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে ইংরেজি শব্দাবলি। যেমন – সারপ্রাইজ, কক্‌পিট (মাধ্যাকর্ষণ), হাউ ফানি, বোগাস্‌ এরিয়া, ম্যাস্‌ কন্ট্রাক্ট, সুইসাইডাল, আইডিয়াল (খুনী), অ্যাক্টিং, সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট, ইমিটেশন (রেকর্ড), হাউ ফুলিশ (রাঙা মাসিমা), লিবারেল (কনে-দেখা আলো) প্রভৃতি। শুধু তাই নয়, গল্পে তিনি ব্যবহার করেছেন ইংরেজি বাক্য এবং কবিতাংশ। যেমন :

১. নো স্যার, ইয়োর রোল নাম্বার ইজ্‌ থার্টি সিক্স ![৩]

২. ডোন্‌ট পুট্‌ এ নিউ স্ট্র অন্‌ দিস্‌ ক্যামেল অব হাঙ্গার –[৪]

৩. He is a dead man in politics ![৫]

৪. We know how to fight the diehard autocrats ![৬]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালাবদর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪১

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'জন্মভূমিশ্চ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১৪

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'যাচাই', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আরো একজন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'চারতলা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪

[৬] প্রাগুক্ত

৫. নাউ আই অ্যাম এ ট্রু এনিমি অ্যান্ড এ ট্রু ইউরোপীয়ান। অ্যাম আই নট ?[১]

৬. You must be a superman.[২]

৭. The strongest man is he, who stands most alone.[৩]

৮. The Time has been,
That when the brains were out,
The man would die,
And there an end; but now they
rise again,
their crowns...[৪]

৯. Here am I here are you :
But what does it mean ?
What are we going to do ?[৫]

১০. Morning shows the day –[৬]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কোনো কোনো গল্পের আবহ নির্মাণে হিন্দি শব্দও ব্যবহার করেছেন। যেমন :

১. আরে তুম্ ইতনা ওখত কিধর থে ? তুম্‌হারা বাপ –[৭]

২. যাই হুজুর। দো-চার বরিষমে এক দফে।[৮]

৩. বললাম, তাম্‌কু তো নেহি পিতা ভেইয়া, জার্‌কে লিয়ে থোড়া আগ্‌কা জরুরৎ –
– বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। আগ্‌তো হ্যায়ই হিঁয়াপর –[৯]

৪. এই কুলি – ঠারো মৎ, ঠারো মৎ ! ফুর্‌তিসে কাম চালাও – জলদি ![১০]

৫. যোগী বন্‌কে আয়ে রাবণোয়া

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'একটি শত্রুর কাহিনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮
[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'পাণ্ডুলিপি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৯
[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আত্মহত্যা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৯
[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গলি', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হয়তো', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৮
[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২১
[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'যাচাই', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
[৮] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'খুনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
[৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নিশাচর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০
[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভোগবতী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১

পঞ্চবটী যঁহা সিয়া রহে –[১]

৬. জান্ লে লেঙ্গে, উস্‌কো জান লে লেঙ্গে –[২]

৭. শালা উল্লু, ক্যায়সা প্রাকটিস কিয়া এত না রোজ ? আভিতক ঠিক্‌সে ঠহ্‌রানে নেহি জানতা ? থোরেসে মেরা জান বচ্ গিয়া –[৩]

৮. মাঈজী আভি পূজামে বৈঠেছেন।[৪]

৯. আদ্‌মি হ্যায় সে তো হাম জানতাই হ্যায়। তুম্ যে ভূত নেহি হ্যায়, সে হাম বুঝতে পারা থা। লেকিন্ হাসত্ কেঁও![৫]

মুসলিম চরিত্রের বাস্তবসম্মত রূপায়ণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ। যেমন :

১. শেখ ফরিদ কুদরৎ / তেল-নিমক-আদরৎ।[৬]

২. তোবা তোবা। তোদের মুখ দেখলেও গুণাহ্ হয়। বাইশ বাজারে নিয়ে গিয়ে তোকে পয়জার মারা উচিত।[৭]

৩. কমবখ্‌ত – উল্লুক ! ফের যদি এসব তোর মুখে শুনতে পাই তাহলে পঁচিশ পয়জার লাগিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দেব।[৮]

৪. মুসলমান-পাড়া তার জবাব পাঠিয়ে দিলে : আল্লা-হু-আকবর – ...ধলা মন্তাইয়ের সভাপতিত্বে শেষ হল মুসলমান-পাড়ার ‘ওয়াজ’। সমস্ত মুসলমান-পাড়া আল্লার নামে কসম নিয়েছে জান দেবে ।[৯]

৫. লা ইল্লাহা, রসুলাল্লা – না, না, এ ভয় চলবে না কফিলদ্দির।[১০]

সংস্কৃত শ্লোকও উদ্ধৃত হয়েছে তাঁর কোনো কোনো গল্পে। ‘তরফদার’ গল্পে ‘অস্পৃশ্যতা নিবারণ সভা’য় বর্ণপ্রথার কুফল সম্পর্কে জনৈক বক্তা উদ্ধৃত করেছেন – ‘চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ।’[১১] ‘তমস্বিনী’ গল্পে বলরাম নিজেকে তান্ত্রিক প্রমাণ করতে প্রায় সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করতেন। যেমন – ‘দেবরাজ ময়া দৃষ্টং

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘প্র্যাকটিস্’, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘আত্মহত্যা’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৯

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘ঘাসবন’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩৭

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘তিতির’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘তৃণ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০

[৮] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘সীমান্ত’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৬

[৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘ইজ্জৎ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৪

[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘কালা বদর’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৪

[১১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘তরফদার’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬

বারিবারণ-মস্তকে, ভক্ষয়তি অর্ঘ্যপত্রাণি, অহং চ বনহস্তিনী।'[১] 'বাইশে শ্রাবণে' কলেজের অনুষ্ঠানে সুনেত্রা গোস্বামী পাঠ করেছেন বেদমন্ত্র – 'সনাতনম্ এনম্ আহুর।'[২] 'পাইপ' গল্পে আগুনের বন্দনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক পি. কে. চৌধুরী বলেছেন – 'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম।'[৩] এছাড়া 'শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু' গল্পে স্রষ্টার স্তুতিসূত্রে বলা হয়েছে :

> মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
> যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।[৪]

'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সব গল্পেই একটা নাটকীয় মাত্রা থাকে, গল্পের বয়নে টানটান উৎকণ্ঠা রাখতে তিনি ভালোবাসেন। '[৫] এ ধরনের নাটকীয় পরিবেশ-সৃষ্টি এবং ভাষায় প্রাণাবেগ সঞ্চরিত করতে লেখক সংলাপধর্মী পরিচর্যার আশ্রয় নিয়েছেন। দুটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

ক) – আনন্দ !

– বলো।

– এখন কি আর সময় নেই ?

– কিসের ?

– ভুল শুধরে নেবার ? মল্লিকার চোখের তারায় সেই সেই চঞ্চল আলোটা আরো উগ্র হয়ে উঠল : তুমি আমাকে নিতে পারো না ? আমি তৈরী আছি ![৬]

খ) – কী দেখব ?

– ওই পাখি দুটো।

– ওদের দেখবার কী আছে ?

– এতক্ষণ ওরা এখানে এ ওকে সোহাগ করছিল – চান করছিল। তুই আমি এলাম দেখে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে গেল।

মুখের ভঙ্গি করে সোনা বললে, যাঃ।

– হ্যাঁ – সত্যি !

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তমস্বিনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬১

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বাইশে শ্রাবণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬৭

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'পাইপ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৪

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু', প্রাগুক্ত, পৃ.৭২০

[৫] গোপাদত্ত ভৌমিক, 'ক্ষোভ-ঘৃণা-ভর্ৎসনা-জুগুপ্সার শতসঞ্চারী : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পভুবন', উত্তম পুরকাইত (সম্পাদিত), উজাগর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মাধ্যাকর্ষণ', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

– ওরা কি এসব বোঝে ?

– বোঝে বইকি। সব বোঝে।[১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পে কিছু কিছু শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার করেছেন। যুদ্ধ-মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত তাঁর কয়েকটি গল্পের নাম শুরু হয়েছে 'কালো' দিয়ে – 'কালো জল', 'কালাবদর', 'কালনেমি' এবং 'কালো মোটর'। অবক্ষয়দীর্ণ, ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থার স্বরূপ প্রকাশে তিনি গল্পের নাম দিয়েছেন 'ভাঙা বন্দর' কিংবা 'ভাঙা চশমা'। 'ভাঙা বন্দর' গল্পে 'ভাঙা' শব্দটি বারবার প্রযুক্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীধর মিত্তির যে চেয়ারে বসে বন্দর প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছে, সেটি ভাঙা – 'হারাণের স্টলে হাতল-ভাঙা একটা চেয়ারে উবু হয়ে বসে শ্রীধর মিত্তির।'[২] শুধু চেয়ার নয়, অন্যান্য উপকরণের বর্ণনাও হয়েছে অনুরূপ – 'জরাজীর্ণ কাঠের পোস্টে আধভাঙা চৌকোণা আলোগুলো এখনো কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যায় মিটমিট করে। ওয়াটার ওয়ার্কসের বড় চৌবাচ্চাটা ভাঙাচোরা অবস্থায় শূন্যে ঝুলে রয়েছে।'[৩]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পে দেশকাল-পরিপ্রেক্ষিতের উপযোগী শব্দ ব্যবহার করেছেন। দেশভাগকেন্দ্রিক গল্পে প্রায়শ স্থান পেয়েছে 'পার্টিশন' শব্দটি। আঞ্চলিকতার রূপায়ণে তিনি তুলে এনেছেন এ-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শব্দাবলি। যেমন : আঁশটে গন্ধ (ঘূর্ণি), কাইতান (কালাবদর), ঠ্যাঙানি (বন-তুলসী), খিলাচ্ছি (বন-বিড়াল), কপকপ (ফলশ্রুতি) প্রভৃতি। 'মহলা' থিয়েটার-কেন্দ্রিক গল্প, তাই এর বর্ণনাংশ প্রাণবন্ত করতে লেখক ব্যবহার করেছেন মঞ্চাভিনয় সংক্রান্ত শব্দসমূহ : একজিট-এন্ট্রাস, ড্রামাটিক জায়গা, মেক-আপ রুম, রিহার্সাল, স্টেজ ফ্রি প্রভৃতি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত 'নিশাচর' গল্পে প্রযুক্ত হয়েছে যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানা শব্দ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

ক) মোটরের কাদা বোমার সপ্লিন্টারের চাইতেও দ্রুতগামী এবং দূরগামী।[৪]

খ) একবার আকাশের দিকে চোখ পড়ল। নিশ্ছিদ্র মেঘে আর নিদ্রিত নগরীর বিষাক্ত প্রশ্বাসে একেবারে গ্র্যানাইটের মতো কঠিন আর জমাট হয়ে রয়েছে।[১]

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভোগবতী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভাঙা বন্দর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৭

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নিশাচর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

গ) দপ্ দপ্ করে একটা আগুন জ্বলে উঠল একটা বাড়ির গাড়িবারান্দার নিচে। রাত্রির বুক চিরে যেন এক ঝলক টাট্‌কা রক্ত পড়ল ছড়িয়ে।[২]

'নীলা' গল্পে প্রতিবাদের রঙ হয়েছে লাল। এ গল্পে কুন্তলা মালিকপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা-সোচ্চার। বিভিন্ন কৌশলে সে চিনিকলের শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে বেগবান করে। প্রতিবাদী এ নারী গল্পের পূর্বাপর পরিধান করে লাল শাড়ি :

ক) লাল টকটকে রঙের শাড়ি পরেছে একখানা, তার তীব্রতা যেন চোখকে আঘাত করে।[৩]

খ) তার তনুদেহকে ঘিরে জ্বলছে লাল-শাড়ির দীপ্তি।[৪]

গ) কুন্তলার গলার শব্দে চমকে উঠল ভাস্বর।... সেই লাল শাড়ি যেন নেশার মতো আচ্ছন্ন করে রয়েছে তাকে।[৫]

'দুঃশাসন' গল্পেও সামাজিক শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী সচেতনতা সৃষ্টিতে 'লাল' এবং লাল অনুষঙ্গবাহী শব্দ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে :

ক) অনেক দূরে থানার লাল রঙের বাড়িটা – দেবীদাসের দোতলা থেকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ওটাকে। রুক্ষ মাটির বুক ফুঁড়ে যেন একটা রক্তজবা ফুটে উঠেছে।[৬]

খ) বন্দরের টিনের চালাগুলো ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে থানার লাল টকটকে বাড়িটা, নিষ্প্রাণ মাটির ফাটা বুকের ভেতর থেকে তার হৃৎপিণ্ডের মতো যেন বেরিয়ে এসেছে একটা রক্তজবা।[৭]

গ) জানিস কেন এত রাঙা হয়েছে ? রক্তে।[৮]

ঘ) কী আশ্চর্য – ভীমের নখের মুখে উছলে উঠছে রক্ত – হাঁ – রক্তই তো ![৯]

ঙ) আদ্দির পাঞ্জাবির হাতায় খানিকটা পানের পিক লেগেছে – যেন রক্তের ছোপ।[১০]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০
[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নীলা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩
[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪
[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫
[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দুঃশাসন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯১
[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৩
[৮] প্রাগুক্ত
[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৬
[১০] প্রাগুক্ত

রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সকল প্রেরণার উৎসস্থল। জাতির যে কোনো দুর্দিনে তিনি বিশ্বকবিকে স্মরণ করেছেন। মৃত্যুর দুদিন পূর্বে (৬ নভেম্বর ১৯৭০) গ্রামোফোন রেকর্ডে নারায়ণ যে দুটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, তার একটি 'রবীন্দ্রনাথকে' :

জলের সেতারে বাজে দিনান্তের সুর
গৈরিক গঙ্গায় বোট চলে –
তিন-পাহাড়ের ছায়া সন্ধ্যার তারাকে ছুঁতে চায় –
দিয়াড়ার ঘরে ঘরে প্রদীপের শিখাগুলি কাঁপে
'নিরুদ্দেশ যাত্রা' পড়ি কিশোরের বিমুগ্ধ আবেগে
তোমাকে প্রথম পাই রক্ত-আলো তরঙ্গিত জলে।

যৌবনের রাত্রি আসে চৈত্র-গন্ধে বিধুর উদাস;

কোথায় নিঃসঙ্গ বাঁশি বাজে :
'যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম-ব্যথা' –
অগণ্য নক্ষত্রপটে অসীম সত্তার দীপায়ন।
আমার জীবন ভরে হে বিরাট তোমার সঞ্চার।

উদ্বেল প্রাণের ঝড় – মিছিলের উত্তাল জনতা;
বাধা-বন্ধ-মৃত্যু ভাঙে – ইতিহাসে অমোঘ স্বাক্ষরে –
আমার রক্তের তালে গুরু গুরু তোমার মন্দিরা :
'ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, ঊর্ধ্বে তোলো শির।'[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সৌন্দর্যভাবনা নারায়ণের কয়েকটি গল্পের শ্রী ও সৌকর্যের উৎস হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে 'তিলঙ্গমা', 'বাইশে শ্রাবণ', 'কনে-দেখা আলো' প্রভৃতি স্মরণীয়। 'কনে-দেখা আলো' গল্পে পাত্রী নির্বাচনের সময় সুকুমারকে রূঢ়দৃষ্টিতে সতর্ক করেছে রবীন্দ্রনাথের একটি চিত্রমূর্তি :

> রবীন্দ্রনাথের মূর্তির দিকে চোখ পড়ল : যেন কঠিন ভর্ৎসনা ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন; আলমারীর বইগুলো যেন গম্ভীর অবজ্ঞায় নির্ধারণ করে দিচ্ছে আমার ক্ষুদ্রতার সীমানা। সঙ্কোচের আর অবধি রইল না।[২]

---

[১] উদ্ধৃত : সঞ্জীবকুমার বসু (সম্পাদিত), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কনে-দেখা আলো', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

'নীলা' গল্পে বাংলাদেশ এবং রবীন্দ্রনাথ অভিন্নভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। গল্পে মাদ্রাজি যুবক ভাস্বর নটরাজন্ এদেশকে চেনে 'ট্যাগোরের দেশ' হিসেবে :

ক) ট্যাগোরের দেশে 'রেড অলিন্ডার্সে'র নন্দিনীকে এখানে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে ?[১]

খ) এই ট্যাগোরের দেশে, এই সবুজ ধান আর পদ্মার দেশে।[২]

গ) ভাস্বর পড়েছে ট্যাগোরের রেড অলিন্ডার্স, গার্ডেনার, পড়েছে লাভার্স গিফ্‌ট আর গীতাঞ্জলি।... অঞ্জনা নদীর ধারে খঞ্জনা গ্রামের প্রান্তে সে খুঁজে ফিরছে কোন্ রঞ্জনাকে, যক্ষপুরীর দেশে নন্দিনীর হাতে জ্বলছে কোন্ মায়ামন্ত্রের প্রদীপ ?[৩]

ঘ) এই কি সেই বাঙলা, ট্যাগোরের দেশ ? এখানেই কি সবুজ ধানের ক্ষেতে কৃষ্ণকলির দেখা মিলবে ?[৪]

ভাস্বরের ব্যক্তিগত-সহকারী কুন্তলা এ গল্পে রূপায়িত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী*র নায়িকা নন্দিনীর আদলে – 'কুন্তলা এসে বসল সোফাতে। বেশবাশ আর রূপসজ্জায় দেখাচ্ছে তাকে মায়াবিনীর মতো। কালো চোখ দুটিতে অলিন্ডার্সের নন্দিনীর স্বপ্নাভাস।'[৫]

'সেই পাখীটা' গল্পেও সঞ্জীব তার স্ত্রী সুনন্দাকে সম্বোধন করেছে নন্দিনী নামে। 'মহলা' গল্পে অভিমন্যু চৌধুরী সহ-অভিনেত্রীর উদ্দেশে বলেছেন – সত্যি বল তো, রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলির চোখদুটি তুমি কোথায় পেলে ?'[৬] 'পিতরি' গল্পে প্রেমিকা সত্যভামাকে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়েছে ধীরেন। 'প্রতিপক্ষে'র গল্পকথক ঘরের ছাদে বসে আবৃত্তি করেছে 'একটার পর একটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা'। কবিগুরুর 'বাঁশি' কবিতার হরিপদ কেরানির সঙ্গে নিজ-ভাগ্যলিপিকে মিলিয়ে দেখেছে 'শুভক্ষণ' গল্পের নিশীথ। বর্ষা ঋতুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আভাসিত হয়েছে 'কলঙ্ক' গল্পে। রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পের প্রসঙ্গ রয়েছে 'তরফদার' গল্পে এবং 'তাসের দেশ' নাটকের প্রসঙ্গ আছে 'তাস' গল্পে। এছাড়া নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক গল্পে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গান উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন :

ক)

১. ঘরেতে এলো না সে তো,

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নীলা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মহলা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

মনে তার নিত্য যাওয়া আসা,

পরনে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর।[১]

২. যখন রবো না আমি মর্ত্যকায়ায়

তখন স্মরিতে যদি হয় মন,

ডেকো না ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায় –[২]

খ)

১. আমার সকল দেহের আকুল রবে

মন্ত্রহারা তোমার স্তবে

ডাহিনে-বামে ছন্দ নামে

নব জনমের মাঝে –

তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ

সঙ্গীতে বিরাজে –[৩]

২. যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে –[৪]

লোকজ-উপাদান

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে বাংলার লোকসংস্কৃতির বিস্তর উপাদান রয়েছে। লোকজীবন থেকে আহরিত প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা, লোকগান, ছড়া, মন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার তাঁর গল্পকে সফল ও সমৃদ্ধ করেছে। নারায়ণের গল্পে ব্যবহৃত লোক-অনুষঙ্গগুলো নিম্নরূপ :

প্রবাদ

১. হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙ লাথি মেরেই থাকে – এ-ই হল দুনিয়ার নিয়ম।[৫]

২. তারা বুঝবে এক হাতে তালি বাজেনি।[৬]

৩. রোমে এসে রোমান না হতে পারলে কী চলে ?[১]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শুভক্ষণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বাইশে শ্রাবণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৭

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬৯

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দুর্ঘটনা', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সঞ্চার', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উদ্বোধন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৪. জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদটা কেউ পছন্দ করেনি।[২]

৫. অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।[৩]

৬. বারে বারে ঘুঘু ধান খেয়ে পালাও – আজ –[৪]

৭. রোমে এসে রোমান হতে হবে।[৫]

৮. ধর্মের ঢাক হাওয়ায় বাজে কিনা।[৬]

৯. ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারবে।[৭]

১০. একেই বলে সাপও মরল না, লাঠিও ভাঙল না।[৮]

১১. কত ধানে কত চাল বেরোয় সেটা বুঝিয়ে দিতে পারব।[৯]

১২. দুধ দিয়ে বাবা কালসাপ পুষেছিলেন।[১০]

১৩. একটুখানি ভুল হলেই মহাভারত একেবারে অসুদ্ধ হয়ে যাবে ?[১১]

১৪. কাকের মাংস কাকে খায় না বাপু।[১২]

১৫. মদন বুনো ওল, কিন্তু নিশি বাঘা তেঁতুল।[১৩]

১৬. মাতঙ্গ পড়িলে দয়ে, পতঙ্গ প্রহার করে।[১৪]

১৭. ন্যাংটোর আবার বাটপাড়ের ভয়।[১৫]

১৮. এমন মুক্তোর হার গিয়ে পড়ল ওই বানরের গলায়।[১৬]

১৯. কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়বার মতো অনুভূতি হল শ্যামলালের।[১]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বনতুলসী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্র্যাকটিস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তমস্বিনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'একটি কৌতুকনাট্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সুখ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৪

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ঘূর্ণি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৭

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ইজ্জৎ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৫

[৮] প্রাগুক্ত

[৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উস্তাদ মেহের খাঁ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৫

[১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৮

[১১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৯

[১২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ছলনাময়ী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫২

[১৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নক্র-চরিত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৫

[১৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালো জল', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৪

[১৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'পুষ্করা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৯

[১৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মর্গ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭২

২০. কাঁহাতক আর ভালো লাগে এই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ?[২]

বাগধারা

১. তুই একেবারে গবেট ভালো-মানুষ – পয়লা নম্বরের ভিতুর ডিম।[৩]

২. একটা ইলিশ মাছ বারো আনা ! মগের মুলুক ছাড়া একে আর কী বলা যায় ![৪]

৩. তুমি আদার ব্যাপারী, সে খোঁজে তোমার কী দরকার ?[৫]

৪. আমি চিনির বলদ – বোঝা টেনে চলেছি, টেনেই চলব।[৬]

৫. ঘোড়াড্ডিম ধম্মো কম্মো। আমি কাউকে ডরাই নে।[৭]

৬. নড়া-চড়া কিচ্ছুটি নেই, যেন কাঠের পুতুল।[৮]

৭. তিন যুগের ভুষুণ্ডী কাগ হয়ে বসে রয়েছে।[৯]

৮. মানুষগুলো ক্ষেপে উঠেছে, মেতে উঠেছে জয়ের আনন্দে। এ যেন সাপের পাঁচখানা পা দেখবার আনন্দ।[১০]

৯. যেসব রুটি-মাংসের দোকানগুলো এ পর্যন্ত কোনো দিন ঝাঁপ বন্ধ করেনি – সেখানে অবধি রাবণের চুলোয় আঁচ পড়েনি আজ।[১১]

১০. তাসের গড়া সংসার তো দুর্ভিক্ষের এক দমকাতেই ভেঙে পড়েছে।[১২]

১১. শালা স্রেফ রাঘববোয়াল। ওর মুখটা বন্ধ না করলে আর –[১৩]

১২. শুনছি সত্যযুগ আসছে, কল্কি অবতার নামবেন মর্ত্যে মহাপাপীদের বিনাশ করতে।[১৪]

১৩. অনেকক্ষণ ধরে তীর্থের কাকের মতো বসে আছে লোকটা।[১৫]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ঘাসবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩৬

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নেতার জন্ম', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৫

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উদ্বোধন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ধানশ্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫১

[৫] প্রাগুক্ত

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৫

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সেই মৃত্যুটা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫

[৮] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দোসর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৫

[৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিসর্জন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫২

[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বন্দুক ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৮

[১১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নতুন গান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৭

[১২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তীর্থযাত্রা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৫

[১৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নক্র-চরিত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৭

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৮

[১৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দুঃশাসন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯০

১৪. পুষ্করাই লাগুক আর ঘোড়ার ডিমই লাগুক – ওতে আমার আর কী হবে ঠাকুর।[১]

১৫. অজিতবাবু ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, ব্যাটার ভক্তি দেখ একবার। বিড়ালতপস্বী আর কাকে বলে ![২]

১৬. তীর্থের কাকের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেছি দিনের পর দিন।[৩]

গ্রামজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত গল্পের পট-পরিবেশকে বিশ্বাসযোগ্যতা দানের প্রয়োজনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রামজীবনে প্রচলিত ছড়া ও লোকগান ব্যবহার করেছেন। এসব গানে লোকজ মানুষের প্রেম-ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-যন্ত্রণা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। নারায়ণের গল্পে ব্যবহৃত লোকগান ও ছড়ার অংশবিশেষ লক্ষণীয় :

১. ও বন্ধু রে –
সোনার খাটে বসো তুমি রূপার
খাটে পাও –[৪]

২. রঙ্গিলা নাও স্রোতে বাইয়া
বন্ধু আসে ভিনদেশিয়া
আর আপন ভুলে রূপবতী
ভাসায় কলসখান –[৫]

৩. কোন্ দেশেতে গেলা বন্ধু
পাথার দিয়া পাড়ি,
আমার সাথে দিয়া গেলা
জীবন-ভরা আড়ি রে –[৬]

৪. মুখ তুলে চাও সজনি –
তোমারি নাম বাঁশিতে মোর
বাজে লো দিন-রজনী।[৭]

৫. ওলো, মন-মজানো বিনোদিনী রাই লো –

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'পুষ্করা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৯

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালনেমি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯৪

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মর্যাদা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৯

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উত্তম পুরুষ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ঘূর্ণি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৩

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪২

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ধানশ্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮

তোমার প্রেম-সায়রে ডুব দিয়েছি

তল তবু না পাই লো ![1]

৬. একদা তুমি প্রিয়ে

আমারি এ তরুমূলে

বসেছ ফুলসাজে

সে-কথা কি গেছ ভুলে ?[2]

৭. আমার ঠাকুর তের্‌নাথ কিছু নাহি চায়,

এক পয়সার গাঁজা দিয়া তিন কলকি সাজায়

রে সাধু ভাই

দিন গেলে তের্‌নাথের নাম লইয়ো।[3]

লোকছড়া

১. পানকৌড়ী পানকৌড়ী, ডাঙায় ওঠো সে,

তোমার শাশুড়ী বলে গেছে বেগুন কোটো সে...

বেগুন হল চাকা চাকা,

বউ হবে খাঁদা নাকা –[4]

২. দেখ ফরিদ কুদরৎ

তেল-নিমক-আদরৎ –[5]

৩. বুড়ো পাদ্রী নেহাৎ পাগল,

ঠোঙ্গা সাহেব আদত ছাগল।[6]

৪. প্যাটেতে ভাত নাই ও শিব,

গোলাতে নাই ধান,

---

[1] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩

[2] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘দিনান্ত’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৮

[3] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘ভাঙা বন্দর’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৭

[4] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘লক্ষ্মীর পা’, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[5] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘তিতির’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

[6] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘একটি শত্রুর কাহিনী’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫

কী দিয়া বাঁচাব ও শিব

ছেল্যা পিল্যার জান।[১]

৫. হাটের চুচুরা মাছ, বাড়িন বাইগন,

তাই খায়্যে বুড়াবুড়ীর নাচন কোন্দন।[২]

মন্ত্র

কফ্‌ফল, কফ্‌ফল, কফ্‌ফল –

চোরের রাত্তির নিষ্ফল !

সাপা, চোরা, বাঘা না বাড়াইও পাও –

যদ্দূরে যায় কফ্‌ফলের রাও ![৩]

বৈষ্ণব পদাবলি

বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বৈষ্ণব পদাবলির ভাবসৌন্দর্য সম্পর্কে স্বভাবতই সচেতন ছিলেন। সঙ্গতকারণে তিনি বৈষ্ণব কবিদের বিভিন্ন পদ এবং রাধা-কৃষ্ণের লীলাভঞ্জনের বিচিত্র অনুষঙ্গ তাঁর গল্পে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত করেছেন। কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখযোগ্য :

১. ছোড়ল আভরণ মুরলী-বিলাস,

পদতলে লুটাই সো পীতবাস !

সখিরে, যাক দরশ বিনু ঝুরই নয়ান –

অব নাহি হেরসি তাকে বয়ান– ...

সুন্দরী তেজহ দারুণ মান –

পদতলে লুটই রসিক কান –[৪]

২. রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,

প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর !

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বন-বিড়াল', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২৫

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ধানশ্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে –
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে –[1]

৩. নিত প্রভাত ভব তিঁবির ছুটে
অন্তর তিঁবির ছুটত নাহি।
সত্যরূপ প্রেমরূপ পহুঁ
পৈঠহুঁ আন্তর মাহি –[2]

৪. ধীরে সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী,
গোপী-পীন–পয়োধর –[3]

বৈষ্ণব পদাবলির সমান্তরালে নারায়ণের গল্পে রয়েছে কালীকীর্তন –

১. কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক হল্‌দি গায় মেখে নাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে,
ডুব দে রে মন, কালী বলে –[4]

২. তোর খাঁড়ার ঘায়ে মায়ার বাঁধন
ঘুচিয়ে দে মা শ্মশানকালী –[5]

উপমা-উৎপ্রেক্ষা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে অলঙ্কার প্রয়োগে সার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ঘটনা ও চরিত্রকে অনেকবেশি স্পষ্ট করবার প্রয়োজন থেকেই তিনি অলংকার ব্যবহার করেছেন। বিশেষত উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগে তিনি প্রদর্শন করেছেন সর্বাধিক কৃতিত্ব। উপমা যেহেতু অভিজ্ঞতার ভাষা, সেহেতু তাঁর গল্পে ব্যবহৃত উপমা অনেকবেশি তাঁর অভিজ্ঞতালোক থেকে চয়ন করেছেন তিনি। এর ফলে অলংকারগুলো হয়ে উঠেছে জীবনসংলগ্ন এবং গল্পে উপস্থাপিত চরিত্রপাত্রের যাপিত জীবনের সঙ্গে গভীর ঐক্যে একীভূত। তাঁর গল্পের

---

[1] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৮
[2] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩০
[3] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নতুন গান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৪
[4] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দরজা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৩
[5] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ছলনাময়ী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৩

উপমান-উৎস হিসেবে কখনো প্রযুক্ত হয়েছে ফুল-পাখি-প্রজাপতি, কখনো কুকুর-বেড়াল-শেয়াল-শকুন, কখনো হিংস্র সরীসৃপ, কখনো অবপ্রাণী কিংবা জলজ মাছ।

জীবনসংগ্রামে পরাজিত পুরুষ নারায়ণের গল্পে কুকুর-বেড়ালের হতদশার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে। এ ধরনের পুরুষ আবার সুযোগ বুঝে শকুনের ন্যায় লোভীদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে, সাপের মতো ফণা তুলে শিকারের অপেক্ষা করেছে, কখনো বন্যজন্তুর শক্তি নিয়ে হিংস্ররূপ ধারণ করেছে। নদী-তীরবর্তী মানুষের জীবনযাত্রা চিত্রায়ণে লেখক প্রয়োগ করেছেন মাছের উপমান। উদ্বাস্তু জনতা কিংবা নিম্নশ্রেণির করুণ-চেহারা তিনি অনুসন্ধান করেছেন অবপ্রাণির মধ্যে। অন্যদিকে যুদ্ধবিধস্ত সমাজের ভগ্নরূপ প্রকাশিত হয়েছে অপশক্তির আকারে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিক্ষোভ-বিদ্রোহের গল্পে রয়েছে আগুন-অস্ত্র-রক্তের নানামাত্রিক ব্যবহার। এসব উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার প্রয়োগের দৃষ্টান্তসমূহ লক্ষণীয় :

ফুল

১. এমন একটি মেয়েকে আমরা পেতে চাই যে পাতায় ঢাকা ফুলের মত।[১]

২. পারুলফুলের মতো মুখখানি থেকে পাপড়ি ঝরে গেছে অনেকগুলো। চোখের কোণে কোণে কালি।[২]

৩. নরম গোল হাতখানিকে একটা ফুটন্ত পদ্মের মতো মনে হয়।[৩]

৪. নির্মল চাঁদের আলো অসীম প্রীতি আর বিশ্বাসের মতো ঝরে পড়ছে – ছড়িয়ে যাচ্ছে যেন রজনীগন্ধার অসংখ্য ছিন্ন পাপড়ি।[৪]

৫. চাঁপা ফুলের মতো হাতখানা কোলের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে সুকুমার নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে।[৫]

৬. বৃষ্টি-ধোয়া পদ্মের মতো মুখখানা রাধা তুলে ধরেছিল সুধাকরের দিকে।[৬]

৭. হিমাংশু দেখল শরতের হলুদ রোদে তার রঙ কাঁটালিচাঁপার পাপড়ির মতো।[৭]

৮. ট্যাঙ্কের জলটায় বেলাশেষের রঙ দুলছে একরাশ মরসুমী ফুলের পাপড়ির মতো।[৮]

৯. সে চোখ পলাশ ফুলের মতোই আরক্তিম।[৯]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তিলঙ্গমা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শুভক্ষণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গিলটি', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বীতংস', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নীলা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ধানশ্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৩

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দিনান্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৮

[৮] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কল্প-পুরুষ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৪

১০. যৌবনের ভরা লাবণ্যে বিশাখা এখনো টলমল করছে শতদল পদ্মের মতো।[২]

১১. এত সহজে হাত বাড়িয়েছে যে, যেন একগুচ্ছ রজনীগন্ধা এগিয়ে দিয়েছে কাউকে।[৩]

১২. পদ্ম-কলির মতো সূর্যটা এখন প্রখর আর প্রচণ্ড।[৪]

১৩. তার ছোট বোন পদ্ম। পদ্মফুলের মতোই টুকটুকে মুখ।[৫]

১৪. অনেক কষ্টে বিয়ে করেছিল বরাশ ফুলের মতো সুন্দরী একটা মেয়েকে।[৬]

১৫. হৃৎপিণ্ড তখনও জলের ঢেউ-লাগা পদ্ম-পাতার মতো দোল খাচ্ছে।[৭]

১৬. বিছানার ওপর শীতের পাপড়ী ঝরা পদ্মের মতো লুটিয়ে আছে মিনু।[৮]

প্রজাপতি

১. বিলাতী সিনেমায় প্রজাপতির মতো রঙীন হয়ে দল বেঁধে এসেছে বাঙালীর মেয়েরা।[৯]

২. হাওয়ার ওপর পা ফেলে দিয়ে প্রজাপতির মতো ঘরের মধ্যে ভেসে এল সত্যভামা।[১০]

৩. এক টুকরো ভবঘুরে মেঘ সেখানে থমকে দাঁড়িয়েছিল, যেন একটা সাদা প্রজাপতি।[১১]

৪. এখনই প্রজাপতির মতো ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে নমিতা।[১২]

৫. চমৎকার গাড়িটা। যেন প্রজাপতির মতো পাখা মেলে উড়ছে।[১৩]

৬. তার রঙীন শাড়ির আঁচলটা বাতাসে উড়ছে পলাতক প্রজাপতির প্রসারিত পাখনার মতো।[১৪]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উন্মেষ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৩

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,'নক্র-চরিত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৬

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তিমিরাভিসার', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭৯

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হাঁস', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬১

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালো মোটর', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৭

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'জান্তব', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কনে-দেখা আলো', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

[৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

[৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নীলা', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'পিতরি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩

[১১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দিনান্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৮

[১২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'অপঘাত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০০

[১৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কবর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৫

[১৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বন-বিড়াল', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২৬

পাখি

১. ভীরু চড়াইপাখির বুকের মতো কাঁপছে হাতখানা, ঘামে ভিজে উঠেছে।[১]

২. গুলি খেয়ে তারই বুকে আহত পাখির মতো লুটিয়ে পড়েছিল লোকেশ।[২]

৩. সাদা বকের মতো পাখাটা ঘুরছে মাথার ওপর।[৩]

৪. দুটো সাদা পর্দা নেমে এসেছে যমুনার খোলা চোখে – যেন মরা পাখীর চোখ।[৪]

৫. নেশায় জড়ানো পাখির কাকলির মতো তার গলা।[৫]

৬. একেবারে ওজন নেই গায়ে, একেবারে পাখির মতো হাল্‌কা।[৬]

৭. এই মুহূর্তে একটা ছোট পাখির মতো তাকে মুঠোয় করে তুলে নিতে পারে রণজিৎ।[৭]

৮. প্রায় নিঃশব্দে পাখির মতো উড়ে গেল রেখা।[৮]

৯. পাখির একটা পালকের মতো হাওয়ায় উজ্জ্বল রোদের মধ্য দিয়ে ভেসে চলেছে ও।[৯]

১০. রোদে কুচি কুচি পাখির পালকের মতো উড়ে উড়ে ছিটকে যেতে লাগল কাঠের টুকরোগুলো।[১০]

১১. পাখীর মতো হালকা মেয়েটা। এক হাতে তাকে তুলে নেওয়া চলে।[১১]

১২. ঠোঁটদুটো বড্ড বেশি টকটকে লাল – যেন টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো দেখতে।[১২]

কুকুর-বেড়াল

১. মাড়ির দুপাশে দুটো ক্যানাইন টীথের মতো দাঁত – তাই দিয়ে টেনে টেনে মাংস ছিঁড়ত কুকুরের মতো।[১৩]

২. আহত কুকুরের মতো সঙ্গী আর্তনাদ করে উঠল।[১৪]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'একজিবিশন', প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ইতিহাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৩

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ঘূর্ণি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪১

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দিনান্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৭

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিসর্জন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৪

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ধস্‌', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৪

[৮] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭২

[৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হরিণের রঙ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৭

[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'জন্মভূমিশ্চ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১২

[১১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ঘাসবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪০

[১২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উর্বশী', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২০

[১৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'অমনোনীতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

[১৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নিশাচর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

৩. শিকারী কুকুরের মতো উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ালো জোসেফ।[১]

৪. পায়ের কাছে পোষা কুকুরের মতো বসে আছে জোসেফ।[২]

৫. চাবুকের সামনে কুঁকড়ে-যাওয়া কুকুরের মতো সঞ্জীব স্তব্ধ হয়ে গেল।[৩]

৬. বনবেড়ালের লুব্ধ পিঙ্গল চোখের মতোই জ্বলে উঠল সুধাকরের চোখ।[৪]

৭. একটা পোষা বেড়ালের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে উদ্‌টা।[৫]

৮. বসে ছিল নিজের ভেতরে মাথা মুখ গুঁজে কুণ্ডলি-পাকানো একটা কুকুরের মতো।[৬]

৯. ঠিক কুকুরের মতো জলের ওপর নাকটা তুলে তুর তুর করে পেরিয়ে যায় দু-এক মাইল।[৭]

১০. কখনও পিণ্ডি পাকিয়ে বসে থাকে, কখনো কুকুরের মতো কুণ্ডলী করে ঘুমোয়।[৮]

১১. শুধু কুকুরের বেঁড়ে ল্যাজের মতো মাথার টিকিতে ব্রাহ্মণত্বের জয়গৌরব ঘোষিত হচ্ছে।[৯]

১২. দেউড়ির কাছাকাছি আসতেই উৎকর্ণ একটা কুকুরের মতো থমকে দাঁড়াল শঙ্কর।[১০]

১৩. বেড়ালের মতো চোখ দুটো চক্‌চক্ করছে কি দেশপ্রেমের বহ্নিতে, না কোনো চাপা বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ সংকেতে ?[১১]

শকুন

১. চেহারা দেখলে বেশ বোঝা যেত সেটা শুকনো, মরা মুখে শকুনের ঠোঁটের মতো একট খাড়া নাক ?[১২]

২. ছাড়া-ছাড়া মেঘ যেন শকুনের রক্তমাখা ডানা ছড়িয়ে দিত।[১৩]

৩. নিশি কর্মকারের শকুনের মতো চোখ দুটোর ওপর সংশয়ের ছায়া এল ঘনিয়ে।[১৪]

৪. নিশির শকুনের মতো চোখ দুটো বিনয়ে কাতলা মাছের মতো নির্বোধ হয়ে এল।[১৫]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘একটি শত্রুর কাহিনী’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘সেই পাখীটা’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘ধানশ্রী’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬২

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৫

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘দিনান্ত’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৩

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘দোসর’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪০

[৮] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘বিসর্জন’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫২

[৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘ইজ্জৎ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯১

[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘উস্তাদ মেহেরা খাঁ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৭

[১১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘কালনেমি’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯৫

[১২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘দ্বৈত’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[১৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘লাল ঘোড়া’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪১

[১৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘নক্র-চরিত’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭২

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৭

৫. খাতায় সে নাম লিখছে বটে, কিন্তু দৃষ্টিটা মরাগোরুলোভী শকুনের মতো তীক্ষ্ণ আর নির্লজ্জ।[১]

সাপ

১. আধবোজা মিটমিটে চোখে তাকায় ঠিক সাপের মতো।[২]

২. সুন্দরলালের দুটো চোখে যেন গোখরা সাপ উঁকি মারতে লাগল।[৩]

৩. ঘা-খাওয়া সাপের মতো ফণা তুলল ভাস্বর।[৪]

৪. অন্ধকারে ফণীমনসার বেড়াগুলো যেন কালো কালো গোখরা সাপের মতো ফণা তুলে রয়েছে।[৫]

৫. বন-তুলসীরা সাপের মতো কিলবিল করে আমাকে আঁকড়ে ধরল।[৬]

৬. এদিকের রাস্তাটা এগিয়ে এসেছে সাপের মতন পাকে পাকে।[৭]

৭. সুনন্দা সাপের মতো অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সঞ্জীবের দিকে।[৮]

৮. সাপের চোখের মতো তার আকর্ষণ-প্রভাব।[৯]

৯. কালো কালো ঘূর্ণি যেন সাপের কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।[১০]

১০. ধুলোপড়া-খাওয়া সাপের মতো মাথা নত করল যা কিছু উত্তেজনা।[১১]

১১. বিচিত্র তার গোঙানির আওয়াজ, মনে হয় যেন সাপে ব্যাং ধরেছে কোথাও।[১২]

১২. খোঁচা-খাওয়া গোখরো সাপের মতো ফণা তুললেন জয়াবতী।[১৩]

১৩. সাপের জিভের মতো ধারালো টর্চের আলো এসে পড়ল উর্মিলার চোখে।[১৪]

১৪. সাপের ছোবল মারার মতো আওয়াজ তুলল তার হাতের চাবুকটা।[১৫]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভাঙা চশমা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৬

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'আসানসোলের লোকটা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বীতংস', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নীলা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তৃণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বন-তুলসী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সেই পাখীটা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯

[৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬

[৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ঘূর্ণি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫

[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তীর্থযাত্রা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪২

[১১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'খড়ুগ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩২

[১২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মর্গ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭২

[১৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তিমিরাভিসার', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯০

[১৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দক্ষিণান্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭১

[১৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'একটি অমর রাত্রি', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮১

১৫. কিন্তু মানুষ পোষ মানে না। সাপের মতো তার স্বভাব।[১]

জীবজন্তু

১. হাত ছেড়ে দিল চিন্ময়, কিন্তু তার চোখ দুটো বুনো জন্তুর মতো জ্বলছে তখন।[২]

২. বড় বড় মোষগুলোকে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত মনে হচ্ছে এখন।[৩]

৩. সীমান্তরেখায় একটা বিশাল বন্য মহিষের মত শুশুনিয়া পাহাড় – সব তার কাছে নতুন।[৪]

৪. একটা বুনো জন্তুর মতো ওপারের বনতুলসী আর লেবুঘাসের বনের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন।[৫]

৫. তারই জন্যে প্রতীক্ষা করছে লোকনাথ – পায়চারি করে বেড়াচ্ছে বন্য জন্তুর মতো।[৬]

৬. চোখের রঙ ক্ষ্যাপা বুনো মোষের মতো রক্তাভ।[৭]

৭. বুনো মোষের মতো গোঁ গোঁ করতে করতে সনাতন বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল।[৮]

৮. এই দুর্যোগের পটভূমিতে যেন হিংস্র একটা বন্য শক্তির মতো আবির্ভূত হয়েছে সে।[৯]

৯. একটা দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস এসে আমার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল – বন্যজন্তুর নিঃশ্বাসের মতো।[১০]

১০. একটা বুনো জানোয়ারের মতো সত্যেন ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।[১১]

বাঘ

১. মেয়েদের ঠোঁটগুলোকে বাঘের মতো মনে হওয়ার কারণ আছে।[১২]

২. বিলের জল ঝলমল করছে যেন বাঘের চোখ।[১৩]

৩. চুলের স্বল্পতার ক্ষতিপূরণ করা হয়েছে বাঘের মতো প্রকাণ্ড মুখখানায়।[১৪]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'জান্তব', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্রপাত', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কেয়া', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উত্তম পুরুষ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সুখ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বন্দুক', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৮-৭০৯

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৯

[৮] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শিল্পী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৮

[৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ধস্', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৬

[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভাঙা চশমা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৮

[১১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দুর্ঘটনা', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

[১২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'একজিবিশন', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

[১৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তৃণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

[১৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তরফদার', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭

৪. বাঘের জিভের মতো সড়কি বল্লম টাঙির ফলা।[১]

৫. কয়েক মুহূর্ত নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে ছিল রহমানের দিকে – যেন রক্তখেকো একটা বাঘের মতো ওর ঘাড়ের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।[২]

৬. খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো ভয়ঙ্কর একটা গর্জন ছেড়ে স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সনাতন।[৩]

৭. হিংস্র বাঘের মতো মুখ করে উস্তাদজীর ঘরে ঢুকল শঙ্কর।[৪]

৮. বাঘের মতো দপ্‌দপিয়ে উঠেছে রণজিতের চোখ।[৫]

৯. খাঁচায় বন্দী বাঘের মতো একটা চাপা গর্জন যেন বেরিয়ে এল তার গলা থেকে।[৬]

১০. ড্যাম্‌ – সোয়াইন ! – বাঘের মতো গর্জে উঠল লোকটা।[৭]

শুকর

১. মানুষ বলে চেনা যায় না; জ্বলন্ত কাঠকয়লার নীচে পোড়া শুয়োরের মতো দেখাচ্ছে।[৮]

২. মাথার শাদা-কালো চুলগুলো সমান মাপে নিরপেক্ষভাবে ছাঁটাই করা – যেন শুয়োরের গায়ের রোঁয়া।[৯]

৩. বৌ-বেটির পরনে কাপড় জোটে না, পেট ভরে ভাত না খেয়ে, কন্দ আর কচু খুঁড়ে বেড়াতে হয় শুয়োরের মতো।[১০]

মাছ

১. তারপরেই ছলাৎ করে শব্দ হল – যেন বড় একটা রুই মাছ উলাস্‌ দিয়ে উঠল জলের ওপর।[১১]

২. চড়াটা পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা বোয়াল মাছের সাদা পেটের মতো।[১২]

৩. কাত্‌লা মাছের মতো প্রকাণ্ড মুখখানায় ভয়ঙ্কর হাসি ফুটিয়ে তুলেছে ফরিদ।[১৩]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সীমান্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৩

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বন্দুক', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৭-৭০৮

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শিল্পী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৭

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৭

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ধস্‌', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৫

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মমি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪২

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'একটি অমর রাত্রি', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮১

[৮] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নিশাচর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২

[৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ধন্বন্তরি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮

[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ইজ্জৎ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৭

[১১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ঘূর্ণি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫০

[১২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিসর্জন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৯

[১৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তীর্থযাত্রা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৫

পোকামাকড়

১. এদেরই ছোট ছোট ছেলেপুলে মুদী-দোকান-ঝাঁট-দেওয়া আরশোলার মতো পথে পথে ঘোরে।[১]

২. মনে আছে ? জোঁকের মত লেগে রয়েছে।[২]

৩. ব্যাগের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কতকগুলো টাইপ করা কাগজ, তাতে লাইন করা পিঁপড়ের মত অঙ্কের সারি।[৩]

৪. কাঁকড়াবিছের ল্যাজের মত তার গোঁফজোড়া, দুপাশে অদ্ভুত ভঙ্গিতে পাকানো।[৪]

৫. এমন করে ব্যাঙের মতো বসে থাকলে চলবে না।[৫]

৬. সব গড্ডলিকা-প্রবাহ বললেও বেশি বলা হয়– তারা যেন পিঁপড়ের সার।[৬]

৭. পানিজোঁকের মতো লিকলিকে আঙুল দিয়ে গা চুলকোতেন।[৭]

৮. প্রদীপের চারপাশে যেন পুড়ে মরবার জন্যেই উড়ে বেড়াচ্ছে পতঙ্গের দল।[৮]

অপশক্তি

১. মড়ার খুলির মতো কোটরে বসা চোখ-মুখ।[৯]

২. মনে হচ্ছে কোথায় যেন উড়ছে প্রায় অশরীরী একটা বিরাট পতঙ্গ।[১০]

৩. বেশবাশ আর রূপসজ্জায় দেখাচ্ছে তাকে মায়াবিনীর মতো।[১১]

৪. নিশীথ নগরীর এই ভয়ার্ত ক্লিন্ন রূপ শ্বাসরোধী অপমৃত্যুর মতো নিষ্প্রদীপের অন্ধকার।[১২]

৫. ইছাপুরের একটা জনহীন প্রান্তরের ভেতরে প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে রমাপতি।[১৩]

৬. কিন্তু তার সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। এ যেন রাক্ষসের লোলুপতা।[১৪]

৭. মেয়ের মতোই চুল ছিল মায়ের – হয়তো রূপও ছিল। কিন্তু এ যেন প্রেতিনীর মূর্তি।[১]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গাছের সারি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মোহীনের কাকা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মাধ্যাকর্ষণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কেয়া', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উত্তম পুরুষ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তরফদার', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তমস্বিনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৫-৪৬৬

[৮] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভাঙা বন্দর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩১

[৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'রাঙা মাসিমা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নীলা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

[১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

[১২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নিশাচর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯

[১৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ডিনার', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯

[১৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'পিতরি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১

৮. এখন তার চোখের সামনে এইগুলো যেন প্রেতচ্ছায়ার মতো দুলতে লাগল।[২]

৯. চোখের তারাদুটো বিস্ফারিত, এক রাশ রুক্ষ চুল উড়ছে ডাকিনীর মতো।[৩]

১০. ওই আলোকরেখার বাইরে অবশিষ্ট জঙ্গলটায় যেন প্রেত-পুরীর জমাট অন্ধকার।[৪]

১১. হাতের বোনাটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিরণলেখা – যেন ভূত দেখল।[৫]

১২. গাছের ডালে ডালে ডাইনীর চুলের মতো শ্যাওলা ঝুলছে।[৬]

১৩. সরলার চোখ রাক্ষসীর মতো জ্বলছে।[৭]

১৪. তার সর্বাঙ্গে অজস্র জোনাকি জ্বলছে ভূতের চোখের মতো।[৮]

১৫. কালো নগ্ন পা দুটোকে দেখাচ্ছে অস্বাভাবিক দীর্ঘ – যেন ভূতের পা।[৯]

১৬. কী অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে নীলাই – যেন মরা মানুষের চোখ।[১০]

১৭. ভাঙা কাঁসরের মতো গলায় অদ্ভুত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল সারদা, যেন প্রেতিনীর আর্তনাদ।[১১]

১৮. প্রেতিনীর মতো তীক্ষ্ণ গলায় প্রায় ককিয়ে উঠল শকুন্তলা।[১২]

১৯. তাদের চোখে সে জ্যোৎস্না যেন দেখা দেয় কঙ্কালের খানিকটা হাসির মতো।[১৩]

আগুন

১. কামনায় যেন শাণিত খানিকটা কালো আগুন দেহ-প্রদীপগুলিতে উঠল শিখায়িত হয়ে।[১৪]

২. আগুনের মতো জ্বলছে অতি তীব্র শক্তির বৈদ্যুতিক আলোটা।[১৫]

৩. খবর পেয়ে ভাস্কর জ্বলতে লাগলো মশালের মতো।[১]

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হলদে চিঠি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সুখ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'টোপ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৬

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ধস্', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৫

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৮

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তীর্থযাত্রা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৫

[৮] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নক্র-চরিত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৩

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮১

[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'খড়্গ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩১

[১১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ডিম', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৯

[১২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বাইশে শ্রাবণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬৭

[১৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দুর্ঘটনা', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১

[১৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বীতংস', *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

[১৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হাড়', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

৪. যমুনার মতো একটা ভিজে কাঁথা নয় – তেতে থাকত আগুনের মতো।[২]

৫. ছোট একটি প্রদীপের শিখা যেন মশালের আগুন হয়ে জ্বলে উঠেছে এখানে।[৩]

৬. জানলা-দরজার প্রত্যেকখানা কাচ দুলতে থাকে আগুনের শিখার মতো।[৪]

৭. আকাশে আগুনের মতো উড়ত টাকার ফুলকি।[৫]

৮. লাল টকটকে চোখ দুটো জ্বলছে যেন আগুনের বিন্দু।[৬]

৯. আকাশের রোদ যেন আগুনের মতো গলে গলে পড়ছে।[৭]

১০. তিন-চারটে কয়লার গুঁড়ো চোখে এসে পড়ল আগুনের ফুলকির মতো।[৮]

রক্ত

১. গার্ডের গাড়ীর লাল আলো অনেক দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে রক্তবিন্দুর মতো।[৯]

২. আলোর শরীরে দপদপ করতে লাগল রক্তবিন্দুর মতো।[১০]

৩. টকটকে ফরসা ত্বকের ভেতর দিয়ে যেন রক্ত-কণিকা বাইরে ফুটে বেরিয়ে পড়ছে।[১১]

৪. রাত্রির বুক চিরে যেন এক ঝলক টাট্‌কা রক্ত পড়ল ছড়িয়ে।[১২]

অস্ত্র

১. গলার আওয়াজ তো নয়, যেন কামান দাগছে ![১৩]

২. ছুরির ধারের মতো খানিকটা তীক্ষ্ণ বঙ্কিম হাসি গৌরীর ঠোঁটের ওপর দিয়ে খেলে গেল।[১৪]

৩. বুদ্ধিতে ছুরির ফলার মতো ঝক্‌ঝক্ করত চোখ।[১]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নীলা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ঘূর্ণি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'অপঘাত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৫

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কল্পপুরুষ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬২

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভাঙা বন্দর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩০

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'খড়ুগ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৫

[৭] প্রাগুক্ত

[৮] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শ্বেতকমল', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১৭

[৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'খুনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গিলটি', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

[১১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হাড়', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

[১২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নিশাচর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

[১৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কেয়া', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

[১৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গিলটি', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

৪. সোনা-পিসীমার কাসির শব্দটা তীরের মতো এসে আমার কানে বিঁধতে লাগল।[২]

৫. পাইকারের কথাগুলো শুনতে ভালো লাগে না, কিন্তু মনের মধ্যে গিয়ে তলোয়ারের আগার মতো খোঁচা মারে।[৩]

৬. টর্চ লাইটের তীব্র ঝাঁকালো আলো কম্পাউন্ডারের গায়ে এসে পড়ল বন্দুকের গুলির মতো।[৪]

৭. সেই ছবিটা হিমাংশুর হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বিঁধে রইল ছোরার মতো।[৫]

৮. রাইফেলের গুলির মতো কর্ণপটহ বিদীর্ণ করে তা সনাতনের মরমে গিয়ে প্রবেশ করতে লাগল।[৬]

৯. শানাইওয়ালার বাজনাটা যেন ছুরির খোঁচার মতো এসে ঘা দিচ্ছে কানে।[৭]

১০. তীরের মতো সোজা হয়ে উস্তাদজী দাঁড়িয়ে উঠলেন।[৮]

১১. খবরটা বুকে এসে লেগেছে বন্দুকের গুলির মতো।[৯]

১২. শুধু অগ্নিকোণে থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝলকায় ধারালো বেয়নেটের ফলার মতো।[১০]

১৩. কড়া রোদ – ক্ষুরের ধারের মতো রোদ।[১১]

১৪. বুকের পাঁজরাগুলো ভেঙে গিয়ে হৃৎপিণ্ড-ফুসফুসের মধ্যে বিঁধে আছে কতগুলো তলোয়ারের ডগার মতো।[১২]

১৫. এক-একটা শব্দ যেন গুলতির গুলির মতো মাথার ভিতরে বিঁধতে থাকে।[১৩]

১৬. ওই আংটিটায় একটা ছোরার ফলা যেন ওঁর রূপের প্রহরী হয়ে আছে।[১৪]

---

[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দাম', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

[২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্রদীপ ও প্রজাপতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'তৃণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮

[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ধন্বন্তরি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭

[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'দিনান্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৭

[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শিল্পী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৭

[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৭

[৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৮

[৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কল্প-পুরুষ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৫

[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'অধিকার', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৩

[১১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'জন্মভূমিশ্চ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১০

[১২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শ্বেতকমল', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২০

[১৩] প্রাগুক্ত

[১৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'হাত', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২৯

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে। কথাসাহিত্য, বিশেষত ছোটগল্প রচনায় তিনি প্রদর্শন করেছেন অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব। সমাজ-রাজনীতি এবং বৈচিত্র্যময় মানবীয় অনুষঙ্গ ও প্রসঙ্গই ছিল তাঁর ছোটগল্পশিল্পের ইপ্সিত বিষয়। সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিপন্ন মানুষের জীবন-বিপর্যয়ের চিত্রই হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটগল্পের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। মধ্যবিত্তের স্বরূপ উন্মোচনেও তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। তাঁর গল্পে চিত্রিত অধিকাংশ মধ্যবিত্তই পেশাজীবী : শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী। এরা প্রায়ই সমাজপতিদের হৃদয়হীন তাণ্ডবে বিপর্যস্ত জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। প্রতিকূল সামাজিক পরিস্থিতিতে অনেকে প্রতিবাদী ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে, সামাজিক অন্যায়-অপকর্মের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছে বলিষ্ঠ প্রতিরোধ; আবার অনেকে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দ্বন্দ্বে দিগভ্রান্ত হয়েছে, শুভবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে অনেকে আপসকামিতার আশ্রয় নিয়েছে, কেউ ধাবিত হয়েছে অন্ধকারপথে।

নিম্নশ্রেণির জীবনযাপনের চিত্রাঙ্কনেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দক্ষতা প্রশংসনীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নারকীয় পরিস্থিতিতে এদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে নাজুক। অভাব-অনটন, ক্ষুধা-দারিদ্র্য কেড়ে নিয়েছে তাদের প্রতিবাদস্পৃহা। অস্তিত্বরক্ষার স্বার্থে এরা বিস্মৃত হয়েছে প্রেম-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, নীতি-নৈতিকতা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে জমিদার-জোতদার শ্রেণির পাশাপাশি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্তাব্যক্তিদের চালচিত্রও প্রদর্শিত হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের বদান্যতায় এদের কেউ-কেউ ভূষিত হয়েছেন ‘রাজাবাহাদুর’, ‘রায়বাহাদুর’, ‘রায়চৌধুরী’ প্রভৃতি খেতাবে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে সরকারের আজ্ঞাবহরূপে দাপট প্রদর্শন করেছে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, মেম্বর এবং ঋণ-সালিশি বোর্ডের সদস্যরা। এরা প্রত্যেকে আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং সামাজিকভাবে মর্যাদাসম্পন্ন। তবে সাধারণ মানুষ এদের ভয় করলেও অন্তস্তলে পোষণ করেছে তীব্র ঘৃণা।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর দুঃখ-দুর্দশার চিত্রায়ণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দক্ষ শিল্পী। তাঁর গল্পের অধিকাংশ নারীচরিত্রই সামাজিক বৈষম্যের শিকার। ধর্মীয় ও সামাজিক অপবিধানের কবলে পড়ে এদের অনেকেই বিপন্ন জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে; নিক্ষিপ্ত হয়েছে বিনষ্ট জীবনে। পরিবার কিংবা সমাজে তাদের মত প্রকাশের ন্যূনতম স্বাধীনতা ছিল না। এছাড়া তারা প্রায়শ পুরুষের কামনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

এমনকি সমাজে যারা শুদ্ধাচারের বার্তাবাহক, তারাও সুযোগ বুঝে অসহায় নারীর প্রতি বাড়িয়ে দিয়েছে প্রলুব্ধ হাত, মিটিয়ে নিয়েছে লেলিহান সাধ। অপমানে ও ক্ষোভে অনেক নারীলক্ষ্মীই বেছে নিয়েছে আত্মহননের পথ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্ক ভিন্ন তাৎপর্যে প্রতিভাত হয়েছে। নরনারীর হার্দ্যজাগতিক সম্পর্ক যুদ্ধ-মন্বন্তরের কারণে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি পেয়েছে তাঁর গল্পে। যুদ্ধোত্তর বাস্তবতায় দাম্পত্যজীবন যে নানাভাবে পীড়িত হয়েছে, ঝগড়া-কলহ-অবিশ্বাস যে প্রেমসম্পর্ককে নাজুক করে তুলেছে তাও প্রদর্শিত হয়েছে নারায়ণের গল্পে।

বাংলা ছোটগল্পে আঞ্চলিক জীবনচিত্রাঙ্কনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিভা অনন্য। সাঁওতাল পরগণা এবং দার্জেলিঙের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী, বরেন্দ্রভূমি কিংবা ডুয়ার্সের প্রান্তিক জনশ্রেণি তাঁর গল্পে শিল্পমূল্য পেয়েছে। এসব অঞ্চলের নিরুপদ্রব জীবনপ্রণালি সভ্যতার নামে কীভাবে ধূলিসাৎ হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত রয়েছে নারায়ণী গল্পে। নদীসংলগ্ন মানুষের জীবনযাত্রাও নারায়ণ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পরিস্ফুটিত করেছেন। এ ধরনের পট-পরিবেশ তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ফলত জেলে-মাঝিদের হতদশা ও সামাজিক বিড়ম্বনা তিনি বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত করেছেন। সামাজিক অন্যায়-অনিয়মের বিপরীতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দ্রোহের গল্পও লিখেছেন। তাঁর গল্পে সামাজিক অপরাধ-অপকর্মের বিরুদ্ধে সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছে একটি সচেতন শ্রেণি। এদের বিজয় সর্বক্ষেত্রে অর্জিত না হলেও, এরা নিশ্চুপ পরাজয় বরণ করেনি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন রাজনীতিসচেতন শিল্পী। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ না করলেও তিনি ছিলেন বামপন্থী রাজনীতির প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল এবং 'প্রগতি লেখক সংঘে'র অন্যতম সদস্য। তাঁর এই রাজনীতি-সম্পৃক্ততার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে ছোটগল্পে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় গল্পকার। ভারতীয় পরিমণ্ডলে এ যুদ্ধের বীভৎসতা এবং জনমানসে এর ঘৃণ্য প্রতিক্রিয়া তিনি বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। যুদ্ধকালে এতদঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যদের দৌরাত্ম্য, জাপানি বোমাহামলার আতঙ্ক, জার্মান-বিদ্বেষ প্রভৃতি তিনি ইতিহাসানুযায়ী সন্নিবেশিত করেছেন। সমকালীন অন্যান্য রাজনৈতিক সংগ্রামও তাঁর গল্পে প্রাসঙ্গিকভাবে স্থান পেয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিছিল স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ। বিশ্বযুদ্ধকালে কংগ্রেস ঘোষিত 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা করে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টির প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি তাঁর গল্পে যথাযথভাবে উন্মোচন করেছেন।

বাংলা ছোটগল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সর্বাধিক সাফল্য দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের গল্পরচনায়। তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরে লক্ষ-লক্ষ মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে, পক্ষান্তরে স্বার্থান্বেষী কিছু দেশীয় ব্যবসায়ী অর্থলোভে দানবিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ক্ষুধার্তের হাহাকার এবং মৃত্যুর মিছিলে ছিন্ন হয়েছে পারিবারিক বন্ধন, তলিয়ে গেছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খল। মহামারি-মন্বন্তর বাঙালির বাহ্যিক জীবনকে একদিকে যেমন বিপর্যস্ত ও জটিল করেছে, তেমনি তাদের মনোজগতে সৃষ্টি করেছে তীব্র অস্তিত্ব-সংকট। দেশ-জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিপন্ন মানুষের জীবনযন্ত্রণাকে তাঁর গল্পে শব্দরূপ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ-তাড়িত, অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষের মৃত্যুর ভয়ংকর-বীভৎস রূপ প্রদর্শনের মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং পারিপার্শ্বিক রূঢ় বাস্তবতা এবং সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি দ্রোহের বাণী উচ্চারণ করেছেন, এবং অনেকক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হয়েছেন এর কারণ-নির্ণয়ে এবং সমাধান-সন্ধানে। মন্বন্তরকালের শিল্পী হিসেবে এখানেই তাঁর চিন্তা-চেতনার স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সমবায়ে আবহমান বাংলার শান্তিপূর্ণ রূপ তাঁর গল্পে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। তবে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত ছোবলে ভারতবর্ষ কীভাবে রক্তাক্ত হয়েছে, এটিও তাঁর গল্পে স্পষ্ট। দেশভাগ এবং শরণার্থীদের জীবনসংকটের রূপায়ণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। যেহেতু তাঁর বাস্তুভিটে ছিল পূর্ববাংলায় এবং সেখানেই তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত হয়েছে, সেহেতু পূর্ববাংলার মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি ছিল তাঁর নাড়ির টান। এজন্য ১৯৪৭ সালের দেশভাগ প্রক্রিয়াকে তিনি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। দেশবিভাজনের ফলে তাঁর অন্তর্লোকে যে বেদনা ও দাহ, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অনেক গল্পে। এসব গল্পে দেশভাগের নেপথ্যে রাজনীতিবিদদের হীন স্বার্থচিন্তা যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি দেশভাগের পরবর্তী পর্যায়ে শরণার্থীদের উপদ্রুত জীবনযাপনও ভাষারূপ পেয়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে রাজনীতি ও দেশপ্রেম অভিন্ন। দেশ ও জনবিরোধী যে কোনো কার্যক্রমে তিনি ছিলেন সদাসোচ্চার। একারণে তাঁর গল্প হয়ে উঠেছে সমকালীন রাজনৈতিক আদর্শ ও আদর্শচ্যুতির প্রতিরূপ। কেবল কলকাতা নয়, পূর্ববাংলার প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামও তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং শিল্পরসে জারিত করে তাঁর গল্পে উপস্থাপন করেছেন। বিগত শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ভারতবর্ষের সমাজ ও রাজনীতিতে যে রূপ-রূপান্তর সাধিত হয়েছে তার অনুপুঙ্খ চিত্রায়ণ ঘটেছে নারায়ণের ছোটগল্পে। এদিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প ও সাহিত্যভাবনার তিনি প্রাগ্রসর

উত্তরসূরি। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী সময়ের উত্তাল ও ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ঘটনাপুঞ্জের যে স্বাক্ষর তাঁর গল্পশরীরে উৎকীর্ণ হয়েছে তা সমকালীন অথবা পরবর্তী অন্য কোনো কথাসাহিত্যিকের ছোটগল্পে দুর্লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছোটগল্প সমকালীন সমাজ-রাজনীতির বিশ্বস্ত দলিলও বটে।

বিষয়বয়নেই শুধু নয়, প্রকরণ-প্রসাধন বিন্যাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সফল শিল্পীব্যক্তিত্ব। তিনি যেহেতু ছোটগল্পশিল্পের গবেষক ও তাত্ত্বিক, সেহেতু তাঁর গল্প প্রকাশ-প্রকরণে শুদ্ধ ও শীলিত। তিনি তাঁর গল্পে বিষয়ানুসারী ভাষা ব্যবহার করেছেন। এ ভাষা গল্পের পট-পরিবেশ ও জীবনানুষঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। গল্পে প্রাণাবেগ সঞ্চারিত করতে তিনি প্রয়োগ করেছেন লোকজীবন থেকে আহরিত প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা, লোকগান, ছড়া, মন্ত্র প্রভৃতি। অলঙ্কার ব্যবহারেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষকরে উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে তিনি লোকজীবনাভিজ্ঞতার অনুসারী। সবমিলিয়ে, কালচেতনার সঙ্গে নন্দনচেতনা, প্রতিরোধ কিংবা প্রতিবাদী কর্মোদ্যোগের সঙ্গে আশাবাদের এক অত্যাশ্চর্য সম্মিলন ঘটেছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

বর্ণক্রম-অনুসারে

মূল গ্রন্থ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *অগ্রন্থিত রচনা*, কথাসত্য, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *গল্পসমগ্র* (অখণ্ড সংস্করণ), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৪২০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৯

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (*দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পঞ্চম মুদ্রণ : কার্তিক ১৪২০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পঞ্চম মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪১৯

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (চতুর্থ খণ্ড), প্রাগুক্ত, চতুর্থ মুদ্রণ : মাঘ ১৪১৯

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (পঞ্চম খণ্ড), প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪১৮

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রাগুক্ত, তৃতীয় মুদ্রণ : কার্তিক ১৪০৪

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (সপ্তম খণ্ড), প্রাগুক্ত, চতুর্থ মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪১৯

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (অষ্টম খণ্ড), প্রাগুক্ত, তৃতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪১২

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (নবম খণ্ড), প্রাগুক্ত, তৃতীয় মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১৮

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (দশম খণ্ড), প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪০৫

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (একাদশ খণ্ড), প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪০৫

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (দ্বাদশ খণ্ড), প্রাগুক্ত, তৃতীয় মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৮

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, দশম মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪০৮

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *সমগ্র কিশোর সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৮

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *সুনন্দর জার্নাল*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ : মাঘ ১৪২২

সহায়ক গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *কল্লোল যুগ*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দশম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪১৬

অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় : *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : মননে ও সৃজনে*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৫

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, ড. : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : ছোটগল্পের রূপকার*, আর্ট পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৫

অমর্ত্য সেন, অধ্যাপক : *দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ* (কবীর চৌধুরী অনূদিত), মাতৃভূমি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২০

অমলেন্দু সেনগুপ্ত : *উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব*, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ২০০৬

অমলেশ ত্রিপাঠী : *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস* (১৮৮৫-১৯৪৭), আনন্দ, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪২৩

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কালের পুত্তলিকা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : জুন : ২০১৫

অশ্রুকুমার সিকদার : *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৫

আবুল কাসেম ফজলুর হক : *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য*, খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭৯

আবুল কাসেম ফজলুল হক : *আশা- আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৩

আহমদ রফিক : *দেশভাগ : ফিরে দেখা*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১৪

উত্তম রায় : *সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে কথনশৈলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : দীপাবলি ২০১০

কামরুদ্দীন আহ্‌মদ : *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ইনসাইড লাইব্রেরী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৩৮৩

কৃষ্ণা বসু : *ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শিল্পরূপ ও জীবনবোধ*, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৩

গিয়াস শামীম : *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০১৯

গিয়াস শামীম : *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৫

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয়

সংস্করণ : আগস্ট ২০১০

জয়া চ্যাটার্জী : *বাঙলা ভাগ হল* (আবু জাফর অনূদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮

জয়া চ্যাটার্জী : *দেশভাগের অর্জন* (আবু জাফর অনূদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে ২০১৭

জান্নাত আরা সোহেলী (সম্পাদিত) : *শ্রেষ্ঠ গল্প তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়* (শ্রেষ্ঠ গল্পমালা সম্পাদক : ডক্টর গিয়াস শামীম), ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

জীবেন্দ্র সিংহ রায় : *প্রমথ চৌধুরী*, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৯৫

তানিম জসিম (সম্পাদিত) : *শ্রেষ্ঠ গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (শ্রেষ্ঠ গল্পমালা সম্পাদক : ডক্টর গিয়াস শামীম), ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত) : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : মাস্টারমশাই*, কোরক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৮

দর্শন চৌধুরী : *গণনাট্য আন্দোলন*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৯

দেবব্রত ঘোষ : *দেশভাগ ও স্বাধীনতা*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৭

ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত) : *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩

ধনঞ্জয় রায় (সম্পাদিত) : *তেভাগা আন্দোলন*, আনন্দ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ : নভেম্বর ২০১৫

নরহরি কবিরাজ : *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা*, মনীষা, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৭৮

নিতাই বসু, ড. : *তারাশঙ্করের শিল্পীমানস*, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ : মার্চ ২০১২

প্রভাস রায়চৌধুরী : *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৪

প্রমথনাথ বিশী : *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪

বিজিত ঘোষ, ড. : *বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা*, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০০

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় : *দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় শোভন সংস্করণ : ২০১২

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০২

বীরেন্দ্র দত্ত : *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৯

বেগম আকতার কামাল : *বিশ্বযুদ্ধ, জীবন ও কথাশিল্প*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪০৭

ভীষ্মদেব চৌধুরী : *জগদীশ গুপ্তের গল্প : পঙ্ক ও পঙ্কজ*, ফুলদল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৫

ভূদেব চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৭৫

ভূদেব চৌধুরী (সম্পাদিত) : *মনোজ বসুর গল্পসমগ্র* (আদিপর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৮২

মধুশ্রী মুখোপাধ্যায় : *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র*, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৭

মফিদুল হক : *দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ : ২০১২

মীর হুমায়ূন কবীর (সম্পাদিত) : *শ্রেষ্ঠ গল্প বনফুল* (শ্রেষ্ঠ গল্পমালা সম্পাদক : ডক্টর গিয়াস শামীম), ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

মুহম্মদ ইদরিস আলী : *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

মোহসিনা হোসাইন (সম্পাদিত) : *শ্রেষ্ঠ গল্প সুবোধ ঘোষ* (শ্রেষ্ঠ গল্পমালা সম্পাদক : ডক্টর গিয়াস শামীম), ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

রথীন্দ্রনাথ রায় : *ছোটগল্পের কথা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ১৯৯৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *সোনার তরী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪১৯

শঙ্কর কুমার দাস : *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৬

শরীফ সিরাজ (সম্পাদিত) : *শ্রেষ্ঠ গল্প শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* (শ্রেষ্ঠ গল্পমালা সম্পাদক : ডক্টর গিয়াস শামীম), ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

শিপ্রা দে : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প*, শৈলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৬

শিশিরকুমার দাশ : *বাংলা ছোটগল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ : আগস্ট ২০১২

শীতল চৌধুরী (সম্পাদিত) : *তারাশঙ্করের ছোটগল্প : রূপ ও বৈচিত্র্য*, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৩

শীতল চৌধুরী : *বাংলা ছোটগল্পের তিন নক্ষত্র*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১১

শেখ মুজিবুর রহমান : *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *দাঙ্গার ইতিহাস*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ : পৌষ

১৪২১

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য : *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* – দ্বিতীয় খণ্ড, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৭১

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ পুনর্মূদ্রণ সংস্করণ : ১৩৮০

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বিক্ষুব্ধ বাংলা*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৪

সরোজ দত্ত : *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

সরোজ দত্ত : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৫

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১২

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া* খণ্ড ৭, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০১১

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া* খণ্ড ১১, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০১১

সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত) : *পৌরাণিক অভিধান*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

সুস্মিতা ঠাকুর : *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৪১৮

সেমন্তী ঘোষ (সম্পাদিত) : *দেশভাগ : স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, গাঙচিল, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৪

সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পাদিত) : *কামরুল হাসান : বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০

সৈয়দ আজিজুল হক : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, কথাপ্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Brander Matthews : *The Philosophy of the Short-Story* , Andesite Press, India 2017

Jawaharlal Nehru : *The Discovery of India,* A John Day Book, US, 1946

Karl Beckson & Arthur Ganz : *Literary Terms* : *A Dictionary*, 7th Printing, N.Y., U.S.A, 1982

Maulana Abul Kalam Azad : *India Wins Freedom* (the complete version), Orient BlackSwan, India, October 1988

R. C. Majumdar : *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century*, Firma K. L. Mukhopadhyay ,Calcutta, January 1960

Valerie Shaw : *The Short Story : A Critical Introduction*, Routledge, India, January 2017

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

উত্তম পুরকাইত (সম্পাদিত) : *উজাগর*, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা (দ্বাদশ বর্ষ ॥ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা), উজাগর প্রকাশন, হাওড়া, ১৪২১

তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম বর্মণ (সম্পাদিত) : *কোরক*, কলকাতা, বইমেলা ১৩৯৮

সঞ্জীবকুমার বসু (সম্পাদিত) : *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, বর্ষ ২৭ ॥ সংখ্যা ৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮